নজরানা

অমরেন্দ্র দাস

শ্রীগুরু পাবলিকেশন ২৩এ, নূর আলি লেন, কলিকাতা-১৪

প্রথম (শ্রীগুরু) প্রকাশ

আগষ্ট ১৯৪২

প্রকাশিকা

শিউলি দাস

২৩এ, নুর আলি লেন

কলিকাতা-৮

সমীক্ষা প্রেস

৪৭, শশিভূষণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

নজরানা

শাহজাহানের অমর কীর্তি ঐ তাজমহল

লোকে জানে সম্রাট শাহজাহান তার প্রিয় পত্নী মমতাজকে কি ভাল বাসতেন। সেই ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ তিনি রচনা করেছেন 'তাজমহল'। যা দেখে আজও লোকে বিস্ময়ে ভাবে, কি ভালবাসতেন সম্রাট শাহজাহান তাঁর পত্নীকে? এই মর্মর স্মৃতিসৌধ তাজমহলকে নিয়ে কবি কত কাব্য রচনা করেছেন কিন্তু কেউ কি একবারও ভাবেন এই তাজমহল রচনা প্রেমের স্মৃতির জন্যে নয় রাষ্ট্রনীতির আর এক চাতুরী। সম্রাট শাহজাহান কখনও তার পত্নীকে ভালবাসেন নি বরং নীরবে নির্যাতন করেছেন। আর সবচেয়ে যেটা তাঁর স্বভাব ছিল প্রেমের ভান করা। এখানে শুধু মমতাজ নয় আনারকলিসা নামে একজন নারী সম্রাটের কাছ থেকে কি ব্যবহার পেয়েছিল তার কথা লেখা হয়েছে পাঠক অবাক হয়ে যাবেন একজন নারী যার সমস্ত হৃদয় ঢেলে সম্রাটকে রাজপ্রাপ্তিতে সাহায্য করেছিল, সম্রাট শাহজাহান তাকে কি নজরানা দিয়েছিলেন?

চলছে তাঞ্জাম। চলছে উর্ধ্বশ্বাসে। এমনভাবে চলছে, যে চলার শেষ নেই। যে চলার বিরাম নেই। অবিরাম সে চলা। থামবে না। কখনও যে থামবে, তাও মনে হয় না। আদৌ কোনদিন থামবে কিনা তারও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

বাদশাহ্ তাঞ্জামের গায়ে রোদ্দুরের ঝিলিক। স্বর্ণবর্ণের রৌদ্রের আলোয় বাদশাহী তাঞ্জামের গায়ের অলঙ্কারাজি জ্বলছে। দারুণভাবে জ্বলছে। আগুনের মত জ্বলছে। যেন একঝলক চলন্ত আগুন।

মরুভূমির ওপর দিয়ে তাঞ্জাম চলেছে। চারদিকে ধু ধু বালি। বালি আর বালি। বালির পাহাড়ের ওপর দিয়ে তাঞ্জাম চলেছে। তাঞ্জামবাহীদের পাগুলি যেন যন্ত্রের মত নামছে আর উঠছে। কালো কালো পাগুলির বিচিত্র চলায় কেমন যেন অশান্ত গতি। রৌদ্রের তাপে বাহীদের দেহ ঘামে চুবুচুবু। তাদের মুখে একটি বিচিত্র শব্দ। সে শব্দের সঙ্গে কোন কিছুরই তুলনা হয় না।

এ শব্দ ছাড়া আরো শব্দ আছে ঘোড়ার খুরের। টগ্‌বগ্‌ করে ঘোড়া ছুটে চলেছে। সামনে ও পিছনে এক একদল ঘোড়-সওয়ার। তাদের পরণে সৈনিকের পোষাক। মোগলসৈন্যের পোষাক। বাদশাহী সৈন্যের পোষাক। সে পোষাকের চমৎকারিত্বে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

তাঞ্জাম চলেছে মরুপ্রান্তর দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে। ঘেরা আবরণীর মধ্যে কে আছে কেউ জানে না। কে যায় কার আহ্বানে সাড়া দিতে তারও কোনও হিসাব কেউ বলতে পারে না। তবে এ তাঞ্জাম এত দ্রুত চলছে কেন? তবে কি কেউ পালাচ্ছে কারো হাত থেকে বাঁচবার জন্যে? আওরত তার ইজ্জত বাঁচানোর জন্যেই তো এমনি করে পালিয়েছে যুগ যুগ ধরে? তবে কি কোন আওরত এই তাঞ্জামের গহ্বরে লুকানো অবস্থায় দিল্লী থেকে তামাম মরুপ্রান্তর টপকিয়ে রাজস্থানের পথে ছুটে চলেছে? কিন্তু কেন? কিসের জন্যে এই পলায়নাভিপ্রায়?

ধূলোর কুয়াশা সমস্ত প্রকৃতিকে ছেয়ে ফেলেছে। প্রচণ্ড নিদাঘের মাঝে সূর্যতাপের রশ্মিচ্ছটায় দিগন্ত উদ্ভাসিত। সেই প্রখর তাপের মধ্যে দিয়ে তাঞ্জাম চলেছে উর্ধ্বশ্বাসে। তাঞ্জামের দরজার ফাঁক দিয়ে দুটি তৃষ্ণাতুর চোখের কাতর চাউনি। হ্যাঁ, দুটি চোখ ছাড়া আর কিছু নয়। শুধু দুটি চঞ্চল হরিণী চোখ। সেই চোখদুটি ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করে কি যেন খুঁজছে? চোখ দুটিতে ভয়ের মেদুর-ছায়া। কেমন যেন সভয়ে চোখ দুটি রাজ্যের দুশ্চিন্তা নিয়ে অপেক্ষামানা।

তারপর একসময় তাঞ্জামের দরজা আর একটু ফাঁক হল। ঝলকে উঠলো এক-ঝলক জৌলুস। গোলাপীরঙের একখানি পদ্মপাপড়ির মত মুখ। দেখা গেল কুসুম কোমল রসটইটুম্বুর অধর যুগল থর থর করে কাঁপছে। কেন কাঁপছে অমন সুন্দর অধরযুগল? তবে কি ঐ আওরতের জীবনে কোন সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে? মাসুম জোয়ানি লেড়কীর ইজ্জতের নজরানা চায় কেউ? দুশমণের হুঁশিয়ারী চোখের বৃত্তে বাধা পড়ে আওরত অনিচ্ছায় দিতে স্বীকৃত হয়েছে নিজের যৌবনের অমূল্য-ঐশ্বর্য। আর সেইজন্যে তার মনে যত বেদনা! সেইজন্যে কান্নার পাহাড়! আর সেইজন্যে

হারাবার ভয়ে কবুতরের ছোট্টবুকের মাঝে কম্পনের দিশাহারা।

কিন্তু কে সেই ভাগ্যবান নওজোয়ান, যে এই কুসুমিত বক্ষ রক্তাক্ত করে ছিঁড়ে নিতে চায় তার স্বপ্ন ?

এসব কল্পনা তাঞ্জামের মধ্যে যে আছে তার কথা ভেবেই অনুচ্চারিত হয়। আর তাঞ্জামকে বেষ্টন করে ঘোড়সওয়ারদের দ্রুত চলাতেই আরো প্রতীয়মান হয়।

এইসময় তাঞ্জামের সামনের ঘোড়সওয়ার দলের অধিনায়কের মনের রঙীন কল্পনাটুকু কেউ জানতে পারলে বুঝি এই পর্যটনের উদ্দেশ্য কতকটা স্পষ্ট হয়ে যায়। অধিনায়কের নাম মহম্মদ ওসমান। ওসমান ভাবছে অনেক স্বপ্নময় রঙীন ছবি। সে কল্পনা করছে না। বাস্তবের ছবিই ভাবছে। তাঞ্জামের মধ্যে ঐ মাসুম আওরত যার বিনিময়ে এই অভিযান চালাতে ওসমানকে দিয়ে স্বীকার করিয়েছে, তার মূল্যায়ন বড় কম নয়। ওসমান সেইজন্যে ভাবছে—সামান্য এক তুচ্ছ অভিযানের বিপরীতে যদি এমন এক পাওয়া হয়, তবে মন্দ কি ? সে না হয় বেইমানের আশ্রয় নিয়ে সেনাধ্যক্ষকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে, আর তার বিনিময়ে যে এক মাসুম আওরত তার যৌবন উপঢৌকন দিচ্ছে! কার ব্যয় কত বেশী ?

একটি আওরত দেবে বলেছে তার ইজ্জতের রোশনাই। দস্যুর মত লুণ্ঠন করে নয়, স্বইচ্ছায় আপন সুরভিত দেহোপচার। তার মধ্যে যে আনন্দ আছে, ঐ নওজোয়ান ওসমান তা জানে। আর জানে বলেই সম্রাট জাহাঙ্গীরের সৈন্যবাহিনীর সেরা সৈনিক বলে পুরস্কার পেয়েও গভীর নিশীথে এক আওরতের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারে নি।

কয়েক ঘণ্টা আগের সে কাহিনী।

গভীর রাত্রে ওসমানের দরজায় এসে কে যেন ঠুক্ ঠুক্ করে শব্দ করতে লাগলো। ওসমানের ঘুম বেশ পাতলা। আচমকা উঠে বসে পল্তের আলোটা বাড়িয়ে দিল। ঘর আলোকিত হল। একটু বিস্ময়ে ওসমান বন্ধ দরজার দিকে তাকালো।

আবার বাইরে থেকে কে যেন ছোট ছোট ধাক্কা দিতে লাগলো।

ওসমান ঘরের দরজার আগলটা খুলে দিল।

ছিট্‌কে ঘরে ঢুকলো জুবেদা। জুবেদা ঘরে ঢুকেই দরজায় আগলটা পরিয়ে দিল।

ওসমান জুবেদাকে এতরাত্রে দেখে দারুণ বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু জুবেদা আগলটা লাগাতে যেতেই ওসমানের সমস্ত পৌরুষ মাথা চাড়া দিয়ে চীৎকার করে উঠলো। বললো—একি করছো জুবেদা ? এতরাত্রে এক নওজোয়ানের ইজ্জত কলঙ্কিত করছো কেন ?জুবেদা দরজার আগলটা তুলে দিতে দিতে ওসমানের কথায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। কিন্তু ওসমানের কথা শেষ হলে সে ঠোঁট উলটিয়ে মুচকি হেসে খিলটা ভাল করে দরজায় এঁটে পরীক্ষা করে আবার ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো—পুরুষমানুষের আবার ইজ্জত !

তারপর ওসমানের সামনে সরে এসে বললো—তাছাড়া আবার সৈনিক। সৈনিকের ইজ্জত বলে কি কিছু আছে ?

কেন ?

যেসব পরাজিত রাজপরিবারের আওরত তারা লুণ্ঠন করে, সেগুলো নিয়ে কি করে ? এই বলে জুবেদা আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো।

ওসমান হতবুদ্ধির মত উত্তর দিল—সে সব আওরত বড় বড় উপাধিধারীদের ভোগে লাগে।

জুবেদা মুচকি হেসে বললো—তুমি তো সেদিন সম্রাজ্ঞী নূরজাহান কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছ ?

সে তো আমার কর্মকুশলতায়।

তেমনি ভোগের জন্যও পাবে অমূল্য পুরস্কার !

ওসমান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো—আমার জীবনে সেদিন কখনও আসবে না।

জুবেদা খিল খিল করে হেসে বললো—বাস্‌রে এই একটুতে এত বড় দীর্ঘনিশ্বাস ! রসিকতাও বুঝি বোঝো না।

হঠাৎ ওসমান বর্তমানে ফিরে এসে সৈনিকের কণ্ঠে বললো– ওসব বাজে কথা ছেড়ে এখন আসল কথা বলো, এই এতরাত্রে আমার ঘরে এসেছ কেন ? যদি কোন সংবাদ দেওয়ার অভিলাষ থাকে তাহলে সত্বর পেশ কর, নতুবা আমার কক্ষ ছেড়ে শীঘ্র চলে যাও। কোন সৈনিকের চোখে পড়লে ওপরওয়ালার কাছে কৈফিয়ৎ তলব হবে।

জুবেদা মাথায় অল্প ওড়নার আবরণ টেনে আলোর সামনে মুখ ফিরিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিল। তার চোখ দুটিতে যেন অভিসারিকার চিহ্ন। সে যেন নিজেকে সঁপে দেবার জন্যে রহস্যচ্ছলে নানান ভঙ্গিমা প্রদর্শন করছে।

তাই ভেবে ওসমান ক্ষিপ্ত হয়ে বললো—বেসরম আওরত, এই যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তাহলে এইমুহূর্তে আমার কক্ষত্যাগ করে চলে যাও।

জুবেদার রমণীমনে হঠাৎ আঘাত লাগলো। সে আহত হয়ে দাঁত দিয়ে অধর চেপে ধরে নিজেকে সংবরণ করে ক্ষুব্ধস্বরে বললো—অহঙ্কার ! তারপর জুবেদা মাথা উঁচু করে বললো ·····আমি সেইজন্যে আসি নি মহম্মদ ওসমান বাহাদুর ! আমি এসেছি সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের প্রধান উপদেষ্টা ওমরাহ ইব্রাহিমের কন্যা আনারউন্নিসার এত্তেলা নিয়ে। আর তারই জলদি ফরমাইসিতে এই নিশীথ রাত্রে এখানে আসা।

ওসমান আনারের নাম শুনে চমকে উঠলো। যদিও সে জানতো জুবেদা আনারের প্রধানা বাঁদী। তবু আনার জুবেদাকে পাঠিয়েছে, এ একেবারে মনে হয়নি। সে ভেবেছিল জুবেদা এসেছে নিজের প্রয়োজন মেটাতে। এই এতো রাত্রে আনার তাকে পাঠাতে পারে, এ যেন স্বপ্নেরও অগোচর। কিন্তু যা স্বপ্ন বলে মনে হয়, তাই এইরাত্রে সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আনারউন্নিসা স্মরণ নিয়েছে তার। এক নওজোয়ান পুরুষ সৈনিকের পক্ষে এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কিসে হতে পারে ? এক জোয়ানী খুবসুরত আওরত তাকে ডেকেছে। সে আওরত কোন শস্তা বংশগৌরবের ইন্তেজারী নয়। বাঁদী বলেও কেউ তাকে গাল দিতে পারে না। সে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে

একজন নামকরা ওমরাহের বেটি। আনারউন্নিসা। আনারউন্নিসার রূপ দেখে জাহাঙ্গীর মহিষী নূরজাহান তাঁর হারেমে স্থান দিয়েছেন। বাদশাহজাদীর সম্মানে ভূষিতা হয়ে আনার বেগমমহলের সুখশয্যায় শুয়ে বাদশাহী আরাম উপভোগ করছে।

সেই আনারের সঙ্গে ঘটনাচক্রে একদিন ওসমান পরিচিত হয়েছিল। ফিরছিল ওসমান রাজদরবার থেকে। একটি গলি-পথ। বেগম-মহলের পথ দিয়ে বাইরে আসার মুখে মিলিত হয়েছে। ওসমান সৈনিকের বেশে নানান আবোল-তাবোল চিন্তার মধ্যে হাবু-ডুবু খেতে সেই গলিপথ দিয়ে ফিরছিল। গলিপথটি খুব প্রশস্ত নয়। দুজন দুপাশ দিয়ে বেশ যাওয়া-আসা করতে পারে কিন্তু অন্যমনস্ক হলেই ধাক্কা লাগবার সম্ভাবনা। একজন অন্যমনস্ক হয়ে আসছিল কিন্তু আর একজন সচেতন হয়েই ধাক্কা মারলো। ধাক্কা মেরে সে খিল খিল করে হেসে উঠতেই ওসমান চমকে উঠলো। তার চিন্তা-জাল ছিন্ন হয়ে গেল। সামনে তাকিয়ে সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে সে আনারের দিকে তাকিয়ে কুর্নিশ করতে গেল।

তাই দেখে আনার হো হো করে হেসে উঠে বললো—একি—তুমি কি সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের সামনে হাজির হয়েছ? আমি আনার। আনারউন্নিসা। বেগম নয়। এক বেসরম মাসুম লেড়কী। তোমার নাম কি নওজোয়ান?

ওসমানের মুখ দিয়ে শুধু অস্ফুটস্বরে বের হল—ওসমান! সে দেখেই চিনেছিল আনারকে। এত রূপ যার সে কি আনার না হয়ে যায়? জেনানা মহলের মধ্যে দুটি খুবসুরত আওরতের কথাই সবার মুখে শোনা যায়, একজন নূরজাহান ও অন্যজন এই আনার। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানকে বহুবার ওসমান দরবারের চিকের আড়ালে দেখেছে। সম্রাজ্ঞীর রূপ সচক্ষে না দেখলেও চিকের আড়ালে দেখে অভিভূত হয়েছিল। কিন্তু এখন আনারকে একেবারে বুকের সীমিতে উষ্ণ নিশ্বাসের মাঝে উপলব্ধি করে যেন অবশ হয়ে গেল।

আনার তার দুচোখের মাঝে মোহিনী মায়া সৃষ্টি করে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো—তুমি আমাকে চেনো নওজোয়ান?

ওসমান মাথা নেড়ে বললো—হ্যাঁ, আনারউন্নিসা বিবি!

বিস্মিত হয়ে আনার জিজ্ঞেস করলো—চিনলে কেমন করে?

ওসমান চুপ করে রইল। মনে মনে ভাবলো—যদি কোন বেওকুফের মতো কথা বের হয়ে যায়, তাহলে সম্রাজ্ঞীর কানে ওঠার সম্ভাবনা। তাই যে কথা মুখে আসছে তাকে লাগাম পরানোই শ্রেয়। তাই সে চুপ করেই রইলো। কোন উত্তর দিল না।

আনার বোধ হয় ওসমানের মনের কথা বুঝতে পারলো, সে বললো, নওজোয়ান, তুমি নির্ভয়ে বলতে পারো তোমার মনের কথা। আনারকে তুমি চেনো না, তার রূপও যেমন জ্যোৎনার মতো স্বচ্ছ, তেমন দিলও! নওজোয়ার তোমার খুশীতে যা মনে আসে আমাকে বলতে পারো আমি কিছু মনে করব না।

ওসমান সাহস পেয়ে তাই বললো—এতদিন আনারউন্নিসার রূপের কথাই শুনে এসেছি, সে রূপ যে এত খুবসুরত তা জানতাম না। তাই অবাক হয়ে নীলাকাশের

মাঝে চন্দ্রের রোশনাই দেখে অভিভূত হচ্ছি আর ভাবছি, চন্দ্রও বুঝি এ রূপের কাছে ম্লান।

হঠাৎ আনার উল্লসিত হয়ে হেসে বললো—দেখলে তো নওজোয়ান, যদি এই কথার তোড়ে বন্ধন সৃষ্টি করে দিতাম, তাহলে কি তোমার কাছ থেকে এমনি স্তুতি শুনতে পেতাম? যাক্ তবু ভাল, একজন নওজোয়ানের মুখে আমার সুরতের বাহবা পেলাম।

ওসমান সাহস পেয়ে আবার বললো—কেন এব আগে কি কোন নওজোয়ান এমনি বাহবা দেয় নি?

আনারউন্নিসা গোলাপী ঠোঁট উলটিয়ে হাত নেড়ে বললো—কই, এ সুরতের ইনাম পেলাম কোথায়? তা ছাড়া থাকি বেগমমহলে, দেখা হয় মাত্র সম্রাটের সঙ্গে। সে সম্রাটও এমন সরাবের নেশায় বেঁহুস হয়ে থাকেন যে, চোখ মেলে কখনও দেখতেই পান না। যখন কোন সময়ে একবার কখনও চোখ মেলেন, তখন সেই চোখের সামনে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান। এই বাঁদী সেই দুর্লভ চোখের ধারে কাছেও আসতে পারে না। তাই এই সুরতের কোন ইনাম মেলে না। আজ তোমার কথায় তাই এই শুভ-দিনটিকে চিহ্নিত করে রাখতে ইচ্ছা করছে।

এই সময় গলিপথে পদধ্বনি শোনা গেল।

ওসমান সচকিত হয়ে উঠলো। সভয়ে বললো—আনারবিবি আমাকে মেহেরবাণী করে ক্ষমা কর। কে যেন আসছে, আমি যাই।

আনারের কিন্তু ভয় করলো না। সে নির্বিঘ্নে বললো—ভয়ের কি আছে? আমরা তো অন্যায় কিছু করছি না। থোড়া বাতচিত করছি।

না, না তোমার কিছু হবে না। তোমার আব্বাজান দরবারের মানীলোক। তুমি সম্রাজ্ঞীর প্রিয়পাত্রী। আমি সামান্য এক সৈনিক আমার ঔদ্ধত্য কেউ ক্ষমা করবে না।

ওসমান চলে যায় দেখে হঠাৎ আনাব বললো—নওজোয়ান, আজকের এই দিনটি স্মরণে থাকবে।

থাকবে! থাকবে! ওসমান তখন পলায়নোদ্যত।

ভুলবে না? যদি কখনও প্রয়োজন হয় ডাকলে সাড়া দেবে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেবো।

পদশব্দ আরো কাছে আসতে আনার তাড়াতাড়ি বললো—নওজোয়ান, তুমি এক সুন্দর আওরতের মহব্বত পেয়েছ। যদি কোন বাধা না উপস্থিত হয়, তাহলে আবার আমরা মিলবো।

গলিমুখে মানুষের দেখা মিলতে দুজনেই দুপথে চলে গেল।

আনারের তখনকার মানসিক অবস্থা কি হয়েছিল জানা যায় নি. তবে ওসমানের মনের অবস্থা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সে যেন আহত হয়ে যন্ত্রণা নিয়ে তার ঘরে ফিরেছিল। বার বার তার মনে হয়েছিল, সে তো এমনি করে কাকেও মনের মধ্যে আহ্বান করে নি, তবে কেন এই আকস্মিক দুর্লভবস্তুটি তাকে হাতছানি দিয়ে

ডাকলো ? এ ডাক জীবনে আলোয়ার মতই মনে হয়। কেন সে ডাকলো ? কেন তার দেখা আকস্মিক মিললো ? সে সৈনিক। তার জীবন যুদ্ধের জন্য, মহব্বতের জন্য নয়। যুদ্ধে জীবন উৎসর্গীকৃত করার জন্যে সে সৈনিক হয়েছে। যদি দু'চারটে যুদ্ধে কোনোরকমে তরোয়ালের আঘাত এড়িয়ে বেঁচে যায়, তাহলে হয়তো উপরি পাওনা স্বরূপ জুটবে সম্রাটের নিজের হাতের পুরস্কার। তার বেশী সৈনিক আর কি আকাঙ্ক্ষা করতে পারে ?

আনারের কথা মাঝে মাঝে মনের মধ্যে আসে নি এমন নয়। কিন্তু সে অপরাধ বলে মনে করে নি। কারণ তার ধমনীতে যুবকের রক্ত, যৌবনও যে অসির ঝনঝনানিতে ঘুমিয়ে পড়েছে, তা নয়। বরং যৌবনের উন্মাদনা তাকে এক একসময়ে যুদ্ধের হট্টগোলেও পাগল করেছে। আনার সেই উন্মাদনার খোরাকই জুগিয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। একটি নওজোয়ান একটি জোয়ানী মাসুম লেড়কীকে ভাববে, এতে আর অন্যায় কি ? তাছাড়া আনার খুবসুরত। অনেক বড় বড় উপাধিধারী সৈনিক-পুরুষের সে আলোচনার বস্তু। ওসমান দেখেছে, বড় বড় কেতাদুরস্ত সৈনিকপুরুষরা আনারউন্নিসার যৌবনলাভের আকাঙ্ক্ষায় কত কৌশল অবলম্বন করছে। আর সেই আনারউন্নিসার সাথে হঠাৎ তার দেখা হয়ে গেল, আর আনার তার দিলে আগুন জ্বালিয়ে মহব্বতের রোশনাই জ্বালিয়ে গেল।

না না, এ স্বপ্ন। কিন্তু তাই বা সে কেমন করে বলবে ? তবে কি আনার কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে পথ তৈরী করে গেল ? আওরত নিজের স্বার্থের জন্যে যেমনি অন্যকে কাছে টানে, তেমনি কি কোন প্রয়োজনের জন্যে আনার তাকে মুগ্ধ করে গেল ? কিন্তু তাই বা কেমন করে হয়—সে যে স্পষ্ট করে বললো—'নওজোয়ান তুমি এক সুন্দর আওরতের মহব্বত পেয়েছ।' কিন্তু মহব্বত পেয়ে লাভ কি ? আনার কি তাকে শাদী করে সেই মহব্বতের সোহাগ পূর্ণ করবে ? কখনই না। ঐরকম সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুমের মত যৌবন নিয়ে যে কত আওরত লাখো লাখো আমীর ওমরাহদের হৃদয় ছারখার করে দিতে পারে, সে আওরত কি এক সামান্য সৈনিককে শাদী করতে পারে ?

তবে কেন আনার তাকে এমনি লুব্ধ করে মজিয়ে গেল ? একটি সামান্য সৈনিক না হয় তার কাছে অবজ্ঞার বস্তু, কিন্তু একটি হৃদয়ের কি কোনো মূল্য নেই ? একটি সৈনিকের হৃদয় আর সম্রাটের হৃদয় কি এক নয় ? তবে কেন এ ছিনিমিনি খেলা খেলে গেল আনার !

জবাব সেদিন মেলেনি। সেদিন কেন আরো অনেকগুলি দিন ও রাত্রি সংশয়ের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে গেল।

যত দিন ও রাত্রি গেল তত নানান দুষ্ট-চিন্তা এসে ওসমানের মনে বাসা বাঁধলো। ওসমান আস্তে আস্তে আনারের সম্বন্ধে কোমল ভাব ত্যাগ করে কঠিন হয়ে উঠলো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল,—না, এ রমণী যদি আর কখনও এমনি আচরণ করে তাহলে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। সামান্য সৈনিক সে হতে পারে কিন্তু একেবারে

পৌরুষহীন তো নয় !

তারপর এইরাত্রে জুবেদার আগমন।

ওসমান বিস্ময়ে বললো—কিন্তু এত রাত্রে আনারউন্নিসা বিবির আমাকে কি দরকার ?

জুবেদা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো—আমরা বাঁদী জনাব। মালেকা মনের খবর জানবো কেমন করে ?

কিন্তু আমি যদি না যাই ?

মালেকার ডাক উপেক্ষা করতে পারে, এমন তো কাউকে আজ পর্যন্ত দেখিনি !

তোমার মালেকা আমাকে কি জন্যে ডেকেছে, না জানা পর্যন্ত আমি যাব না।

জুবেদা বিস্মিত হয়ে বললো—কিন্তু মালেকা তো আমাকে সেকথা বলেনি !

তাহলে তুমি ফিরে যাও জুবেদা, আমি যাব না। যদি দেখা করার প্রয়োজন হয়, তাহলে বলে দিও—আগামীকল্য মধ্যাহ্নে সেই গলিপথে—যেখানে প্রথম দেখা হয়েছিল, সেখানেই হবে।

কিন্তু মালেকা যে বললো তার দারুণ বিপদ। এখুনি যদি তৈরী হয়ে যাত্রা না করি তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে ?

ওসমান হঠাৎ জুবেদার কথায় চমকে উঠলো, বললো আনারবিবি আর কি বলবো ?

জুবেদা মাথা নেড়ে বললো—আর কিছু নয়। শুধু বললো—এখুনি ওসমানকে গুপ্তদরজা দিয়ে যদি এখানে আনতে পারিস্, তাহলে তোকে আমার একটি বহুমূল্য মুক্তার হার নজরানা দেব।

ওসমানের মনটা হঠাৎ গর্বে ফুলে উঠলো। আনার বিপদে তার শরণ নিয়েছে। এর চেয়ে গর্ব আর কি হতে পারে ? অন্ততঃ এক আওরতের কোন উপকারে লাগতে পারবে ভেবে তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণে তার মনে সন্দেহ জাগলো—যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্য হয় ? প্রাণের মায়া অবশ্য সে করে না। এই গভীর নিশীথে তাকে কৌশল করে নিয়ে গিয়ে কোন বেইমানীর আশ্রয় নেবে তা বোধ হয় না। কিম্বা সেই খুবসুরত আওরত এই গভীর নিশীথে তার কাম-চরিতার্থ করবার জন্যে ওসমানকে আহ্বান করেছে তাও একেবারে অবিশ্বাস করা যায় না। তাও যদি হয় ক্ষতি কি ? সামান্য সৈনিক যদি হঠাৎ কোন ভালবস্তুর আকস্মিক আস্বাদন পায় মন্দ কি ? কিন্তু ওসমানের ভয় এসবের জন্যে নয়, ওসমান ভয় করে আওরতকে এইজন্যে যে আওরত নিজের জন্যে তাকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করবে বলে।



গুপ্তদ্বার দিয়ে যখন জুবেদার সঙ্গে আনারের সামনে গিয়ে ওসমান দাঁড়ালো তখন

রাত্রির দ্বিপ্রহর। দ্বিপ্রহরের ঘণ্টাধ্বনি প্রাসাদের পাথরের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে অনুরণিত হয়ে উঠলো।

আনার জুবেদাকে বললো—তুই যা, প্রয়োজন হলে আমি ডাকবো।

ওসমান তাকিয়ে দেখলো, সে গুপ্তদ্বার পথে আনারউন্নিসার শয়নকক্ষের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে। বাদশাহী ঐশ্বর্যের রকমারী রত্ন দিয়ে সাজানো আনারের শয়নকক্ষ। দুগ্ধফেননিভ শয্যাখানি মেহগনি পালঙ্কের ওপর রচনা করা। তার ওপর ভেলভেটের বালিশ। সমস্ত কক্ষটি ঘিরে মূল্যবান সব আসবাবের সারি। স্বর্ণভৃঙ্গার। আতরের খুসবুদান। দামী মেহগনি টেবিল। টেবিলের ওপর গোলাপী মসলিনের ঘেরাটোপ। তার ওপর স্বর্ণপাত্র।

আনারের পোষাক ছিল বহুমূল্যবান। কক্ষের আসবাবের মানানসই করে তার পোশাকেব জৌলুস। সেদিন গলিপথে দেখা সে আনার যেন এ আনার নয়। এ আনার একেবারে সম্পূর্ণ নূতন, অভিনব। যেন মনে হয় কোন সম্রাজ্ঞীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু আনার হঠাৎ কক্ষের সেই টেবিলের কাছে গেল। টেবিলের ওপর রাখা স্বর্ণভৃঙ্গার থেকে সরাব স্বর্ণপাত্র পূর্ণ করে একটি নিজে নিল ও অন্যটি ওসমানকে দিল। ওসমানের দিকে পূর্ণপাত্র এগিয়ে ধরে বললো—তুমি আজ আমার প্রধান অতিথি। তাই এই সারাব দিয়ে তোমার ইন্তেজার করলাম।

হঠাৎ ওসমান আকস্মিক আঘাত দিয়ে বসলো। ক্ষুব্ধস্বরে বললে—আতিথ্য পালন করবার জন্যেই কি তুমি এই গভীর রাত্রে আমাকে ডেকে নিয়ে এলে?

আনারের হাতে ধরা পূর্ণপাত্র ওসমানের কথায় ছলকে উঠলো। ওসমানের কথার গুরুত্বের চেয়ে ওসমানের স্বরের তারতম্যে আনার চমকে উঠলো। কিন্তু নিজেকে অদ্ভুতশক্তিতে পরিবর্তিত করে হেসে বললো—এতরাত্রে বিশ্রামে বিঘ্ন ঘটিয়েছি বলে কি রাগ করেছ নওজোয়ান?

ওসমান কথা বললো না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো আনারের রূপ। যৌবনের জৌলুসে আনারের রূপের মাদকতা এইরাত্রে অভিসারিকার আমন্ত্রণ ঘোষণা করছে। আনারউন্নিসার পরণে সূক্ষ্ম মসলিনের চমকদারী পোষাক। পোষাকের আবরণী ভেদ করে প্রকাশ হয়ে পড়েছে উদ্ভিন্ন যৌবনশোভা। বক্ষের কুসুমস্তম্ভ লো'লুপ হয়ে হাতছানি দিয়ে ওসমানকে ডাকছে। আনার তার রসাপ্লুত অধরে স্মিতহাসিব রেখা টেনে মৃদু মৃদু হাসছিল। তার চোখের দুইকালো তারায় হাসির শাণিত ছুরিকা। সে যেন ভুরুলাঞ্ছিত দুচোখের কামনা দিয়ে ওসমানকে অবজ্ঞা করতে লাগলো।

ওসমানের জাগ্রত পৌরুষ যেন আরো সজাগ হয়ে রূপসী আনারকে অবজ্ঞা করবে বলে প্রয়াসী হল। কিন্তু ওসমানের পৌরুষের চেয়ে আনারের রমণীশক্তি যেন জয় করে নিতে লাগলো বারবার ওসমানের হৃদয়। কিছুক্ষণ চললো এই যুদ্ধ। হঠাৎ ওসমান চীৎকার করে বললো—না, না, না…আমি ডুবে যেতে চাই না। মেহেরবাণী

করে আমাকে রেহাই দাও আনারবিবি! আমি সৈনিক। আমি নীচ—তাই বলে আমার ইজ্জত এমনি করে কলঙ্কিত হবে, সে আমি চাই না।

আনারের হাতে ছিল ওসমানের জন্যে স্বর্ণপাত্রপূর্ণ খুসবু সরাব। সে কোন কথা না বলে দূরে টেবিলের ওপর পূর্ণপাত্র রেখে কক্ষের অন্যাংশে চলে গেল, তারপর যখন ফিরে এল, দেখা গেল সমস্ত দেহকে ঘিরে একটি পুরু ভেলভেটের চাদর সে আবরিত করে এসে দাঁড়িয়েছে। আনার শান্তকণ্ঠে বললো, আমার দেওয়া সরাব তুমি পান করে নাও নওজোয়ান। তুমি এমনি করে আমার স্বভাবের বিচার করবে জানলে কখনই জুবেদাকে দিয়ে এইরাত্রে তোমাকে ডাকিয়ে আনতুম না। আওরতের সম্বন্ধে তোমার ধারণা দেখে শুধু চমকিত হচ্ছি এইভেবে নওজোয়ান—তুমি আমার ক্ষমা পেয়েছ কিন্তু ভবিষ্যতে অন্যকোন আওরতকে যদি এমনি অসম্মানসূচক বাক্য-প্রয়োগ কর—সে তোমার ঔদ্ধত্যের কি শাস্তি প্রয়োগ করবে ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছি! যাই হোক, গোসা না করে সরাবটুকু পান করে নাও। তারপর এতরাত্রে নিজের জীবন তুচ্ছ করে তোমায় কেন ডেকেছি সে রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে তোমার সাহায্য ভিক্ষা করবো।

আনার আবার প্রগলভ হয়ে উঠলো। সহজ হয়ে উঠলো। এবং দোলায়িত ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে সরাবের পাত্র নিয়ে এসে ওসমানকে বললো—নাও ধর, আওরতকে কখনও উপেক্ষা করতে নেই, এই শিক্ষাই তোমার এখনও সম্পূর্ণ হয় নি।

ওসমান অভিভূত হয়ে আনারের হাত থেকে পাত্রটি গ্রহণ করলো, তারপর অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো, কোন আওরত অপমান হজম করে নিয়ে পরিবর্তে মাল্যদান করে—এ বোধ হয় আনার ছাড়া আর কোন রমণীর মধ্যে দেখা যায় নি। কোথায় তীব্র অপমানের বিপরীতে তীব্রতর কোন দণ্ডাজ্ঞার বাক্য প্রচারিত হবে—এ আশাই মনে মনে ওসমান করেছিল কারণ জুবেদাকে সে যা বলেছে, আনারকে যে তা বলা উচিত হয়নি—মুখ থেকে প্রকাশ হয়ে যাবার পরই তার খেয়াল হয়েছে। কিন্তু তখন আর তার করার কিছু ছিল না। তাই মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে সে অপেক্ষা করছিল—এবার সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের সহচারিণী সম্রাজ্ঞীর মতোই দর্পিত ভঙ্গিতে তাকে সর্পের মত ছোবল দেবে। কিন্তু তা না দিয়ে আনার যে ব্যবহার করলো, তা অভিভূত হবার মতোই।

তাই ওসমান অভিভূত হয়ে আনারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কণ্ঠে বললো—তোমার আতিথ্যের পরমায়ু বর্ধিত করবার জন্যে দাও তোমার সরাব।

আনার মৃদুহাস্যে এগিয়ে দিল সরাবপূর্ণ পাত্র।

ওসমান তা গ্রহণ করে পান করলো। আনার সেইদিকে চেয়ে অল্প সময় নিয়ে সেও তার পানপাত্র নিঃশেষ করে ওসমানের দিকে স্মিতহাস্যে তাকালো।

ওসমান বললো—এবার বলো, আমার কোন্ সাহায্য তোমাকে সম্পূর্ণ করবে? আমি তার জন্যে প্রস্তুত।

আনার হেসে বললো—আমি জানি নওজোয়ান, তুমি আমাকে কখনও বিমুখ করবে না। আর করবে না বলেই আমি এই এতো রাত্রে তোমাকে ডাকিয়ে আনতে সাহস করেছি।

ওসমান মনে মনে কি ভাবলো, ভেবে বললো—তাহলে পেশ কর তোমার সেই আর্জি।

আনারের মুখের ওপর তখন ভেসে উঠেছিল একটি ভয়াবহ বিপদের ছবি। মনে পড়লো তার সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের কথাগুলি। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরকে পুত্র সম্বন্ধে উত্তেজিত করছিলেন। শাহজাদা খুরমই সেই পুত্র। শাহজাদা খুরমের মৃত্যু চান সম্রাজ্ঞী নূরজাহান। সেই চক্রান্তের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন আনারের পিতা সম্রাজ্ঞীর প্রধান উপদেষ্টা ইব্রাহিম খাঁ। আর আনার সেই বিপদের আশঙ্কা করে মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে কি করবে ভেবে চলেছে। শাহজাদা খুরমের জন্যে তার মনের সমস্ত শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে। আর তারই জন্যে সে ডেকে নিয়ে এসেছে ওসমানকে। ওসমানকে ভর করে তাকে এক দুঃসাহসিক কাজ করতে হবে।

আনার চিন্তা থেকে সরে এসে হঠাৎ ওসমানকে বললো একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করি। আমি কি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?

ওসমানের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই আনার ম্লান হেসে বললে—এখন আর সে প্রশ্ন অবান্তর। তবে একটা কথা তোমায় বলে নেওয়া দরকার। আমি যা বলবো না তার জন্যে যদি কোন কৌতূহল প্রকাশ কর তাহলে মিথ্যে মনের স্বাতন্ত্র্য হারাবে। তাই অনুরোধ থাকলো নওজোয়ান, কৌতূহল প্রকাশ করে আমার বেদনা বর্ধিত কর না।

ওসমান মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললো—আমি সৈনিক আনার বিবি, কৌতূহল হয়তো আমার একটু বেশী কিন্তু যদি নিষেধ থাকে তবে জান্ কবুল করে সে বিশ্বাস রাখবার ক্ষমতা এ বান্দার আছে। তুমি নির্ভয়ে প্রকাশ কর তোমার আর্জি। আমি সাধ্যমত তার সম্মান রাখবো।

আনার তখন খুশি হয়ে বললো—তাহলে আজই রাত্রে আমরা এখুনি যাত্রা করি মালবের মানডুর দিকে?

বলার সঙ্গে সঙ্গে ওসমান চমকে উঠলো, মনে পড়লো তার মানডুতে কে আছে? মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরম বিস্ময়ে সে আনারের দিকে তাকিয়ে বললো—শাহজাদা খুরম!

আনার মাথা নেড়ে সমর্থন করে বললো—হ্যাঁ, শাহজাদা খুরমই। আমি তাঁর কাছে যেতে চাই নওজোয়ান!

কিন্তু কেন?

কৌতূহল প্রকাশ কর না নওজোয়ান!

ওসমান জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি শাহজাদা খুরমকে পেয়ার কর?

আনার তাকিয়ে থাকলো ওসমানের দিকে। একান্ত নিভৃতে যে কথাটি মথমলের

রক্ষনীর মধ্যে রক্ষিত আছে তার ওপর শুধুমাত্র দৃষ্টিদান করেছে ওসমান। সামান্য দৃষ্টি দানেতেই রক্তিম হয়ে উঠলো আনারের বক্ষঃস্থল। কিন্তু পরক্ষণে সে শিহরিত হয়েও প্রতিবাদ করে উঠলো। ফিস ফিস করে অনুচ্চারিত হয়ে উঠলো আনারের কণ্ঠ—না না এ একান্ত গোপন কথা! সে কি এতবড় আশা মনে পোষণ করতে পারে? ভাবীসিংহাসনের যে উত্তরাধিকারী—শাহজাদা খুরম, দ্বাদশ রাজ্যাঙ্কে যে শাহ্ সুলতান্ খুরম থেকে সম্রাটের কাছে 'শাহজাহান' উপাধি পেয়েছেন, সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি সে আকাঙ্ক্ষা করতে পারে? এ যে একেবারে অলীক কল্পনা বলেই মনে হয়। দুরাশার আকাঙ্ক্ষা। তবু তো কিছু একটি সত্য লুকায়িত থেকে তাকে পীড়া দিচ্ছে, তাকেই বা সে অবজ্ঞা করে কেমন করে?

নিজের মনের চাঞ্চল্য কঠিনভাবে দমন করে আনার মুখের ওপর প্রফুল্ল ভাব টেনে আনার চেষ্টা করলো, তারপর বললো—তোমার কল্পনা অলীক নওজোয়ান! আমি শাহজাদার হৃদয় আকাঙ্ক্ষায় প্রলোভিত নই, আমি শাহজাদাকে বিপদমুক্ত করতে চাই। তাকে ঘিরে এক দারুণ চক্রান্ত এই রাজপুরীর আনাচে কানাচে অনুচ্চারিত হয়ে উঠেছে, আমি সেই সম্বন্ধে তাকে সচেতন করতে চাই। এর বেশী আর আমায় জিজ্ঞেস কর না নওজোয়ান, আমি বলতে পারবো না। তুমি আমাকে সেই মানডুতে নিয়ে যাবে কিনা বলো—আমি শুধু এখন যাত্রা শুরু করতে চাই।

ওসমান গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল—কিন্তু এর পরিণাম কি ভেবে দেখেছ?

আনার অসহনীয় হয়ে বললো—জানি, জানি, এর পরিণাম ধরা পড়লে মৃত্যু। আর দুর্ণাম রটবে, আমি শাহজাদার প্রতি লুব্ধ হয়ে এত বড় দুঃসাহসিকা হয়েছি। তবু এ কলঙ্ক গ্রহণ করেও আমি এই দুঃসাহসের কাজ করতে চাই। তুমি কি আমাকে নিয়ে যাবে না নওজোয়ান? তাহলে কি ভাববো—তুমি সৈনিক হলেও বীর নয়, কাপুরুষ। তোমার প্রাণের মায়া তোমার দেহের শিরায় শিরায়!

এ কথায় ওসমানের বীরমনে আঘাত সৃষ্টি করলো কিন্তু সে আওরতের চাতুরীতে ধরা না দিয়ে বললো—প্রাণের মায়া সবারই থাকে, আমি সৈনিক হয়েছি বলে আমার থাকবে না, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু আমি কেন তোমাকে সাহায্য করবো? কি আমার স্বার্থ? তাছাড়া এত বড় বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করবো—যদি ধরা পড়ি?

মৃত্যু অনিবার্য। মোঘল সাম্রাজ্যের আইনে বিশ্বাসঘাতকের দণ্ড বড় নির্মম।

তাহলে তুমি আমাকে সে কাজে উৎসাহ দিচ্ছ কেন?

আনার হঠাৎ ব্যঙ্গচ্ছলে বললো—যাক্ এত যখন তোমার ভয়, তখন কোন সাহায্যই করতে হবে না। আমি একাই আমার ব্যবস্থা করে নিতে পারবো। সম্রাজ্ঞীর প্রধান উপদেষ্টা ইব্রাহিম খাঁর বেটি হয়ে এইটুকু দুঃসাহস নিশ্চয় প্রকাশ করতে পারবো? তুমি এসো আর বিলম্ব কর না, আবার কোথা থেকে কেউ দেখে ফেলবে তখন সৈনিকের অমূল্যপ্রাণ খোয়া যাবার সম্ভাবনা থাকতে পারে। এই বলে আনার জুবেদাকে ডাকবার জন্যে হাতে তালি দিতে গেলে ওসমান একটু অনুচ্চকণ্ঠে বললো—

থামো! আমাকে এতো নীচ ভাবলে কেমন করে?

আনার তখন বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, বললো—তোমার আচরণে!

আমার আচরণে তুমি কি নীচতার প্রকাশ দেখলে? ওসমান পরম বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো।

আনার হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নওজোয়ান। তুমি নীচতার পরিচয় দিয়েই আমাকে অপমান করলে। আর এও জেনে রেখো, আজ পর্যন্ত এমনভাবে কেউ আঘাত দিতে পারেনি। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের মত রাজশক্তি আমার নেই বটে কিন্তু সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের মতো অহঙ্কার আমার কোন অংশে কম না। তাছাড়া দম্ভও আমার আছে? আমার পিতা প্রধান উপদেষ্টা ইব্রাহিমের কূটনৈতিক বুদ্ধিপ্রখরতার কথা শুনেছ, আমি তাঁরই কন্যা। সুতরাং আমি যখন যাবো বলেছি তখন সমস্ত মোগল সাম্রাজ্যের শক্তি আমাকে বাধা দান করলেও ঠেকিয়ে রাখতে পারবেনা। যাও নওজোয়ান, জুবেদার সঙ্গে যে পথে এই অন্দরমহলে এসে ঢুকেছ সেই পথেই বের হয়ে যাও। যেটুকু নিদ্রার ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছি, একটি আওরতের তোমার ওপর বিশ্বাস ছিল বলেই সে সাহস করেছে নিদ্রার ব্যাঘাত করতে। তার বিশ্বাসও যেমন ছিন্ন হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তোমার নিদ্রার ব্যাঘাতও সেই পরিমাণে অনিষ্টকর বলে গণ্য হয়েছে। এর জন্যে সেই বেগুণা আওরতকে ক্ষমা কর।

কিন্তু ওসমান গেল না, বললো—বেশ, আনারবিবি তুমি যখন এত কথাই বললে তাহলে আমি শেষ একটি কথা জিজ্ঞেস করি। তুমি এত বড় বড় খেতাবধারী সব সৈনিকপুরুষ থাকতে, আমাকেই বা এই সাহায্যের জন্যে নির্বাচন করলে কেন?

আনার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—তোমাকে প্রথম দেখে আমার ভাল লেগেছিল বলে!

বিশ্বাস হয় না!

আনারউন্নিসা সহজে মিথ্যার আশ্রয় নেয় না নওজোয়ান!

এত লোক থাকতে হঠাৎ আমাকেই বা ভাল লাগলো কেন?

সে উত্তর দেবার ক্ষমতা কোন আওরতের নেই। সুতরাং আমিও অপারগ।

আনার আবার বললো—কিন্তু এসব অবান্তর আলাপ আলোচনা করে সময় অপচয় করার দরকার কি? তুমি যেতে পারো নওজোয়ান! আমাকে আজ এখুনিই মালবের পথে রওনা হতে হবে। বিলম্বে সমূহ বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা। আর যাবার আগে যদি শত্রুপক্ষ সুযোগের সদ্ব্যহার করে, তবে আপশোষ কখনও যাবে না। তুমি মিছে বাকবিতণ্ডা করে সময় বইয়ে দিও না। তাছাড়া তুমি স্মরণ রেখো, যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছো, সে কক্ষটি আওরতের কক্ষ। এবং সে কক্ষটি রাজ-অন্তঃপুরের সীমানা। প্রহরী যদি ঘুর্ণাক্ষরেও জানতে পারে, তাহলে তোমার মস্তক ধড় থেকে নামিয়ে দিতে কার্পণ্য করবে না। তুমি যাও নওজোয়ান। আমার কাছে এসে তোমার প্রাণ গেছে শুনলে আমার দিলে আঘাত লাগবে।

হঠাৎ ওসমান বললো--আমি প্রস্তুত আনারবিবি! আমার দ্বারা তোমার যদি

কোন সাহায্য হয়, আমি করতে দ্বিধা করবো না। তবে একটি শর্ত আছে। এই বলে ওসমান একটু থেমে বহুকালের একটি অতীতস্মৃতিকে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করলো। একটি বেইমান আওরৎ। হ্যাঁ, তার নাম ছিল ওমদাৎ। সে মহব্বতের রোশনী জ্বালার অভিনয় করে ওসমানের দিলে আঘাত দিয়ে গেছে। ক্ষত করে গেছে। রক্তাক্ত করে গেছে বক্ষ। সেই ওমদাৎ মহব্বত করতে চায়নি। চেয়েছিল মহব্বতের অভিনয় করে কার্যোদ্ধার করতে। কিন্তু ওসমান যদি একটু আগে জানতো, —জানলে কখনই প্রথম দিলের মহব্বত এমনি করে দান করতো না! যখন জানলো তখন ওমদাৎ বেইমানী করে চলে গেছে। তাই সেই থেকে ওসমান প্রতিজ্ঞা করেছিল—কখনই আর সে ভুল করবে না। আওরতের ভালবাসার মিঠে বুলিতে ভুলে গিয়ে তার কুসুম বক্ষের গণ্ডিতে সাময়িক বাসা বাঁধবে না। যদি কোন সাহায্য করতে হয় কবে কিন্তু তার বিনিময়ে চেয়ে নেবে প্রাপ্যটুকু। সেই প্রাপ্যই হবে সাহায্যের প্রতিদান। এর চেয়ে বড় প্রতিদান চেয়ে আহাম্মক হবার আশা না করাই ভাল।

কিন্তু যে কথা সাহায্যের বিনিময়ে মনে আসছে, সে কথা আনার শুনলে যদি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে? আনাবের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, সে সেই ক্ষমতা ফেলে ছড়িয়ে বিস্তার করতে পারে! যদি ওসমানের ঔদ্ধত্য ক্ষমা না করে প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে ওঠে? ওসমান মনে মনে শঙ্কিত হল। শঙ্কার ছায়া লাগলো তার মুখের ওপর। কিন্তু পরক্ষণে তার মনে এল ওমদাৎকে। ওমদাৎও তো আনারের মতোই দাম্ভিকা ছিল, অবশ্য আনারের মতো তার রাজশক্তি ছিল না। কিন্তু তাতেই বা কম কি? আজ মনে হচ্ছে ওমদাৎ আর আনার একই সিংহাসনের দুই আওরত। ওদের চেহারায় অল্প অমিল থাকতে পারে কিন্তু স্বভাব ওদের সম্পূর্ণ এক।

ওসমান আর ভাবতে পারলো না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো—যদি আনার বিনিময়ে প্রতিদান না দেয়, তাহলে সে সাহায্য করতে এগোবে না। এই সাহায্যের পিছুনে কত বড ঝুঁকি নিতে হবে, সে বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারছে। যখন জানতে পারবে সেনাধ্যক্ষ, ওসমান তার কটি অনুচর সঙ্গে নিয়ে বিদ্রোহী হয়েছে, তখন সেই বিদ্রোহীকে ধরবার জন্যে কী কৌশল অবলম্বন করবেন; আর ধরা পড়লে কী শাস্তি তার জন্যে সাব্যস্ত হবে, তাও আনুমানিক কতকটা সে বুঝতে পারছে না, তা নয়। অথচ এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে তার কোন স্বার্থ নেই। এক অপরিচিত রমণী তার সঙ্গে হঠাৎ আলাপ করে তাকে দিয়ে এতবড কাজটা করিয়ে নিতে চায়! আর তার সম্পূর্ণ স্বার্থ এই রমণীর। ওসমান জানে না আনারবিবি শাহজাদাকে বিপদশূন্য করতে এতো আগ্রহী কেন? এর মধ্যে যদি কোন রহস্য থাকে, তার অজানা। এই রহস্য রাজনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত—বা কোন হৃদয় সম্বন্ধের সঙ্গে যুক্ত—তাও সে জানে না। তবু তাকে সাহায্য করতে হবে এইজন্যে যে, একটি আওরত তার পৌরুষ চেতনাকে দলিত করে অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে চায়।

আনারউন্নিসা সুন্দরী বটে। যৌবন তার যমুনার জলের মত কানায় কানায়

ভরপুর। রূপের জৌলুসে বাদশাহী ঐশ্বর্যের চমক আরো উজ্জ্বলতা দান করেছে। সে হল রাজঅন্তঃপুরের বেগম বাঁদী-নর্তকীর ঈর্ষা। সব মিলিয়ে সে রমণী। তার জোয়ানী রক্তের মধ্যে তুফানের আবেগ। সে মাসুম লেড়কী। তাকে গ্রহণ করতে সবাই চায়। তাকে বসনোন্মুক্ত করতে কোন্ পুরুষের না ইচ্ছা জাগবে? ওসমানের মনেও যদি তার ইচ্ছা থাকে, তাতে ক্ষতি কি? তার ইচ্ছা আছে, যদি আনারকে পাওয়া যায় মন্দ কি? তাকে ভোগ করতে সৈনিকের মন গর্বে ফুলে উঠবে। সৈনিকের জীবন হবে সার্থক। কিন্তু ওসমানের মনে এ সব চিন্তা এলেও তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়। ওসমানই তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। কারণ আনারের দেহভোগের আকাঙ্ক্ষা করা তার মত সৈনিকের পাপ। সে বড় উচ্চাশা নিয়ে জন্মেছে। তাকে আকাঙ্ক্ষা করবে আমীর, ওমরাহ। চাই কি সম্রাটও তাঁর বেগম করে এই আওরতকে সম্মান দিতে পারেন? যেখানে সম্রাট প্রার্থী সেখানে এক নফরের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলেই মনে হয়।

অথচ অবিশ্বাস্য হলেও আনারই সেই প্রলোভনে তাকে বশীভূত করছে। সে এতো লোক থাকতে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন করেছে তাকে। এমন কি বলেছে, 'ভাল লেগেছিল বলেই তোমাকে নির্বাচন করেছিলাম।' এই অর্থ কি পেয়ারের ইস্তেজার নয়? আনার কি পরবর্তী জীবনে তাকে শাদী করে সংসারী হতে পারে না? তবে এ সব রমণীরা কোন অঙ্গীকারেই দীর্ঘস্থায়ী প্রতিজ্ঞা করে থাকতে পারে না। তাই হঠাৎ যা কিছু পাওয়া যায়, তাই চেয়ে নিয়ে ছেড়ে দিতে হয়। উভয়েরই লাভ তাতে সম্পূর্ণ হয়। কেউ কিছুর জন্যে আফশোষ করে না।

ওসমানের চিন্তায় ছেদ পড়লো।

আনার বললো—কই তোমার কি শর্ত—বললে না তো?

হঠাৎ ওসমান বললো—আমার এই সাহায্যের বিনিময়ে কি প্রতিদান দেবে ঠিক করেছ?

এর উত্তরে আনার বললো—তুমি কি চাও বলো? আমার কণ্ঠের বহুমূল্যবান মুক্তার হার তোমায় দিতে পারি। তুমি নিশ্চয় জানো না, এ হার সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের! তিনি খুশি হয়ে তাঁর গলা থেকে খুলে আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন।

ওসমান বললো—আমি ঐ বহুমূল্যবান কণ্ঠহার নিয়ে কি করবো?

আনার বিস্মিত হয়ে বললো—তবে কি চাও? হীরা-জহরত-পান্না-চুনী—যা চাইবে তাই দেবো তাছাড়া বহুমূল্যবান পোষাক, কক্ষের আসবাব।

হঠাৎ ওসমান দুঃসাহসিকভাবে দৃঢ়কণ্ঠে বললো, আমি ওসব কিছুই চাই না আনারবিবি। আমি চাই তোমাকে? তোমাকে সারাজীবনের জন্যে নয়, মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে। এই হলেই আমি এত বড় বিপদজনক কাজে সানন্দে তোমাকে সাহায্য করতে রাজী।

আনার ওসমানের কথা শুনে রক্তিম হয়ে গেল। বিস্মিত নয়, তার পরেও যদি

কিছু থাকে, সে তাই হল। হয়ে মনের মধ্যে সমুদ্রের গর্জন অনুভব করলো। অশান্ত হল তার হৃদয়ের ভেতব। ভাবলো, এ ঔদ্ধত্য ক্ষমার যোগ্য নয়, শাস্তি প্রয়োগ করা উচিত। আবার ভাবলো—ওসমান মন্দ কথা কি বলেছে, অন্য কেউ সাহায্য করলে তো একটি আওরতের কাছে এই চাইতো। আওরতের এ ছাড়া আছে কি? তবু আনার কেমন যেন দুর্বল হয়ে গেল। শাহজাদা খুরমের কথা চিন্তা করে সে মনে মনে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো। ভাবলো, এত বড় ঝুঁকি নিয়ে নিজেকে বিপদের মধ্যে জড়িয়ে এত বড দুঃসাহসিক কাজ না করাই ভাল। তাছাড়া নিজেব রমণী ঐশ্বর্য দান করে যদি অপবের উপকাব করতে হয়, তাহলে সে উপকার নাই বা করা হল। শাহজাদা কি উপকারের সম্মান দেবে? হয়ত বলবে, 'বেগুনা আওরত কী প্রত্যাশায় এই সাহায্য তুমি করেছ?' তখন আনার কোন উত্তরই দিতে পারবে না। তবে সে কাহিনী অনেক পরের। ভবিষ্যতের।

এখন ওসমানের কথার জবাব দিতে হবে। সে যদি যাওয়া স্থগিত করে দেয়, তাহলে ওসমানের কণ্ঠে তাচ্ছিল্য ঝল্‌কিয়ে উঠবে। ওসমান বলবে—কি ভয় পেলে আনারবিবি? এই যে বলেছিলে, তুমি আমাব সঙ্গে মহব্বত কর! সে যদি জবাব না দেয়, তাহলে হয়ত আকাশ ফাটিয়ে হাসতে হাসতে ওসমান চলে যাবে।

অনেক চিন্তা করে আনার তাই কৌশলেব ভূমিকা নিল, গম্ভীর কণ্ঠে বললো—তুমি প্রতিদানে যা চাইলে একটি আওরতের পক্ষে তা দেওয়া খুবই কঠিন, তবু আমি বলছি—তোমার ইচ্ছা আমি হত্যা করবো না। তুমি পাবে তোমার ইচ্ছানুযায়ী, তবে তা আমাব কাযসিদ্ধিব পর।

ওসমান আবার বললো—কিন্তু যদি তুমি বেইমানী কর? কার্যসিদ্ধির পর শাহজাদাব আওতায় গিয়ে আমাব ঔদ্ধত্যেব শাস্তি প্রয়োগ কর?

আনারের মুখের উপর যন্ত্রণাব চিহ্ন ফুটে উঠলো, সে বললো—আমি তোমাকে অনেক আগেই বলেছি নওজোয়ান, আমি তোমার সাথে মহব্বত করি। এই কার্যসিদ্ধির পর উভয়ে যদি আমরা বেঁচে থাকি, তাহলে আমি আমার কথা রাখবো।

ওসমান তাকালো আনারের দিকে। আনারও ইব্রাহিম খাঁর কন্যার মত বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে তাকালো। তারপর ওসমান বললো—কি কৌশল চিন্তা করেছ বলো? রাত তো আর বেশী নেই, চন্দ্রেব রশ্মি ফিকে হয়ে আসছে, এখুনি যাত্রা না করলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা প্রচুর।

আনার কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে যাত্রার বিষয়ে বিস্মৃত হয়েছিল। হঠাৎ ওসমানের কথা শুনে চমকিত হয়ে বর্তমানে ফিরে এসে বললো—সবাই তৈরী আছে সৈনিক। এই রাজ অন্তঃপুরের পিছন দরজার বাইরে একটি অন্ধকার গলিপথে একখানি তাঞ্জাম লুকায়িত আছে, তার সঙ্গে আছে বাহকরা। আমি সেই তাঞ্জামের ভেতর বাদশাহী কোন বাঁদীর বেশে প্রবেশ করবো, তুমি তোমার কটি অনুচরের প্রহরায় আমাকে নিয়ে যাবে। পথে যদি কোন ঘোড়সওয়ার জিজ্ঞেস করে তাহলে বলবে—জাহাঙ্গীরের কোন এক বেগমের আত্মীয়া চলেছে মানডুতে তাঁর নিজের

আবাসে। আর রাজঅন্তঃপুরের কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান তাঁর কোন এক বাঁদীকে পাঠাচ্ছেন মানডুর রাজপুরীতে, সম্রাটের পুত্রবধূর সাথে মোলাকাত করতে। আনারের মুখাবয়বের চেহারা কেউ জানে না বলেই এই কৌশল।

মনে মনে ওসমান আনারের বুদ্ধির প্রশংসা করলো। এবং মনে মনে এও বললো—আনার যদি কোনদিন রাজশক্তি করায়ত্ত করতে পারে, তবে শাসন পরিচালনা করতে সে ভালভাবেই পারবে।

এতকথা প্রকাশ করতে যত সময় লাগলো, সেদিন শেষরাত্রে যাত্রা শুরু করতে তত সময় লাগেনি। রাত্রি শেষযামে ঢলে পড়বার আগেই, যখন প্রহরীরা সমস্ত রাত্রি প্রহরার পর ঝিমুতে ঝিমুতে নিদ্রা গেছে, সেইসময় একখানি তাঞ্জাম নিঃশব্দে প্রাসাদ-ফটকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর তার প্রহরায় ছিল ওসমান ও তার অনুচরেরা।

অন্ধকার যখন গভীর ছিল, তার পথ ছিল দুর্গম। কিন্তু ওসমানের চেনা পথ, সে তাই সবাইকে অনুসরণ করতে বলেছিল। তারপর আস্তে আস্তে যখন অন্ধকার লুপ্ত হয়ে প্রভাত আলোর বর্ণাঢ্য ঝল্‌কে উঠেছিল, সেইসময় তাঞ্জামের বাহিকা ও তার দলবল দিল্লী থেকে অনেকদূরে।

অনেক, অনেকদূর। মাইলের পর মাইল। ঘোড়সওয়ার চলার পথের ওপর দিয়ে শুধু টগ্‌বগ্‌ শব্দ। এর মাঝে পরিশ্রান্ত তাঞ্জাম বাহিকারা দুবার থেমেছিল, থেমে বিশ্রাম নিয়েছিল, তারপর আর থামে নি। তাদের গতি তারপর হয়েছিল অশান্ত।

শুধু অশান্ত সে গতি নয়, উদ্দাম, চঞ্চল সে গতি।

ঊর্ধ্বশ্বাসে চলতে চলতে একবার থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল, পথিমধ্যে একটি ঘোড়সওয়ার দলের সঙ্গে দেখা হতে। ওসমান সেই দলের অধিনায়ককে দেখেই চিনেছিল। জৈন-উল-আবেদীন। জৈন উল-আবেদীন তার দলবলসহ কোথা থেকে যেন প্রাসাদে ফিরছে।

আবেদীনের দলবল পথিমধ্যে দাঁড়িয়ে তাঞ্জামের গতি স্তব্ধ করে দিল। আবেদীন ওসমানকে জিজ্ঞেস করলো—কে যায় তাঞ্জামের মধ্যে ?

ওসমান নির্ভীককণ্ঠে বললো—সম্রাটের অন্যতম বেগমের আত্মীয়া নিজের আবাসে ফিরছেন।

কোথায় সেই আবাস ?

ওসমান বললো—মালবের পথে।

আবেদীন জিজ্ঞেস করলো—তুমি কি সম্রাজ্ঞীর সেনা ?

আবেদীন ও তার দলবল তাঞ্জামের চতুর্দিকে বেষ্টন করে কয়েক পাক ঘুরলো কিন্তু কোন সন্দিগ্ধ কিছু দেখতে না পেয়ে কুর্নিশ করে চলে গেল।

তাদের চলে যাওয়ার শব্দ দূর থেকে দূরান্তে মিলিয়ে গেলে তাঞ্জামের দরজা কিঞ্চিৎ ফাঁক হল।

আনারউন্নিসা ওসমানকে কাছে ডাকলো। ওসমান কাছে গেল। আনার কোন কথা না বলে তার গলার কণ্ঠহার ওসমানের দিকে বাড়িয়ে দিল।

ওসমান বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো—কি জন্যে এ উপহার?

আনার বললো—দারুণ এক বিপদ থেকে তুমি আমাকে মুক্ত করেছ বলে।

কিন্তু তার বিনিময়ে এ পুরস্কার আমি কি করবো?

যাই কর, তুমি গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ কর। তুমি জানো না, যদি কোনরকমে তোমার কথায় সন্দিগ্ধ হয়ে তাঞ্জামের দরজা খুলতে বলতো, ত মানডু যাওয়া হত না। আবেদীনকে তুমি চেনো না, আমি তাকে চিনি নৃশংস সেনাধ্যক্ষ অন্ততঃ সম্রাটের সেনাবাহিনীতে একটিও নেই।

ওসমান বিস্মিত হয়ে বললো—হ্যা, কারণ সে সম্রাজ্ঞীর প্রধান প বহুবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে।

ওসমান আর কিছু না জিজ্ঞাসা করে, দ্রুত সেস্থান থেকে পালানোর জন্যে হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ না করে আবার তার বাহিনীকে সম্মুখ পথ ধরে এগিয়ে গেল। দূর থেকে শোনা গেল ওসমানের বাজখাঁই কণ্ঠ—হুঁশিয়ার!

আবার ছুটে চললো তাঞ্জাম। তাঞ্জামের সঙ্গে আগে-পেছুতে বাহিনী।

আবার দ্রুত তাল লয়।

সেই তাল লয়ের ছন্দে দুলতে দুলতে তাঞ্জামের মধ্যে বসে আনার ভাবতে লাগলো আবেদীনের কথা। আবেদীন যদি একবারও ঘুণাক্ষরে জানতে পারতো, এই তাঞ্জামের অভ্যন্তরে আনার আছে, তাহলে কি সে আনারকে রেহাই দিত। সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়ে যেত রাজঅন্তঃপুরে নয় নিজের শিবিরে। এবং শুধু শিবিরে নয়, তার শয়ন ঘরে। আবেদীন তার কোন অজুহাতই শুনতো না। দারুণ ভাবে সুযোগের অপব্যবহার করতো। এবং আনার বিশ্বাসঘাতিনী হয়েছে জেনেই তার সুবিধে হত আনারকে করায়ত্ত করা। কারণ সম্রাজ্ঞী জানতে পারলে আওরতের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডই দেবেন, তাকে বাঁচিয়ে রাখা মানে মৃত্যুরই মত বলেই আবেদীন মনে করতো।

সেই কথা ভেবে বার বার শিউরে উঠতে লাগলো আনার।

তাছাড়া আবেদীন যদি জানতো সে চলেছে শাহাজাদা খুররমের কাছে। এবং খুররমের কাছে যাবার কারণ চিন্তা করে সে উল্লসিত হয়ে আরো চরম হত। আনার যে শাহাজাদা খুররমকে সাবধান করে দেবার জন্যে চলেছে, সে কথা ঠিকই চিন্তা করে নিত আবেদীন।

কারণ গতরাত্রেই আবেদীন ফিরেছে দাক্ষিণাত্য থেকে। শাহাজাদাকে সম্রাটের

হুকুম শোনাবার জন্যে গিয়েছিল, কিন্তু সেখানে না পেয়ে আবেদীন ফিরে এসেছে। এসে যখন আদ্যোপান্ত সম্রাজ্ঞীর কাছে পেশ করছিল, তখন আনার সেইখানে দাঁড়িয়ে।

আনার মাথা নত করে সম্রাজ্ঞীর পাশে দাঁড়িয়েছিল। আবেদীন লক্ষ করেও ক্ষুব্ধ হয়নি, সে সমস্ত গোপন কথাই সম্রাজ্ঞীর কাছে পেশ করেছিল এবং আনার কাষ্ঠপুত্তলির মত দাঁড়িয়ে শুনেছিল সে সব কথা অনেক গোপন কথা সে জানতো না, জেনেছিল। অনেক চক্রান্ত তার কাছে অজ্ঞাত ছিল। জানবার পর শিউরে উঠেছিল।

[illegible]ন-উল-আবেদীন আড়চোখে তাকে লক্ষ্য করছিল, তাও আনারের চোখ [illegible] কিন্তু আবেদীন অন্য চিন্তা করে লক্ষ্য করছিল, আর আনার ভাবছিল অন্য [illegible]াবেদীন আনারের প্রতি লুব্ধ হয়ে তার দৃষ্টিকে মেলে দিয়েছিল। আনার [illegible] কথা, কিন্তু সে তখন সম্রাজ্ঞী চক্রান্তের কথা শুনে দিশেহারা।

[illegible]ন দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে মুহূর্তমাত্র বিশ্রাম না নিয়ে সম্রাজ্ঞীর কাছে [illegible] এবং সে বলেছিল—শাহজাদা খুররম দাক্ষিণাত্যে নেই। দাক্ষিণাত্য বিজয় [illegible]পুতদের বিদ্রোহ দমন করে তিনি এখন মালবের মানডুতে অবস্থান করছেন। [illegible]যে শাহজাদাকে সম্রাটের হুকুম জানানো হয়েছিল কিন্তু তিনি ফিরতে [illegible]রেছেন। বলেছেন—সামনে বর্ষা আরম্ভ হচ্ছে, এখন বাহিনী নিয়ে ফেরা [illegible] তার চেয়ে বর্ষা কমলে এখান থেকে কান্দাহার অভিযান করলেই হবে। [illegible] থেকে কোন সৈন্য সাহায্যের দরকার নেই। অবশিষ্ট যা সৈন্য আছে সেই [illegible] কিছু সৈন্য সংগ্রহ করে পারস্যাধিপতি প্রথম শাহ্ আব্বাসের বিরুদ্ধে যাত্রা [illegible] অতি সহজে কান্দাহার জয় করা যাবে।

আবেদীনের কথার উত্তরে নূরজাহান ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন—এতদূর স্পর্দ্ধা! অবাধ্য পুত্র সম্রাট পিতার আদেশ পালন না করে নিজের ইচ্ছাকে মেলে দিল! এই পুত্রকে যদি অবিলম্বে শায়েস্তা করা না যায়, তাহলে নিঘাত সে পিতা জীবিত থাকাকালীন সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্র করবে।

আনার দাঁড়িয়ে দেখলো, সম্রাজ্ঞী আহত বন্যপশুর মত ছটফট করতে [illegible] সারা ঘরময় পায়চারি করলেন। তারপর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আবেদীনকে বললেন—সৈনিক, তুমি এখন বিশ্রাম করতে যাও, সম্রাটের সঙ্গে পরামর্শ করে তোমাকে জানাবো—এরপর অবাধ্য পুত্রকে শায়েস্তা করতে কি ব্যবস্থা করা হবে? এই বলে নূরজাহান আর অপেক্ষা না করে সম্রাজ্ঞীর ভূমিকায় কক্ষত্যাগ করে চলে গেলেন।

কক্ষের মধ্যে রইলো দু'জন—আনার ও জৈন-উল আবেদীন।

কিছুক্ষণ দুজনেই নিঃশব্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। জৈন-উল-আবেদীন কি [illegible]ছিল, জানা যায় নি কিন্তু আনার ভাবছিল অনেক কথা। সে ভাবছিল শাহজাদা খুররমের কথা, সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের কথা। পত্নীপ্রাণ সম্রাট জাহাঙ্গীরের কথা। সম্রাজ্ঞীর চোখের মধ্যে যে বিদ্বেষের [illegible] স্ফুলিঙ্গ সে দেখলো তার কথা। আনার মনে মনে সম্রাজ্ঞীর

.ক্ষাভে নিজের শিহরিত হয়ে শাহজাদার অবস্থা কল্পনা করছিল। শাহজাদার বিরুদ্ধে যে বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে, সে কথা সে অনেকদিন শুনেছিল, কিন্তু ষড়যন্ত্রের বহ্নি এত ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে সে তা জানতো না। এরা যে শাহজাদার মৃত্যু চায়, তাও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান চান—স্বামীর পুত্রের মৃত্যু? এ যে অসম্ভব বলেই মনে হয়! নিজের পুত্র নয় বলেই কি এত আক্রোশ স্বামীর পুত্রের ওপর? পুত্রস্নেহের চেয়ে সিংহাসনের মোহই সম্রাজ্ঞীকে নৃশংস করেছে! আর তারই জন্যে সামান্য এক সাধারণ আওরতের মত সম্রাজ্ঞীর ব্যবহার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আনার এতদিন সম্রাজ্ঞীকে আপন শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিল। বসিয়েছিল কারণ নূরজাহানের সৌন্দর্য তাকে প্রলোভিত করেছিল। তার সঙ্গে সম্রাজ্ঞীর সৌন্দর্যের সহযোগিতা ছিল বলে সে সম্রাজ্ঞীর প্রতি লুব্ধ হয়েছিল। তাছাড়া সম্রাজ্ঞীর গুণের প্রশংসায় তার চিত্ত ছিল বিমোহিত। কিন্তু আজ এইমুহূর্তে সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের যত গুণ তার চেয়ে তাঁর দোষ অনেক বেশী। তিনি স্বামীর পুত্রকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজে সিংহাসনে বসতে চান এবং স্বামীর অন্যপুত্র শাহরিয়াকে সিংহাসনের নামমাত্র সম্রাট করে নিজের হাতে শাসনদণ্ড নিতে চান।

আনার সেদিন শুনেছিল তখন অতো বুঝতে পারেনি, সম্রাজ্ঞী নিজের প্রথম স্বামী শের আফকনের ঔরসজাত কন্যা লডিলীর সঙ্গে এই শাহরিয়ার কেন শাদীর আয়োজন করছেন? আজ সে কথা স্পষ্ট হয়ে আনারের মনে দারুণ এক শিহরণ জাগালো। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান এত নীচ বুঝতে পেরে তার হৃদয় ব্যথায় ছেয়ে গেল।

চিন্তা তার হঠাৎ থেমে গেল, জৈন-উল-আবেদীন তার অতি কাছে সরে আসতে। সে হঠাৎ দু-পা পিছিয়ে গিয়ে আবেদীনকে তিরস্কার করে বললো—ছি, তুমি না বীরপুরুষ!

আবেদীন হা হা করে হেসে বললো—আর কতদিন আমাকে এমনি করে বিমুখ করবে সুন্দরী? তারপর ফিস-ফিস করে আবেদীন বললো—শুনতে পাচ্ছ তো এখানকার ষড়যন্ত্র! আরো একটি ষড়যন্ত্রের কথা হয়ত জানো না, ওদিকে তুর্কী সেনাপতি ... হাবল পবাক্রান্ত মহাবৎ খাঁ শুধু সুযোগের অপেক্ষা করছে। একবার শাহজ... ...রম জালে আটকে পড়লেই হয়, তখন নির্ভয়ে সিংহাসন দখল করতে আর অসুবিধে হবে না। তখন দেখবে এই বান্দাই এই দিল্লীর সিংহাসনের সর্বেসর্বা। সেদিনের আর বেশী দেরী কি? তাই এই বেলা বলি সুন্দরী, আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখবে লাভবান হবে। এই বলে আবেদীন আনারের হাত ধরতে যেতেই আনার হাত ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে কক্ষ ছেড়ে চলে গেল।

তারপর সেই রাত্রেই আনার পালিয়ে যাবার জন্যে আয়োজন করেছিল। আর তা.ই ফলস্বরূপ এখন সে মানডুর পথে। যদি পথে আর কোন বাধা না পড়ে তাহলে নির্ঘাৎ সে শাহজাদা খুররমের কাছে গিয়ে পৌছবে।

তাঞ্জাম চলেছে উর্ধ্বশ্বাসে।

আবার আনার ভাবতে শুরু করেছে। আচ্ছা, শাহজাদা খুরম তাকে চিনতে পারবেন তো! সামান্য এক বাঁদী বলে অবহেলা করবেন না? কিন্তু যদি অবহেলাই করেন, তাহলেই বা সে কি কববে? ফিরতে তো আর সে পাবনে না। আবার দিল্লীর অন্তঃপুরে ফিরলে এক আওরতের বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। আব সেই আওরত উল্লাসে অন্য এক আওরতের জন্যে যে শাস্তির ব্যবস্থা কববেন, সে কথা চিন্তা করেই যাত্রার আনন্দ আনারের বার বার ম্লান হয়ে যেতে লাগলো।

আনার ম্লানমুখে আবাব ভাবতে লাগলো—কিন্তু অদূব ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কব সেই চিত্র ভাববার জন্যেই কি তাব এই আজকের অসমসাহসিক অভিযান? হঁ্যা, অসমসাহসিক ছাড়া কি? গতরাত্রির পব থেকে এ পর্যন্ত সে যা করেছে ও কবতে চলেছে, তার কথা ভাবলেই যে তার হৃদকম্প উপস্থিত হচ্ছে? কেমন যেন অবিশ্বাস; অথচ অবিশ্বাস করবেই বা কেমন করে? এইতো সে এই তাঞ্জামেব মধ্যে বসে সামনে ও পিছনে প্রহরাধীনা হয়ে চলেছে শাহজাদা খুরমের কাছে। দিতে চলেছে বাজপবিবাবেব এক গোপন ষড়যন্ত্রের আভাস। যে ষডযন্ত্রের মধ্যে নিহিত আছে, শাহজাদা খুবমের প্রাণ-নাশের কৌশল। আচ্ছা, শাহজাদা যখন তাব কাছ থেকে শুনবেন এ কথা, তখন তাঁর মুখের অবস্থা কি দাঁড়াবে? তিনি কি শোনাব সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে উঠবেন? না, তা মনে হয় উঠবেন না। কাবণ, আনার যতটুকু তাঁকে জানে, তাতে তার একটুকু বিশ্বাস আছে. শাহজাদা শুধু বীর নয়, সংযত। শোনার সঙ্গে সঙ্গে হয়ত গম্ভীর হয়ে যাবেন। তারপর অনেক পরে জিজ্ঞেস কববেন—প্রমাণ।

আনার প্রমাণের কথা স্মরণ হতে আবার ভাবলো—প্রমাণ দেওয়া এমন কিছু কঠিন হবে না। সে বলবে, আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে রাজপুরীতে বাখার মধ্যে এই হত্যার কৌশলই প্রধান। তাই সম্রাজ্ঞী কৌশল করে, সম্রাটকে দিয়ে হুকুমজারী করে আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান।

তারপর যদি শাহজাদা সন্দিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন—এতে তোমার স্বার্থ কি?

এই একটি কথা গতরাত্রি থেকে আনারের মনে এসেছে, কিন্তু কোনবারেই সে সমাধানে আসতে পারে নি। আর এই সমাধানে না আসতে পারার জন্য আসোয়াস্তিতে তার চিত্তের মধ্যে বার বার আলোডন উঠেছে।

এখনও তাব মধ্যে সেই আলোডনই জাগলো। তার হৃদয়ের কুসুমতন্ত্রে সেই আলোড়নের স্পর্শ লাগলো। সেই স্পর্শে হল সমস্ত হৃদয় রক্তাভ। মুখখানিও হলো রক্তিম। মাসুম আওরতের স্পর্শকাতর বক্ষের যৌবন সীমায় দোলন জাগলো। কে যেন হাহাকার করে উঠলো! কে যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো! কার চোখে যেন দুর্লভবস্তু পাওয়ার আশায় অশ্রু দেখা দিল।

আনার শুধু নিজেকে প্রকৃতিস্থ করবার জন্যে অন্য কথার ভীড়ে হারাবার চেষ্টা করলো।

সে এমন কিছু ভাবতে চাইলো, যা এই ভাবনাকে যেন ঢাকনা পরিয়ে দিতে পারে? সেইজন্যে সে তাঞ্জামের দরজা একটু ফাঁক করে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে

লাগলো। কিন্তু তাতেও কি মন অন্যমনস্ক হল? সামনে চোখ দুটি স্তব্ধ কিন্তু মন তার সেই জটিল আবর্তে। যদিও বা সেই জটিল আবর্ত থেকে বের হবার চেষ্টা করছে কিন্তু শুধু অশ্বখুরের টগ্‌বগ্‌ শব্দ ছাড়া আর কিছু তার মধ্যে প্রবেশ করছে না।

তারপর একসময় প্রকৃতির নানান দৃশ্যসম্ভারের মাঝে তার চোখ দুটি স্থির হল। সে মুগ্ধ হল না, বিস্মিত হল।

ঘোড়সওয়ারের চলার পথের ওপর দিয়ে তাঞ্জাম চলেছে। পথের দুধারে মনোরম বৃক্ষের সারি। দীর্ঘবৃক্ষের ছায়ায় পথের ওপর স্নিগ্ধতার আমেজ। দুপুরের প্রচণ্ড-তাপের রেশ এই পথের ওপর নেই। পথটি বৃক্ষের ছায়ায় মনোরম স্নিগ্ধ। কিন্তু আনার দেখলো অন্য দৃশ্য। চলমান তাঞ্জামের ভেতর দিয়ে দেখলো—দূরে দিগন্তবিস্তৃত উন্মুক্তক্ষেত্র। মাইলের পর মাইল পতিত জমির ওপর পড়েছে সূর্যের অসামান্য জ্যোতিঃপ্রবাহ। যেন কেউ তাল তাল সোনা পতিতজমির ওপর ফেলে দিয়ে চলে গেছে। সেই সোনার রঙের অসামান্য জ্যোতি আকাশ আলোকিত করে আরো মনোরম করেছে ধরিত্রী। তাছাড়া আছে পাহাড়ের দীর্ঘ অস্তিত্ব। তার ওপরও ঐ রঙ।

আনার আওরত। জ্ঞান হওয়া অবধি সে হারেমের রুদ্ধদ্বারের মধ্যে বন্ধ। বাইরের প্রকৃতির সৌন্দর্য যা সে দেখেছে, তা খুবই সীমাবদ্ধ। তাই সেই দৃশ্যসম্ভার দেখে দারুণ পুলকিত হল। মনে মনে বললো—এমন দৃশ্য তো রাজঅন্তঃপুরের ঐশ্বর্যময় কোন কক্ষের মধ্যে দেখি নি, এমন কি অন্তঃপুরের অভ্যন্তরে কত মনোরম উদ্যান, সেখানে কত দেশবিদেশের ফুলের সৌরভ, সেই সৌরভের মাঝে মাঝে বিভিন্ন রঙের প্রকাশ। কিন্তু কোথায় এই পুলক?

আনার তাই অবাক হয়ে প্রকৃতির মাঝে ছোট্ট মেয়ের মত নিজেকে লুটিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। তার ইচ্ছে হ'ল, তাঞ্জাম থামিয়ে ঐ উন্মুক্ত সোনার বর্ণ দিগন্তক্ষেত্রে ছুটোছুটি করে খেলা করে। কিন্তু মনে জাগলো ভয়—যদি শত্রুর হাতে ধরা পড়ে সঙ্কল্প বানচাল হয়ে যায়? এই ভেবে শুধু সে মনকষ্ট নিয়ে তাকিয়ে থাকলো বিহ্বল দৃষ্টিতে।

পাহাড়ের মাথার ওপর স্বর্ণমুকুট। এই প্রাকৃতিক রাজ্যের সম্রাট যেন ঐ ওখানে স্বর্ণমুকুট পরে বসে আছেন। আনারের মনে পড়লো মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরকে। যিনি আজও সিংহাসনে বসলে পারিষদবর্গের সামনে তাঁকে সম্রাট বলে মনে হয়। সম্রাটের পোষাকে, তাঁর ঐশ্বর্যে, তাঁর মাথার মুকুটে যেন তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। আনার যতবার চিকের আড়াল দিয়ে সম্রাটকে ঐ অবস্থায় দেখেছে, বিস্মিত হয়েছে। এবং মনে মনে সম্রাটের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছে তাঁর ঐশ্বর্য গরিমা দেখে। কিন্তু আজকের প্রাকৃতিক সম্রাটকে আগে না দেখার জন্যেই মোগল সম্রাটের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছিল। দেখা থাকলে আর স্বীকার করতো না। তাই আজকের ঐ স্বর্ণমুকুট পরিহিত প্রাকৃতিক সম্রাট দেখে তারই কাছে মাথা নত করলো। মনে মনে বললো—মানুষের অনেক অধ্যবসায় যা সম্ভব নয়, প্রকৃতি নিজের থেকে তা দান

করতে পারে।

নীলাকাশের অনেক উঁচু দিয়ে একঝাঁক পাখীর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে আনার হঠাৎ নিজের সঙ্গে তুলনা করলো। সে ভাবলো, ঐ পাখীর দল যেমন নির্ঝঞ্ঝাট আশ্রয়ের আশায় ছুটে চলেছে, তেমনি সে নিজে। সেও একটু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে এই অভিযান শুরু করেছে।

নিরাপদ আশ্রয়ের কথা মনে আসতে আনার বিস্ময়ে ভাবলো—শাহজাদা খুরমের আশ্রয়ে গেলে কি সে নিরাপদ হবে? শাহজাদা খুরম তো কোনদিনও এরকম কোন আশ্বাস দেন নি! তবে কেন তার মনে এই আশ্বাসের ইঙ্গিত? আবার পরক্ষণে ভাবলো—অথচ সেই আশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই তো সে চলেছে এই সুদূর পথে?

আনার বিস্মিত হয়ে ভাববার চেষ্টা করলো—শাহজাদা খুরম কোন সময়ে তাকে ঐ ধরনের কোন আশ্বাস দান করেছিলেন কিনা? বেশী ভাবতে হল না, বেশী অনুসন্ধান করতে হল না, সঙ্গে সঙ্গে আনারের মুখের ওপর উত্তর ঝল্‌কিয়ে উঠলো। আশ্বাস কেন—শাহজাদা কখনও তাকে দেখে থমকে দাঁড়াননি, তবে একবার কোন একটি ঘটনার মুখোমুখি হয়ে তিনি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনেছিলেন।

সেই ঘটনাটুকুই আনারের জীবনে স্মরণীয়। আনারের জীবনের রক্তরেখা। সেই রক্তময় রেখা ধরেই সে এগিয়ে চলেছে। সেই ঘটনাটি কবে ঘটেছিল, আনারের মনে নেই। সাল, তারিখ, দিন, ক্ষণ সব বিস্মৃত। শুধু উপলক্ষ্যটুকু হীরের জ্যোতির মত উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেই একটি দিনের স্মৃতিই আনারের সমস্ত জীবনের পাথেয়। সেদিনই বুঝতে পেরেছিল, শাহজাদা খুরমকে সে ভালবাসে। শাহজাদা খুরম যদি তার যৌবনের মাসুম সম্পদ উপঢৌকন চান, তাহলে সে তা দ্বিধাহীনভাবে দান করতে পারে। কিন্তু শাহজাদা সে সব কিছু চান নি, শুধু ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে চলে গিয়েছিলেন।

আজ দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে সেই ঘটনাটুকুই বার বার মনে পড়ে।

শাহজাদা খুরম বড একটা সম্রাট পিতার কাছে কোনদিনই থাকেন না। আগে তো নয়ই, মমতাজ বিবির সঙ্গে শাদী হবার পর একেবারেই নয়। অধিকাংশ সময় তিনি সম্রাটের দ্বারা আদেশ পালিত হয়ে কোন প্রদেশের শাসনকর্তার পদ গ্রহণ করে সেখানেই কাটান। মনে হয়, পিতার কাছ থেকে দূরে থাকতে পেরে তিনিও নিশ্চিন্ত হন, আর পিতাও সন্তানকে দূরে রেখে শান্তিতে নূতন সম্রাজ্ঞীর বাহুবন্ধনে অতিবাহিত করতে কুণ্ঠিত হন না।

তাই কোন উপলক্ষ ছাড়া যেমন শাহজাদা খুরম রাজপুরীতে আসেন না, তেমনি শাহজাদা পারভেজ তা করতেন না, সময় পেলেই পিতার কাছে কাটিয়ে যেতেন মনে হয় পারভেজ ও খুরমের মধ্যে এ জন্যেই এত পার্থক্য।

যাই হ'ক সেদিনের ঘটনার কথাই আনার স্মরণ করলো। এতদিন সে রাজপুরীর অন্দরমহলে বাস করছে, কখনও এ ধরনের ঘটনার মুখোমুখি হয়নি। অবশ্য তার

বয়সও তখন খুব বেশী না, তাই এসব ঘটনা উপভোগ করার ঠিক জ্ঞান তার পরিমিত হয়নি।

যৌবন এসেছে কবে? সেও বোধহয় আনার হাত গুণে বলে দিতে পারে। তার বুকের মধ্যে যখন শিহরণের জোয়ার জাগলো তখন সে প্রথম কি করেছিল—তা আজও স্পষ্ট হয়ে তাকে লজ্জিত করে তোলে। তাই জ্ঞানের স্ফুটন যখনই হল, তার বুকের কুঁড়িও ঠিক সেই মুহূর্তে ফুটেছিল, এও সে ভালভাবেই জানে।

তাই যে ঘটনার সে মুখোমুখি দাঁড়ালো, সে ঘটনার মত আর কোন ঘটনা এই রাজপুরীতে আগে ঘটেছিল কিনা তা সে জানে না। অবশ্য জানবারও কোন আগ্রহ নেই কারণ যে মর্মন্তুদ ঘটনা সে প্রত্যক্ষ করলো, তা আর কোনদিন ঘটুক—এ প্রতিজ্ঞা সাহস করে আনার আর করতে পারে নি। অথচ এই ঘটনার সাথে যেটুকু রোশনাই সংযোজিত হয়েছিল, তাও এমন আকস্মিক যে সে উপলব্ধি করে অভিভূত হয়ে গেল। অবশ্য এই ঘটনার সাথে তার কোন যোগ ছিল না কিন্তু সেই স্মৃতি ধরে রাখতে গেলেই ঐ ঘটনার কথা মনে করতে হয়। মনে না করতে হলে আনার কখনই তা স্মরণে রাখতো না। মনে করার জন্যেই তার যাতনা উপস্থিত হয়। যতবারই সে মনে করেছে ততবারই তার হৃদয় বেদনার সঞ্চার হয়েছে। তার মুখ কালিমাবর্ণ হয়ে গেছে। অথচ উপায় নেই, এই ঘটনার সাথে তার একটি স্বর্ণস্মৃতি জড়িত—সে কেমন করে তাকে ত্যাগ করবে?

সেদিন শুভ প্রভাত কোন্ উজ্জ্বলরঙের রশ্মি বহন করে আবির্ভূত হয়েছিল, আনার তা জানে না। তবে সে দেখেছিল সেদিনের প্রভাতী আলো পূর্বের মতই অম্লান। পূর্বের মতই দিল্লীর রাজপ্রাসাদের প্রস্তরময় দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে প্রভাত ঘোষণা করলো প্রহরীরা। নহবতখানায় ভৈরবীরাগে সানাই বেজে উঠলো। সে সানাইয়ের মধুররাগিণী মধুর থেকে মধুরতর হয়ে প্রাসাদের সমস্ত মহল সচকিত করে দিল। সুগন্ধি বাতাসের সাথে সে মনোহর রাগিণী যেন দিনের প্রথম সূচনার শুভবার্তা ঘোষণা করলো।

সেই শুভসূচনায় মসজিদের তোরণদ্বারের ওপর আজানের কণ্ঠস্বর জেগে উঠলো, সেই স্বরের অনুসরণে সম্রাট নিদ্রা থেকে জেগে উঠে আল্লাকে সেলাম জানিয়ে গাত্রোত্থান করলেন। প্রাসাদপুরীর সবাই জাগলো, জেগে উঠলো বেগম মহলের বেগমরা। বাঁদী মহলের বাঁদীরা নর্তকী মহলের নর্তকীরা। রাতে যারা সেরাজী নেশায় বেহুঁসী আচরণ করেছিল, তারাও জাগলো। জাগলো শত শত কর্মচারী, মনসবদার, সৈনিক, সেনাধ্যক্ষ, মন্ত্রী। এক এক করে সকলে প্রভাতকে সেলাম জানিয়ে স্ব স্ব কাজে ব্যাপৃত হল।

প্রভাত আলোর চুম্বনে রাজপুরীর উদ্যানবীথিকার ফুলেরা জাগলো। তারা তাদের যৌবনতনু উত্তোলন করে ডাগর চোখের লাজরক্তিম চাউনি নিয়ে পথিককে আকর্ষণ করলো। সৌরভ ছড়ালো। বীথিকা মুখর করলো। মধুকর সেই গুঞ্জনে সাড়া দিয়ে আমোদিত করলো উদ্যান চত্বর। বিহঙ্গদের সেই উপস্থিতি সমস্ত চত্বরে

চত্বরে কলস্বর পরালো।

প্রভাতের এ-রকম প্রকাশ প্রত্যহই একই নিয়মে হয়ে চলেছে, তাই এর নতুনত্ব নেই বলে কোন নতুন উৎসাহ কারো সংযোজন হয় না। কিন্তু সেদিন এর পরবর্তী সময়ে যে ঘটনা ঘটবে তার জন্য কোন ইঙ্গিত এই প্রভাতের প্রথম আলোয় প্রকাশ হল না দেখে তাই এতো বিস্ময়! যদি আলোর প্রকাশ প্রত্যহের চেয়ে ম্লান হয়ে প্রকাশ হত, কিম্বা এমন কোন ইঙ্গিত ফুটে উঠতো, যা দেখে প্রমাণিত হত আগামী কোন এক সময়ে কোন এক অঘটন ঘটবে—তাহলে বুঝি আনারের কোন দুঃখ থাকতো না। আনার কেন কারো দুঃখ থাকতো না, সকলে বলতো—এ তো জানা। আকস্মিক নয়। তৈরী থাকতো সবাই।

তাই দরবার কক্ষের মধ্যে হঠাৎ চিল চীৎকার উত্থিত হতে সমস্ত প্রাসাদ চমকে উঠলো। সে চীৎকারের আর্তস্বর আজো কর্ণকুহরে যেন গাঁথা হয়ে আছে। আনার ভুলতে পারবে না সে-স্বর।

নূরজাহান তখন সবে পরিণীতা হয়ে সম্রাজ্ঞীর পদে আসীন। সম্রাট কিছু সময় রাজকার্য ছাড়া অধিক সময় মেহেরউন্নিসা ওরফে নূরজাহানের সান্নিধ্যে কাটিয়ে না পাওয়ার বেদনা উপশম করেন। মেহেরউন্নিসা তখনও নূরজাহান হন নি। তিনি তখনও রমণীমনের সোহাগ কুসুমের সৌরভে নেশায় উপকরণ সংযোজিত করে আস্তে আস্তে সম্রাটকে বশীভূত করেছেন। সম্রাট তখন রাজকার্যের প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপন করে বিলাস কক্ষে সর্বক্ষণ থাকতে চাইছেন। শাহাজাদা খুরমের শাদী সম্পন্ন হয়েছে। মমতাজবিবির গর্ভের প্রথম সন্তান জাহানারার কণ্ঠস্বর সোচ্চার হয়েছে। মমতাজ-বিবির মাতৃস্বভাব প্রকাশিত হয়ে সমস্ত প্রাসাদপুরী মুগ্ধ করেছে।

সেই সময় দরবারকক্ষে একদিন আর্ত চীৎকার সমস্ত স্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠলো।

অনেকেই ছুটে গিয়ে দরবার কক্ষের গবাক্ষ দিয়ে উঁকি মেরেছিল। আনারও কৌতূহল দমন করতে পারে নি। কিন্তু সে উঁকি দিয়েই আর্তনাদ করে উঠেছিল।

একমুখ শ্মশ্রু ও একমাথা পাগলের মত চুল নিয়ে এক ভাগ্যহত যুবক সম্রাটের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে বিলাপ করছে। আর দু'ই চোখ গড়িয়ে অশ্রুধারা গাল, গলা, বুক ভাসাচ্ছে। কিন্তু ও কি? আনার সচকিত হয়ে উঠলো। যুবকের দুটি চোখের মাঝে শুধু অন্ধকারের কুহেলি, সেখানে নেই কোন নীলজলের সমুদ্র। সমুদ্রের মাঝে নেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ অক্ষিবলয়।

কে যেন পাশ থেকে ফিস ফিস করে বললো—সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহাজাদা খসরু।

সঙ্গে সঙ্গে দরবার কক্ষ থেকে সম্রাট জাহাঙ্গীরের কণ্ঠস্বর সোচ্চার হয়ে উঠলো। তিনি ক্ষিপ্তস্বরে বললেন—না, কোন ক্ষমা না। তোমায় আমি অনেক সুযোগ দিয়েছি, তুমি সে সুযোগ অপব্যয় করেছ। স্বাধীনতা তোমায় দিয়েছিলাম কিন্তু দেখলাম তুমি তা ভোগ করবার উপযুক্ত নও। তাই আবার তোমার জন্যে কারাগারই ব্যবস্থা করলাম। এবং এই আমার শেষ হুকুম—যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে, ততদিনই ঐ

কারাগারের অন্ধ-গুহাতেই আবদ্ধ থাকবে। আমার মৃত্যুর পর যদি তোমার কোন সম্রাট ভ্রাতা দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে তোমাকে মুক্তি দেয়, তাহলে দেবে—নয়তো তোমার শেষশয্যা ঐ কারাগারের মধ্যেই হবে।

শাহাজাদা খসরু করুণকণ্ঠে বললেন—খোদা আমার ওপর সদয় নন পিতা, তাই বলে কোন অনুগ্রহই কি সন্তান পেতে পারে না!

জাহাঙ্গীর সরোষে বললেন—না, পারে না। পুত্র যদি অবাধ্যতার চরমে উঠে পিতার সম্মান নষ্ট করে, তাহলে সে পুত্রের ওপর পিতার কর্তব্যের চেয়ে দুশমনকে শাস্তি দেওয়ার পথই বেছে নিতে হয়।

খসরুর কাছ থেকে আর কোন প্রতিবাদ উঠলো না। সে পড়ে থাকলো অনেকক্ষণ। মাঝে মাঝে কাতর অশ্রুসজল মুখখানি তুলে সম্রাট পিতার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীর তখন দারুণ গম্ভীর। আনারের মনে হল, এই গাম্ভীর্যই বুঝি সম্রাটের শোভা। ঠিক যেন মোগলসম্রাট মহামতি আকবরের প্রতিবিম্ব। মহামতি আকবরকে সে দেখে নি, কিন্তু তাঁর অনেক তৈলচিত্র মহলের দেয়ালে দেয়ালে টাঙানো আছে, সেই ছবির মানুষটির মত তার পুত্র বর্তমানের জাহাঙ্গীর শা।

সমস্ত দরবার কক্ষ স্তব্ধ হয়ে এই নাটকীয় পরিণাম প্রত্যক্ষ করছিল। আমীর, ওমরাহ, মন্ত্রী ও সেনাপতিরা স্তব্ধ। সকলের চোখ জোড়া শুধু জাহাঙ্গীরের গম্ভীর মুখের ওপর ন্যস্ত। সম্রাট জাহাঙ্গীরের মুকুটের হীরাগুলি জ্বলছে ধক্ ধক্ করে। যেন সহস্র বাতিদানের প্রোজ্জ্বলদ্যুতি মুকুটমণির শীর্ষদেশে। সম্রাটের পোষাকের জৌলুসতায় সমস্ত দরবারগৃহ উজ্জ্বল।

জাহাঙ্গীর শা প্রধান মন্ত্রীকে হঠাৎ নির্দেশ দিলেন—এখুনি ঐ অবাধ্য পুত্রকে আজীবন কারাবাসের জন্য নিয়ে গিয়ে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

শুনলো সমস্ত দরবার গৃহের উপস্থিত অভাগ্যতরা কিন্তু কেউ শিউরে উঠলো না। কারণ খসরুর প্রতি এই কঠোর দণ্ডাজ্ঞা আজকের নয়, বহুদিন ধরে চলে আসছে। সম্রাট আকবর যেদিন থেকে পৃথিবী ত্যাগ করেছেন, পুত্রের ওপর শাস্তি প্রয়োগ সেদিন থেকে জাহাঙ্গীর শুরু করেছেন। অবশ্য আকবর বেঁচে থাকার সময়ও অবাধ্য পুত্রকে শায়েস্তা করার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন যুবরাজ সেলিম কিন্তু পিতার জন্যে তা সম্ভব হয় নি। পিতা আকবর খসরুর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে আবার তাকে স্নেহক্রোড়ে টেনে নিয়েছেন।

অবশ্য সম্রাট হবার পর পিতার কাছে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জাহাঙ্গীরও পুত্রকে বার বার ক্ষমা করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু পুত্র খসরুই বার বার সে সুযোগ অপব্যবহার করেছে। জাহাঙ্গীর এও ভেবেছেন মানসিংহ নিজের স্বার্থের জন্যে ভগ্নীর পুত্রকে সিংহাসনের অংশীদার করে সমস্ত প্রতিপত্তি নিজের আওতায় নিয়ে আসতে চায়। খসরু সিংহাসনে বসা মানে মানসিংহেরই সিংহাসন লাভ সম্পূর্ণ হওয়া। একথা অবাধ্য পুত্রকে বার বার বুঝিয়েছেন সম্রাট জাহাঙ্গীর কিন্তু পুত্র বোঝে নি। না বুঝে

ষড়যন্ত্র করে পিতাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে।

সেই পুত্রকে যদি সম্রাট ক্ষমা না করেন—তাহলে কি সম্রাটেরই অপরাধ প্রমাণিত হয়? স্বামী ও পুত্রের মধ্যে এই বিবাদের শেষ নিষ্পত্তি না করতে পেরে রাজা ভরমলের কন্যা খসরুর জননী মৃত্যুকে বরণ করেছেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর তবু পুত্রের মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা দিতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। হয়তো নিজের দেহের শোণিতের কম্পন অনুভূত হতে, শুধু চক্ষু দুটি চিরতরে নষ্ট করে দিয়ে তার চলার পথ রুদ্ধ করেছেন, কিন্তু তবু সেই অন্ধ অবস্থাতেই খসরুর দাপট সহ্যাতিরিক্ত।

আজকের এই প্রহসন শুধু সেই সহ্যের অতীত বলে মূর্ত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন কারাবাসের পর কোন এক সময় খসরুর কাছ থেকে কাতর আবেদন পেলে জাহাঙ্গীর আর কিছুমাত্র চিন্তা না করে পুত্রের মুক্তির আদেশ দেন কারণ তখনই তাঁর মনে জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য স্নেহের প্রাবল্য জেগে ওঠে। এবারও তেমনি মুক্তির আদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু সেই আদেশের প্রতিফল পুত্র যে রকমভাবে সমাধা করেছে তাতে সম্রাটকে আবার কঠোর হতে হয়েছে। প্রথমত খসরু মুক্তি পেয়ে দারুণ উচ্ছৃঙ্খল জীবন শুরু করেছিল। এমন কি সম্রাটের অন্তঃপুরের খাসবাঁদীদের ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের ওপর ব্যাভিচার করেছে। তার ওপর অত্যধিক সেরাজীর নেশায় উন্মত্ত হয়ে রাজ্যের ভাল ভাল বিশ্বাসী কর্মচারীদের ধরে নিয়ে গিয়ে প্রহার করেছে। তাতেও সম্রাট চুপ করেছিলেন কিন্তু যখন অনেক বড় ক্ষতি পুত্র করলো, তখন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বিশ্বস্ত অনুচর মুলক খাঁকে খসরু কৌশলে বিষপ্রয়োগে হত্যা করালো। সে জানতো, এই ব্যক্তিটিকে সরাতে পারলে পিতার যথেষ্ট ক্ষতি হবে। সে শুধু পিতার ক্ষতি করতেই চায়। পিতার ক্ষতি করে তার যে কি আনন্দ সেই জানে!

সম্রাট জাহাঙ্গীর মুলক খাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে মর্মাহত হলেন। আর খসরুর অপরাধ বিবেচনা করে দারুণ বিরক্ত হলেন এবং আরো বিরক্ত হলেন যখন নুরজাহানের পিতা দেওয়ান ইতমাদ্‌উদ্দৌল্লা মির্জা ঘিয়াস বেগ সম্রাটের কাছে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন, তখনই সম্রাটের রক্তে তৈমুর বংশের ক্ষিপ্ততা জেগে উঠলো।

এ সব কথা কিছুই জানতো না আনার। যখন রক্ষী এসে মন্ত্রীর নির্দেশে অন্ধ খসরুর হাতে শৃঙ্খল পরিয়ে তাকে দরবার গৃহ থেকে নিয়ে গেল, তখনই আনার হঠাৎ আচমকা আর্তনাদ করে উঠলো। সে দাঁড়িয়েছিল একটি পাথরের থামের গায়ে নিজেকে লেপটে দিয়ে গবাক্ষপথে দরবারের দিকে চেয়ে।

একটু দূরে ব্যবধান রেখে শাহজাদা খুরম দাঁড়িয়েছিলেন। আনার আচমকা আর্তনাদ করে উঠতে তিনি তার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টানলেন, যা দেখে আনারের সদ্য প্রস্ফুটিত যৌবনতনুর মাঝে দোলন জাগলো। বুকের মাসুম যৌবনস্তম্ভে সমুদ্র উত্তাল ঢেউ সৃষ্টি হল। আনারের দুটি ডাগর চোখে লাগলো রঙের কুমকুম। সে কম্পিত হল, কুণ্ঠিত হল এবং সঙ্কুচিত হয়ে মাথা নোয়ালো।

যার জন্যে তার মুখ দিয়ে আর্তনাদ বের হয়ে পড়েছিল, সে তা নিজের ক্ষমতায় মুহূর্তে সংযত করে নিয়েছে। আর খসরুও তখন শৃঙ্খলিত অবস্থায় দরবার গৃহ ছেড়ে চলে গেছে। আনার সেই অবস্থায় ভাবতে লাগলো—শাহজাদা খুরম কিজন্যে ঐ রকমভাবে হাসলেন? তাঁর হাসির অর্থ কি? তখন অবশ্য শাহজাদা সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন, সেইজন্যে আনারের ভাবতে সুবিধা হল।

আনার ভাবলো—শাহজাদা কি ভ্রাতার শাস্তির নির্মমতা দেখে খুশী হয়ে হাসলেন, না তার আর্তনাদ শুনে হাসলেন। কিন্তু তার আর্তনাদের জন্যে হাসির কি আছে? সে বোকামীব পরিচয় দিয়ে আর্তনাদ করেছে, তাই বলে একজন বুদ্ধিমান বীর নওজোয়ান ক্ষমা না কবে ব্যঙ্গ করে হাসবেন? শাহজাদা খুরমকে অতো হীনমনা বলে আনাবের মনে হল না। বরং অন্যান্য শাহজাদা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীর চেয়ে শাহজাদা খুরমের অনেক গুণ আছে বলেই 'আনাবের মনে হল। সেই পুরুষ কখনও যে সামান্য অসাবধানতার জন্যে এক মাসুম আওবতকে অপমান করতে পারে—এ একেবারেই আনারের অবিশ্বাসেব মত মনে হয়।

যাই হক এই ভাবনার আবর্তেই আনারের দীর্ঘ দুদিন ও কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেল। আনারের মনে থাকলো না, সম্রাটেব জ্যেষ্ঠপুত্র খসরুর ভাগ্যবিপর্যয়, তার জীবন সম্বন্ধে বাজ্যেব বিচার। সব মন থেকে সবে গিয়ে শুধু মনে থাকলো শাহজাদা খুরমের সেই বিচিত্র হাসি।

আনার বার বাব দেখতে লাগলো—চোখেব ওপব সেই যুবা পুরুষেব সুন্দর আকৃতিটি। সুঠাম, সুপুরুষ দীর্ঘ এক বীবপুরুষ। সর্বদা শরীরে যোদ্ধার বেশ। কণ্ঠে মূল্যবান মুক্তার মালা। গাত্রবর্ণ এত সুন্দর যে কারুর সঙ্গেই তুলনা হয় না। গোলাপীবর্ণেব গাত্রে চন্দনের সুবাস। শাহজাদা দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর হাতে ছিল একগুচ্ছ রক্তগোলাপ। তিনি তাঁর ঘ্রাণ নিচ্ছিলেন মাঝে মাঝে।

শুধু দুদিন ধরে এই দৃশ্যটিই বার বাব চোখের ওপর ভাসছিল। এক এক সময় এই ভাবনা গভীর হলে মনের মধ্যে পরম সুখকর সব চিন্তার সাম্রাজ্য তৈরী হচ্ছিল। সেই সাম্রাজ্যের মাঝে মোগল সাম্রাজ্যের দৌলতের রোশনাই না, তার চেয়েও এমন সব অপার্থিব উজ্জ্বল দৃশ্যশোভা সৃষ্টি হচ্ছিল যার তুলনা মেলে না। আনার দেখছিল সেই সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী সে নিজে। পরণে তার নূরজাহানের চেয়েও এমন সব চমকদারী বসন, যার তুলনা কোথাও মেলে না। সে বসনেব অপরূপ কারুকার্য পৃথিবীতে দুর্লভ। এমন সব অলঙ্কার তার অপরূপ দেহের সৌন্দর্য বর্ধিত করেছে, যা কখনও কোন সম্রাট লাখো লাখো দৌলতের বিনিময়ে যোগাড় করতে পারে না।

সেই রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হয়ে আনার পাশে দেখছে সম্রাট শাহজাহানকে। সম্রাট

শাহজাহান শুধু সম্রাট নয়, তিনি মহত্বের কুসুম-হৃদয়। তাঁর চন্দনচর্চিত গোলাপী-বর্ণের বাহুর আলিঙ্গনে আনারের মনে প্রাণে নূতন উন্মাদনার সৃষ্টি করলো। আনার তখন দেখতে পেলো না মমতাজ বিবি বলে একজন আশাবাদিনী রমণী শাহজাহানের সমস্ত মন জুড়ে অবস্থান করছেন। দেখলে হয়ত তার মনের স্বপ্ন একটু ফিকে হত এবং আহত হৃদয় নিয়ে সে অন্য চিন্তায় মন সমর্পণ করতো।

কিন্তু তখন তার মন বিস্মৃতির অতলে সমাহিত। কেমন যেন নেশার মত সে দেখে চলেছে সুন্দর সুন্দর অপরূপ সব মিলনদৃশ্য।···সম্রাটের নাচমহলে সহস্র কাঠ-গেলাসের বাতিদানে অজস্র আলোর শিখা। সমস্ত কক্ষটি ঘিরে দর্পণের সারি। সেই দর্পণের বক্ষ উজ্জ্বল করে হীরা-চুনি-পান্নার রোশনাই। কক্ষপূর্ণ করে, অগুরু সুবাস, তাছাড়া কৌস্তুরী, লোবানের গন্ধও কম না। নাগকেশর, মালতী, রক্ত-গোলাপের স্তবক নাচমহলের খিলানে খিলানে। কারুকার্যময় শুভ্র প্রস্তরের হর্ম্যতলে রক্তবর্ণের মূল্যবান কাশ্মীরী ফরাস পাতা।

বিরাট দীর্ঘ নাচঘর। এ ঘরে অন্য সময়ে সম্রাটের সঙ্গে বহু মেহবান আমীর, ওমরাহের সমাবেশ হয়। তাঁরা সেরাজী পান করেন, নাচ দেখেন। বেঁহুসী আঁখি-যুগল তুলে নর্তকীর যৌবন সীমায় লোলুপদৃষ্টির আলপনা আঁকেন। তারপর সম্রাটকে কুর্নিশ জানিয়ে যে যাঁর জায়গায় চলে যান। কিন্তু আনার কল্পনায় দেখলো, সে ঘরে আর কেউ নেই। শাহজাদা খুরম মূল্যবান সাটিনের পোষাক পরে গলায় দশ হাজারী হীরার কণ্ঠহার ঝুলিয়ে বসে আছেন। শুধু অদৃশ্যস্থান থেকে সারেঙ্গী, এসরাজ, তবলার মিঠে বোল উঠছে, আর আনার খাটো বসনে দেহ আবরিত করে, বক্ষের যৌবনসীমায় একখণ্ড কাঁচুলির বন্ধন সম্বল করে লীলায়িত ছন্দে নৃত্য করে চলেছে। নৃত্যের মাঝে মাঝে স্বর্ণভৃঙ্গার থেকে আতর খুসবু সেরাজী পানপাত্রে ঢেলে শাহজাদা খুরমকে বিতরণ করছে।

শাহজাদা খুরম রঙিন চোখে দেখছেন আনারের যৌবন, আনারের সমুদ্রউত্তাল বক্ষে কুসুমসৌন্দর্য, আনারের নিতম্বের দোলন-ভঙ্গিমা, দুই উরুর কামনামদির ব্যগ্রভাব। আনারের দু'চোখের সুরমালাঞ্ছিত দৃষ্টিশোভাতেও শাহজাদা খুরম আমন্ত্রণ রচনা করছেন। আনার বার বার শিহরিত হচ্ছে। তার মাসুম মনের অজানা রহস্যে কেমন যেন রঙের প্রলেপ সৃষ্টি হচ্ছে। তার চোখে লজ্জা আসছে, দেহ সঙ্কুচিত হচ্ছে, পদদ্বয় জড়িয়ে যাচ্ছে। সে টলে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করছে। তবু তার ভাল লাগছে এইজন্যে যে জীবনের এইক্ষণ আর কখনও আসবে না বলে প্রকাশ পাচ্ছে। এমনভাবে মনের সমস্ত অংশ ভরিয়ে আর পুলক আসবে না বলে আনার তারিয়ে তারিয়ে সেই অনুভূতি উপভোগ করতে লাগলো। তারপর যখন একসময় শাহজাদার বাহুর আলিঙ্গনে ধরা পড়লো, তখন তার আচমকা স্বপ্ন ছিঁড়ে গেল।

সে দারুণভাবে চমকে উঠে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিজে আহত হল। কারণ এমন দুর্লভমুহূর্তে সবকিছু কেড়ে নেওয়ার জন্যে তার মনে যাতনা সৃষ্টি হল। ভয়ও

জাগলো তার, হোক্ এ স্বপ্ন—যদি কখনও এ কাহিনী সত্য হয়, তাহলে এই দুর্লভ-মুহূর্তে তার যদি জীবন মরুভূমি হয়ে যায় তাহলে সে কি নিয়ে বাঁচবে ? একটি মানুষ আওরত যৌবনসীমায় উন্নীতা হবার পর যদি দয়িতের আলিঙ্গন সুখ পায় এবং তার কৌমার্য যদি সেই আলিঙ্গনে পূর্ণতার রূপে ভরে ওঠে—তাতে যে আওরতের সমস্ত জীবন সেই অনুভূতিতে সার্থক হয়ে যায়। আর যদি সার্থক না হয়, যদি অবহেলার কুসুম ধুলায় পড়ে গড়াগড়ি যায়, তার অবস্থা কি হয় ? আনারের সেজন্যে মনে এমন বেদনার স্পর্শ লাগলো, যা তার স্বপ্নের চেয়েও জোরালো।

তবু আনার কাঁদলো না। তার বিবশ স্বপ্নের মাঝেই সে অবস্থান করবার জন্যে মনপ্রাণ সমর্পণ করলো। কারণ সে জানে, কামনাও যেমনি দুর্লভ, তার স্বপ্নও তেমনি অলীক। শাহজাদা হয়ত তাকে দেখে একটু হাসি প্রকাশ করেছেন, তাই বলে তার প্রতি যে কোন লুব্ধ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবেন, এমন ধারণা করা একেবারেই অন্যায়।

তবু সেই কামনাই আনারের সুপ্ত মনে বাসা বেঁধে নিয়ত তাকে দুর্লভ আশঙ্কার মাঝে ঠেলে দিতে লাগলো। শাহজাদা খুরম তারপর তাঁর পরিবারবর্গ নিয়ে বহুদূরে চলে গেলেন। মাঝে অবশ্য দু'একবার এসেছিলেন, আনার তাঁর সামনে না গিয়ে আড়ালেই অবস্থান করেছিল। তার ধারণা, যদি দেখা হলে প্রকাশ হয়ে পড়ে চাঞ্চল্য সেই আশঙ্কায় সে আড়ালেই ছিল। কিন্তু মনে হয়, আড়ালে থাকার জন্যেই তার মনে পাওয়ার কামনা তীব্র হয়েছে। সে ভালবেসেছে। মহব্বতের মেহেদী রঙে রাঙা হয়ে তার হৃদয়-মন সমর্পণ করেছে। ভাল না বাসলে হয়ত সে কবে বেওয়ারিশ সম্ভোগের তাড়নায় নিজেকে বিলিয়ে দিত। কারণ রাজপুরীতে রমণী ও পুরুষের এই আদান-প্রদান খুব দুর্লভ নয়। বরং এত সুলভ যে, যে-কোন মুহূর্তে নিজেকে সঁপেদেওয়ার বাসনা চরিতার্থ করা যায়।

তাছাড়া সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিলাসকক্ষে সেই ক্রীড়ার একটু বেশী প্রচলন।

সেই বিলাসকক্ষের উচ্ছল-জীবনের বর্ণনা প্রকাশ হওয়ার চেয়ে আনারের মনে পড়লো অন্দরমহলের কিছু স্মৃতি।

মহামতি সম্রাট আকবর আটচল্লিশ বৎসর রাজত্ব করে গিয়েছিলেন। সে সময় এত দীর্ঘকাল ধরে কেউ রাজত্ব করেন নি। আকবর যেমন একদিক দিয়ে একজন কঠোর শাসক ছিলেন, অপর দিক দিয়ে একজন বিচক্ষণ প্রজারঞ্জন সম্রাট ছিলেন। তাঁর রাজত্বে বাস করে কেউ বড় একটা কষ্টে দিন অতিবাহিত করেছে বলে মনে হয় না। সবারই শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন বলে তাঁর নাম ইতিহাসে অমর। আর সেজন্যে মহামতি নামে অভিহিত হয়ে মোগল সাম্রাজ্যের উজ্জ্বল-জ্যোতিষ্ক আকাশের স্বর্ণচূড়ায় প্রবহমান হয়ে আছেন।

আনার ভালভাবেই জানে, বর্তমান সম্রাটের পিতা সম্রাট আকবরের রাজত্বের গুণাবলী। এখনও তাঁরই নিয়োজিত অনেক কর্মচারী তাদের সঙ্গে মৃত সম্রাটের ব্যবহারের নানান গল্প ফেঁদে বসে। কিছু কিছু গল্প আনারেরও কানে গেছে। কতক সে বিশ্বাস করেছে, কতক করে নি। অবশ্য অবিশ্বাস করার কোন কারণও ছিল না।

তাই আনার মনে মনে সেই না-দেখা মানুষটিকে শ্রদ্ধাই করে। তাঁর তৈলচিত্রের সামনে কখনও গিয়ে দাঁড়ালে সে কুর্নিশ করে ফিস ফিস করে বলে—'আদাব জানাব। মানুষকে বশ করতে তোমার জোড়া পৃথিবীতে নেই।

কিন্তু গোল বাধায় যত ঐ অন্দরমহলের বেগমরা।

প্রথম প্রথম এক একদিন রাত্রে সে ভয়ে চীৎকার করে উঠেছিল। তখন সে সবে পিতার সঙ্গে সঙ্গে এই অন্দরমহলে এসে উঠেছে। পিতা কাছে থাকতেন না। তিনি অন্যত্র বারমহলে থাকতেন। তার স্থান শুধু অন্দরমহলে হয়েছিল। অন্দরমহলে সে একা একটি ঘরে থাকতো। বয়স তখন কতই বা! সবে মনের মধ্যে সবুজ রঙ ধরতে শুরু করেছে। বক্ষের মসৃণ চর্মের ওপর অপুষ্ট যৌবনস্তম্ভের আবির্ভাব হয়েছে। চোখে লেগেছে রঙের ঘোর, লজ্জার ছায়া।

সে-সময় সে রাজপুরীর অন্দরমহলে একখানি ঘরের মধ্যে স্থান লাভ করলো। এমনি একা একটি কক্ষের মধ্যে সে কখনও কাটায় নি।

রাত্রিবেলা বৃহৎ কক্ষটির একপাশে একটি স্বর্ণময় পালঙ্ক। তার ওপর কোমল বিছানার আস্তরণ। মখমলের ঘেরাটোপ পরানো বালিশ। আনারের প্রথম প্রথম শুতে ভয়ই লেগেছিল। মনে হয়েছিল—এ বিছানায় শুলে ঘুম হবে তো! অন্ধকার কক্ষের মধ্যে আলো বিকীরণের জন্যে স্বর্ণময় বাতিদানে উজ্জল আলোর স্তম্ভ। কক্ষের মধ্যে সেই আলোর সাথে লেবানের মিষ্টি সুবাস।

তাছাড়া গোলাপ ফুলের মিষ্টি সুবাসের সৌরভও সমস্ত কক্ষটি পূর্ণ করে আমোদিত হচ্ছে। আনার প্রথম দিনের রাত্রে রাজ্যের স্বপ্ন কবুতরের ছোট বুকের মধ্যে নিয়ে ভয়ে ভয়ে নির্ঘুম হয়েছিল।

ঘুম তার আসে নি, বোধ হয় নিঝুম হয়েছিল বহুক্ষণ। তখন রাত্রি কত হবে কে জানে। প্রাসাদ দেউড়িতে মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দ বেজে চলেছে। তবে সে কটা বাজার শব্দ, বোঝা মুস্কিল। আস্তে আস্তে রাত্রি নিঝুম হয়ে আসছে, তারই আকৃতি সবদিকে।

আনার ভাবতে ভাবতে হয়ত ঘুমিয়েই পড়েছিল। নরম বিছানা, সুন্দর সুবাস, অহেতুক দুশ্চিন্তা, মনে ভয়—হয়ত এই সব কারণের জন্যেই তার ঘুম এসেছিল। অবশ্য ঘুম আসবার আরো একটি কারণ ছিল। অনেক পথ তাকে পিতার সঙ্গে অশ্বপিঠে আসতে হয়েছিল এই রাজপ্রাসাদে। অনেকপথ লাহোর থেকে দিল্লী। পিতা ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য আর অপেক্ষা করেন নি। নিজের যা সম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল, বিক্রী করে একটি অশ্ব ক্রয় করে চলে এসেছেন। আনার পিতার কাণ্ড

দেখে কাতর হয়ে বলেছিল, পিতাজী, একটা কথার ওপর ভর করে যথাসর্বস্ব খোয়ালেন, এরপর যদি চিনতে না পারেন, তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে?

কন্যার কথায় পিতা ইব্রাহিম খাঁ বলিষ্ঠ বক্ষের পেশী দৃঢ় করে গম্ভীরস্বরে বলেছিলেন—নসীব মন্দ হয়, তাহলে সবই খোয়া যাবে। তবে যিনি আজকের সম্রাজ্ঞী তিনি যে ভুলে যাবেন, এ একেবারেই বিশ্বাস হয় না। তারপর ইব্রাহিম খাঁ নিজের বিশ্বাসের ওপর দৃঢ়সঙ্কল্প ধারণ করে বললেন—আওরত আমি জীবনে অনেক দেখেছি আনার। কিন্তু অমন বুদ্ধিমতী আর কখনও দেখিনি। এই বলে ইব্রাহিম আবার বহুবার কথিত কাহিনী বললেন। তার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাগ্যের অদ্ভুত ক্ষমতায়ই যে নূরজাহানের সাক্ষাত পেয়েছেন, এ কথাও বার বার বললেন। আর আল্লা মেহেরবানী করে ইব্রাহিমকে দিয়ে একটি সাহায্য করিয়ে নিয়েছেন বলেই মোগল সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের কৃপালাভ দুর্লভ হয় নি।

ইব্রাহিম সেইজন্যে বার বার আল্লাকেই তাঁর আনন্দাশ্রু উৎসর্গ করেন। সামান্য একটি ঘটনা। লাহোরে একটি মেলা বসেছিল। মেলায় বহু লোকের আবির্ভাব হয়েছিল। যেমন বহু লোক তেমনি প্রচুর দ্রব্যসম্ভার। দেশবিদেশ থেকে বণিকদল এসে তাঁদের ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলেন। জাদুকররা নানান ধরনের কেরামতি খেলায় আসর সরগরম করছিলেন। ভারতবর্ষের চারদিক থেকে এমনকি তার বাইরে চীন, জাপান থেকেও সওদাগররা এই লাহোরের মাটিতে কেনাবেচা করতে এসেছিলেন। ইরান থেকে ইরানী বুলবুলরা এসে নৃত্যের জমজমাট আসর বসিয়ে দিয়েছিল। রাজকর্মচারী, আমীর ওমরাহরা সেই সব ইরানী কন্যাদের দেহ দোলানি নৃত্য দেখে লুব্ধ হয়ে তাদের কিনে নিয়ে কেয়াবাত কেয়াবাত বলে মোহরের থলিয়া ছুঁড়ে দিয়ে নিজেদের মেহমান আদমি নাম অক্ষয় করেছিলেন।

মোগল সম্রাটও সে সময় লাহোরে। বোধ হয়, এই মেলা দেখবার জন্যেই তাঁর সপরিবারে লাহোর আগমন।

সে দিনের মেলা চলছিল পূর্ণোদ্যমে। সময় ছিল দ্বিপ্রহরের মাঝামাঝি। আকাশে ছিল প্রখর রৌদ্রের উজ্জ্বল আলো। সূর্য তখন মধ্য বিন্দুতে। বৃক্ষের সবুজ পত্রে স্বর্ণ আলোর দ্যুতি। বাতাসে উষ্ণ জলীয় বাষ্প ঢুকে তপ্ত করেছে মেলার পরিবেশ। বৃহৎ উন্মুক্ত ক্ষেত্র জুড়ে এই মেলার ব্যবস্থা।

সারি সারি বিভিন্ন দ্রব্যের বিপনীর সামনে খদ্দেরের ইতস্তত চলাফেরা। অহেতুক গোলমাল। অহেতুক ভেঁপুর শব্দে দিগন্ত পূর্ণ।

আমীর, ওমরাহ ঘরের রমণীরা বিচিত্র বসনে ও অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে মেলার চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে তারাও আছে, যারা শিকার ধরবার তালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যারা দেহোপচার নিবেদনের জন্যে ধন সম্পদে পূর্ণ আমীরের খোঁজে এ বিপনী থেকে অন্য বিপনীতে ঘুরছে। তবে তাদের চেনা বড় মুস্কিল। প্রতিটি রমণীর চোখে সুরমার অঞ্জন। সবারই দৃষ্টির মাঝে বঙ্কিম চাউনি। অধরের কোণে তাম্বুলের রক্তরাগ রেখা। সবারই দেহ ঘিরে বাসনার আমন্ত্রণ।

এই সময় মেলার মধ্যে থেকে হঠাৎ রমণীকণ্ঠে আর্ত-চীৎকার উত্থিত হল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চলমান মেলা স্তব্ধ। সকলেরই চোখ সেই চীৎকারকে অনুসরণ করে ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছলো।

তখন ঘটনাস্থলে তলোয়ারের যুদ্ধ চলেছে। পাশে দাঁড়িয়ে রোরুদ্যমানা এক রমণী। ঘটনাটি সঙ্গে সঙ্গে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল, এই রমণীকে বলপূর্বক একটি দস্যু নিয়ে পালাচ্ছিল, তার কাছ থেকে যিনি উদ্ধার করেছেন, তাঁরই সঙ্গে ঐ দস্যুর তলোয়ারের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। যিনি রমণীটিকে বাঁচিয়ে ছিলেন, তিনিই সেই ইব্রাহিম খাঁ। অসীম সাহস, দুর্জয় ক্ষমতা এবং তলোয়ারের যুদ্ধে তাঁর মত কৌশল বড় একটা দেখা যায় না। কিছুক্ষণের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত করে দস্যুকে পরাজিত করলেন, তারপর যখন তাকে চিরতরে শেষ করতে যাবেন, ঘটনাস্থলে ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাজ্ঞী নূরজাহান এসে উপস্থিত হলেন।

নূরজাহান ঘটনা স্থলে এসে ক্ষিপ্তস্বরে বললেন —থামো !

ইব্রাহিম খাঁর তীক্ষ্ণ তরবারী দস্যুর বক্ষ বিদীর্ণ করছিল। রমণী কণ্ঠের 'থামো' শব্দ শুনে তিনি স্তব্ধ হয়ে এপাশে নূরজাহানের দিকে তাকালেন। তাকাতেই তিনি চিনতে পারলেন ভারতের সম্রাজ্ঞীকে : তাঁরও সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। রক্ত পড়ছিল সমস্ত দেহের বিভিন্ন স্থান দিয়ে। সমস্ত শরীর অবশ, ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। তবু তিনি শ্রদ্ধাভরে কুর্নিশ সহকারে দস্যুকে ত্যাগ করে সম্রাজ্ঞীর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

নূরজাহান রক্ষীকে আদেশ দিলেন দস্যুকে শৃঙ্খলিত করে নিয়ে যাবার জন্যে। তারপর রোরুদ্যমানা রমণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, সাকিনা, শিবিরে ফিরে যাও। জানা গেল, এই সাকিনা নূরজাহানের অন্যতম এক বাঁদী। তারপর নূরজাহান সম্রাজ্ঞীর দৃষ্টিতে অথচ কোমল স্বরে ইব্রাহিমের দিকে তাকিয়ে বললেন --বীরপুরুষ, আপনার সাহায্য না পেলে একটি বেগুনা আওরতের ইজ্জত কলুষিত হত। আপনি সাহসের পরিচয় দিয়েছেন বলে আমার শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। এবার বলুন কি পুরস্কার পেলে আপনি খুশি হবেন !

তখন ইব্রাহিম খাঁ বীরপুরুষের মতই উত্তর দিলেন, বললেন—দিন দুনিয়ার মালেকা, আপনার কথা শুনে আমার মন ক্ষুণ্ণ হয়ে যাচ্ছে। আমি কি কোন পুরস্কারের লোভে এই সাহায্যের জন্যে অগ্রসর হয়েছি ? আমি শক্তিমান, খোদাবান আল্লার সাহায্যেই চালিত। পথে দেখলাম এক রমণী বিপন্না। আমি সেই বিপন্না রমণীকে উদ্ধারের জন্যেই অগ্রসর হয়েছি, কোন পুরস্কারের লোভে নয়।

সম্রাজ্ঞী মৃদু হাসলেন, হেসে বললেন—আপনিই প্রকৃত বীর সৈনিক। বেশ আপনাকে আমি কোন পুরস্কার দিয়ে অপমান করবো না। যদি কখনও আপনার কোন প্রয়োজন হয়, আপনি নিঃসন্দেহে আমার কাছে পেশ করবেন, আমি সাধ্যমত তা পূরণ করবো। এই বলে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান চলে গিয়েছিলেন।

তারপর অনেকদিন চলে গেছে।

আনার অনেকবার বলেছিল—পিতাজী, সম্রাজ্ঞী ভুলে গেছেন সে ঘটনা।

কিন্তু ইব্রাহিম খাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল—না সম্রাজ্ঞী কখনও ভোলেন নি সে কথা। মাত্র এক লহমা দেখা। কিন্তু লোকচরিত্র কি ঐ এক লহমাতে চেনা যায় না? সেদিনের সেই প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয়ে মিথ্যে করে দেবেন একটি আত্মবিশ্বাস? না-না সে কখনও হতে পারে না? সেই ইব্রাহিম খাঁ যথাসর্বস্ব বিক্রী করে একটি অশ্ব কিনে তার ওপর সওয়ার হয়ে কন্যাকে পাশে বসিয়ে দিল্লীর রাজদরবারে চলে এলেন।

অনেক ক্লেশ সহ্য করে প্রাসাদে প্রবেশের অনুমতি মিললো। তারপর আরো ক্লেশ সহ্য করে সম্রাজ্ঞীর কাছে সাক্ষাতের অনুমতি এল। অবশ্য ইব্রাহিম খাঁ দীর্ঘ এক পত্র লিখে তাতে হাজার হাজার সেলামের কথা যোজনা করে সম্রাজ্ঞীর কৃপা-লাভের চেষ্টা করলেন। সে চিঠি বহু হাত ঘুরলো, চৌকিদার দেখলো, পরীক্ষা হল, তারপর তা যথাস্থানে পৌঁছতেও অনেক বিলম্ব হল।

ইব্রাহিম খাঁ কন্যাকে সঙ্গে করে প্রাসাদের একপাশে দালানের ওপর বসে আহ্বানের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন, যে আহ্বান তাঁর মনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে লালিত হয়েছে।

সময় যেতে লাগলো বড় ধীরগতিতে। প্রতীক্ষাও যেন আর শেষ হয় না। ইব্রাহিম খাঁ মনে মনে ছটফট করতে লাগলেন। আনারের প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছিল কিন্তু সে বুদ্ধিমতী, এসময় পিতা আহারের কোন ব্যবস্থা করতে পারবেন না বলে সে নিজেকে শান্ত করবার চেষ্টা করছিল। অবশ্য ইব্রাহিম খাঁ বুঝতে পারছিলেন আনারের কষ্ট। কিন্তু করবার তাঁর কি আছে? যদি সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে আহ্বান আসে তবেই তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে। নতুবা—এরপরের ইতিহাস চিন্তা করাই যায় না।

এদিকে আর এক উপদ্রব শুরু হয়েছিল। আনারকে দেখে চলমান অশ্বারোহী, উচ্চপদস্থ মনসবদার প্রভৃতি রাজকর্মচারীরা থমকে দাঁড়াচ্ছিল। কেউ কেউ দুঃসাহসী হয়ে ইব্রাহিম খাঁকে জিজ্ঞেস করছিল—এটি কি আপনার বেটি?

ইব্রাহিম খাঁ বুঝতে পারছিলেন সবই। কিন্তু করবার তাঁর কি আছে? তবু দুঃসাহসীকে উত্তর না দিয়ে নিজের তলোয়ারের খাপে হাত দিয়ে বিশাল বক্ষটি ফুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

তাতেই বীরপুরুষরা তাড়াতাড়ি হেসে পশ্চাদাপসারণ করছিল। এর মধ্যে আবার একজন সাহসী হয়ে আনারের গোলাপী গালে একটি টুসকি দিয়ে নিজের হিম্মৎ প্রকাশ করলো।

ইব্রাহিম খাঁ ক্ষুব্ধ হয়ে খাপ থেকে তলোয়ার বের করে সাহসীকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন।

সাহসী সৈনিকও কম শক্তিমান নয়। সেও খাপ থেকে তলোয়ার বের করে ইব্রাহিম খাঁর তলোয়ারের ওপর আঘাত হানলো। শব্দ হল দুই তলোয়ারের সংঘর্ষে—সূর্যের কিরণচ্ছটায় সেই তলোয়ারের বক্ষ ঝকমক্ করে উঠলো। সংঘর্ষ হল ভীষণ। ঝন্ ঝন্ শব্দে সমস্ত ক্ষেত্রটি মুখরিত করে বিরাট এক অসিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

দুজনেই যোদ্ধা, দুজনেই কৌশলী, দুজনের হাতের তরবারী খেলতে লাগলো চরকির মত। ভীড় দাঁড়িয়ে গেল। কৌতুক সৃষ্টি হল। উল্লাসও কম নয়।

ইব্রাহিম খাঁর বিপরীতে যে জন তারই উৎসাহদাতা বেশী। ইব্রাহিম খাঁর কেউ নেই। নয়া আদমী। নয়া মুসাফির। এসেছে ভাগ্যপরিবর্তনের জন্যে সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে দেখা করতে। তবে কি সম্রাজ্ঞীর কেউ ? না, তাঁর যদি কোন আত্মীয় হত—তাহলে নিশ্চয় এতক্ষণ রাজসুখে আপ্যায়িত হত।···তবে মেয়েটার সুরত বড় চমৎকার, ও আর একটু বড হলে কোন শাহজাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এই সব নানান আলোচনা এই সংঘর্ষের মধ্যে আলোচিত হয়ে গেল।

ইব্রাহিমের দেহ ক্ষতবিক্ষত হল। তবে তিনি ক্লান্ত নন, তিনি আরো নতুন উৎসাহ আহরণ করে অপরপক্ষকে আঘাত হানতে লাগলেন। এই মনে করে তাঁর উৎসাহ হল, আজকে তাঁর শক্তির পরীক্ষা স্বীকৃত হবে। এবং যদি তিনি সফল হন, তাহলে স্বয়ং সম্রাটের কাছেও তাঁর শক্তির কথা অপ্রকাশ থাকবে না। একজন সাত্যিকারের সাহসী বীরপুরুষ যে রাজপুরীতে আগমন করেছে, একথা প্রচার হয়ে গেলে তাঁরই সুবিধা। তাই ইব্রাহিম খাঁ নব নব বলসঞ্চয় করে অপরপক্ষকে আক্রমণ করতে লাগলেন। এবং অতর্কিতে ইব্রাহিম খাঁ আঘাত প্রাপ্ত হলেন। ডানহাতের কনুইয়ের ওপরের জামা ছিঁড়ে গিয়ে চর্মের ওপর আঘাত লাগলো। রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো অবিরল ধারায়। তাই দেখে আনার আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠলো।

আনারের আর্তস্বরের চীৎকারে হাসলো দর্শকরা। হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হাসলো।

ইব্রাহিম খাঁর দেহের শোণিতে আগুন জ্বললো। মাথার মধ্যে খুনের নেশা। তরবারী চললো দ্রুতগতিতে। অপরপক্ষকে দারুণ এক আঘাত হানবার জন্যে ইব্রাহিম খাঁ মরীয়া। হাতের ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত বের হয়ে সমস্ত দেহ রক্তাক্ত করে দিল। তবু সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি অপমানিত, তাই সে অপমানের জ্বালায় ক্ষিপ্ত। তিনি পরাজিত, তাঁর এতকালের অসি চালনার দক্ষতা সম্পূর্ণ অবহেলিত। শুধু তাঁর অপমান নয় লাহোরের অপমান। লাহোরের মাটির অপমান। সেই অপমানের শোধ না নিলে পরিত্রাণ নেই।

ইব্রাহিম খাঁ ভীম বিক্রমে বার বার অপর পক্ষকে আক্রমণ করতে লাগলেন। অপর পক্ষও কম বলশালী নয়। তারও অসিচালনা ক্ষিপ্রগতিতে চলছে। সেও পুনরায় আঘাত করবার জন্যে সুযোগ খুঁজছে।

উৎসাহীরা উৎসাহ দিচ্ছে—কৎলু খাঁ জয়লাভ করলেই খুবসুরত এক চতুর্দশী আওরত উপঢৌকন মিলবে। নাও নাও আবার আঘাত কর। জান নিতেই হবে!

কিন্তু ইত্যবসরে ইব্রাহিম খাঁ জল্লাদের খড়্গের মত তলোয়ারটি তুলে কৎলু খাঁর স্কন্ধের একপাশে সজোরে বসিয়ে দিলেন। স্কন্ধ ও হস্তের যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হল। কৎলু খাঁর হাত থেকে তরবারী খসে পড়লো।

ইব্রাহিম খাঁ গিয়ে কৎলু খাঁর বক্ষ লক্ষ্য করে আবার তরবারীর অগ্রভাগ প্রবেশ করাতে গেলেন, এইসময় রক্ষী এসে ইব্রাহিম খাঁকে থামতে বলে তাঁর হাতে সম্রাজ্ঞীর হস্তলিখিত হুকুমনামা দিল। তাতে লেখা ছিল—'অবিলম্বে সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে দেখা কর। তিনি সাক্ষাতের জন্যে উদগ্রীব।'

এক লহমা চিরকুটটি দেখে নিয়ে আর কালবিলম্ব না করে ইব্রাহিম খাঁ রক্তাক্তদেহে কন্যার হস্ত সবলে আকর্ষণ করে রক্ষীর অনুসরণ করলেন।

এত দুশ্চিন্তা, এত আলোচনা, মনে নানান প্রশ্নের উদয়—সব অপসারিত হয়ে ইব্রাহিম খাঁর বিশ্বাসই হল দৃঢ়।

সম্রাজ্ঞী চিকের আড়ালে উপবেশন করে ইব্রাহিম খাঁকে সুমিষ্টস্বরে বললেন—সবই মনে আছে সৈনিক। আমি জীবনে খুব কম ঘটনাই বিস্মৃত হই। এখন আপনি আমার কাছ থেকে কি প্রার্থনা করেন, জানালেই আমি বাধিত হব।

তখন ইব্রাহিম খাঁ সাহস পেয়ে তাঁর আগমন বৃত্তান্ত অকপটে সম্রাজ্ঞীকে বললেন এবং শেষে এখানে আসার পর যে বিপদের মাঝে পড়েছিলেন, তার কথাও জানালেন।

সম্রাজ্ঞী সমস্ত অবগত হয়ে আরক্ত মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। সম্ভবতঃ তিনি চিন্তা করে নিলেন এদের সম্বন্ধে। চিকের আড়ালে ছিলেন সম্রাজ্ঞী, এপাশে আনার ও তার পিতা ইব্রাহিম খাঁ। অবশ্য চিকের ব্যবধান থাকলেও পরস্পরকে বেশ ভালভাবেই দেখা যাচ্ছিল। সম্রাজ্ঞী নুরজাহানকে এর আগে আনার দেখেনি, সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সম্রাজ্ঞীর অপরূপ রূপসৌন্দর্য দেখছিল। সম্রাজ্ঞীর রূপের সঙ্গে হীরা চুনি পান্নার সমন্বয় যেন আরো ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করেছিল। সম্রাজ্ঞীর পোষাক ছিল রাজোচিত। স্বর্ণখচিত সালোয়ার, কাশ্মিজের বাহারে আরো যেন খোলতাই হয়েছিল তাঁর রূপসৌন্দর্য। মাথায় ছিল বহুমূল্য মুকুট। মুকুটে হীরার জ্যোতি।

কিন্তু সম্রাজ্ঞীর চোখ দুটি সবচেয়ে সুন্দর। এত অলঙ্কার সমস্ত শরীরে, এত ঔজ্জ্বল্য দেহের পরতে পরতে কিন্তু চোখ দুটিকে ম্লান করতে পারে এমন কোন ঔজ্জ্বল্য কোথাও নেই। আনার তাকিয়েছিল সেই খুবসুরত চোখ দুটির দিকে।

সম্রাজ্ঞীও বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে আনারের দিকে তাকিয়েছিলেন। আর মনে মনে বিস্ময়ে বলছিলেন—হারেম আলো করা এমন রূপের কখনও অবমাননা করা উচিত নয়। তাই তিনি ইব্রাহিম খাঁর বক্তব্যের কোন উত্তর না দিয়ে হঠাৎ আনারের দিকে হাত ইসারা করে বললেন—ওটি কি আপনার বেটি?

ইব্রাহিম খাঁ মাথা নাড়লেন।

সম্রাজ্ঞী বললেন—ও আজ থেকে আমার অন্তঃপুরেই থাকবে।

ইব্রাহিম খাঁ কুর্নিশ করে বললেন—যো হুকুম মালেকা।

আর আপনি আজ উপস্থিত অতিথিশালায় বিশ্রাম নিন। সম্রাটের সঙ্গে আলোচনা করে তারপর আপনার ব্যবস্থা সমাপ্ত করবো। আপনি আমার পরামর্শদাতারূপে কাজ করতে নিশ্চয় অমত করবেন না!

ইব্রাহিম খাঁ আবার কুর্নিশ করতে সম্রাজ্ঞী বুঝতে পারলেন তাঁর মনের কথা। তারপর তিনি আর অপেক্ষা করলেন না।

নূরজাহান অদৃশ্য হতেই একটি পরিচারিকা এসে আনারকে বললো—চলো, মালেকার হুকুম।

আনার পিতার দিকে তাকালো। ইব্রাহিম খাঁও কন্যার দিকে তাকালেন।

আনারের চোখের কোণে জল টলমল করে উঠলো। সে পিতার রুধিরাক্ত ক্ষত হাতের দিকে তাকিয়ে কাতর হয়ে উঠলো।

ইব্রাহিম খাঁ কন্যার অহেতুক দুশ্চিন্তায় হাস্যপ্রকাশ করে বললেন—বেটি ভয় কি? আমাদের নসীব আজ পরিবর্তিত হয়েছে। আর হাতের এই চোট্ দুদিন বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাবে। তুমি যাও, ভাবনার কিছু নেই। আমি কাছে কাছেই থাকবো।

আনার কোন কথাই বলতে পারলো না। আর তাছাড়া সে বলবে কি? কথা তার কিই বা আছে? এসে সে পড়েছে বিরাট সাম্রাজ্যে। এখানে অনেক লোক, অনেক গুঞ্জন। পিতা যোদ্ধা, তিনি রাজপুরীতে নিজের আসন তৈরীর জন্যে সুদূর লাহোর থেকে দিল্লীতে এসেছেন।

আনার হঠাৎ নূরজাহানের অনুগ্রহের কথা ভাবলো। তিনি তাকে হঠাৎ হারেমে পুরে কিসের জন্যে লালনপালন করতে চান? তবে কি তাঁর মনে কোন অভিসন্ধি উঁকিঝুঁকি দিয়ে উঠেছে? কিন্তু কী সে অভিসন্ধি? আনার আর কিছু ভাবতে পারলো না। অদূর ভবিষ্যতের ছবি স্মরণ করতে না পারে সে ভীরুপায়ে বাঁদীর পশ্চাদাপসরণ করলো। যেতে যেতে সে বার বার কুর্নিশ করতে লাগলো পিতাকে। চোখের অশ্রুর নির্মাল্য দিয়ে পিতাকে সে নীরবে প্রার্থনা জানাতে লাগলো—পিতা, দুনিয়ায় তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আম্মা কবরশায়িত হবার পর তুমিই আমার সব। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে রেখে দিয়ে আমার কথা একেবারে বিস্মৃত হয়ো না পিতা!

তারপর আনার গিয়ে বাঁদীর ফরমাইসিতে গোলাপ জলের সুবাসে স্নান সমাপ্ত করলো। নিজের দেহ মুক্তাভস্ম দিয়ে মার্জনা করে বাদশাহী হারেমের মত যোগ্য করে তুললো। তারপর তার জন্যে যে মূল্যবান সব পোষাক, অলঙ্কার আসতে লাগলো, তাই দেখে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো তার জন্যে এ আয়োজন কেন, এ যে শাহজাদীর সম্মানে ভূষিতা হওয়ার মত! তবে কি সম্রাজ্ঞী তাকে দিয়ে কোন উদ্দেশ্যসাধন করতে চান? কিন্তু সে উদ্দেশ্য কি?

চুপ করে সে দাঁড়িয়ে থাকলো। বাঁদী বোধ হয় তার মনের কথা বুঝলো, বললো—চিন্তার কি আছে? সম্রাজ্ঞী তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন, আর তাঁরই হুকুমে এই সব রাজোচিত আয়োজন।

আনার তবু নিরুত্তর। সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো, দিল্লীর বাদশাহের

দৌলতের রোশনাই, পোষাকের চেকনাইতে সমস্ত কক্ষ পূর্ণ। সলমা, চুমকির কাজ করা স্বর্ণখচিত সব জাফরাণী, গোলাপী ফিরোজা রঙের সাটিন, মখমল, রেশমী সালোয়ার, পাঞ্জাবী, ওড়না। কয়েকটি বহুমূল্য কণ্ঠহার শয্যার একপাশে রক্ষিত রয়েছে, তাদের দিকে তাকিয়ে আনারের চোখ ঝল্‌সে যেতে লাগলো।

তারপর মন তার একসময় দৃঢ় হলে সেই সব সামগ্রী থেকে সে একটি একটি পোষাক তুলে নিয়ে কক্ষের বেলজিয়াম মুকুরের সামনে দাঁড করিয়ে নিজেকে সাজালো। বাঁদী তাকে সাহায্য করে দিতে লাগলো সব রকম। তারপর তার সাজ সমাপ্ত হলে সে কক্ষের পাথরের দেয়ালের সঙ্গে গ্রথিত বিরাট দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো।

দেখতে দেখতে অভিভূত হয়ে উঠতে লাগলো আনার। সে নিজেকে চিনতে পারলো না। স্বচ্ছ দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে আছে যেন আগামী দিনের এক রূপসী চতুর্দশী সম্রাজ্ঞী। তার সমস্ত দেহের বিভিন্ন বাঁকে বাঁকে তাই কামনা ঘন উগ্রতার সীমাহীন ঔজ্জ্বল্য। আনার মনে মনে বললো—সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের চোখ আছে। জহুরীর মতো ঠিক আসল রত্নটি চিনে নিয়ে হারেমে স্থান দিয়েছেন।

আনার যখন দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে, বাঁদী সেই দেখে মুচকি হেসে বললো—মালেকা, গোস্তাখি যদি মাপ হয় একটা কথা বলি, দিলভরা এই সুরত একটু সামলে রেখো। এই রূপের চেকনাই আমীর ওমরাহরা দেখলে তাদের শান্তি বিঘ্নিত হবে। চাই কি বিদ্রোহও সৃষ্টি হতে পারে?

আনার বাঁদীর কথায় মৃদু হেসে দর্পণের সামনে থেকে সরে এসে বললো—তোমার নাম কি বাঁদী?

ইরানী।

তুমি কি আমার কাছে থাকবার জন্যে নিয়োজিত হয়েছ?

বাঁদী কুর্নিশ করে বললো—জি মালেকা! সম্রাজ্ঞীর হুকুমে আমি বহাল হয়েছি আপনার ফরমাইস পালন করতে।

আনার আবার শুধোলো—আচ্ছা, সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে আমার দেখা হবে কখন বলতে পারো!

ইরাণী কুর্নিশ করে বললো—তোমার ইচ্ছা সম্রাজ্ঞীর কাছে পেশ করলেই তাঁর হুকুম মিলবে। তারপর ইরাণী আগ্রহ ভরে জিজ্ঞেস করলো—তুমি কি দেখা করতে চাও মালেকা?

আনার কি ভেবে বললো—থাক্।

তারপর নিজেই মনে মনে বললো—দেখা করেই বা লাভ কি? তার যা প্রয়োজন ছিল সে তাই পেয়েছে। বাদশাহী খানা, বাদশাহী বাসস্থান, বাদশাহের সমস্ত সুখই সে পেয়েছে। এর চেয়ে আর কি সুখ সে আকাঙ্ক্ষা করতে পারে? ছিল পিতার কাছে একান্ত দৈন্যের মধ্যে। একবেলা আহার জুটতো কিনা সন্দেহ। তারপর পিতার ক্ষমতায়ই এই সৌভাগ্য তার আবির্ভূত হল। সেই সৌভাগ্যের

বেতন স্বরূপ তার মিলছে কাবাব, কোর্মা, পোলাও। সুকোমল শয্যার ব্যবস্থা। পোষাকের রকমারী। দেহের অলঙ্কার। আর কি দরকার? একটি চোদ্দ বছরের আওরত জীবনে আর কি সে আশা করতে পারে?

আনার সে সময়ে আর কিছুই ভাবতে পারে নি। ভাবতে পারে নি কোন সোহাগের রঙ। কোন বাসনার রাত্রি তার পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যায়নি বলে তার মনে আর কোন আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়নি। তাছাড়া সে এতকাল ছিল পিতার সাহচর্যে। পিতার সঙ্গে তার কন্যার সম্পর্ক। শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্বন্ধ। সেখানে এসব কামনা-বাসনার লগ্ন লুপ্ত। তাছাড়া তার বয়স তখন ছিল কম। আম্মাজান মারা যাবার পর দশ থেকে চোদ্দ বছর তার যে কি রকম করে কেটেছে কে জানে? জ্ঞান অবশ্য তার অনেক আগেই হয়েছিল, তবে জ্ঞানের উন্মেষ হতে তার বিলম্ব হয়েছিল। যাই হ'ক, জ্ঞান হলেও আওরতের মনে যে যৌবনের আকাঙ্ক্ষা জাগে, তা তার কোনদিনই জাগে নি।

সে সব আরো অনেক পরে যখন সৃষ্টি হয়েছিল, তখন সে অবাকই হয়ে গিয়েছিল, মোগল রাজপুরীতে আসার পরই তার সেই অভিজ্ঞতা মনের সোপানে সৃষ্টির উন্মেষ ঘটায়। দেখেছে বাদশাহকে, সম্রাজ্ঞীকে, বেগমদের, শাহজাদাদের, বাঁদী, নর্তকী সকলকে। দিনরাত বিলাসের সোহাগ-সিংহাসনে উপবেশন করে সেরাজীর নেশায় মাতোয়ারা হয়ে যে উচ্ছৃঙ্খল জীবনের স্রোত সে প্রত্যক্ষ করেছে, তাতে তার যৌবনের উন্মেষ ঘটতে এতটুকু বিলম্ব হয়নি। মনের মধ্যে তখনই তার পুলক এসে জমেছে। সে কক্ষের দরজা বন্ধ করে বক্ষবাস উন্মোচিত করেছে। দেখেছে দর্পণের প্রতিবিম্বে নিজের বক্ষের রক্তাভ যৌবন পুষ্প। দেখে সে শিহরিত হয়ে লজ্জায় নিজের বক্ষ আবরিত করেছে। বদ্ধ কক্ষের মধ্যে চতুর্দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখেছে—কেউ দেখে ফেলেছে কিনা! দেয়ালের চোখ আছে কিনা দেখে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি নিজের বক্ষবাস ঠিক করে নিয়েছে।

চোদ্দ বছরের মাসুম মনের পবিত্র কুসুমটি রক্তবর্ণের উজ্জ্বলতা নিয়ে হারেমের ভেতর প্রবেশ করেছিল কিন্তু কটি দিন ও রাত্রি অতিবাহিত হবার পরই তার মনের চেহারা পরিবর্তিত হয়। আলোকপ্রাপ্তা হবার পরই তার মনে বিস্ময়ের পর বিস্ময় সৃষ্টি হয়। সে যেন কদিনেই সমস্ত অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে পরিণত মনের স্পর্শ পায়। সে রমণী হয়ে ওঠে। তার চোখে অনেক ভাষার রূপান্তর ঘটে। বক্ষের সীমিতে কাঁচুলীর বন্ধন হয় আরো দৃঢ়। সালোয়ার কামিজের আবরণী দিয়ে সে পূর্ণভাবে নিজেকে ঢেকে রাখে। আর তার মনে সৃষ্টি হয় দারুণ ভয়। সে ভয়ের মেদুর ছায়ায় সর্বদা সঙ্কুচিত হয়ে থাকে।

এ সব অভিজ্ঞতা আনারের মনে সঞ্চিত হওয়ার আগে প্রথম দিনের ঘটনাই তাকে চমকে দিয়েছিল। সেদিন রাত্রে সে এমন চমকিত হয়েছিল, যা সে জীবনে আর কখনও হয়নি। অবশ্য এই চমকই তার জীবনে শুরু ও শেষ। আর তাকে অন্ততঃ এই হারেমের মধ্যে চমকাতে হয়নি। তারপর সে প্রত্যক্ষ করেছে অনেক

আশ্চর্য ঘটনা, অনেক উত্থান ও পতনের ইতিহাস, অনেক আজব কাহিনী—যা সে কখনও কল্পনায় কোথাও স্থান দিতে পারতো না। দেখেছে আর মনে মনে বিস্ময়ে বলেছে—দুনিয়ার আসল রঙমহলের ইতিহাস বুঝি এই!



ঘুম প্রথম দিন রাত্রে আসতো না যদি না সে ক্লান্ত থাকতো। ঘুম এল শুধু ঐ কারণের জন্যে। ঘুম আসতো না তার কারণ এমন সুকোমল বিছানায় কি আনার কখনও শুয়েছিল? মেহগনি পালঙ্কের ওপর মখমলের সুকোমল শয্যা, তার ওপর শিমূল তুলোর বালিশ। কক্ষের মধ্যে আমোদিত অগুরু আতরের সুবাস। তাছাড়া প্রস্ফুটিত গুলাব গুচ্ছ স্বর্ণময় পুষ্পদানে সজ্জিত রয়েছে কক্ষের কোণে কোণে, তা থেকে সৌরভ ভেসে আসছে আনারের নাসারন্ধ্রে।

রাত্রির অন্ধকারকে অপমানিত করে সবুজ বর্ণের সামাদানের মধ্যে কয়েকটি স্নিগ্ধ সুগন্ধি বর্তিকা কেঁপে কেঁপে আলো বিকীরণ করছিল। আনার কোমল শয্যার গহ্বরে অসামান্য তনু-ক্ষেপন করে সেই কম্পিত আলোর শিখার দিকে তাকিয়েছিল। সমস্ত কক্ষটি সবুজ বর্ণের আলোর প্রভায় স্বপ্নীল। সে সেই স্বপ্নীল কক্ষের মধ্যে শুয়ে আরো স্বপ্নের আচ্ছাদনের মাঝে মনপ্রাণ সমর্পণ করলো।

সেদিন বাইরের আকাশে চন্দ্রের রজতশুভ্র আলোর বর্ণাঢ্যপ্রকাশ হয়নি। বোধ হয় তিথি নক্ষত্রের সময়ের ক্ষেপে অন্ধকার রাত্রিই সেদিন নির্দিষ্ট ছিল। হয়ত চন্দ্র সপ্রকাশ ছিল, তা ছিল মেঘের গহন আঁধারে। তাই আলোহীন আকাশের বক্ষ ঘিরে শুধু অশনি সঙ্কেতের দিশারা। অন্ধকার নিকষ কালোর মাঝে যেন দুশমণের শাণিত ছুরিকা হত্যার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অপেক্ষা করছে। আনার তাই ভেবে শিউরে উঠলো। সে তাই বাইরের আকাশের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে কক্ষের বাইরের পদশব্দ শোনার চেষ্টা করলো। পদশব্দ শুনতে পেত, খোজা প্রহরী বাইরের দীর্ঘ বারান্দায় পাহারা দিচ্ছে। সঙ্গীন তুলে প্রহরীর পাহারা দেওয়ার কথা চিন্তা করে আনার হঠাৎ ভাবলো—তবে কি সে সম্রাজ্ঞী কর্তৃক বন্দিনী হয়ে এই হারেমে স্থান পেল? কিন্তু কেন? সে কেন বন্দিনী হবে? কি তার অপরাধ? আবার ভাবলো—এসব ভাবনাও বোধ হয় অমূলক। তার ভালর জন্যেই হয়ত সম্রাজ্ঞী তাকে হারেমের রাজসিক আরামে বসবাসের সুযোগ দিয়েছেন।

পিতার কথা সে ভাবলো, পিতা কি সম্রাট কর্তৃক অনুমতি পেয়ে রাজকার্যের সহায়ক হবেন? যদি না হন! যদি সম্রাজ্ঞীর কথা সম্রাট না মেনে তার পিতাকে তাচ্ছিল্য করেন? আনার আবার ভাবলো—না তা হবার নয়। সম্রাট কখনই অপরূপ সুন্দরী বেগমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের বিরাগভাজন হবেন না।

কারণ এই নবতম বেগমের সঙ্গে সম্রাটের সম্বন্ধের কথা কে না জানে। তামাম ভারত-বর্ষের সব লোকই জানে সম্রাটের দুর্বল হৃদয়টুকুর কথা। তিনি এই আওরতের সুরতের আগুনে নিজের হৃদয় দগ্ধ করে কোহিনূরের সম্মান দান করেছেন। একটি পুরুষের কাছে একটি রমণী যতখানি—তার চেয়ে অনেক বেশী স্থান জাহাঙ্গীর খাঁ তাঁর নতুন বেগম নূরজাহানকে দিয়েছিলেন।

এখন জাহাঙ্গীর খাঁ নামমাত্র রাজকার্য ছাড়া অধিকাংশ সময় বিলাস কক্ষে কাটান। বিলাস কক্ষের বিলাস-ফরাসের ওপর মখমলের তাকিয়া ঠেসান দিয়ে গুলাবী আতরের সুগন্ধময় সেবাজী পান করে নর্তকীর চটুল দেহের নৃত্যভঙ্গিমা উপভোগ করেন। তারপর নাচ দেখতে দেখতে বাদশাহী রক্তে উষ্ণতার স্পর্শ অনুভূত হলে তিনি খুবসুরত আওরতের দিকে বিবশ হয়ে তাকান। নবতম বেগম সম্রাজ্ঞী নূরজাহান স্বামীকে এরই মধ্যে আনন্দে মাতিয়ে রেখে রাজকার্যের অধিকাংশই নিজে সম্পন্ন করেন। এবং স্বামীকে প্রয়োজনের মধ্যে নিজের দেহ-সুষমা দান করে, স্বামীর চিত্তের বিক্ষুব্ধতা মোচন করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের বিলাসী মনের আকাঙ্ক্ষা এতো বেশী প্রবল যে সম্রাজ্ঞীর ঐ অল্প সময়ের সোহাগে চিত্তের আকাঙ্ক্ষা দমিত হয় না। সে কথা বুঝতে পেরে সম্রাজ্ঞী স্বামীর মনের বেদনা উপশমের জন্য ঐ বিলাসী-কক্ষেই স্বামীকে অধিকাংশ সময় কাটাতে প্রশ্রয় দেন।

এসব কথা এখানে এসেই আনার জানতে পেরেছিল। গল্প করেছিল ইরানী। তাই সে-কথা ভেবে সে নিশ্চিন্ত হল এইজন্যে যে, তার পিতা যদি সম্রাজ্ঞীর কৃপা-লাভে জয়ী হয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয় তিনি কাজ পাবেন। মন্দ দিকটা এক এক সময় মনের মধ্যে যে উদয় হচ্ছিল না তা নয়, কিন্তু আনার ভাবতে চাইছিল না। মনে আসছিল, যদি পিতা কাজ না পান, তাহলে তাদের দুর্গতির একশেষ হবে। আচ্ছা পিতা যদি নিয়োগ না হন, তাহলে সে কি এই হারেমে বাদশাহী আরামে দিন গুজরান করবে? যদি সম্রাজ্ঞী তার পিতাকে বলেন—আপনার বেটি এখানে থাকুক। পিতা কি চিন্তা না করেই বলবেন—থাক্। ঐ জোয়ানী বেটি নিয়ে আমি কি করবো? তার চেয়ে এ আশ্রয় তার ভাগ্যের।

আরো অনেক আবোল-তাবোল চিন্তা সে কোমল শয্যার গহ্বরে শুয়ে ভাবছিল। কোনটা সে বুঝতে পেরে নিজেই বিস্ময়ে ত্যাগ করছিল আবার কোনটার সত্যাসত্য বিবেচনা করে নিজে হত-চকিত হয়ে ভাবছিল—এও কি সম্ভব···আনারের একা এই বৃহৎ কক্ষে শুয়ে শুয়ে ভয় করছিল। সে ভয়ে ভয়ে চোখ বুজিয়ে এইসব আবোল-তাবোল ভাবছিল। চোখ খুলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু তার খুলতে সাহস হচ্ছিল না।

ইরানী পাশেই আছে। পাশে মানে এই কক্ষের সামনের ঐ ওধারে। বলেছিল, ডাকলেই সাড়া দেবে।

ইরানীকে ডাকতে ইচ্ছে করছিল আনারের, কিন্তু লজ্জা করছিল—ইরানী কি ভাববে? হয়ত বলেই বসবে—ভূতের ভয়? তা ভূত রাজপুরীতে থাকতে পারে। প্রত্যহ কত আদমীর শাস্তি কবুল হচ্ছে, তাদের দ্বিখণ্ডিত দেহের আত্মাগুলো কোথায়

যাচ্ছে? তাদের কি মুক্তি আছে? তাই তারা প্রতিশোধের জন্যে ভূতের বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ইরানী মেয়েটি বেশ। এই ক'ঘণ্টার মধ্যে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে আনারের সঙ্গে। আর ইরানী ছাড়া এই এত বড় রাজপুরীতে কার সঙ্গেই বা ভাব হবে? ঐ থাকলো যতক্ষণ না রাত্রি হল। আনারের সমস্ত ফরমাইস খেটে, আনারকে বিছানার গহ্বরে ঢুকিয়ে দিয়ে সে চলে গেল।

এই ইরানীই পরবর্তী জীবনে আনারের বহু কাজে সাহায্য করেছিল। ইরানী আনারের একরকম সখী হয়ে গিয়েছিল। তবে ইরানীর শেষ জীবনের ইতিহাসটি এত মর্মন্তুদ যে সে কথা ভাবলে আজ আনারের চোখে জল এসে পড়ে। ইরানী মারা যাবার পর জুবেদা পরিচারিকা হওয়ার ইতিহাসটুকু আলোচিত হলে,—তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তবে সে কাহিনী আরো অনেক পরের।

সে রাত্রে এইসব আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতে আনার কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, তা সে জানে না। আচমকা তার ঘুম ভেঙে গেল।



তখন রাত্রি বোধ হয় নিশুতি। প্রাসাদের কোথাও কোন শব্দের লেশমাত্র ছিল না। মৃত্যুর মত স্তব্ধতা হাত-পা মেলে দিয়ে অন্ধকারে চুপ করে শুয়ে আছে। প্রাসাদের নহবত চূড়ায় তখন কোন প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছিল না। আনার শুনতে পেল বাইরের বারান্দায় খোজা প্রহরীর ভারী জুতোর চলাফেরা। সেই শব্দের অনুরণন আনারের বুকে লেগে তার ভীরুবক্ষ আরো ভয়াবহ করে তুলতে লাগলো।

কিন্তু তার ঘুম ভাঙলো সে-জন্যে না। ঘুম ভাঙলো আচমকা রমণীকণ্ঠের তীব্র চীৎকারে। কে যেন কার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় পরিত্রাহি চীৎকার করে উঠলো। উঃ কী সে মর্মভেদী চীৎকার! সমস্ত প্রাসাদের প্রস্তরময় দেয়াল কাঁপিয়ে সেই চীৎকার গোল হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চতুর্দিকে ধাক্কা মেরে সচেতন করে তুললো। একবার নয়, বার বার, অনেকবার। অগুণতিভাবে রমণীকণ্ঠের চীৎকার উঠতে লাগলো। আনারের তাতেই ঘুম ভাঙলো। আচমকা সে ভয়ে ধড়মড়িয়ে বিছানার ওপর উঠে বসলো।

শুনতে পেল কারা যেন তার কক্ষের পাশের বারান্দা দিয়ে ছুটে চলে গেল। আনার তাড়াতাড়ি উঠে কক্ষের বাইরে যাবার চেষ্টা করলো কিন্তু মনে পড়লো ইরানীর নিষেধ বাক্য। 'যদি রাত্রিবেলা কোন শব্দ পাও, তাহলে কোন কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে বাইরে যাবে না। বাদশাহের হুকুমে অহেতুক কৌতূহলীর শাস্তি নাকি চরম মৃত্যুদণ্ড।' সে কথা স্মরণ হতে আনার ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বিছানার ওপরই

বসে থাকলো! দু একবার অবশ্য হাতের তালি দিয়ে ইরানীকে আহ্বান করলো। কিন্তু কোথায় ইরানী? সে হয়ত তখন গভীর ঘুমের দেশে—নতুবা সেই ঘটনাস্থলে গিয়ে কোন সাহায্যার্থে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে।

আনার তাই একান্ত অসহায়ের মত বসে বসে ভাবতে লাগলো সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান, অপরিচিত পরিবেশ—কিই বা সে ভাবতে পারে? তবু কিছু কল্পনার আশ্রয় নিয়ে ভাবলো। যে কাঁদলো, যে চীৎকার করলো—সে কে? হয়ত কোন বেগুণা আওরত। হয়ত তাকে তারই মত এই হারেমের প্রকোষ্ঠে আটক রেখে তার ওপর কোন অত্যাচার করা হচ্ছে! অত্যাচার! অত্যাচারের কথা মনে আসতেই আনার বিস্ময়ে ভাবলো, কি ধরনের অত্যাচার এই নতুন মেয়েটির ওপর বাদশাহের লোকেরা করতে পারে? আচ্ছা সম্রাজ্ঞী নূরজাহান এই অত্যাচারের কথা জানেন তো? না জানারই বা কি আছে? যদি অজানা থাকে নিশ্চয় এই চীৎকারে জানা হয়ে গেছে। আর সম্রাজ্ঞীর আদেশবিহীন কাজ কেই বা কববে? সম্রাজ্ঞীর অজ্ঞাতে কি কোন অপরাধমূলক কার্য সমাধা হতে পারে?

কিন্তু সম্রাজ্ঞী কোন অপরাধের সঙ্গে জড়িত আছেন, মনে এলেই কেমন যেন আনারের মন তাতে সায় দিতে চায় না। মনে পড়ে যায় তার সেই প্রথম ও শেষ দেখা সম্রাজ্ঞীর সুন্দর মুখখানি, তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, তাঁর আলাপের সুমধুর ছন্দ—তাছাড়া সম্রাজ্ঞীর পোষাকের জলুসতায় চিত্তেব স্বচ্ছতা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল বলে এই লহমাতেই আনার সম্রাজ্ঞীকে ভালবেসেছিল। তাই সম্রাজ্ঞী এই ঘটনার সাথে জড়িত আছে মনে করতেই তার মন সম্পূর্ণ সায় দিল—না, এ কখনও হতে পারে না। যদি সেই রমণী কারো দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে থাকে, তা সম্পূর্ণ সম্রাজ্ঞীর অজানা।

আচ্ছা রমণীটির ওপর কি কেউ ব্যাভিচারের চেষ্টা করেছিল? আর সেইজন্যে সে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় অমন চীৎকার করে উঠলো? নাকি, তার ওপর ব্যভিচার হয়ে যাবার পর বীভৎসতার কল্পনায় চীৎকার কবে উঠেছে? কে জানে, কি হতে পারে? আদৌ হয়ত এসব কোনটাই নয়। হয়ত সে অপরাধিনী, সে কোন বাঁদী কিম্বা নর্তকী। তার বিচারের কথা শুনে হয়ত এই রাত্রে সে আতঙ্কিত হয়ে চীৎকার করে উঠেছে। হয়ত আগামী প্রত্যুষে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে। নারী জল্লাদ তাকে নিয়ে যেতে এসেছে বলে সে অমন জোরে কেঁদে উঠলো।

ভাবনা থেকে সরে এসে আনার আবার বর্তমানে ফিরে এল। এবার সে শুনতে পেল চীৎকার নয়, কান্নার করুণ সুর। কান্নাটা কাছে নয়, অনেকদূরে। আগে চীৎকারটা অনেক কাছে ছিল, যেন মনে হচ্ছিল এক দেয়ালের ব্যবধান। এখন কান্নাটা দূরে সরে যেতে মনে হল, কেউ যেন সেই রমণীটিকে টেনে হিঁচড়ে এরই মধ্যে দূরে টেনে নিয়ে গেল। কিন্তু কেন?

কেন? কেন? কেন? আনার যেন সেই কেনর আবর্তে পড়ে দিশেহারা হয়ে গেল। আজই সে এখানে এসেছে। সম্পূর্ণ অপরিচিতই এই বাদশাহের অন্তঃপুর। সে জানে না এই বাদশাহের অন্তঃপুরের গভীর রহস্য। শুনেছে এখানে আছে প্রাই

হাজার হাজার সুন্দরী, অপ্সরী, খুবসুরত জোয়ানী আওরত। তারা কেউ কেউ বাদশাহের বেগম উপাধি পেয়ে ধন্যা, কেউ যৌবনের প্রথম প্রস্ফুটিত গুলাবপুষ্পের বর্ণ ও সৌরভ নিয়ে অপেক্ষমানা। কেউ আবার বাঁদীর জীবন নিয়ে বয়সের সমস্ত কাল এই হারেমেই কাটিয়ে দিয়েছে। হারেমে যে সব মেয়েদের বয়েস বাড়লো, তাদের কপালও মন্দ হল, তাদের মাসোহারাও কমলো, সঙ্গে সঙ্গে জীবনও বরবাদ হল। এই বাদশাহী হারেমে সব চেয়ে আদর পায়, যারা অধিক সুন্দরী ও যাদের বয়স কম।

হরানী এই কথাগুলি বলে আনারের দিকে তাকিয়ে হেসেছিল।

আনার তাই দেখে শিউরে উঠেছিল। কিন্তু প্রশ্ন করেনি। সে বুঝতে পেরেছিল—মুচাক হাসির মধ্যে হরানী কি প্রকাশ করতে চায়। কমবয়সী জোয়ানী আওরতের যে এখানে মূল্য বেশী, সে-কথা ভেবেই আনার অভিভূত হয়েছিল। এখানে এত ঐশ্বর্য, এত জাঁক-জমক—সবেরই মধ্যে একটা অর্থ আছে। এখানে রক্তবর্ণের জিনিসেরই বেশী সমাদর।

বয়স কম সুন্দরী মেয়েদের এত মূল্য কেন? এ কথা তখন জিজ্ঞেস করার জন্য আনারের মন আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে জিজ্ঞেস করেনি বলে রক্ষে। কারণ তার একদিন বা দুদিন পরেই বুঝেছিল, কম বয়স মেয়েদের এত সমাদর কেন এখানে? পরে জানবার পর বুঝেছিল, সেদিন ইরানীকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে লজ্জাতেই পড়তে হত। সে যা উত্তর দিত, হয়ত তার অপুষ্ট মনের ছবিই ফুটে উঠতো।

যাই হ ক আনার সেদিন রাত্রে বসে ক্রন্দনমুখরিত রমণীটিকে কম বয়সের সুন্দরী বলেই মনে করেছিল, এবং এই কম বয়সের আওরতদের যেরকম সমাদর, তেমনি তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের কথা ভেবে সে মনে মনে আহত হয়েছিল।

সে রাত্রি আনারের কেটেছিল একান্ত নিরুদ্বেগের মধ্যে দিয়ে। বাকী রাত্রিটুকু সে আর পালঙ্কের দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় শয়ন করেনি। বসেছিল সমস্তক্ষণ। বসে বসে শুনেছিল প্রাসাদের নহবত চূড়ায় শেষ প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি। এমন কি ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে মসজিদের আজান ও তার কানে গিয়েছিল। সে শুনে মনে মনে প্রভাত আলোর বর্ণ কুসুমের বক্ষে চুম্বন এঁকে আল্লার কাছে প্রার্থনা পেশ করেছিল।

সেই কান্নাটি সারা রাত্রিই করুণ আর্তনাদের মত গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে প্রাসাদ সোপানে আছাড় খেয়ে পড়েছিল। আনার শুনেছিল সেই করুণ অশ্রুসজল অভিব্যক্তি। সে শুধু জমাট কুয়াশার মধ্যে বিস্ময় নিয়ে নির্বাক হয়ে সেই রমণীর কান্নাই শুনেছিল। তার করার কিছু ছিল না। তার ভাবারও কিছু ছিলনা। সম্পূর্ণ নিরুপায় হয়ে সে প্রভাতের অপেক্ষায় বাকী রাতটুকু বসে থাকলো। এই অপেক্ষার মাঝে মেহগনি টেবিলের রক্ষিত স্বর্ণভৃঙ্গার পূর্ণ খসবু সেরাজী ও পান পাত্রের পানে ক'বার তাকিয়েছিল আনার। তার ইচ্ছে করেছিল সে একটু ঐ পদার্থ গ্রহণ করে। ঐ পদার্থের আস্বাদ যেন খুব মিঠে। তাতে আছে গুলাবী আতরের খসবু। সেই

আতরের জোরালো সুগন্ধে মাথার মধ্যে কেমন আলোড়ন জেগে উঠবে। দেহের শোণিতে জাগবে উষ্ণ প্রস্রবণ। চোখের কোলে নামবে ঘুমের প্রলেপ। মনে হবে কারো কোলে মাথা দিয়ে অনন্তকাল ধরে শুয়ে থাকি? সে কোলটি কোন আওরতের হবে না, মরদের হবে। আর সে মরদ হবে বীরপুরুষ, তার বাহু হবে লোহার মত কঠিন। সে সেই লোহার মত কঠিন বাহু দিয়ে নিষ্পেষণের সোহাগে ভরিয়ে দেবে হৃদয়। এ কথাগুলি [illegible]লের ওপর সেরাজী পাত্র রাখতে রাখতে ইরানী বলেছিল।

আনারের সেই কথাগুলি মনে আসতে তার হাত নিসপিস করতে লাগলো। তারপর নিজেকে সংযত করে ভাবলো—এত ব্যস্ততার কি আছে? অভিজ্ঞতা তো সঞ্চয় হবেই! বাদশাহী হারেমের মধ্যে যখন প্রবেশ করেছে, তখন বিলাসের কিছু কিছু উপকরণ কি বপ্ত হবে না? তখনই সেরাজী পান করে রঙিন নেশার মাঝে স্বপ্ন কুমকুমের আলপনা আঁকলেই হবে।

পরদিন প্রভাত আলোয় অন্তঃপুরের কক্ষ ঝলমল করলে, বাইরে পাখীদের কলরব উচ্চারিত হলে, প্রাসাদের নানান অংশে লোকেদের কলগুঞ্জন প্রতিধ্বনিত হলে—ইরানীর দেখা মিললো—সে এসে বললো—নয়া বিবি, ঘুম ভাঙলো?

আনার মাথা নেড়ে বললো—হ্যাঁ, অনেকক্ষণ। তারপর সে কোন ভণিতা না করে বললো—আচ্ছা ইরানী, গত রাত্রের ঘটনা তুমি কিছু জানো? আমি ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তারপর সেই চীৎকারে এমন ঘুম ভেঙে গেল যে, আর ঘুমই এল না। এই বলে আনার আদ্যোপান্ত ঘটনা সব বলে গেল।

ইরানী সব শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো—আনার বিবি, কৌতূহল প্রকাশ করা বাদশাহের নিয়মে মৃত্যুদণ্ড। তুমি কৌতূহলী হয়ে যদি আর কারো কাছে এই ঘটনার কথা জানতে চেয়ে তার রহস্য সমাধান করতে চাইতে হয়ত সে বেইমানী করে বাদশাহের কানে তোমার কথা পেশ করতো—আর তার পরিনাম কি হত নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারো? যাই হক, তুমি যখন আমাকে জিজ্ঞেস করেছ, আমি তোমার ওপর বেইমানী করে তোমার সুন্দরাকৃতি ধ্বংস করে দিতে চাইনা। তবে এ বিষয়ে আর কৌতূহল প্রকাশ করে আমাকে বিব্রত কর না, কারণ আমি বলতে পারবো না! তাছাড়া আজ যে ঘটনা তোমার কাছে অজ্ঞাত থাকলো, কদিন থাকবার পরই তুমি তা জানতে পারবে। প্রত্যহ রাত্রেই এরকম এক একটা ঘটনা ঘটে। রাত্রির নিস্তব্ধতা কিছুক্ষণের জন্যে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়, তারপর তা আবার জোড়া লেগে যায়। কিন্তু এরজন্যে খুব বড় একটা উদ্বেগবোধ কেউ করে না। কারো ঘুমের ব্যাঘাতও সৃষ্টি হয় না। সবাই জানে অন্দরমহলের এ এক নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

আনার কোন কথা বললো না, তবু সে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে ইরাণীর দিকে তাকিয়ে থাকলো।

ইরাণী তাই দেখে মাথা নত করে নিম্নস্বরে বললো—আনারবিবি, তোমার মুখের অবস্থা দেখেই আমাকে বলতে হচ্ছে গতরাত্রির ঘটনা, কারণ তোমার ওই কৌতুহল নিবৃত্তি করতে পারলেই আমাব জান পয়চান হবে না! কিন্তু না বলতে পারলেই খুশী হতাম। কারণ আমি বাঁদী হয়ে সম্মানীয়া বেগমের আচরণ ব্যাখা করার দুঃসাহস আল্লা আমার ক্ষমা করবেন না—যাই হক, তবু বলছি তোমার কৌতুহলের জন্যে—বলে ইবাণী আল্লার উদ্দেশ্যে হাত তুলে চোখ বুজে ক'বার খোদাবান বলে গত-বাত্রিব কথা বলতে লাগলে'।

ইরাণী এমনি করে চাপাস্বরে বলতে লাগলো যেন কারো কাণে না যায়। বলতে লাগলো, গতরাত্রে যে আর্তস্বরে চীৎকার কবে উঠেছিল সে শপীর বিষ খেয়েছিল। তার নাম জহরা। অদ্ভুত সুন্দরী মেয়েটি। কাবুলের বুলবুল। সম্রাট আকবর কাবুল বিজয়ের সময়ে আকস্মিকভাবে যে-সব আওরতদের তিনি নিজের হারেমে এনেছিলেন, তার মধ্যে জহরা বলে এই ছোট্টমেয়েটি ছিল। সম্রাট আকবর যখন তাকে এনেছিলেন তখন সে ছিল কমজোয়ানী। যৌবন তখন তার আসে নি। তবে যৌবন এলে যে সে হারেমের জৌলুস বাড়াবে এইভেবেই সম্রাট আকবব হারেমের পিঞ্জরায় তাকে পুরেছিলেন। তারপর তিনি তাকে ভুলে যান।

এদিকে জহরা দিনে দিনে বড হয়ে ওঠে। তার জৌলুসে হারেমের উজ্জ্বলতা বাড়ে। তার মনে আসে চঞ্চলতা। কণ্ঠে আসে বিহঙ্গের কাকলি। সে গুলাব-পুষ্পেব মত রঙেব পসরা মেলে হারেমের অতুজ্জ্বল দর্পণের বক্ষ ঝলসে দেয়। কিন্তু সকলে জানে সে শাহনসা আকবরের সম্পত্তি। এ সম্পত্তির প্রতি লুব্ধদৃষ্টির আলপনা আঁকলে নিশ্চিত গর্দান। এদিকে জহরার হয় অসুবিধা। তার উদ্দাম-যৌবনের স্রোতে কারো কলধ্বনি না শ্রুত হলে সে মনে মনে দগ্ধ হয়। সে পুড়তে থাকে। নিজের আগুনভরা দেহেব তাপে নিজেই পুডতে থাকে। তার মাসুম-জোয়ানী দেহ ভোগের কাজে না লাগতে সে কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রাসাদ অন্তঃপুরের অবরোধ ভেঙ্গে বার বার সে বাইরে বেরিয়ে পড়তে চায় কিন্তু রক্ষীর জন্যে তা পারে না। একদিন হয়ত সে পালিয়ে যেত। যদি না হঠাৎ শাহনসা আকবর দেহত্যাগ করতেন।

সম্রাট আকবর চলে যেতে তার পুত্র যুবরাজ সেলিম জাহাঙ্গীর শা নাম নিয়ে সিংহাসনে বসলেন। ফতেপুর থেকে ফিরে এলেন একেবারে দিল্লীতে। নিয়ে এলেন পিতার নিয়োজিত কয়েক হাজার সুন্দরী বেগম, বাঁদী ও মেয়েলোককে। নিজের তখন কয়েকশত বাঁদী ও বেগম। পিতা মরবার সময় জাহাঙ্গীরকে বলে গিয়েছিলেন —'তাঁর রক্ষিত আওরতদের যেন যত্নে রাখা হয় ও তাদের নিয়মিত মাসোহারা দেওয়া হয়।' জাহাঙ্গীর শা পিতার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন, এবং পিতার সংগৃহীত আওরতদের তিনি হারেমে স্থান দিয়ে তাদের মাসোহারার সুবন্দোবস্ত করে

দিয়েছিলেন। পিতার আওরত বলে যেটুকু সম্মান পুত্রের করা উচিত তা তিনি করতেন। সেইসব আওরতদের মধ্যে এমন এক একটি খুবসুরত সুন্দরী ছিল যে তাদের দিকে তাকালেই চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়। জাহাঙ্গীর খুবসুরত সুন্দরীর প্রতি কেউ আগ্রহান্বিত ছিলেন কিন্তু পিতার এই সংগ্রহের ওপর তাঁর কোন লিপ্সা কেউ কখনও দেখেনি। তারা আলাদা একটি মহলের ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে রাজসিক আরামে আহার নিদ্রা করে দিন গুজরান করতো। তাদের আরামের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেবার জন্যে জাহাঙ্গীর কোষাধ্যক্ষকে ঢালাও হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর পিতার প্রতি শ্রদ্ধার জন্যে সবই যত্নসহকারে সমাধান করেছিলেন কিন্তু তাঁরও বোধহয় ভয় ছিল—এত করেও তিনি এই হারেমের সুব্যবস্থা বজায় রাখতে পারবেন না।

আর তারই প্রমাণ জহরা। শুধু জহরা কেন তামাম হিন্দুস্থানেব বহু আওরতই তখন পূর্ণযৌবন নিয়ে 'মৃত সম্রাটের আওরত' এই নামে হারেমের প্রকোষ্ঠ শোভা করছে। যেখানে আহার-নিদ্রা-বিলাসের উপকরণের কোন অভাব নেই, সেখানে যৌবনের এই কান্নাই সমস্ত প্রাসাদচত্বরে প্রতিধ্বনি তুলে অনুরণিত হয়ে উঠলো।

সম্রাজ্ঞী নূরজাহান আসার পর তিনি এই বিক্ষুব্ধ আওরতদের মানসিক চঞ্চলতা দমিত করবার প্রয়াসে সুচিন্তিত কতকগুলি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন কিন্তু ভয় দেখালে কি এই উন্মাদনার কোন নিবৃত্তি ঘটে? বরং ভয়ের শাসনে আরো ক্ষিপ্ত যৌবনতনুগুলি মৃত্যুর প্রতিজ্ঞা পণ করে বেওয়াবিশ জীবনেব দিকে ঝুঁকে পড়ে।

তারা বিদ্রোহিনী হবার যখন চেষ্টা করছে, তখন সম্রাজ্ঞী নূরজাহান তাদের ওপর সতর্কদৃষ্টির প্রহরা নিযুক্ত করে আরো কঠোব হলেন।

এই জহরা এরই মধ্যে দুবার মরতে গিয়েছিল কিন্তু দুবার ধরা পাড়ে গিয়েছিল। এবার তার তিনবার।

এই বলে ইরানী হেসে বললো—এবারও সে ধরা পড়ে গেল। বেচারী মরতে গিয়ে মরতে না পেরে যে লজ্জার মাঝে বার বার পড়ে যাচ্ছে, তাই দেখেই বড় কষ্ট। তারপর ইরানী একটু দম নিয়ে বললো—আর তাছাড়া না মরেই বা সে কী করবে? বেঁচে থেকে লাভ কি? ভাল আহার আর উত্তমশয্যায় নিদ্রা, মূল্যবান পোষাক ও অলঙ্কারের আশা নিয়ে কোন আওরত কি দীর্ঘদিন বাঁচতে পারে? তাই জহরা মরতে চেয়ে কোন অন্যায় করে নি। বরং মহামতি শাহনসা আকবর মারা যাবার সময় তাঁর আওরতগুলির ঐ সঙ্গে কোরবানী হলে বোধহয় এই সমস্যা আর উদয় হত না।

আনার কোন প্রশ্ন না করে অবাক দুটি চোখের বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে ইরানীর কথা শুনছিল। ইরানীর মনের বিদ্বেষ যে জহরার মতই ঝরে পড়ছিল, তাই দেখে আনার মনে মনে ইরানীর জন্যই দুঃখিত হল।

ইরানীর তখন কণ্ঠে আবেগ এসে প্লাবন সৃষ্টি করেছে। তার কণ্ঠে আগে সংযত ভাব ছিল, সে নিম্নস্বরে কথা বলছিল। উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়ে তার কণ্ঠস্বর আর লঘু চাইলো না। সে নিম্নস্বরে কথা বললেও বেশ উষ্মামিশ্রিত হয়ে তার ভাষা প্রকাশ পাচ্ছিল। ইরানী বললো—সবাই জানে শাহনসা আকবরের মত অমন বিচক্ষণ

সম্রাট এর পূর্বে আর দেখা যায় নি। তাঁরা সম্রাটের গুণের দিকটা দেখেছেন বলে এইসব স্তুতিবাদ করতে কার্পণ্য করেন না। কিন্তু তাঁরা যদি অনুগ্রহ করে সম্রাটের মন্দের দিকটাও দেখতেন? যদি দেখতেন তাহলে আর কখনও এইরকম ভুল করতেন না। সম্রাট আকবর ছিলেন দারুণ ধূর্ত এবং তিনি তারই কৌশলে নিজের স্তুতিগানের জন্যে বহু স্তুতিকার নিযুক্ত করেছিলেন। তার একজন হচ্ছে ঐ আবুলফজল। আবুলফজল না মরলে হয়ত অনেক মিথ্যে কথা সাজিয়ে সাজিয়ে আরো আকবর-নামার পাতা ভরাতেন। তার চেয়ে মরে যেতে সম্রাটেব ভালদিকের প্রচার কিছুটা কমে মন্দদিকটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তাতে তাঁকে চেনা গেছে।

সম্রাট আকবর নাকি উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন না—অনেকে বলে। যদি উচ্ছৃঙ্খল না ছিলেন তবে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর হারেম থেকে এত আওরত বের হল কেন? তাঁর আওরতের সংখ্যা দেখে হতচকিত হয়ে চিন্তা করতে হয়েছিল—কোনদিন কোনকালে কোন সম্রাটের অন্তঃপুরে এত আওরত দেখা গেছে কিনা?

তারপর ইরানী বললো—আমি এসব অবশ্য অন্য সবাইয়ের কাছে শুনেছি। তবে দেখছি, তাঁরই হাজার হাজার আওরত এই হারেম শোভা করে রয়েছে। তাদের দেখেই সম্রাট আকবরের মানসিক অবস্থার একটি নজির পাই। শুনেছি, তিনি নাকি প্রতিমুহূর্তে এক একটি নতুন আওরতের মুখ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতেন। আর যে আওরত সেরা সুন্দরী হওয়া বাহুল্য। শুধু সুন্দরী নয়, সুন্দরের মাঝে যৌবনের চমক। প্রস্ফুটিত যৌবনতনুর শোভা দেখে শাহনসা পাদিশাহর দেহের শোণিতে উন্মাদনা পরিলক্ষিত হবে এমনি আওরতের দর্শনই তিনি চাইতেন। আর তারই জন্যে তিনি হিন্দুস্থান ও তার বাইরের বিভিন্ন জায়গা থেকে নয়া নয়া খুবসুরত আওরত আনার ব্যবস্থা করতেন। আওরত আসতো ইরাক, রোম, তুর্কিস্থান, বদকশান, সিরবান. খরগেজ, তিব্বত, কাশ্মীর ও বঙ্গদেশের। ·

ইবানী আবার হেসে বললো—আর একটি কথা শুনলে হয়ত তুমি চমকাবে, তবে বিশ্বাস কোরো। সম্রাট আকবর হিন্দুরাজাদের সঙ্গে সখ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ হতেন, কেন জানো? তিনি হিন্দুরমণীর প্রতি সবচেয়ে লুব্ধ ছিলেন এবং তাদের অঙ্কশায়িনী করবার জন্যে মনের মধ্যে এমন উত্তেজনা অনুভব করতেন যে, সেই উত্তেজনায় তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়তো। সেইজন্যে তিনি হিন্দুরাজাদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গঠিত করে তাঁদের কন্যাদের শাদীর ইন্তেজার দিয়ে হারেমে পুরতেন। তুমি হয়তো শুনলে আরো আশ্চর্য হয়ে যাবে—তাঁর আদেশ ছিল, যে রাজা তাঁর সাথে সন্ধির প্রস্তাব করবে, সেই সন্ধির শর্তস্বরূপ তাঁর একটি কন্যা সম্রাটকে উপঢৌকন দেবে। অবশ্য সম্রাট সেই কন্যার উপযুক্ত মর্যাদা দান করে তাকে হারেমে স্থান দেবেন। এমনি করেই সম্রাট তাঁর রমণী আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করেছেন, আর সেইজন্যে তাঁর হারেমে বহু ধরনের রমণীতে সর্বদা পূর্ণ ছিল।

ইরানী আবার বললো—আমার গোস্তাকি মাপ কর বহিন। আমি খোদাতুল্য মৃত সম্রাটের নামে অনেক কুৎসা রটনা করেছি। যদি কোন মিথ্যে বলে থাকি, তবে

খোদা যেন আমায় বাকরোধ করে মেরে ফেলেন। ভারত বিজয়ের গৌরব নিয়ে যে মহাপুরুষ দীর্ঘকাল রাজত্ব করে গেছেন, তার বিলাস উপকরণের কথাগুলি শুনলে তুমি চমকিত হবে। ভগবানের জ্যোতি ছাড়া তিনি অন্য কোন জ্যোতি দ্বারা নিজের স্কন্ধাবার আলোকিত করতেন না। যুদ্ধেই এই স্কন্ধাবার প্রচলিত ছিল। এই স্কন্ধাবার এক ধরনের তাঁবু। ঠিক দু-প্রহরকালে সূর্যকান্তি নামে হিন্দুদের ব্যবহার্য একপ্রকার স্ফটিকপদার্থের স্পর্শে স্বর্গের অগ্নি সংগ্রহ করা হত। সূর্যের আলোকে আতসপাথর ধরে তুলার বা শোলার আগুন ধরানো হত। এই অগ্নি একজন জ্ঞানী লোকের কাছে রক্ষা করা হত। এই অগ্নির জ্বালা থেকেই পাদশাহের স্কন্ধাবারের আলোকমালা প্রজ্জলিত হত। বৎসরান্তে একবার করে নূতন অগ্নি সঞ্চয় করা হত। যে পাত্রে অগ্নি থাকতো, তার নাম আগেনগার। আর একরকমের পাথর ছিল, যার নাম চন্দ্রকান্তি, এই চন্দ্রকান্তি প্রস্তর চন্দ্রকিরণে ধরলে বিন্দু বিন্দু জলপাত হত। এই জল ধীরে ধীরে সঞ্চয় করে রাখা হত। পাদিশাহ তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে যে সরবৎ পান করতেন, আশমানের এই জলবিন্দু তাতে দেওয়া হত।

আর পাদিশাহ সূর্যাস্তের পূর্বে একদণ্ড থাকতে নিদ্রা থেকে উঠতেন, কিম্বা তিনি যদি অশ্বারোহণে কোন কাজে যেতেন, বিশেষ বাধা না পড়লে সন্ধ্যার আগেই স্কন্ধাবারে ফিরে আসতেন। সন্ধ্যা হলেই সম্রাটের সামনে বারটি কর্পূরের বাতি, নিরেট স্বর্ণের বাতিদানের ওপর বসিয়ে ঐ আশমানী আগুনে প্রজ্জলিত করে রাখা হত। পরে বিচিত্র স্বল্প বসনভূষণে, বলতে গেলে অর্ধনগ্ন ষোড়শী যুবতী কামিনী মধুরকণ্ঠে প্রণয়সঙ্গীত করতে করতে সম্রাটের সামনে উপস্থিত হত, এবং বাতিদান শুদ্ধ একটি একটি বাতি নিয়ে নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে অপূর্ব নৃত্য করতে করতে সম্রাটকে আরতি করতো। আর সম্রাট প্রত্যহের মত সেই বারটি অর্ধনগ্ন নর্তকীর দেহ সুষমা উপভোগ করতে করতে মধুর হাস্যে নিরুত্তর হয়ে থাকতেন। এমনি প্রত্যহ বারটি নতুন নতুন নর্তকী দর্শন দিয়ে সেই সন্ধ্যার আরতি ক্রিয়া সম্পন্ন করতো। তারপর তারা আল্লার কাছে সম্রাটের জন্যে প্রার্থনা জ্ঞাপন করে চলে যেত।

এই যে প্রত্যহ এই বারটি নতুন নর্তকীর আবির্ভাব হত, তারা যদি কখনও কেউ অস্পৃশ্য জীবন গোপন করে এই পূজা-কার্যে আত্মনিয়োগ করতো, আর তা যদি সম্রাট জানতে পারতেন, তাহলে তাদের জীবন রক্ষা কেউ করতে পারতো না। এক-একজন নর্তকী দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের জন্যেই বহাল থাকতো। এবং এই কাজের কঠিন নিয়ম তা.ক মেনে চলতে হত। কখনও যদি কেউ এই নিয়ম লঙ্ঘন করতো, তারও চরম শাস্তি নির্দিষ্ট ছিল।

হঠাৎ ইরানী আবার আনারকে প্রশ্ন করলো—আচ্ছা বলতে পার—এই নর্তকী-গুলির জীবনের কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা কি নেই? তারা শুধু জীবন উৎসর্গ করেই যাবে—পাবে না কিছু! তাই যারা সম্রাটের ভয়ে নিজের যৌবনতনু কঠিন নিয়মের মধ্যে রুদ্ধ করে রেখেছিল, তাদের শেষপর্যন্ত অবস্থা হল কি জানো —পাগল হয়ে গেল। আর যারা ধরে রাখতে পারলো না, পাওয়ার জন্যে, পূর্ণতার

জন্যে দেহ উৎসর্গ করলো, তারা সম্রাটের বিচারে জল্লাদের শাণিতকৃপাণের তলায় মৃত্যুর আলপনা আঁকলো! আচ্ছা আনারবিবি—একটি প্রজ্বলিত বাতিদান নিজের অর্ধনগ্ন দেহের ওপর প্রতিফলিত করে একটি ষোড়শী যুবতী রমণী একটি পুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে নৃত্য করবে—আর সেই পুরুষ কামনার চোখ নিয়ে লুব্ধদৃষ্টিতে সেই যৌবনতনু উপভোগ করবে—অথচ সেই যুবতীর উপভোগ করার কিছু থাকবে না? সে তার কর্তব্য কর্ম করে দেহ আবরিত করে হারেমের বদ্ধপ্রকোষ্ঠে গিয়ে বাসা নেবে, উন্মাদনা কমাবার জন্যে আশমানের ঐ নীলের মাঝে অশ্রুমুকুলিত দুটি চোখের কাতরদৃষ্টি মেলে দিয়ে বলবে—'খোদা শক্তি দাও, মেহেরবাণী করে আমার দেহের শোণিতে বরফের মত হিমশীতলতা এনে দাও।'

হঠাৎ ইরানী ক্রন্দনভারে সঙ্কুচিত হয়ে অবনত মস্তকে হর্ম্যতলে বসে পড়তে আনার চমকে উঠলো। এতক্ষণ সে ইরানীর কথা শুনতে শুনতে কোথায় কোন্ প্রান্তরে যেন চলে গিয়েছিল। এসব কথা সে কখনও শোনে নি। সম্রাট মহানুভব। সম্রাট আল্লার সমান। সম্রাটের ঐশ্বর্য আল্লারই দান, এই জানতো সে। আর জানতো, সম্রাটের হারেমে অনেক বেগম আছেন। তাঁরা নাকি পরীর মত দেখতে। অবশ্য এসব জ্ঞান তার কিশোর বয়সের। বড় হবার পর তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এবং এই হারেমে প্রবেশের পর তার অভিজ্ঞতা পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এখন ইরানীর কাছে যা শুনলো তা শুনে সে অবাকই হয়ে গেল। এমন তো সে কখনও কল্পনা করেনি! একি সম্ভব? কিন্তু অবিশ্বাস, তাই বা কেমন করে সে করে? যে রমণীটি তার সামনে এতক্ষণ অভিনয়ের ভঙ্গিতে অনর্গল কতকগুলি ঘটনা বিবৃত করে গেল—তার বর্ণনাগুলি কি সবই কাল্পনিক? বানানো? কিন্তু ইরানীর আবেগ, তার কান্না, সব কী করে মিথ্যে হতে পারে?···হঠাৎ আনারের মনের মধ্যে আর একটি কথা বিদ্যুতের মত চমক দিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়লো—ইরানী কাঁদলো কেন? তবে কি ইরানীর জীবনের সঙ্গে ঐ কথিত জীবনের কোন সম্পর্ক আছে? হয়ত আছে। হয়ত নেই। কেমন যেন এক রহস্যের মত মনে হল আনারের। ইরানীকে সেই যন্ত্রণাদায়ক ঘটনার নায়িকা মনে করতে আনারের স্বভাবে বাধলো। তারপর নিজেই মনে মনে বললো—যদি কিছু থাকে, তা কোন এক সময় প্রকাশ হয়ে পড়বে। এখন সাপের ঝাঁপিতে হাত দিয়ে নিজে দংশন ভোগ করি কেন?

আনার এ প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে বললো,—জহুরার কথা কিন্তু অসম্পূর্ণ থাকলো ইরানী?

ইরানী তখন নিজেকে সম্পূর্ণ প্রকৃতস্থ করে নিয়েছে। মুখের ওপর নেমে এসেছে প্রশান্ত ভাব, বললো, জহরার আর কি হবে? সে খেয়েছিল পপীর বিষ। জানবার পরই তার সেই বিষ তোলার ব্যবস্থা হল। বিষ তোলার যে মর্মান্তিক প্রক্রিয়া তার ওপর চালানো হয়েছিল, তারই যন্ত্রণায় সে ঐ চীৎকার করছিল। আর কিছু নয়। এযাত্রাও সে বোধ হয় বেঁচে গেল। হাকিম বলে গেছেন, এখন দু'একদিন শুয়ে থাকলেই সুস্থ হয়ে যাবে।

এই বলে ইরানী আর অপেক্ষা করলো না, কোনরকম তসলিম না করেই কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল।

আনার বুঝলো ইরানী আর নিজেকে সংযত করে রাখতে পাচ্ছিল না বলে অদৃশ্য হল। সে এও বুঝলো, এখান থেকে ইরানী এখন সরে গিয়ে কোথায় গেল! নিজের কক্ষে গিয়ে কক্ষের দরজা বন্ধ করে বিছানার ওপর আছড়ে পড়ে সে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদবে। কেঁদে কেঁদে সে বুকটা হাল্কা করে তারপর আবার নিজের কর্তব্যকর্মে মন দেবে। হয়ত আবার হাসতে হাসতে এসে বলবে, আনারবিবি, তোমার কিছু প্রয়োজন আছে তো বলো? এই একদিনেই আনার বেশ ভালভাবে ইরানীকে চিনেছিল। কিন্তু চিনলেও এই কিছুক্ষণ আগের ইরানীকে সে চিনতে পারলো না? ঐ মেয়েটি কি···? যে আরব্য উপন্যাসের কাহিনী এতক্ষণ ধরে বলে গেল—আনার তার কিছুই বুঝলো না। তবে এইটুকু সে বেশ ভালভাবেই বুঝলো, এই কাহিনীর সঙ্গে ইরানীর জীবনযুক্ত। কিন্তু কতটুকু যুক্ত সে তা জানে না। এবং কোন্ আঘাতের জন্যে ইরানীর জীবন বরবাদ হয়ে গেছে, তাও আনার বুঝতে পারলো না।

তাই ইরানী চলে যাবার পর আনার সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ কক্ষে একা অনেক আবোল তাবোল ভাবলো। তারপর নিজেই গাত্রোত্থান করে জাফরী কাটা গবাক্ষের জাল দিয়ে বাইরের সূর্য ওঠা প্রভাতের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ইরানী তারপর এসে তার কর্তব্যকর্ম করলো, দিন গেল আবার দিন এল—মাঝে মাঝে অবশ্য আনার বিস্ময়ে ইরানীর দিকে তাকিয়ে থেকেছে কিন্তু কোন প্রশ্ন করেনি। সেদিনের পর সেই কাহিনীর একেবারে সমাধি হতে আনার মাঝে মাঝে ইরানীর মুখের ওপর থেকে অর্থ অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করেছে। জহবার আত্মহত্যার কাহিনী সম্পূর্ণ হাস্যকরভাবে শেষ হবার পর এই কাহিনীর একেবারেই সমাধি হয়েছিল। তবে ঘটনা কী ঘটেনি? যা ঘটেছিল, তাতে চাঞ্চল্যকর কিছু ছিল না! হারেমের দাসীরা বলতো—এ মামুলী ঘটনা।

বেগমদের মধ্যে সেরাজী অনেকেই পান করতেন। উন্মত্ত অনেকেই হতেন। বেওয়ারিশ জীবন যাপন করবার বাসনা অনেকেরই ছিল কিন্তু কঠিন অবরোধ ও প্রখর প্রহরার জন্যে তা সম্ভব হত না। তাই উন্মত্ত হয়ে রাতের স্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। উল্লাসে চীৎকার করতেন। পানপাত্র ছুঁড়ে দেয়ালের বিরাট দর্পণ ভাঙতেন। অহেতুক কতকগুলি প্রচণ্ড শব্দে চারিদিকে হট্টগোলের সৃষ্টি হত।

প্রথম প্রথম আনার অবাক হত। আচমকা তার ঘুম ভেঙে যেত। বিস্ময়ে বসে বসে সে ভাবতো—এ কি রকম অশান্তিময় অন্দরমহল? তারপর তাও তার আস্তে আস্তে সয়ে গেল।

ঠিক কবে আনারের সে কথা মনে নেই। তার আসবার ঠিক কতদিন পরে ঐ ঘটনা ঘটেছিল, তাও ঠিক সে বলতে পারবে না। তবে এইটুকু সে জানে, তখন তার অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা। নাচমহল থেকে বাদ্যঝঙ্কার ও নর্তকীদের পায়ের ঘুঙুর

নিক্কণ ভেসে আসছিল। অবশ্য সর্বদাই হয়, তবে সন্ধ্যে হলে কাঠগেলাসের ঝাড়-লণ্ঠনের জোরালো আলো জলসে আরো প্রকট হত—এ দিন তেমনি হচ্ছিল। বরং অন্যান্য দিনের চেয়ে আরো সুরেলা, ছন্দময়, সারেঙ্গীর মিঠে-সুরের আবেশে আরো প্রাণ চঞ্চলতা সৃষ্টি হয়েছিল।

আনার সেদিন নিজের কক্ষেই বসেছিল। বসেছিল এমনি আনমনা হয়ে। কিছুক্ষণ আগে এসেছিল সম্রাজ্ঞীর পূর্বস্বামী শের আফগানের ঔরসজাত নূরজাহান-কন্যা লডিলী।

লডিলী আলাপ করতে এসেছিল আনারের সঙ্গে। আলাপ করবার মাঝে শুনিয়ে গেল সম্রাটের কনিষ্ঠপুত্র শাহরিয়ার সঙ্গে তার নিবিড় সোহাগের সম্বন্ধ। হয়ত আম্মাজান শাদীর আয়োজনও করতে পারেন কিছুদিনের মধ্যে—সে কথাও লডিলী গৌরবের সঙ্গে বলে গেল।

আনার মনে মনে হেসেছিল লডিলীর কথায়। আওরত আমীর হোক্ বা ফকীর হোক্—সবারই মধ্যে সেই একই মনের পরিচয়। তার আনন্দটুকু নিজের মধ্যে না রেখে অপরকে পরিবেশন করে নিজের তৃপ্তিটুকুর আস্বাদন গ্রহণ করা। অবশ্য এরমধ্যে আওরতের ঈর্ষাপরায়ণ মনের পরিচয়ও প্রকাশ হয়েছে। লডিলী বলতে চেয়েছে—আমার সুখের ও সোহাগের সাথে কারো তুলনা মেলে না।

আনার ভাবলো—লডিলী ছেলেমানুষ। আবার ভাবলো—ছেলেমানুষ তাই বা কেমন করে বলবে? আওরতের যৌবন এলে সে সব বয়সেই এক। না হয় লডিলী তার চেয়ে দু এক বছরের ছোট। ছোট বলে বুদ্ধি কম এই বা সে কেমন করে বলবে?

লডিলী একদিন শাহজাদা খুররমেরও প্রেয়সী হতে চেয়েছিল!

লডিলী চলে যাবার পর এইসব যখন সে ভাবছে, ঝড়ের বেগে ইরানী সেইসময় কক্ষে প্রবেশ করলো।

ইরানীকে দেখে অবাক হয়ে আনার তার দিকে তাকিয়ে থাকলো। একি সে স্বপ্ন দেখছে নাকি? ইরানী তার পরিচারিকা কিন্তু হঠাৎ ভাগ্য-সুপ্রসন্নে সম্রাজ্ঞীর পদপ্রাপ্তির গৌরব যেন অধিকার করেছে! তবে কি জাহাঙ্গীর শা হঠাৎ ইরানীর ওপর প্রসন্ন হয়ে তাকে দিয়েছেন কোন গৌরব? এমন তো প্রত্যহ কত হচ্ছে, কতজনের নসীব এমনি প্রত্যহ পরিবর্তিত হচ্ছে। হয়ত এমনি কোন সম্মান পুরস্কার পেয়েছে ইরানী! তবু আনারের বিস্ময় জাগলো, সে অভিভূত হল, এবং অনেকক্ষণ সে একদৃষ্টে ইরানীর মূল্যবান বেশভূষা করা দেহের দিকে তাকিয়ে হেসে অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো—তুমি কি সেই ইরানী—আমার পরিচারিকা!

ইরানী উত্তেজিত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করেছিল কিন্তু স্তব্ধ হয়ে কেন যে সে আনারের সামনে নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল, তা ঠিক জানে না। হঠাৎ আনারের কথায় সে সমস্ত কক্ষে প্রতিধ্বনি তুলে অট্টহাস্য করে বললো—হ্যাঁ, হ্যাঁ আমিই সেই বাঁদী ইরানী—হুজুরালি। তবে সে স্ব-ইচ্ছায়। তা না হলে কারো সাহস হয় না, আমাকে সে বাঁদী বলে।

আনাবের বিস্ময়ের ধাপ যেন আস্তে আস্তে অনেক উঁচুতে উঠে গেল। সে ভাবলো—ইরানী কি সেরাজী পান করেছে? নাহলে হঠাৎ সে এত বড বড় কথা বলছে কেন? আনার নিজের দৃষ্টির নিশানা ইরানীর মুখের ওপর ফেলে তাকে পরীক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলো না—ইরানী মাতাল হয়ে না সুস্থমাস্তিষ্কে একথা বলছে।

আনার তাই আবার ইরানীর সমস্ত দেহ পরীক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু একি! ইরানী! এ বেশ কেন? স্বল্প বসনে দেহ আচ্ছাদিত করে অর্ধনগ্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে ছি, ছি, কি বিশ্রী লাগছে ইরানীকে। আনার লজ্জায় চোখে হাত চাপা দিল। তার দুই কপোল রক্তিম হয়ে উঠলো আনার চাপা স্বরে উত্তেজিত হয়ে বললো—ইরানী তুমি চলে যাও। চলে যাও।

আনারের লজ্জিতভাব দেখে ইরানী মনে মনে আনন্দ অনুভব করছিল, তারপর আনারের কথা শুনে হঠাৎ সে ক্ষিপ্ত হয়ে বললো—কেন? কেন চলে যাবো?

আনার ইরানীর ক্রুদ্ধমুখ ও চোখের দিকে তাকিয়ে ভীত হয়ে চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিল। তারপর ইরানীর দুই রক্তবর্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা নত করে কি যেন ভাবতে লাগলো?

হঠাৎ হি হি করে আবার অট্টহাস্য হল। সমস্ত কক্ষের আসবাব পত্তর কেঁপে উঠলো। মাথার ওপর ঝাড়ের কাচগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিতালী করে জলতরঙ্গ শব্দ করে উঠলো। বাইরে থেকে বাদ্যঝঙ্কারের শব্দ আসছিল, আসছিল গানের সাথে নর্তকীর পায়ের ঘুঙুর নিক্কণ। এর আগে সেই মধুর শব্দ কান দিয়ে শুনে আনার মনে মনে খুশী হচ্ছিল, তার মনে আসছিল সম্রাজ্ঞী বলেছেন—তাকে নাচ শিখতে হবে। এ সবই তার মন থেকে মুছে গেল। শুধু ক্ষিপ্তরমণীর উল্লাসভরা অট্টহাস্য ছাড়া সব লয়। সমস্ত কক্ষ ভরে শুধু ঐশ্বর্যের রোশনাইয়ের সাথে হাসির বুদ্বুদ—আর সে হাসি হেসেছে কে—তাও জানে আনার। আনারের ইচ্ছে করলো, এক্ষুনি তার বাঁদীকে গলা ধাক্কা দিয়ে কক্ষ থেকে বের করে দেয়। এই বেয়াদপি অসহ্য। আর যদি এই হুকুমের অবমাননা করে তাহলে সম্রাজ্ঞীকে জানিয়ে তার সমুচিত ব্যবস্থা করবে। কিন্তু সে ভাবনাও দীর্ঘস্থায়ী হল না। তার মনে হল, সে দুর্বল, সে ভীরু সে কিছুই করতে পারে না, শুধু ভাবতে পারে। আর তার ভাবনাও খুব জোরদার নয়।

শুধু তার দুর্বলতার জন্যেই কি সে তার বাঁদীর বেয়াদপি সহ্য করছে? আনার সে কথাও বিস্ময়ে ভাবলো। তারপর নিজেই উত্তর দিল—না। ইরানীর জীবনের জন্যে তার করুণা আছে। ইরানীর জীবনের অতীত শোনবার আকাঙ্ক্ষা আছে। ইরানী আসলে কে? সেই পরিচয়ের জন্যে মনের অদম্য আগ্রহ আছে। সেজন্যে ইরানীকে স কিছু বলতে পারে না। তার জীবন কাহিনী না শোনা পর্যন্ত মনের বিচারসভায় বসবে না।

কারণ এই প্রাসাদের প্রতি অন্ধপ্রকোষ্ঠের মাঝে যে রহস্য লুকিয়ে আছে তার

কিছু কিছু তাকে জানতে হবে। এখানে যে সহজজীবনের কোন উৎসব রচিত হয় না, তাও যেমন তার জানা—তেমনি ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের মাঝে জাঁকজমক ঘেরা কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে কত মানুষের মনের ওপর হাহাকারের কান্না সংযোজিত আছে—তাও তাকে জানতে হবে। বাদশাহের অন্তঃপুরে থেকে সেই অন্তঃপুরের রহস্য জানবে না, সে কি কখনও হতে পারে? তাই ইরানীর বেয়াদপি সহ্য করেও তাকে তার আপন স্বাধীনতায় উন্মুক্ত করে দিল। সেজন্যে আনার জ্বলে না উঠে বরং একেবারে নিভে গিয়ে শান্ত এক কমনীয় দীপশিখা চোখে জ্বাললো। জ্বেলে বললো—ইরানী, কি হয়েছে তোমার? আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি না?

ইরানী আনারের কাছ থেকে হঠাৎ বিপরীত ব্যবহার পেতে সে বিস্মিত হয়ে আনারের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর হঠাৎ কক্ষের অন্যপ্রান্তে চলে গিয়ে একটি নির্বাপিত স্বর্ণবাতিদান জ্বালিয়ে সেটি হাতে নিয়ে আনারের সামনে এসে দাঁড়ালো।



আনার দেখলো সেই প্রজ্বলিত বাতিদানের শিখায় ইরানীর উদ্ভিন্ন বক্ষস্তম্ভ প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু ওকি? ঐ বক্ষস্তম্ভের ওপর কোন উন্মাদনার সাড়া নেই কেন? ইরানীর যৌবনশিখা অস্তাচলের পথে ঢলে পড়েছে, এ যেন আনারের কাছে বিস্ময়! সে মনে মনে বললো—কই আগে তো ইরানীকে দেখে বিগত যৌবনা বলে মনে হত না! ইরানীর বয়সে এ যে একেবারেই বোঝা যায় না! তবে কি সে ইচ্ছে করে নিজের যৌবনকে দলিত করেছে? আনারের আরো কিছু ভাববার আগেই ইরানী নিঃশব্দে নিজের বক্ষের স্বল্প আবরিত বসন উন্মোচিত করে দিল।

আনার লজ্জিত হল। কিন্তু লজ্জার আবরণ তার সরে গেল ইরানীর বক্ষস্তম্ভের দিকে তাকিয়ে। সে শুধু অবাক হল না, হতচকিত হয়ে দুইচোখের বিস্ময় জ্বেলে একটি রমণীর অসামান্য যৌবন কুসুমের দিকে তাকিয়ে থাকলো। ইরানীর যৌবনস্তম্ভে কোন অসামান্যতার ছায়া নেই, নেই কোন সাগরের ফেনারাশির মত শুভ্রতার অঞ্জন। বরং সেই অসামান্যতা বীভৎসতার রূপে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তার স্তনযুগলের ওপর রক্ত-আবীরের চিহ্ন। কে যেন ছুরিকার অগ্রভাগ দিয়ে রমণীর কুসুমস্তম্ভের ওপর আঘাত হেনেছে। সেই আঘাতের যন্ত্রণায় বিন্দু বিন্দু রক্তচিহ্ন স্তম্ভের ওপর ফুটে উঠেছে। কুসুমস্তম্ভের মাদকতা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। মনে হয় বার্ধক্যের কোন বর্ষিয়সী রমণী তার বক্ষবাস উন্মোচন করে নিস্পৃহ যৌবনস্তম্ভ মেলে দিয়েছে।

আনার অভিভূতের মত ফিসফিস করে বললো—কে এ কাজ করলো ইরানী?

ইরানী বাতিদানের আলো ফুৎকারে নির্বাপিত করে স্বর্ণদানটি কক্ষের একপাশে রেখে দিল, তারপর বললো—বুঝলে না আনারবিবি, কে করেছে এমনি নির্যাতন?

আনার মাথা নাড়লো। না, সে কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না।

ইরানী বললো—কে করেছে, এ প্রশ্ন এখানে অবান্তর? তবে এইটুকু বলতে পারি—এর জন্যে দায়ী সেই মহামতি সম্রাট আকবর। তারই আদেশে একটি নম্রা খুবসুরত আওরত দিনের পর দিন দেহ শুচিতার মধ্যে আরতির কর্ম করে গেল—আর তার বিনিময়ে সে পেল এই পুরস্কার।

আনার যদিও অনেক কিছুই পূর্বে অনুমান করতে পেরেছিল—তবু বিস্মিত হয়ে বললো—তুমিও কি সেই আরতির নর্তকী হয়ে সাম্রাজ্যের নিয়ম রক্ষা করতে?

ইরানীর দু'চোখে তখন মুক্তাবিন্দুর মত জল টলমল করছে। মাথা নেড়ে বললো—অস্বীকার করি কেমন করে! আজ যে তারই পুরস্কার নিয়ে সমস্ত জীবন বরবাদ হয়ে গেল। মরতে চেয়েছি আনারবিবি, কিন্তু মরতে পারি নি। মেহেরবানি করে সম্রাজ্ঞী এইটুকু কৃপা করেছেন—আমার কর্মহীন জীবন যাতে আরো চিন্তার আশ্রয় না পায়, সেজন্যে তুমি আসতে তিনি তোমার বাঁদী উপাধি দিয়েছেন। সম্রাজ্ঞীর এ বড় অনুগ্রহ। কিন্তু আমি চিন্তার আশ্রয় ছেড়ে মুক্তি পেলাম কোথায়? আমার মনে যেন সেইস্মৃতি বার বার আমাকে শয়তানের মত পিছু পিছু তাড়া করে যে। আমি কিছুতে ভুলতে পারি না সেই নির্যাতন। একজনের নির্মমতায় আমার যৌবনের সমস্ত স্বপ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তাই বার বার নিজেকে আঘাত করে অবশিষ্ট যেটুকু যৌবন আছে তা নিঃশেষ করে দিই। তবু কি তার শেষ আছে?

আনার জিজ্ঞেস করলো—কিন্তু আজকে তোমার হঠাৎ কি হল?

একথা জিজ্ঞেস করতে ইরানী স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো, তারপর লজ্জায় অধোবদনে মুখ ঢাকলো, ঢেকে বললো—এ দেহও একজন গ্রহণ করবার জন্যে এসেছিল। সম্রাজ্ঞী জানতে পেরে আমাকে ধরে নিয়ে এসে তিরস্কার করে বললেন—ভুলে যেও না, তুমি সম্রাট আকবরের সংগৃহীত আওরত। কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলে তোমায় ঔদ্ধত্যের শাস্তি গ্রহণ করতে হবে।

আমি তার উত্তরে সম্রাজ্ঞীর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু সম্রাজ্ঞীকে কিছু বলতে পারি নি, নিজের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি নিজের ওপর প্রতিশোধ নেবো। এখনও যৌবনের উন্মাদনা কেন মনের মধ্যে অনুভব করি—সেজন্যেই প্রতিশোধ নেব। দোষ কার,কারও দোষ নয়। সব দোষ নসীবের। এই কথা বলতে বলতে ইরানী কক্ষ থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে গেল।

আনার তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে শুধু বিস্ময়ে ভাবলো—একি? এ যে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ করে চলে গেল? আনার সমস্ত কক্ষময় তখনও সেই ইরানীর আর্তস্বরের প্রতিধ্বনি শুনতে লাগলো—সব দোষ নসীবের। ইরানীর নসীব!

আনার ভাবলো—তাই কি ঠিক? ইরানী কি ঠিক কথাই বলে গেল? সবই নসীবের দোষ! আল্লার চালিত সেই নসীব, নসীবে লিখিত হয়েছে সেই অপরাধের কথা, তাই ফলেছে। কেউই এজন্যে অপরাধী নয়। মানুষ এজন্যে কি করবে?

মানুষের দ্বারা চালিত হয়ে যে কার্য সম্পন্ন হয়েছে, সে নসীবের প্রয়োজনে আল্লা মানুষকে দিয়ে করিয়েছেন। যুক্তি অকাট্য। কোন ভুল নেই।

কিন্তু আনারের মনে প্রশ্ন জেগে উঠলো—সত্যিই কি মানুষ এর জন্যে কোন অংশে দায়ী নয়? মহামাত সম্রাট আকবরকে সে কখনও দেখে নি। তবে শুনেছিল তার মত মানুষ নাকি হয় না। তিনি আল্লার প্রেরিত দূত, তিনি ঈশ্বর। সেই আকবরের কথা আনারের মনে এল।

না, সেই মহান সম্রাটের কথা আনার ভাববে না। ছোটমুখে বড় কথা শোভা পায় না। যিনি একদিন হিন্দুস্তানের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন, যিনি আপন বাহুবলে সমস্ত হিন্দুস্থানের শক্তি জয় করে স্বর্ণময় সিংহাসনের সবচেয়ে উঁচুমঞ্চে হীরক জ্যোতির মত শোভা করে বসেছিলেন—তার সমালোচনা করবে এক ক্ষুদ্রপ্রাণ আওরত? না, না এ স্পর্দ্ধা আনারের নেই। তাই সেদিন আল্লার মত খোদার আসনে বসিয়ে মনে মনে সেই সেকেন্দার ভূমিতে চিরশায়িত মৃত সম্রাটের প্রতি তসলিম পেশ করেছিল। বলেছিল—'হে খোদাতুল্য সম্রাট, তুমি আমার অপরাধ মার্জনা কর। আনার জানে না বলেই তোমার প্রতি যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, তোমার বিরাট বক্ষের উদার ক্ষমা দিয়ে তাকে তুচ্ছ কর।'

সেদিন এই কথাই বার বার বলেছিল এইজন্যে যে, সেদিন সে এই সাম্রাজ্য সম্বন্ধে কিছু জানতো না কিন্তু পরবর্তীকালে আনারের মন পরিবর্তিত হয়েছিল। সে মৃত বাদশাহের ওপর কোন দোষারোপ করেনি বটে, তবে নসীবের দোহাই দিয়ে আওরতের ইজ্জতের কোরবানি সহ্য করে নি।

ইরানীর মৃত্যু সেজন্যে তার কাছে চির উজ্জ্বল হয়েছিল। সেদিন ইরানী উন্মত্ত হয়ে যে আচরণ প্রকাশ করে গিয়েছিল, ঠিক সেই রাত্রেই সেই বিক্ষুব্ধপ্রাণ, দলিত যৌবনবতীর মৃত্যু হয়েছিল। তার মৃত্যু কেমন করে হয়েছিল সেও আজ রহস্যাবৃত। শুধু হারেমের মধ্যে এক ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। সকলের মুখে ভীত এক মৃত্যুর করালছায়া ফুটে উঠেছিল। শকুনের কান্না সমস্ত হারেমের চতুর্দিক ঘিরে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল।



আনার যখন শুনলো তারও চোখে জল এসেছিল। সেও আপন মনে কেঁদেছিল। শুনলো ইরানীর সমস্ত দেহ ছুরিকা দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে কে যেন হারেমের এক গলিপথে ফেলে দিয়ে গেছে। ইরানীর দেহে ছিল সেই পোষাক, যে পোষাকে সে আনারের কাছে এসেছিল। হত্যা যে তাকে করা হয়েছিল এ বেশ স্পষ্ট, কিন্তু হত্যা কে করলো, এ একেবারে স্পষ্ট নয়। রাতের অন্ধকারে শাণিত ছুরিকা যে ঐ শোকার্ত

আওরতটির সমস্ত নিশ্বাস রুদ্ধ করে দিল তা কে জানে ?

কিন্তু আনারের মনে হল,—কে একাজ করেছে, সবাই জানে, শুধু সেই জানে না। সেই জানে না কার দ্বারা এ কাজ সম্ভব হয়েছে। জানতে পেরেছে অনেক পরে। তবে সে কেউ জানিয়ে দেয় নি। নিজের অভিজ্ঞতা দিন দিন ধাপে ধাপে মনের মধ্যে সৃষ্টি হতে সে বুঝতে পেরেছিল হত্যাকারী কে ? বুঝতে পেরে সে হতবুদ্ধি হয়ে শুধু ইরানীর সেই শেষ কথাগুলিরই প্রতিধ্বনি করেছিল, 'সম্রাজ্ঞী নুরজাহান মেহেরবানী করে আমাকে কর্মহীন অবস্থায় কর্ম দিয়ে চিন্তা দূর করেছেন। তোমার পরিচারিকা হয়েছি শুধু সেইজন্য।' বেচারী আওরত, ইজ্জতের কোন মূল্য না পেয়ে বিক্ষুব্ধ জীবন নিয়ে শুধু মৃত্যুকেই কামনা করতো। আচ্ছা, আজ সে কবরশায়িত হয়ে কি শান্তি পেয়েছে প্রাণে ? কে জানে, শান্তি পেয়েছে কি না ? যদি একবার দেখা হত তাহলে জিজ্ঞেস করতো—যে জীবনের তুমি কোন ইনাম পেলে না, সে জীবনান্তে কি তুমি শান্তি পেলে ? পেলে কোন মূল্য ?

ইরানীর মৃত্যুর কতদিন পর পর্যন্ত হারেমের কক্ষে একা থাকতে আনারের বেশ ভয় করেছে। কেবল তার মনে হয়েছে—ইরানী সেই অর্ধনগ্ন দেহে হাতে স্বর্ণবাতিদান নিয়ে প্রজ্জলিত শিখার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে হাসছে। সে প্রেতিনীর মত অট্টহাস্য হেসে সমস্ত প্রাসাদের দেয়ালগুলো ভেঙে দিচ্ছে। অভিশাপ দিচ্ছে। লাখো লাখো ইজ্জতহারা আওরতের নীরব চোখের জলের অভিশাপের সঙ্গে সেও অভিশাপ দিচ্ছে—এ দৌলতের রোশনাই একদিন ম্লান হয়ে যাবে। এ মণিমুক্তাখচিত লোভাতুর সিংহাসন মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে যাবে। এই পাষাণের প্রস্তরময় বিরাট বিরাট স্তম্ভ, একদিন বাজ পড়ে মৃত্তিকা শায়িত হবে। আনার কতদিন রাত্রে আচমকা ঘুম ভেঙে যেতে, কান্না শুনতে পেয়েছে। নিস্তব্ধ প্রাসাদের মাঝে কোন শব্দের লেশমাত্র নেই। গভীর নিশুতি ত্রিযামা রাত্রি। সবাই তখন ঘুমে অচেতন। সেই সময় ঐ বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না। কান্নার মাঝে করুণ অভিব্যক্তি! কে যেন মুক্তি চায়। বন্দিনী মুক্তি পাবার জন্য কত করুণ মিনতি করছে।

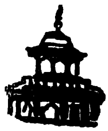
আনার সেই কান্না শুনতে শুনতে কতদিন বিছানার ওপর বসেছে। তারপর শিহরিত হয়ে সভয়ে চতুর্দিকে তাকিয়েছে। ভয় পেয়ে ছুটে গেছে বাইরে—কে কাঁদে দেখবার জন্য তার সমস্ত শক্তি একাগ্র করেছে। তাকে যেন কেউ সেই কান্নার প্রান্তে নিয়ে যাবার জন্য ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু তার মধ্যেও তার মনে হয়েছে—কোথায় সে যাবে ? সে কাঁদছে কোথায়, সে কি তা জানে ? যাবে সে কোথায় ? এই কক্ষ ছাড়া সে তো কিছুই জানে না। হারেমের কোন্ পথ তার জানা। সবই তো তার অজানা। ইরানী কোথায় নিহত হয়েছিল, সে তো তা জানে না, শুধু শুনেছিল —কোন্ এক গলির মধ্যে তার রক্তাক্ত দেহ ছুরিকাহত অবস্থায় পাওয়া গেছে। কিন্তু সে গলিপথ কোন্‌টি, সে তা জানে না।

আনার ঐ অবস্থায় এও ভাবলো—কিন্তু ইরানীই যে কাঁদছে, তারই বা প্রমাণ কি ? কতরমণী তো প্রত্যহ নানারকম দুঃখের মাঝে জীবন নিৰ্বাহ করে শেষপর্যন্ত

সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুকে বরণ করে। হয়ত তাদের মধ্যে কেউ।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই কত রাত সে নিঘু'ম অবস্থায় অতিবাহিত করেছে। আর অ'শু এক স্তব্ধতার মাঝে অবসর জীবনে সে শুধু ইরানীকেই ভেবেছে। সব সময় ইরানী তার পিছু পিছু থেকে তার রমণী মন দৃঢ় করে দিয়েছে। ইরানীর চোখের জল, ইরানীর ওপর অবিচার যেন তার সমস্ত ভবিষ্যৎ চিন্তাকে উজ্জ্বল করে দিয়েছে। ইরানীর বরবাদী জীবনের জন্য সে কেঁদেছে, হাঁউ মাঁউ করে কেঁদেছে। হর্ম্যতলে শয়ন করে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল করে দিয়ে কেঁদেছে। ইরানীকে সে কোনদিনও ভোলে নি। পরবর্তী জীবনে আরো কত মর্মান্তিক ঘটনার সে মুখোমুখি হয়েছে, কত বেগম, বাঁদী, নর্তকীর ওপর অত্যাচার, অবিচার সে প্রত্যক্ষ করেছে, তাদের জন্য অনুতাপ করেছে কিন্তু ইরানীর স্মৃতি তার মনের মধ্যে অম্লানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

এক একসময় অবশ্য ভেবেছে—ইরানী এমন করে তার মনে রেখাপাত করলো কেন? তার মত আরো অনেক আওরতই তো ইজ্জতের কোরবানী দিয়ে হারেমের প্রস্তরময় দেয়ালের ওপর মাথা ঠুকে মরেছে। কই তাদের জন্যে তো এত তীব্র অনুশোচনা মনের মধ্যে জাগে নি? তবে কি ইরানী তার প্রথম যৌবনপ্রাপ্ত মনে রেখাঙ্কিত করেছিল বলে ওর প্রতি তার এত অনুশোচনা? কে জানে, কোন্‌টা ঠিক? মনের মধ্যে কোন্‌টা কখন বাসা বেঁধে চিরঅক্ষয় হয়ে যায় কে জানে? তবে একথা সুনিশ্চিত, ইরানী তার মনের অপুষ্টভাবকে দৃঢ় করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।



আজ বহুকাল পর এই প্রাসাদের অবরোধ ত্যাগ করে আনার চলে এল। আজই তার সেসব কথা বার বার মনে পড়ছে। মনে পড়ছে ইরানীকে। দীর্ঘদিন পূর্বে লোকোত্তর সেই আত্মার প্রতি সমবেদনা বার বার তার মন থেকে মূর্ত হয়ে বের হচ্ছে। চোখে জলও আসছে। দুঃখ জাগছে শুধু নিরাশ্রয় আওরতদের জন্যে। যে আওরতরা মরদদের সোহাগের মণিমুক্তা হতে পারলো না, অথচ তাদের আকাঙ্ক্ষা তীব্র স্বর্ণোজ্জ্বল জ্যোতি নিয়ে অম্লান থাকলো—সেই আওরতদের জন্য তার অনুশোচনার শেষ নেই।

স্মৃতি আছে। ইতিহাসও কম রচিত হয় নি। আজ কয়েকটি বছরের ইতিহাস স্মরণ করতে গেলে অনেক হাসি ও কান্নার মাঝে সময় অতিবাহিত করতে হবে।

আসবার সময় জুবেদা যখন কাঁদতে লাগলো, সেই জুবেদারকে স্মরণ হতেই ইরানীর কথা মনে এসেছিল। জুবেদা বাঁদী। সে বলে, আমি বাঁদী হবার জন্যই সাধনা করেছি, তাই আমার কোন দুঃখ নেই। সত্যি জুবেদার তুলনা হয় না। ইরানী মরে যাবার পর সম্রাজ্ঞী জুবেদাকে আনারের সেবাদাসী করে পাঠিয়েছিলেন, সেই থেকে

এই পর্যন্ত সে আনারের ছায়ার সঙ্গে সেবার কর্তব্য করে চলেছে।

আনার কাতর হল বিদায়ের দৃশ্যটি স্মরণ হলে। নিঃশব্দ অন্ধকারে যখন সে লুকায়িত তাঞ্জামে উঠে বসলো, হঠাৎ সে কান্নার শব্দ শুনতে পেল।

আনার বিস্মিত হয়ে সেই অন্ধকারে জুবেদাকে ডাকলো—জুবেদা, কাঁদে কে?

জুবেদা নিজের কান্না না লুকিয়ে স্পষ্টই বললো—আমি মালেকা। কাঁদছিস্ কেন?

আপনি চলে যাচ্ছেন, আর কখনও দেখা হবে না। এর বেশি বলতে পারলো না জুবেদা। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো শব্দ করে।

সাবধান করে চাপাস্বরে আনাব তাকে বললো—এই চুপ। এখন কান্নার সময় নয়। তুই যদি এমনি করে কাঁদিস্—তাহলে ঠিক ধবা পড়ে যাব। আব তার পরিণাম কি জানিস্?

জুবেদা বোধহয় সেইকথা ভেবে চুপ কবে গেল। অন্ধকারে আনার একবার জুবেদাব মুখটা দেখবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। ততক্ষণে বাহকরা তাঞ্জাম ঘাড়ে তুলেছে। তাড়াতাড়ি আনাব নিজেব কণ্ঠ থেকে একছড়া বহুমূল্য মুক্তার হার খুলে জুবেদার হাতে সঁপে দিল। ফিস ফিস করে বললো—নিজেকে বাঁচাবার জন্য যা বলার প্রয়োজন বলবি। সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলেই খুশী হতাম কিন্তু পথে যদি ধরা পড়ি, সেই ভয়ে তোকে রেখে গেলাম। হয়ত সম্রাজ্ঞী তোকে ক্ষমা করে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন।

তারপর আর বলার সুযোগ কিছু মেলেনি, তাঞ্জাম বাহকেরা নিঃশব্দে বের হয়ে গিয়েছিল। আনার সেজন্যে পথ চলতে চলতে বার বার জুবেদার কথাই ভাবলো,—বেচারী মেয়েটি কোন সাজা না পেলে হয়?

এই সব ভাবনার সাগরের মধ্যে ডুবে গিয়ে কত সময় যে তার অতিবাহিত হয়েছে, তা সে জানে না। হঠাৎ চমক ভাঙলো তাঞ্জামের বন্ধ দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ হতে। বিস্ময়ে আচমকা সে নিজের বর্তমান অবস্থায় এসে চতুর্দিক তাকিয়ে দেখলো, যে বন্ধ তাঞ্জামের মধ্যে সে অবস্থান করছে। বাইরে তখনও সেই ঠক্ ঠক্ করে টোকা দেওয়ার শব্দ হচ্ছিল। আরো সে দেখলো, তাঞ্জাম চলছে না থেমে পড়েছে। কেন থেমে পড়েছে এ কথা বিস্ময়ে ভাবতে গিয়ে হঠাৎ সে তাঞ্জামের দরজা খুলে ফেললো। খুলে ফেলতে সে দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে আছে অশ্বের ওপর সওয়ার হয়ে মহম্মদ ওসমান। ওসমানকে দেখে তার স্মরণ হল যে রাজঅন্তঃপুরের অবরোধ চিরতরে ত্যাগ করে চলেছে মরীচিকার পথে। মরীচিকার পথ ছাড়া আর কি? যেখানে এত আয়োজন করে সে যাচ্ছে, সেখানে কিরকম সমাদর পাবে তা তো তার জানা নেই। তবে আনুমানিক একটা শুভচিন্তা নিয়েই আশার স্বর্ণোজ্জ্বল কল্পনার মাঝে অবগাহন করেই যাচ্ছে। অবশ্য এ রকম বিরাট আশা নিয়ে সবাই অসাধ্যসাধনই করে। যদি তাতে সুফল লাভ হয়, আশার মূল্য সৃষ্টি হয়। আর যদি বিফল হয় সে আশা, তবে আশার ব্যর্থতায় নিজের মনে যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। আনারের জীবনে যে কোন্‌টা জুটবে, আনার

তা জানে না। তাই সেই দুশ্চিন্তায়ই তার যাত্রাপথে সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করেও সুস্থির নয়।

আনার আবার নিজেকে ভাবনার বেষ্টনি থেকে মুক্ত করে ওসমানের দিকে তাকালো, তারপর জিজ্ঞেস করলো, ওসমান তাঞ্জাম থামলো কেন?

ওসমান এতক্ষণ একদৃষ্টে আনারের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। পড়ন্ত রৌদ্রের গোধুলি রক্তিম রশ্মি এসে আনারের মুখের ওপর পড়েছে। যেন কনে দেখার আলো কেউ বিকিরণ করে আয়োজনেব সৃষ্টি করেছে বর্ধিত সৌন্দর্যের। আনার সুন্দরী। সুন্দরী বললে ভুল হবে, হারেমের সমস্ত সুন্দরী আওরতদের সে সেরা। একমাত্র সম্রাজ্ঞী নুরজাহান ছাড়া সকলের সৌন্দর্যই তাব কাছে ম্লান। তবে যদি সম্রাজ্ঞী নুবজাহান বর্ধিত রোশনাইয়ের চূর্ণ দিয়ে হীরা জহরতের বক্ষে আগুন জেলে অঙ্গেব বর্ণ সেই হীরা-চুনি-পান্নার সঙ্গে যুক্ত না করতেন, বোধহয় আনারের সৌন্দর্যের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ থাকতো না। তবু যা ছিল, তার তুলনা হয় না। ওসমান সামান্য সৈনিক হলেও তার তো হৃদয় আছে, সে সেই হৃদয়েব কুসুম অংশ মেলে দিয়ে দুচোখ ভরে আনারের প্রস্ফুটিত যৌবনের রূপ আহবণ কবছিল. আর মনে মনে বলছিল—মেরে খোদা, মহব্বত যদি দাও, যেন এবই কাছে জীবন উৎসর্গীকৃত হয়। হঠাৎ তার চমক-ভাঙলো আনাবের কথায়। তাই সে অপ্রস্তুত হয়ে বর্তমানে ফিরে এসে বললো—কিছু বলবে তুমি আনারবিবি?

আনাব বুছতে পাচ্ছিল ওসমানের অবস্থা। কিন্তু সে অবস্থার ওপর আনার কোন গুরুত্ব না দিয়ে বাইরে পডন্ত বেলার দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকলো। সে দেখলো, নীলাকাশের বুকে একদিকে সূর্যের শেষচিহ্ন। অপরদিকে কে যেন কালো একটা বিরাট পর্দা আস্তে আস্তে পৃথিবীটাকে চাপা দেবার চেষ্টায় ব্যস্ত। আনার আরো দেখলো, বড বড় সাইপ্রাসবৃক্ষ মাথা উঁচু করে যমদূতের মত দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি। তার পাশাপাশি দেবদারু. বটবৃক্ষ প্রভৃতি তাদের অস্তিত্ব প্রচার করতে দাঁডিয়ে আছে সাইপ্রাস বৃক্ষের পাশাপাশি মিতালী করে। আনার হঠাৎ শুনতে পেল বাদ্যঝঙ্কারের শব্দ। তার মনে হল কে যেন এই দুর্গম বনমধ্যে মিঠে বোল তুলেছে চিত্ত মধুর কবতে। কে বাজাচ্ছে এই দুর্গমস্থানে এমনি সুন্দর প্রাণঢালা বাদ্যযন্ত্র! এ বাদ্যঝঙ্কার যে প্রাসাদের বড বড় ওস্তাদের হাতেও কখনও এমন মধুর হয়ে খেলেনি? আনার হঠাৎ কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠবে বলে ইচ্ছুক হয়ে উঠলো। তার জানবার প্রয়াস এত উগ্র হল যে সে আর নিজেকে সংযত করতে পারলো না। কে ঐ বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে জানবার জন্যে ওসমানকে কাতর হয়ে বললো—ওসমানসাহেব কে বাজাচ্ছে ঐ বাদ্যযন্ত্র আমাকে সেখানে নিয়ে চল না! এমন সুন্দর যন্ত্রসঙ্গীত যে আমি কখনও শুনি নি।

ওসমান আনারের নির্বুদ্ধিতায় মৃদু হাসলো, বললো—তুমি কি কখনও ঝরণার প্রাকৃতিক সঙ্গীত শোনো নি?

আনারের কানে তখনও সেই মধুর শব্দের নিনাদ। একসুরে বেজে চলেছে সেই

যন্ত্রের সুর। যেন মনে হচ্ছে কোন অপ্সরী এই গোধূলিক্ষণে বীণ নিয়ে বাজিয়ে চলেছে প্রাণঢালা আবেগে। সে বসে আছে পাহাড়ের শিলার ওপর। সামনে দিয়ে শিলার সোপান ভিজিয়ে জলধারা বয়ে চলেছে। সেই জলধারায় কোন সুর নেই, আছে যত সুর সেই কুমারীর পদ্মকলিসম হাতের অঙ্গুলিতে। আনার আরো দেখতে পেল, সেই কুমারীকন্যার ডাগর দুটি চোখের কৃষ্ণকালো দৃষ্টিতে লাখো আবেগের মূর্ছনা। সেই আওরত কিছুই জানে না। নিতান্তই অবলা সে। তার মাথার রেশমী চুলে গাঁথা আছে একস্তবক নাগকেশর। সে বন্যফুলে মালা গেঁথে নিজে পরে আছে, আর তার মুখখানি ঘিরে প্রতিফলিত হয়েছে এক বন্য আদিমতা। সবুজ শ্যামলিমার সেই অবয়ব দেখে আনার অভিভূত হয়ে ভুলে গেল স্থান-কাল-পাত্র। আরো কতক্ষণ সে এই সব স্বপ্ন দেখতো কে জানে? ওসমানের কথায় হঠাৎ আবার বর্তমানে ফিরে এল।

ওসমান বললো—আজ আমরা রাতটুকু এই পাহাড়ের কাছেই অবস্থান করবো। কারণ এ রাত্রে দুর্গম পথ চলা বড় দুষ্কর

আনার ওসমানের কথা শুনে সভয়ে বললো—আমাকে কি এত বোকা ভাবো আনারবিবি? আমি বাদশাহী সড়কের পথ ছেড়ে ভিন্নপথে চলে এসেছি। এ পথে বাদশাহী ফৌজ কখনও আসবে না।

আনার চুপ করে থাকলো। ওসমান অবশ্য কথাটা ভালই বলেছে কিন্তু তার মনোপুতঃ হল না। প্রথমতঃ এইরাত্রে এই দুর্গমস্থানে বাস করবার ইচ্ছা তার একেবারে নেই। দ্বিতীয়তঃ সে একা একটি আওরত সমস্ত সম্মান খুইয়ে এই এতগুলি মরদের সঙ্গে এক জায়গায় রাত্রিবাস করতে ইচ্ছুক নয়। আর তৃতীয়তঃ সে তাড়াতাড়ি চায় শাহজাহানের কাছে পৌঁছতে। যা হয় সেখানে গিয়েই ঘটুক অন্ততঃ একটা নির্ভয়ের আশ্রয়ে, এই পথিমধ্যে সে প্রাণ বা ইজ্জত দিতে রাজী নয়। ইজ্জতের কথা স্মরণ হতে আবার তার মাথায় এক চিন্তা এল। তবে কি ওসমান তাকে কৌশলে এখানে এই দুর্গমস্থানে এনে তার ইজ্জত-হানি করতে চায়? মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সেই মুহূর্তে কঠিন হয়ে বললো—না, এখানে থামা চলবে না। রাত্রের মধ্যেই চলবো।

কিন্তু ওসমান আশ্চর্যভাবে আচরণ পরিবর্তিত করে বললো—না, তুমি বললেও কেউ এইরাত্রে এক পাও চলবে না। যদি জ্যোৎস্নার আলো জাগে তখন বিবেচনা করে দেখা যাবে।

আনার ওসমানের কথা শুনে হতচকিত হয়ে বললো—তুমি কি আমার ওপর বলের আশ্রয় নিচ্ছ ওসমান খাঁ?

ওসমান আনারের ওপর অহেতুক কঠোর হতে নিজে মনে মনে বেশ আহত হয়েছিল। তাই আনারের কথায় ম্লান হেসে বললো—না আনারবিবি আমি তোমার ওপর কোন বলের আশ্রয় নিই নি? ভেবো না, এই দুর্গমস্থানে একটি আওরতকে একা পেয়ে তার ওপর কোন্ ইচ্ছাকে মেলে দিয়ে ওসমান খাঁ বীরত্বের পরিচয় দেবে?

আমি শুধু তোমার ওপর কঠোরতা প্রকাশ করেছি, এই অভিযানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে। খোদার কাছে শপথ করে বলতে পারি, আমার আর কোন মতলব নেই। আমরা বাদশাহী সড়ক না ধরে ভিন্ন পথে ঘুরপাক খেয়ে এসেছি বলে ধরা পড়ি নি। যদি বাদশাহী সড়ক ধরে আসতুম নিশ্চয় ধরা পড়তুম। কারণ আমি বাতাসে কান পেতে শুনতে পেয়েছি অশ্বখুরের ধ্বনি। তাছাড়া তোমার পলায়ন ব্যাপার নিয়ে সম্রাজ্ঞী যে তীব্র অনুসন্ধান চালাচ্ছে, এ নিশ্চয় বুঝতে পারো। তাই বুদ্ধির প্রখরতা সৃষ্টি করে একটু ঘোরালো পথ দিয়ে মালবদেশে পৌছচি। এই ঘোরালো পথের সন্ধান আমার জানা ছিল না। আমার এক অনুচর জানতো বলে আজ আমাদের প্রাণরক্ষা হল। আর তারই কথামত এই সন্ধ্যেবেলা এখানে থেমে পড়েছি, কারণ সেই বললো--এরপর রাত্রিবেলা এই পথ অতিক্রম করা সমীচীন হবে না। এখানে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত আছে সেই পর্বতের ভেতর দিয়ে অনেক পথ আছে, সেই পথ দিয়ে রাত্রিবেলা চলতে গেলে প্রাণ হারাতে হবে। তাছাড়া দুর্ভেদ্য অরণ্য আছে, হিংস্র জন্তু জানোয়ারেরা সর্বদা শীকার অন্বেষণে ফিরছে। তাদের কবলে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে রাত্রিটুকু এখানে অবস্থান করা ভাল। আমার যদি এসব কথা তুমি বিশ্বাস না কর তাহলে আমার সেই অনুচরকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিই।

আনার মনে মনে ভাবলো—তোমার যদি কোন দুষ্ট মতলব থাকে তাহলে তোমার সেই অনুচরকে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখাও বিচিত্র নয়। তবে যাই হক ভয় পেলে হবে না, যদি এরা শত্রুতা করে তাহলে সেই শত্রুদের সঙ্গে যুঝবার ক্ষমতা আহরণ করতে হবে, আর যদি মিত্রভাবাপন্ন হয়ে তাকে সাহায্য করে, তাহলে বলবার কিছু নেই। সময়ান্তরে পুরস্কার দিয়ে এদের সাহস বর্ধিত করা হবে। এই কথা ভেবে আনার তাড়াতাড়ি ওসমানকে নিষেধ করে বললো—তোমার অনুচরকে আর পাঠাতে হবে না। তোমার কথাই বিশ্বাস করলাম।

ওসমান অশ্বের ওপর সওয়ার হয়েছিল। আর আনার বাহকদের কাঁধে ধরা তাঞ্জামে বসেছিল। ওসমান সেই অবস্থায় কুর্নিশ করে বললো—আজ রাতটুকু এখানে কাটাতে পারলেই আগামীকল্য প্রত্যুষেই আমরা শাহজাদা খুরম বাহাদুরের প্রাসাদে গিয়ে পৌছবো।

ওসমানের কথা শুনে আনার কৌতুক সংবরণ করতে পারলো না, বললো—যদি আজ রাত্রে কোনরূপে প্রাণ রক্ষিত হয়, তবে তো ?

ওসমান হাসতে হাসতে চলে গেলে, তার অশ্বখুরের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেলে আনারের কানে আবার সেই বাদ্যঝঙ্কারের সুমধুর ঝঙ্কার প্রবেশ করলো। অভিভূতের মত কান পেতে এক মনে শুনতে লাগলো সেই মৃদু ঝরণার ঐক্যতান।

তাঞ্জাম মাটিতে রক্ষিত হলে সে সেই ঝঙ্কার অনুসরণ করে এগিয়ে চললো সামনের দিকে। নিজে যাচ্ছে না কেউ যেন তাকে আকর্ষণ করে সেই উল্লেখযোগ্য স্থানে নিয়ে যাচ্ছে, এমনি মনে হল আনারকে দেখে।



তখন সন্ধ্যার কালো রঙের পোচরা কে যেন দিয়ে চলেছে চতুর্দিকে। গাছের পাতার ওপর গোধুলিরাগের শেষবর্ণ রক্তিমচ্ছটায় মাখিয়ে দিয়েছে তার পরশ। পাহাড়ের সানুদেশে গিয়ে পৌছতে আনার দেখলো, আকাশ সমান এক যমদূত বিশাল শরীর নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে সেখানে। তার সমস্ত অমসৃণ দেহের ওপর শেষ বিদায়ীকালীন সূর্যের রশ্মি পড়েছে। পাহাড়ের গেরুয়াবর্ণের ওপর আরো রক্তাভার স্পর্শ সৃষ্টি হয়েছে! দেখাচ্ছে মনোরম। দূর থেকে আনার দেখলো, পাহাড়ের বক্ষের ওপর ছোট বড় বহু গাছের সারি। সেই গাছগুলি বাতাসে দুলছে। হঠাৎ অন্যপাশে তার চোখ সরে গেল। যার আকর্ষণে সে এখানে এসেছিল সেই দৃশ্য ও তার সঙ্গীত শুনে সে চমকিত হল। আনার তাকিয়ে থাকলো বিস্ময়ে সেই-দিকে। পাহাড়ের খণ্ড খণ্ড শিলাধৌত করে ঝরণার স্রোতধারা কুলকুল ধ্বনি করতে করতে বয়ে চলেছে। কোথাও সেই জলধারা প্রচণ্ডবেগে শিলাধৌত করে নেমে এসেছে, কোথাও তার গতি মন্থর।

হঠাৎ আনারের মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা প্রবলভাবে জেগে উঠলো, সে এই জলধারার মাঝে অবগাহন করে স্নিগ্ধজলের সুরভি গ্রহণ করবে। ইচ্ছাটা প্রকাশ হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের মধ্যে ভয়ের সঙ্কোচন জেগে উঠলো। এই উন্মুক্ত স্থানে সে দেহবাস খুলে রেখে জলকেলি করবে? পরক্ষণে বিপরীত চিন্তাধারা তাকে আঘাত করলো—ক্ষতি কি? কেউ কাছাকাছি না এলেই চলবে। আর যদি এসেই পড়ে, লজ্জায় সে নিজেই সরে যাবে। তবু এই উপলব্ধি থেকে সরে না যাওয়াই ভাল। জীবনে সব সময় তো সব সুযোগ আসে না! এই ঝরণার জলে তার গভীর উত্তুঙ্গ যৌবনপুষ্ট দেহ ডুবিয়ে রেখে আর ঐ ঝরণার সুরসঙ্গীতের মত মনের মধ্যে গানের সুর সৃষ্টি করে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করলেই মিলবে একটি দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

আনারের মনে পড়লো বাদশাহের স্নানাগারের কথা। বাদশাহের স্নানাগারের সৃষ্টি তাঁর শিল্পসৌন্দর্যের আর একটি চমৎকার নিদর্শন। সে কখনও সেখানে প্রবেশের অধিকার পায়নি। শুধু বাদশাহের নির্বাচিত আওরতরা সেখানে একটি বিশেষ মুহূর্তে গিয়ে পৌছোয়। সে শুনেছিল সেই স্নানাগারের মাঝে উগ্র প্রস্রবণের এক গোলাপ জলের ধারা সৃষ্টি আছে, আর সেই ধারার মাঝে বাদশাহ তার নির্বাচিত বেগম বা আওরতদের নগ্নতার সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে জলকেলি করেন। স্নানাগারের সমস্ত দেয়ালের আবরণের ওপর বেলজিয়াম আয়নার চকমকি। তার ওপর জোরালো আলোর রোশনাই। সেই আলো ও আয়নার মাঝে কারো লুকোবার উপায় নেই। সব দৃশ্য প্রতীয়মান। নিত্যনতুন প্রস্ফুটিত যৌবন পুষ্পের সেই বিচিত্রভঙ্গিমার মাঝে বাদশাহের এই উপভোগের কথা চিন্তা করে আনার শিউরে

উঠতো। শিউরে উঠে সে আপন বক্ষের ওপর দু'হাত আড়াআড়িভাবে স্থাপন করে নিজের লজ্জাকে লুকোতে চাইতো। আর বার বার সে ভাবতো, সম্রাজ্ঞী যদি কোনদিন বলেন তোমাকে বাদশাহের কাছে যেতে হবে, তাহলে সে কি করবে? সেই দুশ্চিন্তা নিয়েই, মনের দারুণ এক উত্তেজনার মধ্যে ভাবী আশঙ্কায় তার অন্তঃপুরের সমস্ত সময়গুলি কাটতো, আর যতদিন এগিয়ে যেত, সম্রাজ্ঞী কর্তৃক নিত্য-নতুন বিলাসের উপকরণ কক্ষের মধ্যে এসে পড়লে সে শঙ্কিত হয়ে পরবর্তী আদেশের অপেক্ষা থাকতো। তারপর বহুসময় অতিবাহিত হয়ে গেলে কোন বাঁদী এত্তেলা নিয়ে না এলে সে নিশ্চিন্ত হয়ে আর একটি প্রশ্নের আবর্তের মধ্যে প্রবেশ করে ভাবতে বসতো, তবে কিসের জন্যে সম্রাজ্ঞী তাকে এত যত্ন ও আদরের মধ্যে দিয়ে এই রাজসিক আরামের মধ্যে রেখেছেন? তবে কি তাঁর বহুমূল্যবান রূপের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে!

কিন্তু সম্রাজ্ঞীর কথা ভেবে আনার কিছুতে বিশ্বাস করতো না, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান বিনা স্বার্থে কোন এক আওরতকে এতো আরামে রাখতে পারেন! সম্রাজ্ঞী নূরজাহান কেন? এত বড় সাম্রাজ্যের কেউই কখনও বিনা স্বার্থে কিছু করেছে বলে আনারের মনে পড়ে না। এখানকার সকলেই স্বার্থপর। এমনকি গুলাববাগের ঐ অগণিত-পুষ্পরাও বিনাস্বার্থে এতটুকু সুরভি দান করে না। তারা লোক বুঝে বিতরণ করে তাদের সৌন্দর্য।

তাই আনারের অনেকগুলি বছর শুধু বাদশাহের হারেমে থেকে আশঙ্কার মধ্যে জীবন অতিবাহিত হয়েছে। সে প্রত্যহ রাজসিক আহার্যবস্তু গলাধঃকরণ করেছে, সুকোমল মখমল শয্যার গহনে শুয়ে নিজের প্রস্ফুটিত যৌবনতনুর সোহাগ সৃষ্টি করেছে, অঙ্গে পরেছে রক্তবর্ণ সাটিনের সালোয়ার, বক্ষের সুষমার মাঝে ঢাকা দিয়েছে রেশমীবস্ত্রের সুদৃশ্য কাচুলির বন্ধন, তার ওপর পরেছে গোলাপীবর্ণের ছোট জামা, আর সর্বোপরি একটি আকাশীরঙের সুমসৃণ ওড়না দিয়ে বক্ষের যৌবন সৌন্দর্যের রূপ বর্ধিত করেছে। প্রত্যহ তার পোষাক পরিবর্তন ও প্রসাধনের জন্যে সম্রাজ্ঞী কর্তৃক আদেশ আসতো, আর দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে আপন ইচ্ছায় সাজাতো সে নিজেকে অপরূপ-ভাবে। পাশে অবশ্য থাকতো সাহায্যকারী বাঁদী ও জুবেদা।

কিন্তু প্রত্যহ নিজের সুরমাশাঙ্কিত কামনা-ভরা দৃষ্টি ও বক্ষের সমুদ্র উত্তাল যৌবনস্তম্ভ দর্পণের মধ্যে দিয়ে দেখে নিজে শিহরিত হয়ে ভাবতো—সম্রাজ্ঞী প্রত্যহ তাকে এমনি অপরূপ সাজ সাজতে বলেন কেন? অথচ সাজবার পর তো তার কোন হুকুম আসে না? এক একসময় তার রাগ হত—প্রতীক্ষার এই প্রহর গোণার চেয়ে তার সাজের কেউ মূল্য দিলে সে বুঝি সবচেয়ে খুশী হত। না হয় সে মূল্য অমূল্যের সমান না হত, তবু তো সার্থক হত তার এই প্রত্যহের বেশভূষা করা! কিন্তু কেউ এল না। কেউ এল না বলেই হয়ত পরবর্তীকালে সে বিদ্রোহিণী হবার সাহস সঞ্চয় করেছিল। তার শোণিতের মধ্যে যে উন্মাদ হবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাই বার বার তাকে উৎসাহ দিয়ে জাগিয়ে তুলে বলতো—'এ জীবন আর কদিনের। ঐ গুলাব-

বাগের প্রস্ফুটিত রংবাহার পুষ্পের মত ক্ষণস্থায়ী জীবন। যা পারো লুটে নাও, ভোগ করে নাও। এ মুহূর্ত আর থাকবে না।' ··কিন্তু আনার পারে নি। আনার লুটিয়ে দেবার অনেকরকম কৌশল মনে মনে রপ্ত করেছে কিন্তু মনেই থেকেছে তার বাসনা, বাইরে বের হয়ে কোন অঘটন ঘটাতে সাহস করে নি। আর পারে নি বলেই সেই সুপ্তযৌবনের উন্মাদনা আজ তীব্র হয়ে মরীচিকার পথে ছুটিয়ে দিয়েছে তার অশ্ব। জানে না সে অশ্ব ঠিক উপযুক্তস্থানে গিয়ে উপস্থিত হবে কিনা। সবই সন্দেহের দোলায় দুলছে। সবই কুয়াশার জালের মধ্যে আটক হয়ে বন্দীজীবন ভোগ করেছে।

হঠাৎ আনার দারুণ চমকে উঠলো, পাশে কার যেন অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। চেয়ে দেখলো চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার তার হাত পা মেলে দিয়ে সমস্ত প্রান্তর ঢেকে দিয়েছে। সামনে যে বিরাট পাহাড়টি দাঁড়িয়েছিল, এখন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না, শুধু সামনের অংশটিতে বিরাট এক জমাট অন্ধকার আরো ঘন হয়ে ভয়াবহতার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু শোনা যাচ্ছে সেই নীরব একটানা বিচিত্রসুরের যন্ত্রসঙ্গীত।

আনার বুঝলো, অনেকক্ষণ সে এই একজায়গায় দাঁড়িয়ে ভেবেছে। তার মনের মধ্যে এই ঝরণার জলে স্নান করার স্পৃহা জেগেছিল, কিন্তু এই ভাবনা শয়তানের মত কাঁধে ভর করায়, তার সেই একান্ত স্পৃহা কাজে পরিণত হল না। তার অনুশোচনা সেইমুহূর্তে চিত্ত বিষাদের কালিমায় পূর্ণ করলো, তারপর নিজেকে সংযত করে পাশে অন্ধকারে দণ্ডায়মান মানুষটিকে উদ্দেশ্য করে বললো — ওসমান সাহেব, বাতি জ্বালবে না?

অন্ধকারে অপেক্ষমান সেই মানুষটির কণ্ঠস্বর উত্তর দিল —নিশানা জানিয়ে কি শেষপর্যন্ত শত্রুর হাতে ধরা পড়বো?

কিন্তু সারারাত্রি কি এমনি বিনা আলোয় থাকবে?

না, মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই আল্লার আলো আশমান উজ্জ্বল করবে।

কিন্তু ততক্ষণ কি করব?

সহসা কোন উত্তর এল না। সমস্ত অন্ধকার প্রান্তর জুড়ে নিস্তব্ধতা নেমে এল। শুধু ঝরণার কলতান শোনা যেতে লাগলো। আর চতুর্দিকে জমাট অন্ধকার আরো জমাট হয়ে ভয়াবহতার সৃষ্টি করলো। আনার ভয় পেয়ে আর্তস্বরে বললো—ওসমান সাহেব, কথা বলছো না কেন?

কোন উত্তর পাওয়া গেল না। কিন্তু দুখানি লৌহকঠিন বাহু আনারের কাঁধের ওপর দিয়ে উঠে এসে তাকে অধিকার করতে চাইলো। দুখানি কঠিন বাহু নয়, দুটি বিষধর সর্পের উত্তপ্ত অঙ্গ যেন পুড়িয়ে দেবার আয়োজন করলো আনারের সর্বদেহ।

আনার হঠাৎ দারুণভাবে বিস্মিত হয়ে হতবাক হয়ে গেল। কেমন যেন সে দুর্বলতা অনুভব করলো। সমস্ত দেহে শিথিলতার স্পর্শ অনুভূত হতে সে চেতনা জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করলো। এরকম অতর্কিতে কেউ কখনও তাকে বলপূর্বক অধিকার করতে চায় নি বলে সে আরো বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে গেল। তাই হঠাৎ সে কি করবে, ভেবে না পেয়ে, চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই হাত দুখানির ক্রীড়া দেখতে

লাগলো। আর ভাবতে লাগলো—ওসমান তাকে বিশ্বাস করতে পারে নি বলে সে এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু ওসমানকে সে কি তাব এতদিন ধরে সযত্নে রক্ষিত রমণীব কৌস্তভ রত্ন দান কববে বলেই ঠিক কবে রেখেছিল? না ওসমান নিজেও যেমন বুঝতে পেবেছিল, আনারও তেমনি ভালভাবে জানে—তাব যৌবনের অঙ্গার ওসমান হতে পারে না। সে যৌবন বাদশাহের আকাঙ্খিত হতে পারে, সে যৌবন একজন সামান্য সৈনিকের ভোগ্য কেমন করে হয়?

ওসমানও সেই কথা ভেবে নিজের পৌরুষেব অধিকার বজায় রাখার জন্যে এই সুযোগটি হাতছাড়া করে নি।

আনার এদিকে অখণ্ড ভাবনার মাঝে সমাহিত হয়ে শুধু ভাবছে, কিন্তু তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি সেই অন্ধকারে প্রখর হয়ে আছে। দুটি হাতের মাঝে আনার ভাবছে—হাত দুটি শয়তানেব কি? যদি শয়তানের নয় বলে মনে ভাবে তাহলে কি হয়? যদি ধরা যায় ঐ হাত দু'খানি বহু আকাঙ্খার পরম পাওয়া, তাহলে তো এই দুশ্চিন্তাব দংশন বক্তাক্ত করে না দেহ! সে কি তাই ভাববে, এই সন্ধ্যার অন্ধকারে এক অপরিচিত স্থানে অন্য কাবো জানাব যে ঘটনা ঘটতে চলেছে তা ঘটুক। বরং তার পাওয়ার ঘর বহুদিন শূন্য হয়ে আছে, তা সম্পূর্ণরূপে ভরে উঠলে তার রমণী জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। আর তাছাড়া এই লোকালয়হীন প্রান্তবে কেই বা জানবে এ গোপন দেওয়া-নেওয়া। নিক্, প্রাণভরে দিক্ এক বীবপুরুষ সৈনিক মরদ। আব সে পাক শান্তি। উভয়ের দেওয়া নেওয়াব মাঝে অমৃতেবই ফসল ফুটে উঠুক। একজন না পাওয়ার বেদনা নিয়ে ক্ষুধার্ত হয়ে কেন পশুর আক্রমণেব ভূমিকা নেবে! তাব চেয়ে নিজেকে সঁপে দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবাবণ করলেই তাব আব আক্রমণের নেশা থাকবে না।

কিন্তু হঠাৎ আনাব চমকে উঠে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো দারুণভাবে। সেই হাত দুখানি পেছন দিক থেকে কাঁধের প্রান্তসীমা দিয়ে নেমে এসে একেবারে বক্ষেব যৌবন-সীমায় স্পর্শ করলো। আনারের সমস্ত দেহমন তাতেই বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। যে স্বর্ণময় দুর্লভ বস্তু সে আপন যত্নেব মাঝে এতদিন ধবে কত আক্রমণের মধ্যে দিয়ে রক্ষা করে আসছে, তার হঠাৎ এই অযাচিতভাবে অবমাননায় আনারের মন বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। শোনিতের মধ্যে আমেজের তীব্রতা অপসারিত হয়ে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্বলিত হল। সে সবলে হাত দুখানি সরিয়ে দিয়ে অন্ধকারে একপাশে সরে গিয়ে ক্ষিপ্তস্বরে বললো - তুমি এত তুচ্ছ সৈনিক ওসমান খাঁ?

সঙ্গে সঙ্গে বিকৃতস্বরে উত্তর এল—হ্যাঁ কাবণ তোমাকে এরপর পাব না বলে এই সুযোগের ব্যবহাব।

আবার সেই অন্ধকারেব মানুষটি আনারেব অতি কাছে সরে গিয়ে তাকে নিজের বক্ষে স্থাপন করতে গেল। একজন পুরুষ সে তাব জৈবিক ক্ষুধায় প্রবৃত্তিব নোকর হয়ে একটি দুর্বল রমণীকে অধিকাব করতে চায়, আর একটি রমণী এমনি একটি পরিবেশের মাঝে পড়ে দিশেহারা হয়ে নিজেকে রক্ষার জন্যে আপন শক্তি বৃদ্ধি করতে চায়। দুজনেই নিজেদের বলপ্রয়োগের দ্বারা চেষ্টা করতে লাগলো দুটি ক্ষমতাকে হস্তগত

করতে। চললো ধস্তাধস্তি সেই অন্ধকারের মাঝে অনেকক্ষণ। ওসমান আনারকে বসনোন্মুক্ত করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো, আর আনার চেষ্টাকে দমিত করবার জন্য বাধা দিতে লাগলো বার বার। এই চেষ্টার মাঝে ফল হল আনারের মজবুত বসন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আর ওসমানের দেহ হল রক্তাক্ত। আনার যখন পেরে উঠছিল না তখন সে তার দন্তের অগ্রভাগ দিয়ে ওসমানের দেহের বিভিন্নাংশে কামড় দিচ্ছিল। এই সময়ে মেঘের আড়াল থেকে চন্দ্রের স্নিগ্ধ রশ্মি এসে সেই অংশে আলোকপাত করলো। দুজন দুজনকে দেখলো একদৃষ্টে। আনার ওসমানের ভয়াবহ আকৃতি দেখে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বার মুহূর্তে পৌছলো। এইসময় ওসমান নিজের কোমরে রক্ষিত তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বের করে আনারের বক্ষ লক্ষ্য করে তুললো। চন্দ্রের রূপালী আলোর ধারার মাঝে ছুরিকার ফলা ঝিক্‌মিক্ করে উঠলো। আনার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে চীৎকার করে উঠলো। তার চীৎকার সেই নিস্তব্ধ রাত্রি খণ্ড খণ্ড করে দিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। পাহাড়ের প্রস্তরের বুকে আঘাত লেগে আরো সোচ্চার হল সেই রমণীকণ্ঠ।

ওসমান সেই চীৎকারে আতঙ্কিত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলো।

ক্রন্দনরত আনার তখন ঘাসের গালিচার ওপর অবসন্ন দেহে বসে পড়েছে।

ওসমান পালিয়ে যাবার পর তার অনুচরেরা আনারের ভয়ার্ত চীৎকার শুনে সেখানে এল, এসে আনারকে ঐ অবস্থায় দেখে অনুনয়ের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো—কি হয়েছে আপনার? সর্দার কি এখানে আসে নি?

আনার তাড়াতাড়ি নিজেকে ঘাসের জাজিমে গোপন করে চোখের জল যতদূর পারলো লুকিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বললো—আমার কিছু হয় নি। তোমরা যাও।

অনুচরেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করতে করতে সে স্থান ত্যাগ করলো। তাদের গোস্তাখি হবে বলে তারা জিজ্ঞেস করতে পারলো না, কিন্তু তাদের মুখের ওপর প্রতিফলিত হয়েছিল সেই একটি প্রশ্ন—'তবে আর্তস্বরে চীৎকার করলেন কেন?'

আনারও বুঝলো সে কথা কিন্তু তখন তার কোনকিছুই গভীরভাবে উপলব্ধি করবার সামর্থ্য ছিল না। যদি থাকতো, তাহলে সে ভাবতো—এই এদের কাছে তাদের সর্দারের শয়তানী মতলবের বর্ণনা দিলে কি উপকার হত? তারা কি তাদের ঐ শয়তান সর্দারকে কোন সাজা দিত? দিত কিনা—সে কথা ভাববার সামর্থ্য আনারের সেইমুহূর্তে ছিল না। শুধু ওসমানের অনুচরেরা চলে গেলে সে চন্দ্রের প্রখর উজ্জ্বলতার মাঝে নিজের ছিন্নবসনের প্রান্তে তাকালো।

সে যখন বাদশাহ হারেম ত্যাগ করে, কতকগুলি দামী পোষাক সঙ্গে নিয়ে এসেছিল; কিন্তু সে পোষাকগুলি তাঞ্জামের মধ্যে পেটিকাবদ্ধ হয়ে আছে। আর তার পরণে যা ছিল তা গত রাত্রের ব্যবহৃত পোষাক। পোষাক পরিবর্তনের সুযোগ ছিল না বলে তার পরিধানে খুব একটা মূল্যবান কিছু ছিল না। তাছাড়া সে মূল্যবান পোষাক পরে এই অভিযান করবে না বলেই সাধারণ বেশেই যাত্রা করেছিল। আর যে পোষাক সে সঙ্গে নিয়েছিল তা ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে ভেবেই নিয়েছিল।

শাহজাদা খুরমের আশ্রয়ে গিয়ে হয়ত দরকার হতে পারে।

আজ তারই বিশেষ প্রয়োজন হল দেখে সে ঐ মুহূর্তে অভিভূত হয়ে পড়লো। এখন যদি ঐ পোষাক না থাকতো তাহলে এই ছিন্ন পোষাকে ভাবী সম্রাট শাহজাহানের সামনে কি করে দাঁড়াতো? দাঁড়ানোর সাহসই তার হত না। কিন্তু এই ঘটনার পরও কি সে শাহজাহানের কাছে পৌছতে পারবে?

হঠাৎ আনার সেই ঘাসের জাজিমে বসে পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ না করে যে ঘটনা ঘটলো, তার আবর্তে মুহ্যমান না হয়ে এই অভিযানের সার্থকতার কথা ভাবলো। যদি এই ঘটনার পর ওসমান নিজের শয়তানী স্বভাব প্রকাশ করেছে বলে লজ্জায় না ফেরে? যদি একেবারেই পলায়ন করে থাকে তাহলে উপায় কি হবে? ওসমানের অনুচররা কি তাকে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছে দেবে?

আনার আরো ভাবলো—এই কিছুক্ষণ আগে তার অনুচরেরা জিজ্ঞেস করতে আনার আসল কথা গোপন করে অনুচরদের তাড়িয়ে দিল, এতে কি এই প্রমাণিত হল না যে সে ওসমানের দুষ্ট মতলবের কথা আপাততঃ গোপন রেখে সে তাকে ক্ষমা করতে চায়? উদ্দেশ্য তাকে ঠিক জায়গায় পৌছে দেবে বলে। ওসমানকে এই কথা জানালে বোধ হয় সে আর লজ্জায় পালিয়ে যাবে না—এই কথা ভেবে আনার নিজের সমস্ত ক্লান্তি ভুলে গিয়ে চতুর্দিকে ওসমানকে খুঁজলো। তারপর ফিসফিস করে বললো—ওসমান, তোমার এই শয়তানী আমি ক্ষমা করেছি, লজ্জায় পালিয়ে না গিয়ে এই যাত্রাকে সার্থক করে তোলার জন্যে কাছে এস। কিন্তু সে চীৎকার করে সেকথা বলতে পারল না, শুধু চাপ স্বরে বলে চতুর্দিকে কাতর হয়ে তাকালো। কিন্তু কোথায় তখন ওসমান?

আনারের সেইমুহূর্তে ইচ্ছা করলো—ওসমানকে খুশি করলেই বুঝি সবদিক দিয়ে মঙ্গল হত। আবার পরক্ষণে ভাবলো—তাকে খুশি করলে তো তার যৌবন হত উচ্ছিষ্ট। সে সেই উচ্ছিষ্ট যৌবনের উপঢৌকন নিয়ে শাহজাদা খুরমের সামনে দাঁড়াতো কেমন করে? তার যে লজ্জা করতো। দারুণ লজ্জা। মনে হত একটি নকল হীরার জ্যোতি শাহজাদার সামনে ধরে তাকে প্রলোভিত করতে চাইছে। আর শাহজাদা যদি জানতে পারেন, —এ হীরা আসল হীরা নয়—নকল! নকল ইজ্জতের রোশনাই জ্বেলে হিন্দুস্থানের ভাবী শাহজাদাকে এক ঝুটি আওরত বশ করতে চাইছে, তা'হলে শাহজাদা খুরম কি শান্ত থাকবেন? কোনদিন কোন পুরুষ কি এক্ষেত্রে কোন ক্ষমার আশ্রয় নিয়েছে? না, বেইমান বা উচ্ছিষ্ট আওরতের প্রতি কোন পুরুষই কখনও কোন অনুকম্পা প্রদর্শন করেন নি, আর শাহজাহান তো সমস্ত হিন্দুস্থানের সেরা একজন ভাগ্যবান পুরুষ, তিনি কি কখনও নকল হীরা জহরতের ওপর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবেন? যখন তাঁর এক একটা অঙ্গুল হেলনে লাখো খুবসুরত আওরত মেলে?

তবু আনারের সেইমুহূর্তে মনে হল—নাইবা ভাবী বাদশাহ তাকে গ্রহণ করলেন, সে যে সংবাদ বহন করে যাচ্ছে, সেই সংবাদ পরিবেশনে শাহজাদাকে খুশি করতে

পারলেই তার কাজ শেষ। পরের যে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবার যেমন আশা শুধু দুরাশার মধ্যে পর্যবসিত হয়ে আছে, তেমনি না হয় একেবারে জলবুদ্বুদের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—তবু এই সান্ত্বনায় তার মনের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে যে সে ভাবীসম্রাটের সিংহাসন প্রাপ্তির পথ সুগম করে দিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে এক বিরাট চক্রান্ত তাঁকে যে হত্যা করবার ব্যবস্থা করেছিল, তাই থেকে সেই ভাগ্যবান পুরুষকে সে বাঁচিয়েছে।

এই সান্ত্বনার কথা মনে এলেও তবু যেন সেই গোপন আকাঙ্ক্ষা বাসনার উর্ধ্বে আরোহণ করে তার মনের গোপন স্থান রাঙা হয়ে থাকলো। সে হল আশা। আনার সেই ঘাসের জাজিমে বসে ছিন্নপ্রায় বসনে, ইজ্জত যাবার বেদনায় ব্যথিত হয়েও সে সেই চন্দ্রালোকিত সমস্ত প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে সেই উজ্জ্বল আশার প্রকাশ দেখতে লাগলো। পাহাড়ের শিলাধৌত করে সেই ঝরণার সুরমাধুর্য সে উপভোগ করতে লাগলো। আরো দেখতে লাগলো পাহাড়ের সমস্ত খাঁজে খাঁজে চন্দ্রের রশ্মিশোভা। বৃক্ষের পত্রালয়ে রূপোলী রঙ লেগে বিচিত্র অভিসার মুহূর্ত তৈরী হয়েছে। সেই অভিসার মুহূর্তে অন্য আর কিছু ভাল লাগে না, ভাল লাগে শুধু যৌবনের সেই একই বাসনা চরিতার্থ করতে। দেহের সেই একই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষার মাঝে কোন অনিচ্ছাকৃত ইচ্ছার পূরণ সৃষ্টি হলেই লাগে সংঘাত—ওসমান সেই অন্যায়ের আশ্রয় নিয়েছিল। সে বোধ হয় আর নিজের প্রবৃত্তি দমন করতে পাচ্ছিল না বলে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাইছিল। আনার বার বার ওসমানের অন্যায় আচরণ ক্ষমা করতে চাইলো কিন্তু মন তার কিছুতে সায় দিল না।

মন যখন তার সায় দিলো না তখন সে দিশেহারা হয়ে চীৎকার করে বলতে চাইলো—যদি তাকে ক্ষমা না করা যায়, তাহলে এই যাত্রা শেষপর্যন্ত সার্থক হয়ে উঠবে কেমন করে? সে এই নিরুপায় বিরুদ্ধবাদী মনের জন্যে আল্লার কাছে প্রার্থনা জানালো—আল্লা, আমার মধ্যে ক্ষমার আশ্রয় দাও, নাহলে আমার এই শুভ ইচ্ছা পূরণ হবার পথে বিঘ্নের সম্ভাবনা। ওসমান যদি আমার কাছ থেকে অবহেলা পায়, তাহলে সে নিজস্ব ইচ্ছাকে প্রসারিত করবে। এমন কি সে হয়ত এই দুর্গমস্থানে তাকে ফেলে দিতে চলে যাবে।

এই দুর্গমস্থানে তাকে নির্বাসিত করে চলে যেতে পারে!—এই চিন্তা করে আতঙ্কে আনারের চোখে আবার জল দেখা দিল। তার দুটি অপলক চোখের কোল বেয়ে অশ্রুবিন্দু গালের প্রান্ত ভিজিয়ে ঘাসের জাজিমের ওপর পড়তে লাগলো। এই কিছুক্ষণ আগে এক সৈনিক বলপূর্বক তার ইজ্জত হানি করতে চেয়েছিল—তার জন্যে তার মধ্যে যত-না হাহাকার সৃষ্টি হয়েছিল, এই নির্বাসনের কথা চিন্তা করে তার মধ্যে ততবেশী যাতনার সৃষ্টি হল। সে তাই তাড়াতাড়ি সভয়ে সে স্থান ত্যাগ করে যেখানে তাঞ্জাম রক্ষিত ছিল, সেখানে গেল। দ্রুত সে গেল কারণ যদি পেটিকাটি উদ্ধার করতে না পারে?

দেখলো তাঞ্জামটি একপাশে অবহেলায় পড়ে আছে। সেখানে আর কেউ নেই। আনার চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলো—কাছাকাছিও কেউ নেই। তাঞ্জাম বাহকেরা

' কোথায় গেল, একবার চিন্তা করবার চেষ্টা করলো কিন্তু চিন্তা তার বেশীদূর এগোলো না বলে সে সেখানেই তাকে স্থগিত রেখে তাঞ্জামের দরজা খুলে ফেললো ; খুলে তার মধ্যে প্রবেশ করে পেটিকাটি দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্তে তা থেকে বসন বের করে পরিধান করলো তারপর আবার তাঞ্জাম ত্যাগ করে পূর্বস্থানে ফিরে গেল।

সেখানে গিয়ে সে ঘাসের পুরু গালিচার ওপর ক্লান্তদেহে বসে পড়লো। দেখতে লাগলো প্রাণভরে জ্যোৎস্নার অপরূপ আলো। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে মন থেকে মুছে দিয়ে সে চোখের সামনে বিশাল নীলাভ আশমানের মাঝে রত্নখচিত নক্ষত্ররাশির দিকে তাকিয়ে থাকলো। মনে মনে বললো—'দুঃসাহসিক জীবনের আবর্তে যখন মৃত্যু লিখিত আছে, তখন এই রাত্রি, এই আশমান, এই জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য উপভোগ করা ভাল। এমন আশমানের দেখা বাদশাহী হারেমে কখনও মেলে নি। জাফরী কাটা সেই ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে যেটুকু আশমানের দেখা মিলতো, তাতে মন তৃপ্ত হত না। সেই দেখা আর এই দেখায় অনেক তফাৎ।' এই বলে আনার সেই জ্যোৎস্না ভরা আশমানের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকলো। প্রাণভরে সুধার মত জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ আলোক ধারা গ্রহণ করে কিছুক্ষণ আগের ঘটনা চিরতরে ভুলতে চাইলো। ভুলতে চাইলো দুষ্ট মনের অনেক অন্যায় চিন্তা। মনের বিভিন্ন স্তরে যে সব সঙ্গীতের সুর বিভিন্ন মুহূর্তে কাব্য সৃষ্টি করে রেখেছিল, এই মুহূর্তে আনার তাদের আসবার দরজা মুক্ত করে দিল। পাহাড়ের কোল বেয়ে সেই ঝরণাধারা ও তার সুর রাত্রির স্তিমিত অবস্থায় আরো প্রচণ্ড হয়েছিল, সৃষ্টি করেছিল আরো মনোরম পরিবেশ। আনার সেই মনোরম পরিবেশে সমস্ত ক্লান্তি ভুলে গিয়ে নাচবে বলে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু তাকে তখন বাধা দিল একখণ্ড মেঘ।

একখণ্ড মেঘ চন্দ্রের অপরূপ সৌন্দর্যময় অবয়বের ওপর আবরণ সৃষ্টি করতে সমস্ত প্রান্তর জুড়ে হঠাৎ অন্ধকার নেমে এল। আনার নাচবে বলে পায়ের গোড়ালি তুলে হাতে মুদ্রা সৃষ্টি করেছিল কিন্তু অন্ধকারের ঐ ভীষণ জল্লাদের মূর্তি দেখে সে আতঙ্কিত হয়ে দু'চোখে হাত চাপা দিয়ে ঘাসের জাজিমের ওপর মুখ লুকোলো। অনেকক্ষণ সে সভয়ে দুই হাঁটুর মাঝে মুখ লুকায়িত করে বসে থাকলো, আবার চন্দ্র প্রকাশমান হতেও সে ভয়ে মুখ তুললো না। মুখ তুললে পাছে চন্দ্র আবার মেঘের মধ্যে লুকোয়, এই ভয়ে সে সেই অবস্থায় চুপ করে থাকলো। এমনি করে দীর্ঘ সময় থাকতে থাকতে এক সময় কখন তার চোখে নিদ্রা এসে তাকে সেই ঘাসের ওপরই শুইয়ে দিল, সে তা জানে না। একে বাদশাহী হারেমের সুখ তিমিরে বিলাসের পঙ্কে লালিত পালিত দেহ, বহুদিন কোন পরিশ্রম শরীরে পড়ে নি, আর পড়লেও আজকের মত পরিশ্রম কোথায়? সেই দেহে যখন নিদ্রা এসে ভর করে ক্লান্তির

মাঝে চেতনা কেড়ে নিল, তখন কোথায় থাকলো আনারের ইজ্জত, আর কোথায় থাকলো তার নিরাপদ আশ্রয়ের চিন্তা!

ঝরণার কোলে পাহাড়ের বিরাট দেহের অন্তরালে মোগল বাদশাহের কঠিন অবরোধ ঘেরা হারেমের এক খুবসুরত জোয়ানী আওরত সমস্ত ইজ্জতের প্রহরা বিনষ্ট করে শুয়ে আছে কোন এক অজানা জায়গায়, ঘাসের মখমল শয্যায় একান্ত অসহায়ের মত। ওসমান না হয় ভীরু কাপুরুষের মত লজ্জায় পালিয়েছে, তাই বলে কি আর কোন পুরুষ সেখানে নেই? তাদের শরীরে কি পুরুষের রক্ত নেই? কেউ কি পারবে না এই অবসরে ঐ প্রস্ফুটিত কুসুমপ্রসূনের মত একটি রক্তগোলাপের তনুশোভা লুণ্ঠিত করে আপন বক্ষের সীমায় রেখে উত্তাপের বলয় পরাতে?

আছে তো ঐ টিলার পেছনে কতকগুলি অশ্বের পাশে উপবেশন করে সৈনিক-পুরুষরা। ওসমান না হয় পালিয়ে গিয়ে কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে, তাই বলে কি ঐ সৈনিকরাও কাপুরুষ? এ অন্য কেউ বিশ্বাস করলেও করতে পারে কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের একটি প্রাণীও করে না। কারণ সকলে জানে সৈনিকদের জীবন আকাশের বুকে জাগা একটি নক্ষত্রের মত। ওরা যেমন উজ্জ্বল হয়ে জেগে ওঠে, তেমনি এক যুদ্ধের পর ওদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। লক্ষ লক্ষ সৈনিকের মধ্যে হাজার হাজার কোথায় মিলিয়ে গেল, তার হিসাব আর কে রাখে? তাই সৈনিকরা তাদের এই অল্পক্ষণের জীবনকে পূর্ণ করে তোলবার জন্যে সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙে মাঝে মাঝে বেওয়ারিশ জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অবশ্য তার জন্যে শাস্তিও তাদের তৈরী থাকে কিন্তু তবু যেন তারা বেপরোয়া।

তাই সৈনিকরা বেপরোয়া হয়ে জোয়ানী আওরতের সন্ধানে ইতস্তত: দৃষ্টি সঞ্চালন করতো অবশ্য মিলতো না বড় একটা। কারণ এ সব ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের কড়া শাসন সর্বদা রক্তচক্ষু বের করে তাদের বশে রাখবার চেষ্টা করতো। তবে শাসনের বাইরেও তো ফাঁক ছিল, তাই মাঝে মাঝে সৈনিকদের বীরত্বের ইতিহাসও চারিদিক মুখরিত হয়ে প্রচারিত হত। সকলেই জানে, সৈনিকরা একবার বাগে পেলে হয়। চরিত্র যাদের নেই, জীবন যাদের ক'দিনের—তাদের কাছ থেকে ভাল ভাল চিন্তা আশা করা একেবারেই অন্যায়। সৈনিকদের সম্বন্ধে এসব কথা নতুন নয়, তাই বিশেষ ব্যাখ্যারও প্রয়োজন নেই।

ঐ টিলার পাশে যারা অবস্থান করছিল, তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে এ যাত্রাও আনার বেঁচে গেল, নয়ত কি হত বলা মুস্কিল! সারাদিনের একনাগাড়ি পথশ্রম, তারপর এতটুকু বিশ্রাম নেই, আহারও কিছু জোটে নি, সুতরাং টিলার পায়ে শুয়ে থাকা সৈনিকদের দোষ কোথায়? তবু তাদের মধ্যে কেউ না কেউ হয়ত জেগে থেকে ঘাপ্‌টি মেরে থাকতো কিন্তু ওরা জানতো যাকে তারা শাহজাদা খুরমের কাছে নিয়ে যাচ্ছে, সে আওরত শাহাজাদার সম্পত্তি, আর তিনি যদি না গ্রহণ করেন, তবে তাদের সর্দার ওসমান খাঁ করবে।

সেই চিন্তা করেই তারা হাল ছেড়ে দিয়ে পরম নির্ভরতায় ঘুমের কোলে ঢলে

পড়েছিল।

সমস্ত প্রান্তর জুড়ে যখন ঘুমের নিঝুমতা—তখন একবার উপস্থিত আনারের অবস্থাটা চিন্তা করা যাক্।

আনার ঘুমচ্ছে। আচ্ছা সে কি সত্যি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমচ্ছে? না, তাকে কেউ জোর করে সেরাজী পান করিয়ে দিয়েছে? সেরাজী পানের নেশায় নিঝুম হয়ে তার রমণীতনুর কোষে কোষে ঘুমের ঢল নেমেছে। সে হয়ত বার বার চেষ্টা করেছিল নিজেকে জাগিয়ে রাখবার কিন্তু দেহের ঐ অসহনীয় অবস্থাই তাকে ঐ অসহায়ার মত মাটিতে শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। যেন ছোট্ট একটি গোলাপী পুষ্পস্তবক চন্দ্রের সুষমায় বিধৌত হয়ে ঝরণার গীত শুনতে শুনতে আবেশে চোখ মুদে শুয়ে পড়েছে। হয়ত আনার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভাবছে সে শুয়ে আছে সম্রাজ্ঞীর প্রহরাধীনে হারেমের মখমল বিছানো সুকোমল শয্যায় অগুরু ও কস্তুরী সুবাসের ঘ্রাণ নিতে নিতে। তার মাথার কাছে জাফরীকাটা গবাক্ষের ভেতরে চন্দ্রের জ্যোৎস্নাধারা বিধৌত করেছে তার অপরূপ তনুসম্ভার। মলয়-হিল্লোলে গুলাববাগের সুবাস সুগন্ধ মিশ্রিত হয়ে তার কক্ষপূর্ণ করে দিয়েছে।

আনার কি ঠিক এ কথাই ভাবছে, এই উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝে একা অসহায়ের মত শুয়ে শুয়ে? কে জানে সে কি ভাবছে? তবে তার ক্লান্ত দেহের আর কোন চঞ্চলতা নেই, সম্পূর্ণ নিথর একটি রমণী দেহ সেই ঘাসের উপর একান্ত অবহেলাভরে পড়ে আছে। যদি তার একবারও ঘুমটি কোনক্রমে ভেঙে যেত, তাহলে সে কোথায় শুয়ে আছে চিন্তা করেই লাফিয়ে উঠতো। এবং লাফিয়ে উঠেই আতঙ্কিত হয়ে নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করে দিশেহারা হয়ে যেত।

যাই হক, সমস্ত রাত্রি এমনি নিতান্ত ঘটনাহীন হয়েই মুহূর্ত অতিবাহিত হল, আনার ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেল শয়তানের হাত থেকে একান্ত অক্ষত শরীরে।

ভোরের আলো তখনও ফোটেনি। সবে চন্দ্রিমা তখন আস্তে আস্তে মেঘের বুকে লুকোচ্ছিল। প্রভাতের ফিকে আলো সবে পাহাড়ের মাথার মুকুটে আলো দিয়েছে। পাখীরা প্রভাতের আবির্ভাব মুহূর্ত ঘোষণা করতে শুরু করেছে। দুনিয়ার প্রকাশ আবার অন্ধকারের ভেতর থেকে মুখ বের করে আস্তে আস্তে হাত পা মেলতে শুরু করেছে। সাইপ্রাস, দেবদারু, বটবৃক্ষের পত্রপল্লবিত দেহের অস্তিত্ব আবার সপ্রকাশ হয়ে বাতাসের মৃদুস্পর্শে আন্দোলিত হচ্ছে।

যখন এমনি এক শান্ত কমনীয়তার সৃষ্টিতে ভোরের পরিবেশ স্নিগ্ধ ও মধুর, হঠাৎ চতুর্দিক প্রকম্পিত করে বহু অশ্বখুরের প্রচণ্ড শব্দ উত্থিত হল। যেন মনে হল কোন দেশের কোন রাজা তাঁর বিশালবাহিনী নিয়ে ছুটে আসছে এইদিকে। বাতাসে তাই

হতে লাগলো গুম গুম শব্দ। পাখীরা একমনে বৃক্ষের ডালে বসে সঙ্গীতের জলসা বসিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ প্রভাতের গান গাইছিল! তারাও এই শব্দে আতঙ্কিত হয়ে সভয়ে এ ডাল থেকে অন্য ডালে, এ বৃক্ষ থেকে অন্য বৃক্ষে উড়ে গিয়ে আশমানের অনেক উঁচু দিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো।

অশ্বখুরের শব্দ আরো কাছে আসতে লাগল। আরো আরো অনেক কাছে। আনার তখনও ক্লান্তিতে ঘাসের ওপর শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছিল। তার মুখের ওপর পড়েছিল প্রভাতী আলো। হঠাৎ তারও কানে গেল সেই শব্দ। আচমকা তার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে যেতে সে দেখলো প্রভাত আলোর বর্ণাঢ্য। তারপর কোথায় শুয়েছিল সেই কথা চিন্তা করে অবাক বিস্ময়ে সে উঠে দাঁড়ালো।

কিন্তু আর সে ভাববার অবকাশ পেল না। সামনে এসে দাঁড়ালো ভীমদর্শন আকৃতির এক সৈনিক-পুরুষ।

আনার তাকে দেখে চিনলো, রহমান। রহমান ওসমানের নিজস্ব অনুচর।

আনারের কিছু জিজ্ঞাসার আগেই রহমান দারুণ উত্তেজনায় বললো—বিবিসাহেব, আর বিলম্ব করলে বাদশাহী সৈন্যের হাতে ধরা পড়তে হবে। এখুনি হয়ত তারা এসে পড়বে। দেখছেন না, কত সহস্র অশ্বখুরের শব্দ প্রচণ্ড হয়ে উঠছে!

আনার কিন্তু কোন উত্তেজনা প্রকাশ করলো না, সে সংযত হয়ে বললো—বেশতো, তোমরা পালিয়ে যাও—আমার জন্যেই তো ওরা আসছে, আমাকে পেলেই ওরা চলে যাবে।

রহমান অস্থির হয়ে বললো—গোস্তাখি মাপ করুন বিবিসাহেব, এ কখনও হয় না। সর্দারের কাছে আমি কবুল করেছিলুম, আপনাকে পৌঁছে দেব।

তোমার সর্দার কোথায় রহমান?

রহমান মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, সে তা জানে না। তবে সর্দার কাছাকাছি আছে এ সে বলতে পারে।

আনার রহমানের কথায় শুধু হাসলো, কোন কথা বললো না। তার কানে গেল হাজার হাজার অশ্বখুরের শব্দ। ঊর্ধ্বশ্বাসে যে হাজার হাজার সৈন্য তাকে ধরতে ছুটে আসছে, আর সে সৈন্য প্রেরণ করেছেন সম্রাট নয়, সম্রাজ্ঞী, সেই কথা ভেবে সে হাসলো। সম্রাজ্ঞী কিসের জন্যে তাকে হারেমের সুখতিমিরে ধরে রেখেছিলেন বোঝা যায় না, তবে আনার পালিয়ে গেলে যে তাঁর ক্ষতি—এই বাহিনী প্রেরণেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আনার সেই জন্যেও আবার হাসলো। মনে মনে বললো—মন্দ কি সম্রাজ্ঞীর কাছে তার মূল্য যে অনেক বেশী - আজকের এই বিরাট ফৌজ প্রেরণেই তাতে বোঝা যায়। আর এই বাহিনীর অধিনায়ক যে আবেদীন সে কথাও তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। পথিমধ্যে আবেদীন দেখেছিল তাদের। কিন্তু তখন বুঝতে পারেনি যে তার শীকার পলায়ন করছে। তারপর প্রাসাদে ফিরেই যখন শুনলো, তখন সম্রাজ্ঞীর কাছে সর্ববৃত্তান্ত বলে তাঁর কাছ থেকে আনারের উদ্ধারের আদেশ চেয়েনিল। তারপর সম্রাজ্ঞী বাদশাহী হুকুমের পরওয়ানা জারি করে আবেদীনকে সহস্র

সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক করে আবার আনারকে প্রাসাদে ফিরিয়ে আনার জন্যে পাঠালেন। আর আবেদীন মনের মধ্যে হঠাৎ লোভের রঙমহল তৈরী করে আনারকে সেখানে বসাবার আশায় অশ্ব ছুটিয়ে দিল।

আনার মনে মনে আবার বললো—এর আর ভুল নেই। জৈন-উল আবেদীনই আসছে এক বিরাট ফৌজের অধিনায়ক হয়ে। সুতরাং পালাতে হবেই।

হঠাৎ সে আর নিজেকে চিন্তার অবকাশ না দিয়ে অস্থির হয়ে বললো কোথায় লুকোবে সৈনিক? ফৌজ তো কাছেই এসে পড়লো?

রহমান বললো—কোন ভয় নেই, সামনে ঐ পাহাড়ে ভেতরে এক দুর্গম গিরিগুহা আছে, তারমধ্যে একবার ঢুকতে পারলেই আর শাহীফৌজ আমাদের সন্ধান পাবে না।

তাহলে তাই চলো।

বলার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ রহমান 'গোস্তাখি মাপ করবেন বিবি' বলে আচমকা আনারের একটি হাত সবলে ধরে ছুটতে লাগলো পাহাড়ের গিরিপথ ধরে। অসমতল গিরিপথ দিয়ে ছুটতে ছুটতে আনারের সুন্দর পা দুটি রক্তাক্ত হয়ে উঠলো। সে মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগলো। যন্ত্রণায় তার মুখখানি নীল হয়ে উঠলো। একসময় সে কঠিন পাথরের ওপর ঠোক্কর খেয়ে লুটিয়ে পড়লো গিরিপথের অমসৃণ ভূমিতে।

কিন্তু তখন আর ভাবনার সময় ছিল না, ওদিকে বাদশাহী ফৌজ ভাগে ভাগে বিভক্ত হয়ে সমস্ত পাহাড়ের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। রহমান সেই উঁচু অংশ থেকে দেখতে পেল, একদল অশ্বারোহী তাঞ্জামখানি ভেঙে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিল। একদিকে আগুনের লেলিহান শিখা, প্রচণ্ডভাবে ধূম নির্গত হয়ে আশমানের প্রভাত স্নিগ্ধতা কালিমারণ করছে, অন্যদিকে সেই অগ্নিপ্রদাহের দিকে তাকিয়ে বাদশাহী সৈন্যের উল্লাসধ্বনি। উল্লাসধ্বনি শ্রুত হয়ে আনার শিউরে উঠে আবার দাঁড়াবার চেষ্টা করলো, তারপর যখন পারলো না তখন হঠাৎ পরিশ্রমে, যন্ত্রণায়, ধরা পড়বার ভয়ে ভীত হয়ে চীৎকার করে বললো রহমান আর বিলম্ব কর না। আমাকে তুলে নিয়ে গিরিগুহার পথে ছুটে চলো, না হলে এ উন্মত্ত সৈনিক-দের হাতে পরিত্রাণ নেই।

রহমান এই অবস্থায় এই ধরনের একটি উপায় চিন্তা করছিল কিন্তু মেহমান আওরতের সম্মান ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে সে কিছু করতে সাহস পাচ্ছিল না। আনারের চীৎকারে সেই উপায়টি পেশ করতে রহমান দ্বিধা করলো না, আনারের সুকোমল তনু দুই বলিষ্ঠ হাতের মধ্যে স্থাপন করে সে দৈত্যের মত সেই গিরিগুহার দিকে ছুটলো। আনার যন্ত্রণায় মুখখানি বিকৃত করে সেই শূন্যে চড়ে রহমানের হাতের মধ্যে তার প্রাণটি ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজে থাকলো।

পথ খুব কম নয়। গিরিপথের চড়াই উৎরাই ভেঙে ভেঙে ছুটে চলতে চলতে রহমান বার বার বাধা পেতে লাগলো। অমসৃণ পথ, আগাছা জঙ্গল, লতাপাতার

বাধা অতিক্রম করে চলতে গিয়ে রহমানকে বার বার থমকে দাঁড়াতে হল। এদিকে দূর থেকে ভেসে আসতে লাগলো সৈন্যদের অহেতুক উল্লাস। বাদশাহের জয়ধ্বনি। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের জয়ধ্বনি। তাদের জয়োল্লাসেতে মনে হল, তারা বুঝি কৃতকার্য হয়েছে, ধরে ফেলেছে বিশ্বাসঘাতক দলটিকে।

রহমান এদিকে ছুটতে লাগলো আর মাঝে মাঝে পেছন ফিরে দেখতে লাগলো পাহাড়ের তলদেশের দিকে চেয়ে। সূর্য তখন পাহাড়ের ওপর উঠে তার সোনার বর্ণ বিকিরণ করেছে। সেই সূর্যের রশ্মিশোভায় রহমান দেখলো, সৈনিকদের উন্মুক্ত তরবারীগুলি সূর্যের আলোয় দ্যুতি ছড়িয়েছে। তাছাড়া ফৌজের রকমারী পোষাকের ওপরও জৌলুষের ছড়াছড়ি।

আনার এদিকে চোখ বুজিয়ে আল্লার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছিল, তার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। সে দারুণ ভয়ে কণ্টকিত হয়ে ভাবছিল যদি এ যাত্রা না পলায়ন করতে পারে তাহলে নির্ঘাৎ ধরা পড়তে হবে। তারপর ধরা পড়লে তার নসীবে কি কি পুরস্কার জুটবে, তারও হিসাব মনে মনে করছিল। হিসাব তা আগেই করা ছিল, সেই হিসাবের চিত্রগুলি সেইমুহূর্তে আবার তার মনে এল। মনে আসতে তার চোখে শ্রাবনের ধারা বইলো আরো প্রবল বেগে।··সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান লাবণ্য শোভায় উজ্জ্বল মুখশ্রী নিয়ে হঠাৎ দুটি সুন্দর চোখে বিদ্বেষের অগ্নি জ্বালবেন, তারপর ···না না এ অসম্ভব! তার চেয়ে মৃত্যুও অনেক সুখের। ঐ রাজপ্রাসাদে অপরাধিনীর মত প্রবেশের আগে ধরা পড়বার মুহূর্তে মুসলমান আওরত চিরতরে প্রাণবিসর্জন দেবে। জৈন-উল আবেদীন তার ভোগের চক্ষুদুটি লোলুপ করবার আগেই সে ঢলে পড়বে চিরনিদ্রার কোলে। সে তো বীর পিতা ইব্রাহিম খাঁর কন্যা, তার কি এমনি আত্মসমর্পণ করা শোভা পায়?

হঠাৎ শূন্যের অবস্থান তার শেষ হয়ে গেল। চেয়ে দেখলো সে একটি অন্ধকার গিরিগুহার মধ্যে। সামান্য একটু আলো পাশের একটি ছোট্ট ফোকর দিয়ে এসে গুহার অন্ধকার রাজ্য একটু স্পষ্ট করেছে। গুহার মধ্যে অনেক লোক। তাদের চাপাস্বরের কথাবার্তা শুনতে পেল আনার। সামনে রহমান দাঁড়িয়েছিল। সে জিজ্ঞেস করলো, রহমান, এখানে কি সকলেই এসে আস্তানা নিয়েছে?

রহমান মাথা নাড়লো কিন্তু কোন কথার উত্তর দিল না।

আনার আবার জিজ্ঞেস করলো—এ জায়গাটি কি নিরাপদ?

রহমান মাথা নেড়ে বললো—হ্যাঁ। তারপর একটু দম নিয়ে চাপাস্বরে বললো—শুধু নিরাপদ নয়, এ আস্তানার ঠিকানা পাওয়া অন্য কারো কাছে খুব সহজ নয়! আমাদের এই গিরিগুহাটির সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা ছিল বলেই গতরাত্রে আমরা এখানে আস্তানা করতে সাহসী হয়েছিলাম। কারণ আমরা জানতাম, হয়ত শাহীফৌজ ভোররাত্রি নাগাৎ এখানে এসে পৌছবে। বাইরে থেকে এই গুহাটির কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। দীর্ঘদিন ধরে ফৌজ যদি এই গুহাটির সন্ধান করে, তবে শুধু তাদের পরিশ্রমই হবে, মিলবে না কোন সন্ধান।

হঠাৎ রহমানের কথা বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে একাধিক ভারী পায়ের শব্দ তাদের কথাবার্তা শোনা গেল।

আনার বসেছিল হঠাৎ এই অবস্থায় আতঙ্কে উঠে দাঁড়ালো।

তারপর সমস্ত পাহাড়ের প্রস্তরময় কক্ষে প্রতিধ্বনি তুলে চীৎকার উত্থিত হল—যেখানে যে আছো সেখান থেকে বের হয়ে এসো, না'হলে প্রাণ বাঁচানোর শক্তি থাকবে না।

কিছুক্ষণ আবার নিস্তব্ধতা।

আবার প্রচণ্ড হল তরোয়ালের আঘাত। অনেক জন সৈনিক এলোপাথারি তরোয়ালের আঘাত করতে লাগলো পাহাড়ের গায়ে। শব্দ হতে লাগলো বিশ্রীভাবে—ঝন্ ঝনাৎ। ঝন্ ঝনাৎ।

আনার দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো সেই শব্দ শুনতে শুনতে। পাহাড়ের গায়ে যে তরোয়ালের বিশ্রী শব্দ হচ্ছিল, আনারের মনে হল সে শব্দ তার অন্তঃস্থল ভেদ করে বের হচ্ছে। আর তরোয়ালের আঘাত পাহাড়ের বুকে হচ্ছে না, কে যেন তার বুকের ওপর হাজার হাজার তরোয়ালের আঘাত হানছে। রক্ত পড়ছে সমস্ত দেহ চুঁইয়ে।

বাইরে থেকে আবার জলদ-গম্ভীর কণ্ঠস্বর ছুটে এল—বিদ্রোহী সৈনিক, তোমাদের সঙ্গে যদি আনার নামে কোন আওরত থাকে, তাকে ফেরত দিলেই তোমাদের মুক্তি। যদি কোন শাস্তি না পেতে চাও, তাহলে সেই বেইমান আওরতকে দিয়ে নিজেদের মুক্তি ফিরিয়ে নাও।

গুহার মধ্যে অনেকগুলি চোখ একসঙ্গে আনারের দিকে তাকালো। আনারের ভয় কাতর শুষ্কমুখ। ব্যাকুল দুটি চোখের দৃষ্টি সমস্ত চোখগুলির মাঝে বুলিয়ে তারপর সে মাথা নত করলো। মনে মনে সে শঙ্কিত হল বাইরের ঐ কণ্ঠস্বরের অর্থ বুঝে। সে কণ্ঠস্বর যে জৈন-উল আবেদীনের—তাও সে বুঝলো। আর আবেদীন যে ছলের আশ্রয় নিয়ে সৈনিকদের লোভ জাগাচ্ছে, তাও বুঝলো। আবেদীন বলতে চাইছে এত বিরাট ফৌজ নিয়ে ছুটে আসা শুধু একটি আওরতের জন্যে। তার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। কথাটা হয়ত স্পষ্ট। কিন্তু সেই প্রলোভনে ভুলে যদি সৈনিকরা নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য তাকে বাইরে ঠেলে দেয়, তাহলে তারাও নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে পারবে না। জৈন-উল আবেদীনের মতো ধূর্ত স্বভাবের সেনাপতিকে যারা চেনে তারা নিশ্চয় এই ফাঁদে পা দেবে না।

কিন্তু আনার সেই মুহূর্তে আর একটি কথাও ভাবলো—তার জীবন যদি উৎসর্গ করে এতগুলি সৈনিকের প্রাণ বাঁচে, মন্দ কি? সামান্য এক আওরতের জীবন। আওরতের মূল্য আর কি? এরকম বহু আওরতই বাদশাহের হারেমের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে দিনরাত রোরুদ্যমানা হয়ে আছে। মাসের মধ্যে কত আওরতই তো কত রকমের মৃত্যুকে বরণ করছে। আনার না হয় সেইরকম কিছু একটা ভাববে। তবু তো অনেকগুলি বীরের প্রাণ বাঁচবে। আর তাছাড়া তারই জন্যে কতকগুলি সৈনিক মৃত্যুকে তুচ্ছ করে এগিয়ে এসেছে, এখন তারই কর্তব্য সেই সব সৈনিকদের

বাঁচানোর। আনারের মনে হঠাৎ স্বার্থত্যাগের ইচ্ছা জেগে উঠলো এবং নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে বহুজনের প্রাণ বাঁচানোব আগ্রহ জেগে উঠলো। হঠাৎ সে সমস্ত কাতর চোখগুলির দিকে তাকিয়ে রহমানের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে সংযত-কণ্ঠে বললো—রহমান, আমাকে গুহার বাইরে পাঠিয়ে দাও। কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গে তার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। সে তাড়াতাড়ি ওড়নার প্রান্তভাগ দিয়ে চক্ষুদ্বয় মুছে নিজেকে প্রকৃতস্থ করার চেষ্টা করল।

রহমান হঠাৎ আনারকে কথা বলতে নিষেধ করে হাত নেড়ে ইসারায় বললো—চুপ, ওরা ঐরকম প্রলোভন দেখিয়ে আমাদের বন্দী করতে চায়, আসলে ওরা বুঝতে পারছে না আমরা আদতে কোথায় আছি। যাই হক, এখন কথা না বলে ওদের পরবর্তী কর্মধারা অনুসরণ করতে হবে; তবে এ কথা ঠিক—ওরা হাজার চেষ্টা করলেও এই গুহার সন্ধান পাবে না।

তারপর রহমান সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে হাত-পা নেড়ে ইসারায় বললো—তোমরা কোন অস্থিরতা প্রকাশ কর না। এখন কতদিন এই মৃত্যু গুহার মধ্যে অবস্থান করতে হবে জানি না। তবে কয়েকঘণ্টা অপেক্ষা কর, দেখবে শাহী ফৌজ আমাদের সন্ধান না পেলে অযথা এখানে বসে না থেকে চলে যাবে। তোমরা তো জানোই শাহীফৌজের অভিযান!

সঙ্গীদের মধ্যে থেকে একজন শুধু পেট ও মুখ দেখিয়ে বললো—খাবো কি? খানাপিনা না হলে মানুষ বাঁচে?

রহমান হেসে বললো—একটু ধৈর্য ধর, ওরা চলে গেলেই একটি সুমিষ্ট ফলের আস্বাদ পাবে। এই পাহাড়েরই একটি কোণে সুপক্ক ফলের গাছ আছে, সেই গাছে যে কটা ফল আছে তা দিয়ে আমাদের ক্ষুধার উপশম হবে।

এই কথোপকথন আবার শুরু হয়ে গেল। আবার একাধিক ভারী পায়ের শব্দ গুহার কাছাকাছি সোচ্চার হয়ে উঠলো। আবার তাদের তরবারীর আঘাত পাহাড়ের বক্ষে শব্দ করতে করতে এগিয়ে চললো। যেন বাইরে দক্ষযজ্ঞ হতে লাগলো, এমনি নানাবিধ শব্দ হতে থাকলো। কোন সময়ে শব্দ হল প্রচণ্ড, কোন সময়ে স্তিমিত। আবার সব চুপ। আবার হঠাৎ হৈ হৈ করে শব্দ জেগে উঠতে লাগলো।

যখন শব্দ প্রচণ্ড হয়ে উঠলো, আনার আতঙ্কে কণ্টকিত হয়ে ভাবলো—এই বুঝি তারা গুহাটির সন্ধান পায়! সে মনে মনে এও বিস্ময়ে ভাবছিল, এই গুহার অস্তিত্ব কিরকম অবস্থায় লুকায়িত আছে, যার জন্যে ধূর্ত, কৌশলী শাহীফৌজও তার সন্ধান পাচ্ছে না? এই অবস্থায় তার বারবার মনে পড়তে লাগলো ওসমানকে। ওসমানেরই হাতের সৃষ্টি এই অনুচরবৃন্দ। রহমান তার একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর। রহমান যা সম্ভব করলো ওসমান থাকলে আরো কত বেশী করতো? অথচ সেই ওসমান এক সামান্য রমণীদেহের প্রতি লুব্ধ হয়ে তার নিজের বীরত্ব হারালো। এক-দিকে যেমন নিজের লোভাতুর দেহের জন্যে বিতৃষ্ণা জাগলো, অপরদিকে ওসমানের পলায়নের জন্য দুঃখ সৃষ্টি হল। ওসমান কাছে থাকলে এতটা ভয় নিশ্চয় জাগতো না।

ওসমানের বীরত্বের ওপর তার বিশ্বাস ছিল। আর বিশ্বাস হয়েছিল বলেই অতো সৈনিকদের মধ্যে সে ঠিক লোকটি চিনে নিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বিশ্বাস তার থাকলো না। ওসমান সুযোগের নাগপাশে পড়ে গ্লানি নিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলো। সেই মুহূর্তে ওসমানের জন্যে আনাবের বার বার দুঃখ জাগতে লাগলো।

আনার তারপর সেই গুহার ভূমিতে বসে পড়ে তার ক্ষত পা দুটিতে হাত বুলোতে লাগলো। এতক্ষণ দুটি পায়ের এই ক্ষতাংশ সে ভুলেছিল। যন্ত্রণা ছিল বটে কিন্তু সে যন্ত্রণার চেয়ে প্রাণের যন্ত্রণাই তার বেশী হয়েছিল। এখন প্রাণ বাঁচার স্থিরতা স্বীকৃত হতে তার পায়ের যন্ত্রণাই জেগে উঠলো। দেখলো, দুটি পায়ের ওপর জমাট রক্তের ছোপ। সেই রক্তের দিকে তাকিয়ে তার মনটা হঠাৎ হু হু করে উঠলো। এমন কষ্ট যে তার হবে সে কি আগে ভেবেছিল? আর জানলেও বা করবার তার কি ছিল? ঐ বদ্ধ প্রাসাদের ভেতর উৎকট ঐশ্বর্যের জলুসে অবস্থান করে মনের স্বাতন্ত্র্য তার কোথায় ছিল? প্রতিটি সময় নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে অতিবাহিত করে বার বার মনে হত নিয়ম ভেঙে বেপরোয়া হতে। কিন্তু বিচারের সম্মুখীন হতে বলে সে নিজের খুশী মত হৃদয় মেলে ধরতে পারতো না। তাই মনের মধ্যে শুধু অনিয়মের বাষ্প জমে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে থাকতো।

সেই বাষ্পই কানায় কানায় ভরে উঠে আজ তাকে এই অবস্থার সম্মুখীন করলো। আর সে চলেছে সম্পূর্ণ নতুন একটি পরিবেশে। মনে সেজন্য যথেষ্ট পুলক ছিল, স্বপ্নও যে ভিন্ন ভিন্ন নতুন নতুন চিত্র সৃষ্টি করে তার চিত্ত ভরিয়ে রাখে নি, এ কথা অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল এই অভিযানের পিছনের কষ্ট। সে জানতো যে এত কষ্ট হবে। বিদ্রোহিনী সে হয়েছে নানান কারণে। তবে সবের উপরে মনের মধ্যে ছিল একটি রঙীন স্বপ্নকে সার্থক করতে সুযোগের প্রয়োজন ছিল। সেই সুযোগ হঠাৎ তার জীবনে এসে গেল। শাহাজাদার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র তাকে ঠেলে দিল প্রাসাদের বাইরে। সে আর কোন দুষ্টচিন্তার ওপর ভর করে কোনরকম দ্বিধা করলো না, বেরিয়ে পড়লো অন্ধকার রাত্রির মাঝে ভয়াবহ প্রান্তরের দুঃসাহসিকতাকে দু'পা দিয়ে মাড়িয়ে। তারপর ওসমান, জৈন-উল-আবেদীনের কথাও বার বার মনে পড়লো। এখন এসব সহ্য করে যদি সেই মান্ডুর প্রাসাদে পৌছতে পারে তবেই সার্থক হবে এই কষ্ট।

কিন্তু আর ভাবনা এগোলো না, আনার চমকে উঠলো তৎক্ষণে গিরিগুহার ছাদের ওপর কে যেন পাথর ভাঙতে শুরু করেছে। গুম্ গুম্ করে একটি বিশ্রী শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ওপরে পাথর চাপা ছাদের অংশ থেকে শব্দ ও ধুলো গুহার মধ্যে পড়ে চতুর্দিক ভরিয়ে তুললো। ভেতরের মানুষেরা সেই অবস্থায় দারুণ আতঙ্কিত হয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে গুহার একান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে সরে যেতে লাগলো। ওপর থেকে ছোট ছোট পাথরের ঢেলা গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে পড়তে লাগলো। তারই একটি টুকরো মাথায় পড়লে রক্তের নদী বইবে। ওদিকে ওপরে একসুরে প্রচণ্ডভাবে পাথর সরানোর কাজ চলেছে। বিরাট বিরাট পাথর সরিয়ে তারা জানতে চায়

কোথায় এরা লুকোল্গা! সেই পাথর এক একখানা করে গড়াতে গিরিগুহার মাঝে অবস্থান করা সঙ্গীন হয়ে উঠলো। কিন্তু উপায় কি? এই গিরিগুহা থেকে বের হলেই নির্ঘাৎ মৃত্যু।

হঠাৎ একটি ছোট্ট পাথর গিরিগুহার বিশাল উঁচু ছাত থেকে গড়িয়ে পড়ল একেবারে আনারের মাথার ওপর। রহমান দূর থেকে তাই দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে আনারকে সরিয়ে দিল। পাথরটি মাটিতে পড়ে ঠিক্‌রে গেল কয়েকদিকে। রহমান আনারকে একটি ছোট্ট ঘুলঘুলির মত জায়গা দেখিয়ে সেখানে অপেক্ষা করতে বললো।

আনার সভয়ে আতঙ্কে ঘুলঘুলির কাছে গিয়ে দেখতে লাগলো তার মধ্যে সর্বনাশের দৃশ্য। অন্ধকার গুহার মধ্যভাগ; যেটুকু দেখা যায় তা খুব পর্যাপ্ত নয়। আগাছা জঙ্গলে চতুর্দিক আচ্ছাদিত। সবচেয়ে বেশী দুর্গন্ধে পূর্ণ। কতরকমের বিশ্রী উৎকট গন্ধ যে গুহার মধ্যে আছে, তার হিসাব নেই। সেই গন্ধের অনুভবে মনের মধ্যে বমনোদ্বেগের সৃষ্টি হয়। তবে অনুভব করার কোন ফুরসৎ ছিল না বলে তাই গন্ধের জোরালো সৌরভ ঘুরে ঘুরে শুধু আবর্ত সৃষ্টি করে চলেছিল। বাতাস এতটুকু নেই, আলো আসার পথ মাত্র একটি, ছোট্ট একহাত ফোকর। সেই ফোকরটি এমন ভাবে ছিল যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। সেই আলোটুকুই এ গুহার সম্পদ। যে আলো ও বাতাস ঐ ফোকর দিয়ে আসছিল, তাতেই গুহান্তরের অবস্থানকারীরা কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে অপেক্ষা করছিল, না হলে এখানে প্রবেশ করে লুকিয়ে থাকা খুবই কষ্টকর হত। শ্বাসকষ্টে প্রাণ যেত।

তবু প্রত্যেকেরই নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। একে পথশ্রমে সকলে ক্লান্ত। তার ওপর আহার নেই, নিদ্রা নেই। আহার-নিদ্রা ছাড়া কয়েকদিন বেঁচে থাকার ক্ষমতা সৈনিকের আছে কিন্তু আনার পাচ্ছিল না। সে আরো ক্লান্ত হয়ে কেমন যেন যন্ত্রণার অনেক উর্ধ্বে আরোহণ করেছিল। তার সুন্দর মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। পেটের পাকস্থলী ক্ষিদের জ্বালায় পাক দিচ্ছিল। চোখে নিদ্রার ক্লান্তি নামছিল। কিন্তু নিদ্রা আসবে কি? মরণ-ভয় যখন সম্মুখ, তখন আর কিছুর অভাব বোধ করা সাধ্যাতীত।

মাঝে মাঝে অবশ্য রহমান ফিস ফিস করে সকলকে উৎসাহ দিচ্ছিল। সে উৎসাহে সকলে উৎসাহী হচ্ছিল কিনা বোঝা মুস্কিল তবে আনার হচ্ছিল। আনারের মনে জাগছিল, তারা ধরা পড়বে না। এ যাত্রা তাদের শুভ হবেই। তারা নিশ্চয় গিয়ে পৌছবে মাণ্ডুর প্রাসাদে। শাহজাদা খুররমের কাছে গিয়ে পেশ করবে সেই ষড়যন্ত্রের কথা। তিনি যদি খুশি হন তাহলে সে বলবে—এই দলটিকে উপযুক্ত পুরস্কার দিয়ে তাদের খুশি করুন। এরা অনেক বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে এই অভিযান সার্থক করে তুলেছে।

হঠাৎ আবার প্রচণ্ড চীৎকার ছুটে এল গুহার মধ্যে। সকলে আবার চমকে উঠলো। সবাই শুনলো অশ্বের মর্মভেদী চীৎকার। কারা যেন অশ্বকে হত্যা করছে। একাধিক অশ্ব প্রাণের যন্ত্রণায় ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার জুড়ে দিয়েছে।

এই চীৎকারের মধ্যে রহমান গম্ভীরস্বরে বললো—উন্মত্ত ফৌজ আমাদের না পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্বগুলির প্রাণ সংহার করছে। তারপর সে একটি সৈনিককে জিজ্ঞেস করলো—আবদুল, অশ্বগুলি ঠিক জায়গায় রেখে এসেছিলে তো!

সে মাথা নাড়তে রহমান বললো—হয়ত তারাই তাদের উপস্থিতি জানিয়ে দিয়েছে। অশ্বগুলি গেলে এই অসুবিধে, মাণ্ডুতে পৌছতে বিলম্ব হবে।

কিছুক্ষণ ধরে চললো সেই অশ্বগুলির তীব্র-আর্তনাদ। মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর পশুগুলির চীৎকার যেন মানুষের আর্তনাদকেও ছাপিয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে চললো সেই যন্ত্রণা কাতর আর্তনাদ। গুহার বাইরের সেই ধ্বনি যেন গুহার ভেতরেও ধোঁয়ার সৃষ্টি করলো। সকলে সভয়ে, সেই মরণ-আর্তনাদের রোদনধ্বনি শুনতে লাগলো।

তারপর একসময় সব চুপ হয়ে গেল। কিন্তু থাকলো সেই আর্তনাদের রেশ। সেই মৃত্যুর কাতরতা। মৃত্যুর বীভৎসতা। যেন মৃত্যুর দানবতা চারদিকে তার হাত-পা মেলে ভয়ঙ্কর রক্তময় চক্ষু তুলে সকলকে শাসাতে লাগলো।

গুহার ভেতরে ও বাইরে কোন শব্দের ঐক্যতান নেই। গুহার বাইরে পাহাড়ের প্রান্তরে কি হচ্ছিল জানা নেই তবে গুহার অভ্যন্তরের মানুষগুলি যেন শান্তির মাঝে নিশ্চিন্ত হয়ে পরমক্লান্তির সাগরে ডুব দিল। আনারও ক্লান্তিতে অর্ধচেতন হয়ে পরম আরামে গুহার দেয়ালে ঠেসান দিয়ে চোখ বুজলো।

গুহার ভেতরে যখন এইরকম অবস্থা, তখন গুহার বাইরে বাদশাহী ফৌজের দল শেষ চেষ্টা করে পড়ন্তরৌদ্রের স্তিমিত রোশনাইয়ের মাঝে পাহাড়ের কোলে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা যে উৎসাহ নিয়ে এখানে আগমন করেছিল, এখন সে উৎসাহ অন্তর্হিত হয়ে মুখের ওপর প্রতিফলিত বিষাদের ম্লান ছায়া, অনুৎসাহের কালিমাবর্ণ। ফৌজের অধিনায়ক জৈন-উল-আবেদীন সবার মাঝে মাথা উঁচু করে অশ্বারোহণে সওয়ার হয়ে ভাবছে—সামান্য একটি বিদ্রোহী দলকে সে বন্দী করতে পারলো না? এ মুখ দেখাবে সে কেমন করে? সে যে অনেক গর্ব করে বক্ষস্ফীত করে সম্রাজ্ঞীর কাছে কবুল করে এসেছিল, এখন যদি অকৃতকার্য হয়ে প্রাসাদে ফেরে, তাহলে সম্রাজ্ঞী কি বলবেন? কিছু হয়ত তিনি বলবেন না, তবে যে বিশ্বাস তাঁর মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, সে বিশ্বাস তাঁর চূর্ণ হয়ে যাবে?

আবেদীন আনারের কথাও ভাবলো—সেই খুবসুরত আওরতটিকে এইসময় হাত করতে পারলে তার ইজ্জত লুণ্ঠন করা যেত। হারেমের সম্ভ্রম নষ্ট করে তাকে হাত করার দুঃসাহস আর দেখাতে হত না। কিন্তু কোথায় সে গেল? কোথায় যে তাকে লুকিয়ে রাখা হল, এত চেষ্টা করেও কোন সন্ধান মিললো না? অথচ তাঞ্জামের মধ্যে তার পেটিকা ভর্তি বসন পাওয়া গেল, যে তাঞ্জামখানি অপহৃত হয়েছিল, তাও পাওয়া গেল। সেখানি নষ্ট করে ফেলার জন্যে আগুন জ্বালানো হল। সবই সুষ্ঠুভাবে সমাধা হল। কিন্তু তাদেরই সন্ধান পাওয়া গেল না। সমস্ত পাহাড় তচ্‌নচ্‌ করে, ঝরণার মুখে অযথা কতকগুলি পাথরের টুক্‌রো ফেলে তার গতিরোধ করে শুধু অনিষ্ট-সাধনই হল, মিললো না সেই দুর্বৃত্তদের সন্ধান।

তবু জৈন-উল-আবেদীন আরো সময় ব্যয় করলো। ফৌজ পাঠিয়ে সমস্ত পাথরের বক্ষ বিদীর্ণ করে তাদের সন্ধানের নির্দেশ প্রদান করলো। সৈনিকরা বড় বড় লৌহবলয় দিয়ে পাথর ভেঙে ভেঙে অনুসন্ধান চালালো কিন্তু কোন সন্ধানই মিললো না। তারপর আবেদীনের কাছে একজন সৈনিক এসে নিম্নস্বরে কি বলতে সে আদেশ প্রদান করল—পশ্চাদ্ধাবণ কর।

সারি সারি অশ্বারোহী সৈনিক অশ্বের ওপর সওয়ার হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললো। আবার বাতাসে জেগে উঠলো অশ্বখুরের টগ্‌বগ্‌ শব্দ। সে-সময়ে পড়ন্ত-রৌদ্রের ঝলসানো তাপে ফৌজের পোষাকের জাঁকজমক আশমানের বুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। দীর্ঘক্ষণ ধরে চললো ঊর্ধ্বশ্বাসে অশ্বারোহীর দৌড়। কিন্তু পাহাড়ের তলদেশ, ঝরণার নিচে থেকে সেই অশ্বারোহীর শেষচিহ্ন অপসারিত হতে প্রায় ঘণ্টাবধি কাল সময় লাগলো।

একেই বলে মোগল সাম্রাজ্য। একটি আওরতকে ধরতে পাঠিয়েছে হাজার হাজার ফৌজ। তাহলে সম্পূর্ণ দেশ জয় করতে তারা কত সৈন্য পাঠায়? মোগলদের ঐশ্বর্যের যেমন কোন হিসাব নেই। প্রাচুর্যের মধ্যে অবস্থান করলে হিসাবের কোন খতিয়ান থাকে না, তারই প্রমাণ এই! সে যাই হ'ক। আরো একটি অর্থ মূর্ত হয়ে উঠলো, মোগল ফৌজ কখনও পরাজয় স্বীকার করে ফিরে যায় না। এই ফৌজ ফিরে যেতে বাধ্য হল, কিন্তু জৈন-উল আবেদীনের বীরত্ব এই পরাজয়ের পর বাদশাহের নিয়মে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হল। হয়ত দু'হাজারী সেনাধ্যক্ষ থেকে তার পথ একেবারে সামান্য সৈনিকে পরিণত হবে।



এদিকে ফৌজ অন্তর্হিত হলে গুহার অভ্যন্তর থেকে লুকায়িত সৈনিকরা বেরিয়ে এল। আনারও আবার মুক্তির আশায় মনে বলসঞ্চার করে বাইরের বাতাসে এসে খুশির হিল্লোল ছড়িয়ে দিল।

রহমান অধিনায়কের ক্ষমতা গ্রহণ করে সেই সুস্বাদু ফলের সন্ধানে সেই স্থানে অগ্রসর হল। সেখানে গিয়ে রক্তাভ ফলগুলি পেয়ে সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করে দিল। আপেলের মত রক্তাভ সুস্বাদু ফলের আস্বাদনে সৈনিকদের ক্ষুন্নিবৃত্তি চরিতার্থ হল। আনারও দু'চার টুকরো ভক্ষণ না করে পারলো না। এখনও অনেকক্ষণ যুঝতে হবে বলে সে তাই ভক্ষণ করে পেটের পাকস্থলীর অগ্নিদীপ্তি মন্দীভূত করলো। খেতে খেতে একথাও ভাবলো—এই নাম না জানা বন-ফলের আস্বাদন নিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি চরিতার্থ করতে হচ্ছে বটে কিন্তু এখন হারেমে অবস্থান করলে পাকশালা থেকে কত উপাদেয় খানা তার জন্যে স্বর্ণপাত্রে সজ্জিত হয়ে থরে থরে আসতো। সে যাক্‌গে, এই বনফলের যে আস্বাদন, বর্তমান পরিবেশে—বাদশাহী উপাদেয় খানায় কি সে

পরিতৃপ্তি পাওয়া যেত? আনার তাও মনে করতে পারলো না। তারপর ভাবলো—জৈন-উল-আবেদীনের আজ অবস্থাটা! সে প্রাসাদে ফিরলে তিরস্কারে কণ্টকিত হবে। মোগলরা কখনও কোন কারণে পরাজিত হলে দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এই পরাজয় যে তারা কিছুতে স্বীকার করবে না, তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

আনারও যেমন এমনি কথা ভাবছিল, রহমানও ভাবছিল। তাই রহমান দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যে তৎপর হল। সে সকলকে সঙ্গে করে পাহাড়ের বিভিন্ন গিরিপথ অনুসন্ধান করতে করতে নিচের দিকে নামতে লাগলো। পথিমধ্যে ক'টি রক্তাক্ত অশ্ব মৃতাবস্থায় পড়েছিল। বহু অংশ ঘিরে রক্ত পড়ে রয়েছে। চাপ চাপ রক্তের বীভৎসতায় সেই অংশগুলি ভয়াবহ। তাছাড়া মৃত অশ্বগুলির বীভৎস ক্ষতাংশ দেখে আরো আতঙ্কের সৃষ্টি হল। সেই নারকীয় হত্যা যে অশ্বগুলির অপরাধের জন্যে নয়, তা সকলে বুঝলো। তাই নির্বোধ পশুগুলির জন্যে সকলের অনুকম্পা জাগলো।

কিন্তু এই সময় রহমান বললো—আমাদের যতগুলি অশ্ব ছিল সেগুলির সব হত্যা হয়নি বলেই মনে হচ্ছে, সুতরাং অনুসন্ধান করে বের করতে হবে তাদের। না'হলে এই দুর্গম পথ পদব্রজে অতিক্রম করা সমীচীন হবে না কারণ সমতল ক্ষেত্রের ওপর দিয়ে এবার আমাদের চলতে হবে। বাদশাহী ফৌজ একবার অকৃতকার্য হয়েছে। তারা যে আবার আসবে, এ নিশ্চয়ই অজানা নয়। সুতরাং আমাদের সেই রকম সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। এই বলে রহমান সেই আবদুল্লা বলে সৈনিককে নির্দেশ দিল—তুমি যেখানে বনপাতার ছাউনিতে অশ্বগুলিকে লুকায়িত করে রেখে এসেছিলে, সে-জায়গাটা ভাল করে অনুসন্ধান করে এসো। আমার মাহুত অশ্বটি নিশ্চয় হত হয়েছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া তোমাদেরও এমন দুচারটি শিক্ষিত অশ্ব ছিল যা সহজে শত্রু কর্তৃক ধরা পড়া সন্দেহাতীত।

আবদুল্লা ও তার সঙ্গে আরো কয়েকটি অনুচর অশ্ব-সন্ধানে দ্রুত গমন করলো।

সূর্য তখন অস্তাচলে। সূর্যোদয়ের মুহূর্তে যে ঘটনার শুরু হয়েছিল, সূর্যের বিদায়ের সময় সে ঘটনার পরিসমাপ্তি হল। আবার গোধূলি রাগে নেমে আসতে লাগলো অন্ধকারের কুহেলি। পুরো একটি বেলা শেষ হয়ে গেল নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে। এখনও অবশ্য বাঁচতে পেরেছে কি না সন্দেহ। যতক্ষণ না মাণ্ডুর প্রাসাদে পৌঁছানো যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত ধরা পড়বার ভয় থাকবেই।

তবু যেন কেন অনেক আনন্দ লাগলো আনারের। রাত্রি আবার আসবে। এতগুলি মরদের মধ্যে রাত্রিবাস করা ভয়াবহ। ওসমান সেজন্যে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। তবু তার ভাল লাগলো এইজন্যে যে, সে এইমাত্র ফৌজের হাতে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। এখন অন্ততঃ কিছুক্ষণ আর কোন চিন্তা নেই।

আত্মরক্ষায় জন্যে আবার যদি চিন্তা করতে হয় সে করবে, তবে এই মুহূর্তে সে খুশি হয়ে আনন্দ করবে। ভাল ভাল কথা ভাববে, ভাল ভাল স্বপ্ন দেখবে। শাহজাদা খুররমের কথাই ভাববে। সে যে দারুণ একটা দুঃসাহসের মধ্যে দিয়ে মাণ্ডুতে

পৌঁছেচে যখন শুনবেন শাহজাদা খুরম—তখন যে কণ্ঠের দোদুল্যমান হীরকখচিত কণ্ঠহার আনারকে উপহার দেবেন, এই কথা ভেবেই আনারের মনে পুলক সঞ্চার হল।

হঠাৎ সেই আবদুল তিন চারটি অশ্ব সঙ্গে নিয়ে সেখানে ফিরলো, সঙ্গে রহমানের সেই শিক্ষিত অশ্ব মাহুত। রহমান আর কালবিলম্ব করলো না। অশ্বের ওপর সওয়ার হয়ে বসলো এবং আনারকে তার কাছে সরে আসবার জন্যে নির্দেশ দিল।

আনার ইতস্ততঃ করছে দেখে রহমান সেনাধ্যক্ষের মত গম্ভীরস্বরে বললো—এখন সরম জাগার সময় নয়, মাত্র কটি অশ্ব উদ্ধার করতে পারা গেছে, এর মধ্যেই আমাদের কাজ করে নিতে হবে। মাণ্ডু দুর্গে প্রবেশের পূর্বে তোমার সম্মান রক্ষার্থে আমি তোমাকে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামিয়ে দেব।

আনার দেখলো, সত্যিই এ ছাড়া উপায়ও নেই। এখন যদি যেতে অস্বীকার করে তা আবার বাদশাহী ফৌজের ধরা পড়ার সম্ভাবনা। তার চেয়ে আওরতের যেটুকু সম্মান নষ্ট হল, মাণ্ডুর কাছে গিয়ে তা পুনরুদ্ধার করলেই হবে। তাছাডা মনের মধ্যেই সঙ্কোচের প্রাবল্য, মন থেকে সঙ্কোচ অপসারিত হলে থাকে না কোন মলিনতা। সে আর ইতস্ততঃ না করে রহমানের কাছে সরে গেল, রহমান তুলে নিল তার অশ্বের ওপর আনারকে। তারপর রহমান আরো তিনজন অশ্বারোহীকে সঙ্গে নিয়ে অবশিষ্টদের বললো—তোমরা অশ্বের সন্ধান পাও ভাল, নয়তো এই পাহাড়ের বামদিকের পথ ধরে ঘুর পথে পদব্রজে মাণ্ডুদুর্গের দিকে এগিয়ে যাবে। যদি ধরা পড়, তাহলে জান কবুল করে এই বাহিনীর সম্মান রক্ষা করবে! তারপর তাঞ্জামবাহীদেব উদ্দেশ্য বললে—তোমরা নিশ্চয় আনার কথা বুঝতে পেরেছ। যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর, আর যদি তোমাদের সন্ধান কোন দিন পাই, তাহলে এই শাণিত অসির অগ্রভাগ তোমাদের বক্ষ বিদীর্ণ করবে। এই বলে রহমান তার খাপ থেকে তরোয়াল বের করে সন্ধ্যার পূর্বমুহূর্তে অস্তমিত সূর্যের গায়ে তুলে ধরলে। অসির রোশনাই জ্বলে উঠে শূন্যের মাঝে অগ্নিদীপ্তি প্রকাশিত হ'ল।

রহমান তারপর খাপে তলোয়ার ভরে আর অপেক্ষা না করে তিনজন অশ্বারোহীকে সঙ্গে নিয়ে অশ্ব ছুটিয়ে দিল। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললো চারটি অশ্ব। আনার অশ্বের ওপর সওয়ার হয়ে মনে মনে আল্লার কাছে প্রার্থনা করলো—খোদাবান, তুমি তো জানো আমার মনের অভিপ্রায় কি? আর যেন পথে কোন বাধাবিপত্তির মাঝে না পড়ি, যেন মাণ্ডুদুর্গে ঠিক পৌছতে পারি।



পথে কত ইতিহাস তৈরী হল। কত স্মৃতির পাথনায় ভর করে এই অভিযান সার্থকতার পথে এগিয়ে চলেছে। এই ইতিহাস তৈরী হবে, আনার কি জানতো?

সে ভেবেছিল, বাদশাহী অন্তঃপুর থেকে পালিয়ে যেতে পারলেই সে নির্বিঘ্নে মাণ্ডু দুর্গে গিয়ে পৌঁছবে। কিন্তু তার অনুমান ভুলই হয়েছিল। আর তাছাড়া সে ভাববেই বা কেমন করে, কখনও তো সে একাকী বাইরে বের হয় নি! পরিণত হবার পর একবার সে পিতার সঙ্গে লাহোর থেকে এসে হারেমে প্রবেশ করেছিল, তারপর আর যা বেরিয়েছিল তা তাঞ্জামের মধ্যে আবদ্ধ হয়েই। সম্রাট আগ্রা, কাশ্মীর, লাহোর সমস্ত বছর ঘুরলে, অন্তঃপুরে কতকাংশ আওরত তাঁর সঙ্গে থাকতো। সম্রাজ্ঞী সঙ্গে যেতেন বলে তাকেও সেই সঙ্গে যেতে হত। তার যাত্রার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। বাদশাহের সঙ্গে হাজার হাজার লটবহর যেতো, তার সঙ্গে সেও একটি। অন্তঃপুরিকারা যেমনভাবে বাদশাহের সঙ্গে যেত, তারও ব্যবস্থা সেরূপ ছিল। শিবিকার অভ্যন্তরে কঠিন অবরোধের মধ্যে সামিয়ানা ঢাকায় চলতো। চলতো সমান গতিতে। পথিমধ্যে কোন বাধা উপস্থিত হত না, তাই এ যাত্রায় কোন বাধা আসবে সে একবারও ভাবতে পারে নি।

যাই হক—জীবনে অনেক অভিজ্ঞতাই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয় না, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হয়। তবে এ অভিজ্ঞতা তার জীবনে আর কোন কাজে লাগবে না। সে আওরত, অবরোধপ্রথা মেনে চলাই তার ধর্ম। আর কোন মরদের হৃদয়সঙ্গিনী হবার জন্যেই তার জন্ম। মনোমত কেউ জীবনে এলে আর প্রয়োজন কি? তখন অন্য কোনদিকে তাকাবার দরকার নেই।

মাণ্ডুর পথে ছুটে চলেছে চারটি অশ্ব। তাদের গতিবেগে লাগছে বাতাসের আলোড়ন। মাঝে অন্ধকার পথ অতিক্রম করার অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর রুটির মত থালাভরা চাঁদ উঠতে জ্যোৎস্নালোকিত হয়ে উঠলো সমস্ত পথ। রহমান সোজা পথ দিয়ে চলছিল না, সে ঘুর পথে যাচ্ছিল। অধিকাংশ গভীর অরণ্যের ভেতর দিয়ে পথ করে চলছিল। তার কেন, সবারই অনুমান—বাদশাহী ফৌজ পরাজিত হয়ে কিছুতে আশা ছাড়বে না, দরকার হলে তারা মাণ্ডুর পথ পর্যন্ত ফৌজ সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে রাখবে। সামান্য ক'টি লোককে ধরবার জন্যে যে এত তোড়জোড় করার কোন অর্থ হয় না, সে লজ্জাও তাদের দমিত করবে না। আজ না হয় তারা বাদশাহী ফৌজের বিরুদ্ধে গিয়ে এই যাত্রার সঙ্গী হয়েছে, এতদিন তো সেই বাদশাহী সৈন্যরই তারা এক একজন ছিল। তারা কি দেখেনি সৈন্যাধ্যক্ষের পরিচালনার রীতি?

তাই চারটি অশ্ব চললো অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে মাণ্ডুর পথে।

আনার বসেছিল রহমানের বক্ষের সীমিতে। রহমানের পুরুষ বক্ষের তাপ তার পিঠে লেগে পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করছিল। সে মাঝে মাঝে মনে মনে ভয় পাচ্ছিল, এই

বুঝি রহমানের বলিষ্ঠ দুইহস্ত তাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে! কিন্তু তার পাপ মন বলেই এমনি নানান কথা মনে আসছিল। রহমান সে ধরনের কিছুই করছিল না, শুধু মাঝে মাঝে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলছিল—তোমার কি কষ্ট হচ্ছে আনারবিবি?

আনারের সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল, অশ্বপিঠে তার অভ্যাস নেই, তার ওপর এই দ্রুত চলা—সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তার ব্যথা করছিল। তবু সে জানালো, তার কোন কষ্ট হচ্ছে না। এই জানানোর মধ্যে তার আনন্দ ছিল এই যে, সে আর কিছু সময়ের ভেতর মাণ্ডুর প্রাসাদে গিয়ে পৌঁছবে। তখন আর কোন কষ্টই তার থাকবে না।

এমনি ঊর্ধ্বশ্বাসে একনাগাড়ি চলে কখন চন্দ্রিমা ঢলে পড়লো, কখন পূর্ব আকাশে আবার ভোরের আলো ফুটলো, কেউই জানে না। শুধু সেই ভোরের আলোয় দূর থেকে বৃহৎ মাণ্ডুদুর্গের চূড়ো দেখে সকলে আনন্দে হর্ষধ্বনি করে উঠলো।

তবু সেই বৃহৎ দুর্গের চূড়ো দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল, কাছে যেতে যে আরো আধঘণ্টার পথ অতিক্রম করতে হবে এই ভেবে চারটি সৈনিক আরো গতি বাড়িয়ে দিল। শুধু একটি বৃহৎ উন্মুক্তক্ষেত্র। মরুভূমির মত বালুকাময় প্রান্তর অতিক্রম করলেই মিলবে দুর্গের সীমানা।

সকলেরই মনে আনন্দের সঞ্চার হয়েছিল। সকলের মনে পুনঃ শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল। সকলের চোখের মণিতে প্রাণের সাড়া উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎ দপ করে সেই ঔজ্জ্বল্যমান হীরকজ্যোতি নির্বাপিত হল। একটি অশ্বখুরের শব্দ সোচ্চার হয়ে উঠলো। রহমান চকিত অশ্বের গতি মন্দীভূত করলো। পিছন দিকে বারবার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে দেখলো, একটি অশ্বারোহী ছুটে আসছে।

একটিমাত্র অশ্বারোহী। তবু চারজন সৈনিক কোমরবন্ধ থেকে চকিতে তরোয়াল কোষমুক্ত করে ঊর্ধ্বদিকে তুলে ধরলো। ওদের অনুমান হল, এ নিশ্চয় বাদশাহীদূত! হয়ত পিছনে বিরাটবাহিনী নিয়ে সেনাধ্যক্ষ আসছে, এগিয়ে দিয়েছে কোন দূতকে অনুসন্ধানে।

ওরা তরবারী উত্তোলিত করে দেখালো, তার কারণ যদি ঐ দূত ভয় পেয়ে পলায়ন করে এই ইচ্ছায়, কিন্তু অশ্বারোহী পশ্চাদ্ধাবন করলো না বা অশ্বের গতি মন্দীভূত করলো না বরং আরো দ্রুতলয় করলো তার গতি। অশ্বারোহী একেবারে সীমানার মধ্যে এসে পড়লে রহমান বাতাসে তরবারী আন্দোলিত করে হুঙ্কারধ্বনি দিয়ে বললো—আর বেশীদূর এগিয়ে এলে মস্তক দ্বিখণ্ডিত হবে। সাবধান, আর এক পাও এগিও না।

অশ্বারোহী বীর। সেও তরবারী উত্তোলন করে প্রত্যুত্তর দিল—সাবাস্ বীর! আমি প্রস্তুত। এগিয়ে এসে আমাকে অস্ত্রমুক্ত কর।

কিন্তু অশ্বারোহী আরো কাছে এগিয়ে এলে রহমান চিনতে পারলো ব্যক্তিটিকে। সে উল্লসিতস্বরে বলে উঠল,—ওস্তাদ তুমি?

অশ্বারোহী একেবারে এদের সামনে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো—হ্যাঁ আমি!

আমিই মহম্মদ ওসমান খাঁ বাহাদুর। তারপর ওসমান আনারবিবিকে কুর্নিশ করে বললো—গোস্তাখি মাপ কর আনারবিবি। আমাকে হঠাৎ চলে যেতে হয়েছিল বলে মাপ চাইছি। আমি যদি না যেতাম তাহলে তোমাদের বাঁচানো মুস্কিল হয়ে পড়তো। এই বলে সে গতরাত্রের কাহিনী সংক্ষেপ বিবৃত করলো। আমিই বিরাট ফৌজকে প্রলোভিত করে ঐ পাহাড়ের অন্বেষণ বন্ধ করিয়ে অন্যপথে চালিত করি। নাহলে যেভাবে তারা পাহাড়ের চতুর্দিক খুঁজে ফিরছিল, তাতে তোমাদের বের করতে আর বেশী বিলম্ব হত না। জৈন্য-উল আবেদীন আগে আমায় চিনতে পারে নি, পরে যখন চিনেছিল তখন আমি পলায়ন করেছি। আমি জানতাম, রহমান যখন সঙ্গে আছে তখন ভাবনার কিছু নেই। এই বলে ওসমান রহমানের পিঠ চাপড়ে বললো—সাবধান !

তারপর আর অযথা কালক্ষেপ না করে পাঁচটি অশ্বের পাগুলি দ্রুত হয়ে উঠলো। রহমানের অশ্বেই আনার বসে থাকলো। শুধু ওসমান অগ্রে ধাবিত হল, তার পিছুতে রহমানের সঙ্গে আনার। আনার ওসমানকে আকস্মিক দেখে মনে মনে নিশ্চিন্ত হল। সে রাত্রের ঘটনার পর ওসমান হারিয়ে যায় নি দেখে তার মনের অনুশোচনা লুপ্ত হল। তাছাড়া সে রাত্রের কোন চিহ্ন ওসমানের মুখের ওপর প্রতিফলিত না দেখে সে শান্তিলাভ করলো। এখন সে আর কোন অবস্থায়ই বৃত্তে আটক থেকে অযথা যন্ত্রণা ভোগ করতে চায় না। সামনে ঐ মাণ্ডুর দুর্গ। ওখানে আছেন সেই আরাধ্যপুরুষ। যিনি তার জন্যে অপেক্ষমান। না, না, তিনি অপেক্ষমান নন, সে অপেক্ষামানা। তাঁর নিবিড় সান্নিধ্যে যাবার জন্যে এখন সে অতীতকে পিছনে ফেলে বর্তমানের এই সূর্যওঠা প্রভাতের আলোর বসন পরতে চায়। সে এখন নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে শাহজাদা খুরমের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। অতীতের মালিন্যের বসন ত্যাগ করে আগামীদিনের বাদশাহের বক্ষে গিয়ে স্থান নেবে। এই বাদশাহের কাছে আসবার জন্যে রমণী যদি কোন ছলের আশ্রয় নিয়ে থাকে সে জন্যে সে-রমণীর অপরাধ কোথায় ? রমণী চিরকালই আপন স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্যে অনেক রকমের প্রলোভন সৃষ্টি করেছে, আনার তো তাদের থেকে কোন অংশে ভিন্ন নয়, তাই সে যা করেছে, তার অপরাধের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

আনার মাণ্ডুর প্রাসাদের যত কাছে আসতে লাগলো, এইসব কথা ভাবতে লাগলো। শাহজাদা খুরম যদি তার ওপর প্রসন্ন হন, তাহলে সে ওসমানের জন্য সুপারিশ করবে। ওসমান, রহমান এদের যাতে বড় উপাধি দিয়ে সম্মান করা হয়, তার ব্যবস্থা করবে।

মাণ্ডুর প্রাসাদ একেবারে চোখের নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছিল। বিরাট প্রাসাদের চতুর্দিকে বেষ্টন করে আকাশসমান পর্বত। সেই পর্বতচূড়ায় সূর্যরশ্মির মুকুট। প্রাসাদের সর্বোচ্চচূড়ায় স্বর্ণখচিত মিনার, সেই মিনারে সূর্যরশ্মির ঔজ্জ্বল্যমান প্রভা জ্যোতির প্রাখর্য বিকীরণ করছিল।

ওরা দুর্গের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে মাণ্ডুর দুর্গের সেই ঐতিহ্যময় অতীতেতিহাস স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এই মাণ্ডুর প্রাসাদকে ঘিরে যে একটি চমৎকার কাহিনী লোকপ্রবাদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে তা মূর্ত হল। মূর্ত হল প্রাসাদের ঐতিহ্যময় অপূর্ব নিষ্প্রাণ শিল্পসৌন্দর্য। মোগল সাম্রাজ্যের এই ঐশ্বর্য, এই রোশনাই, এই বিলাস—তার অনেক আগে যে মাণ্ডুর এই দুর্গের ঐশ্বর্য, তার রোশনাই, তার বিলাসের সরাবী পানপাত্র পূর্ণ সেই কথা-কাহিনী জেগে উঠলো।

ওরা প্রাসাদের সিংহদ্বারের কাছে দাঁড়ালে সূর্যরশ্মির স্বর্ণরঙে প্রাসাদের অপরূপ যৌবনতনু যেন যোড়শী জোয়ানী মাওরতের মত নৃত্যভঙ্গে ওদের স্বাগতম জানালো!

আনার মুগ্ধ হয়ে শুধু অভিভূতের মত মাণ্ডুর প্রাসাদের কারুকার্য দেখতে লাগলো। সে শুনেছিল একদিন বর্তমান বাদশাহের পিতা নাকি এই মাণ্ডুব পর্বতময় দুর্ভেদ্যদুর্গ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন। কারণ তিনি যখন এই মাণ্ডুর দুর্গ অনেক কষ্টে প্রচুর শ্রম ব্যয় করে করায়ত্ত করেছিলেন তখন এর অভ্যন্তর ভাগ দেখে চমকিত হয়েছিলেন। দুর্গের এই অদ্ভুত নির্মাণ দেখে তিনি আদেশ জ্ঞাপন করেছিলেন এই দুর্গ ভেঙে ফেলতে। কারণ তার কোন শাসন পরিচালক এই দুর্গে বাস করলেই সে বিদ্রোহী হবার সুযোগ পাবে। বাইরে থেকে এই দুর্গ জয় করতে গেলে অনেক বাধা, সেই বাধা অতিক্রম করা বড় দুঃসাধ্য। সেই অসুবিধার জন্যেই এই মাণ্ডুর দুর্গের ধ্বংস-সাধন করেছিলেন, কিন্তু তবু যা ছিল তা যে সত্যিই চমৎকার—আনার আজ স্বচক্ষে দেখে হতচকিত হল। অবশ্য বর্তমান সম্রাট জাহাঙ্গীর শা এই দুর্গের অনেক সংস্কার-সাধন করেছিলেন।

এ ছাড়া মাণ্ডুর দুর্গের সম্বন্ধে আরো একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। এক দরিদ্র অধিবাসী কোন এক জঙ্গলপূর্ণ পর্বতে প্রত্যহ কুঠার নিয়ে কাঠ কাটতে যেত। এই কাঠ কেটে সে যা উপার্জন করতো, তাই দিয়ে সংসার চালাতো। মাঝে মাঝে সে সেই কুঠার মেরামতের জন্য কর্মকারের বাড়ী নিয়ে যেত! একদিন কাঠুরিয়া যখন কাঠ কাটছিল, তখন তার কুঠার এক প্রস্তরের গাত্র স্পর্শ করলো। যে কোন বস্তু এর সংসর্গে আসতো, তা স্বর্ণে পরিণত করাই এই প্রস্তরের গুণ ছিল। প্রস্তর স্পর্শ করবামাত্র কুঠার স্বর্ণময় হয়ে গেল।

কাঠুরিয়া দেখলো সেই কুঠার দিয়ে আর কাজ চলে না। সে তখনি সেই কর্মকারের বাড়ী গেল। সে কর্মকারকে বললো—তুমি আমার কুঠারের একি অবস্থা করেছ? আমার এই কুঠার দিয়ে জীবন বাঁচানোর রসদ তৈরী হয়, তুমি তা নষ্ট করে দিয়ে আমাকে মৃত্যুর সম্মুখীন করলে? তা'ছাড়া কুঠারটি তামায় পরিণত হয়ে সে তার তীক্ষ্ণতা হারিয়েছে।

কর্মকার কুঠারটি পরীক্ষা করে কাঠুরিয়ার কাছ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হল। সে বুদ্ধিমান, তাই বললো—তোমার চিন্তার কিছু নেই। আমি তোমায় নতুন কুঠার দিচ্ছি এবং এই কুঠারটি গ্রহণ করছি, তবে সর্বাগ্রে আমাকে সেই প্রস্তরটি দেখাও, যে তোমার কুঠার নষ্ট করেছে।

নির্বোধ কাঠুরিয়া তৎক্ষণাৎ কর্মকারকে সেইস্থানে নিয়ে গিয়ে প্রস্তরটি দেখালো। কর্মকার আনন্দের সঙ্গে তা বহন করে নিজের গৃহে নিয়ে গেল এবং স্ত্রী পুত্র কাকেও প্রস্তরের তত্ত্ব না বলে তা লৌহ-সিন্দুকে আবদ্ধ করে রাখলো এবং কাঠুরিয়াকে একটি লৌহময় তীক্ষ্ণ নতুন কুঠার প্রদান করে বিদায় দিল।

তারপর এই সৌভাগ্যবান কর্মকার নিজের কাছে যত লৌহ ছিল সব স্বর্ণে পরিণত করতে লাগলো। ক্রমে সে একটি বিশাল অট্টালিকা প্রস্তুত করলো। বাৎসরিক দু'হাজার থেকে নয় হাজার টাকা বেতনে সমর-বিদ্যা নিপুণ বহু যোদ্ধা নিযুক্ত করলো।

অধীন কর্মচারীদের ওপর তার দয়া ও দানের কথা পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়লে পৃথিবীর নানাস্থানের বীর ও সুধীবর্গ তার কাছে এসে একত্র হলেন। কর্মকার সকলকেই সমাদরে অভ্যর্থনা করে আপন গৃহে স্থান দিল। তার যে ভাণ্ডার সঞ্চিত ছিল, তা থেকে অনায়াসে এই বিপুল ব্যয় নির্বাহ হতে লাগলো! এই অক্ষয় রত্নভাণ্ডারকে সুদৃঢ় স্থানে নিরাপদে রক্ষা করবার জন্যে সে অতিশয় ব্যস্ত হয়ে পড়লো এবং সেইমত স্থান অন্বেষণ করতে লাগলো। বহু অনুসন্ধানের পর অভ্রভেদী পর্বতবেষ্টিত এই মাণ্ডুর বিস্তৃত উপত্যকা দেখতে পেয়ে সে তা সমর-বিদ্যা অনুসারে গড়বন্দী করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হল! তারপরে আর কালবিলম্ব না করে সে কুড়ি হাজার মিস্ত্রি দিয়ে বিপরীত দিক থেকে কাজ আরম্ভ করে দিল। এই রকমভাবে বিশ্রামহীন কার্য করে ত্রিশ বৎসর পরে পিতাপুত্রে এক জায়গায় গিয়ে মিললো। অর্থাৎ কার্য সম্পন্ন হয়ে গেল। এই দুর্গের বেড় বিয়াল্লিশ মাইল এবং এটি প্রস্তুত করতে এত অর্থ ব্যয় হয়েছিল যা গণনা করা মানুষের অসাধ্য। এই দুর্গের দশটি সিংহদ্বার এবং চারদিকে চারটি নির্গম-দ্বার প্রস্তুত হল। পর্বতোপরি স্থাপিত প্রত্যেক সিংহদ্বার থেকে পর্বতের সানুদেশ পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার ধাপ ছিল। দুর্গের মধ্যে এক বিশাল উচ্চ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল, এই মসজিদের মধ্যে এক হাজার প্রকোষ্ঠ ছিল এবং প্রতি শুক্রবারের উপাসনার জন্য প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে বেদী নির্মিত হয়েছিল। এই প্রকাণ্ড দুর্গের মধ্যে প্রকাশ্য উপাসনার দিন বিপুল জনসমাগম হত, এবং হাজার প্রকোষ্ঠই মানুষে পূর্ণ হয়ে যেত। মসজিদের সমান্তরালভাবে একটি বৃহৎ অতিথিশালা এবং কর্মকারের পরিবারবর্গের সমাধির জন্য একটি উচ্চ গোলঘর নির্মিত হয়েছিল। এই গোলঘরের অভ্যন্তরে গরম জলের চারটি ফোয়ারা করা হয়েছিল। ফোয়ারা থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে যে দ্রব্য নির্গত হতো তা ক্রমশঃ একত্র হয়ে রাশীকৃত প্রস্তরে পরিণত হত। এই জমকালো উপাসনালয় নির্মিত এবং এর চতুর্দিকস্থ প্রদেশ কর্মকার কর্তৃক অধিকৃত হলে বুরহানপুরের রাজার দূত কর্মকারের কাছে উপস্থিত হল। রাজার দূত প্রস্তাব করলো, রাজার পুত্রের সঙ্গে কর্মকারের কন্যার পাণিপ্রার্থনা।

কর্মকার এই সৌভাগ্যে আহ্লাদিত হয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে কন্যার সাজসজ্জা ও যাত্রার আয়োজন সম্পন্ন করলো। কন্যাকে দূতের হাতে সমর্পণ করে যাত্রার প্রাক্কালে সেই পরশ পাথরের একখণ্ড স্বর্ণখচিত বস্ত্রে বেঁধে কর্মকার তা কন্যার হাতে সমর্পণ করে

বললো—সে যেন রাজাকে বলে যে বিদায়ের সময় তার পিতা তাকে এই উপহার প্রদান করেছেন। তারপর কর্মকার সেই প্রস্তরের গুণ কন্যাকে বুঝিয়ে দিলেন—বলে দিলেন—তার পিতা এই প্রস্তরের পরিবর্তে দু' লক্ষ টাকা পেলেও তা তিনি পরিত্যাগ করতেন না, শুধু কন্যার প্রতি স্নেহবশেই তিনি তা দান করেছেন।

দূতের সমভিব্যাহারে মাণ্ডুর রাজকুমারী বহু অনুচর নিয়ে তাপ্তী নদীর তীরে অবস্থিত বুরহান্‌পুর নগরে যাত্রা করলো।

চারদিনের পরে তারা নর্মদা নদীর তীরে উপস্থিত হল। এই স্থানে বুরহানপুরের রাজা সম্ভ্রান্ত বংশীয় কর্মচারিগণসহ কন্যার অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কন্যাকে স্বর্ণ ও সুসজ্জিত অশ্ব অর্পণ করে তাকে মহাসমারোহের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন। কিন্তু রাজা রাজবধূর উপযুক্ত কোনো প্রকার জাঁকজমক এবং বহুমূল্য যৌতুক না দেখে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ কন্যার পিতা এই অভাব পূর্ণ করবেন।

কর্মকারের কন্যা বুরহানপুরের রাজাকে বললো,·· সে পিতৃগৃহ থেকে বিদায়ের কালে তার পিতা তাকে স্বর্ণখচিত বস্ত্রের এক থলিয়া দিয়েছেন, এর ভেতর একখানি প্রস্তর আছে। তার মূল্য একশত পরগণার রাজস্বের তুল্য। পিতা বলে দিয়েছিল যে, রাজা তার অলঙ্কার এবং অন্যান্য রাজকীয় উপহারের বিষয় প্রশ্ন করলে তাঁকে এই উপহার দেবে। পিতার আদেশানুসারে কন্যা বুরহানপুরেব রাজার পদতলে স্বর্ণখচিত থলিয়া রাখলো।

বুরহানপুরের রাজা সেই থলিয়াটি খুলে প্রস্তরটি পরীক্ষা করে দেখলেন। কিন্তু সামান্য এক প্রস্তর বোধ হওয়াতে তিনি বিরক্ত হলেন। তারপর অন্য কিছু সঙ্গে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে প্রস্তরখানি অবহেলাভবে নদীর জলে নিক্ষেপ করলেন। এবং তিনি মনে করলেন—কন্যার পিতা তাঁর অবমাননার জন্যই এরূপ ব্যবহার করেছে। তিনি ক্রোধভরে তখুনি রাজকুমারীকে মাণ্ডুনগরে পিতৃসমীপে প্রেরণ করলেন।

মাণ্ডু-অধিপতি রাজকুমারীকে প্রত্যাবর্তন করতে দেখে এবং সবিশেষ অবগত হয়ে দুঃখের সঙ্গে বুরহানপুরের রাজাকে একখানি পত্র প্রেরণ করলো। তাতে সে লিখলো—'আপনি মহামূল্যবান বস্তু হাতে পেয়েও তা ভোগ করতে পারলেন না। আপনি শুধু আমার কন্যাকে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন বলেই আমি আপনাকে ঐরূপ মূল্যবান দ্রব্য প্রেরণ করেছিলাম। সে দ্রব্য প্রতিদিন আপনার গৃহে রাশি রাশি স্বর্ণ উৎপাদন করতো এবং আমার কন্যার ভরণপোষণের কোন অসুবিধা হত না। আমি যে দ্রব্যের স্পর্শে এত ধনদৌলত মজুত করতে সক্ষম হয়েছিলাম, সেই দ্রব্য আপনি নির্বুদ্ধিতায় নর্মদার জলে নিক্ষেপ করলেন। যাই, হোক, আপনার ভাগ্য অতিশয় মন্দ-না-হলে এরূপ বিপরীত অবস্থা সংঘটিত হত না।'

পত্র পেয়ে সবিশেষ অবগত হয়ে বুরহানপুরের রাজা দুঃখে এবং অনুতাপে দগ্ধ হলেন। তিনি লোক নিযুক্ত করে নর্মদা নদীর গভীর তলদেশ পর্যন্ত অন্বেষণ করালেন, কিন্তু কোথায় কী? রাজার ভাগ্যে আর সেই মহামূল্য প্রস্তরখণ্ড পুনর্লাভ হল না।

তারপর বহুকাল চলে গেল।

মোগল সম্রাট আকবর বুরহানপুরের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। সৈন্যদলের সঙ্গে যে সব হস্তী ছিল, তাদের একটির পাদদেশে এক বৃহৎ লৌহশৃঙ্খল ছিল। নর্মদা নদীর বিস্তৃত জলরাশি পার হয়ে অপর পারে পৌঁছবার পর দেখা গেল যে হস্তীর পায়ের লৌহ-শৃঙ্খল স্বর্ণ-শৃঙ্খলে পরিণত হয়েছে। নদী পার হবার সময় লৌহশৃঙ্খলটি কখন যে সেই রহস্যময় হারানো প্রস্তরের সংস্পর্শে এসেছিল তা কেউই বুঝতে পারে নি। এই অপূর্ব ঘটনার কথা সম্রাট আকবর অবগত হয়ে নদীর তলদেশ অন্বেষণের জন্যে বহু লোক নিযুক্ত করেছিলেন কিন্তু তাঁর চেষ্টা সফল হয়নি।

মাণ্ডুদুর্গ অতিশয় সুদৃঢ় হলেও তারপর সম্রাট আকবর ছয়মাস অবরোধের পর তা অধিকার করেন। এই দুর্গ অধিকার করে তিনি এর সিংহদ্বার, দুর্গপ্রাচীর প্রভৃতি ধ্বংস করতে আদেশ দেন কারণ এই দুর্গম গিরিদুর্গে অবস্থান করে অনেক বিদ্রোহী প্রজা সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হবার সুযোগ পেত। মাণ্ডুদুর্গ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও এর সন্নিকটবর্তী প্রদেশসমূহ পূর্বের মত সমৃদ্ধিশালী ছিল।

এসব কাহিনী আনার বাদশাহী হারেমে বসেই শুনেছিল। মাণ্ডু দুর্গের কথা অনেকের মুখে। শাহজাদা খুরম বোধহয় সেজন্যে এই স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তখন তিনি এই স্থানের ওপর দিয়ে গিয়ে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশাল দুর্গ পর্যবেক্ষণ করে তা পুনর্নিমাণের আদেশ দিয়েছিলেন। এবং এই দুর্গকে পুনরায় সুসংস্কৃত করে সুদৃশ্য বিশাল অট্টালিকা প্রভৃতি তৈরী করিয়েছিলেন। এবং আরো সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য সুন্দর উদ্যান, মনোহর নির্ঝর প্রভৃতি পরিশোভিত করে নগরের শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন।



আনার সেই কথা ফটকের সামনে দাঁড়িয়েই চিন্তা করলো, আর দেখলো দুর্গকে বেষ্টন করে কত সহস্র অট্টালিকা, শোভন উদ্যান বীথিকা, মনোরম জলাশয় প্রভৃতি সজ্জিত রয়েছে। সে বিস্ময়ে চিন্তা করলো—এ সবই কি সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে নির্মিত হয়েছে? নাকি মাণ্ডুদুর্গের সেই রূপকথার গল্পের সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্য আছে?

ওরা সকলেই অশ্ব থেকে নেমে পড়েছিল। দাঁড়িয়েছিল ঐ পাহাড়ের সানুদেশে লৌহফটকের সামনে। ফটকের বৃহৎ খিলানে সূর্যরশ্মির ঔজ্জ্বল্য হীরকজ্যোতি প্রভা দান করেছিল। মাথায় ওপর নহবতচূড়ায় তখন ভৈরবী রাগের সুরবাহার। সানাইয়ের সুমধুর সুরের রাগিনী বাতাসের বুকে মধুর আবেশ সৃষ্টি করে পরিবেশ মধুরতর করেছিল!

এতক্ষণ পরে আনারের মনে লজ্জার স্পর্শ লাগলো। সে ভাবলো, তার মনে

আওরতের স্বাভাবিক সরম আছে। সে সরমের প্রভায় লাজরক্তিম হয়ে মাটিতে চক্ষু দুটি ন্যস্ত করে মনে মনে শঙ্কিত হল। আপন মনে ভাবলো—এই এক মুহূর্ত পরেই সেই আরাধ্য পুরুষের সঙ্গে তার দেখা হবে। তখন সে কথা বলতে পারবে তো? আওরতের স্বাভাবিক সরমে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাবে না? কিন্তু যদি রুদ্ধ হয়ে যায়, যদি কথা না প্রকাশ হয়, যদি ষড়যন্ত্র-বৃত্তান্ত না প্রকাশ করতে পেরে সমস্ত উদ্যম নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এই আসার কষ্ট সবই যে নষ্ট হয়ে যাবে? আনার কেমন যেন সেই মুহূর্তে দিশেহারা হয়ে পড়লো।

এই সময় শাস্ত্রীপাহারাদার ওদের কাছে সরে এল। এসে জিজ্ঞেস করলো, তারা কারা? এবং কি প্রয়োজনে এখানে অপেক্ষা করছে?

ওসমান আনারের দিকে দেখিয়ে শাস্ত্রী পাহারাদারকে বললো—এই আওরতকে জিজ্ঞেস করো তার প্রয়োজন ..আমরা এঁর সঙ্গে এসেছি মাত্র। আমরা কিছু জানি না।

আনার সঙ্কোচ কাটাবার চেষ্টা করছিল কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সে তা কাটাতে পারছিল না। তাই কেমন যেন বুদ্ধিহীনার মতো লাজবদনে মাথানত করে দাঁড়িয়েছিল।

শাস্ত্রী পাহারাদার তাকিয়েছিল একান্ত অবহেলাভরে আনারের দিকে। আনারের পোষাকে তাকে কোন আমীর, ওমরাহ ঘরের জেনানা বলে বোধ হচ্ছিল না। সেইজন্যে শাস্ত্রী পাহারাদার কেমন যেন তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল! তবু সে একেবারে 'হঠ্ যাও' ও বলতে পাচ্ছিল না, তার কারণ সে জানে শাহজাদার মর্জির ওপর জেনানার ভাগ্য নিরূপিত হয়। এ জেনানা খুবসুরত। শাহজাদা দেখলে তার দিলে অবশ্যই চিড় লাগবে। এমন কি—এ জেনানাকে ধনদৌলত দিয়ে বেগম করে নিতে পারেন।

এইসময় আনার কথা বললো—আমি দিল্লী বাদশাহের অন্তঃপুর থেকে আসছি। সম্রাজ্ঞী আমাকে এক এত্তেলা দিয়ে পাঠিয়েছেন। বাদশাহের পুত্র শাহজাদা খুরমের কাছে একটি গোপনীয় সংবাদ জানানোর জন্যে। তুমি যদি আমাকে শাহজাদার কাছে নিয়ে যাও, তাহলে আমি বহুৎ খুশ হয়ে তোমার মঙ্গল কামনা করবো।

শাস্ত্রী পাহারাদার জোয়ান পুরুষ। তারও ধমণীতে আছে পেয়ারের রক্ত। সেও সুন্দরীর কথায় বিগলিত হতে পারে। সে বিগলিত হয়েই মৃদু হেসে বললো—হ্যাঁ, তোমাকে বিবি আমি শাহজাদার কাছে নিয়ে যাবার তকলিফ করতে পারি কিন্তু তোমার সঙ্গীদের এখানেই থাকতে হবে।

উত্তর দিল ওসমান। সে বললো—নিশ্চয়। তুমি বাবা মেহেরবানী করে আনার বিবিকে তার মহামহিম শাহজাদার কাছে নিয়ে যাও—আমরা এখানেই থাকতে পারবো।

শাস্ত্রী পাহারাদার মুহূর্তে হাতের তালি দিয়ে অপর একটি পাহারাদারকে ডাকলো, সে এলে তাকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে আনারকে সঙ্গে করে প্রথম পাহারাদারটি

ভেতরে চলে গেল। আনার একবার শুধু পিছনে তাকালো, তার চোখের মধ্যে ব্যাকুল দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিই তার শেষ না শুরু বোঝা গেল না।

মার্বেল প্রস্তরের মসৃণ মেঝের ওপর দিয়ে চলতে চলতে আনারের বক্ষের মধ্যে ধুকধুকুনি যেন আরো দ্রুত হয়ে উঠলো। প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ, ঐশ্বর্যের পর ঐশ্বর্য। রোশনাইয়ের পর রোশনাই। জৌলুসের চকমকি প্রতিটি প্রকোষ্ঠের গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল করে আছে। আনার বাদশাহী হারেমে লালিত, সে বহু ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকে চোখের মুগ্ধবোধ সহজ করেছিল, তাই এই অফুরন্ত জৌলুস দেখে চমকিত হল না, কিন্তু মাণ্ডুদুর্গের কারুকার্য দেখে সে বিস্মিত হল। বিস্মিত হল, সে ধীরে ধীরে যত এগিয়ে চলেছে তত পাহাড়ের শীর্ষদেশে যাচ্ছে। বহু কারুকার্যমণ্ডিত নানান ধরনের মর্মরময় সোপানশ্রেণী, সেই সোপানশ্রেণী তাকে বার বার অতিক্রম করতে হচ্ছে। স্থানে স্থানে উন্মুক্তক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রে গোলাপ জলের সুগন্ধ ফোয়ারা। সুগন্ধ নির্যাসে বাতাস আমোদিত। প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে দর্পণের সারি। রঙীন মখমলের বস্ত্রাচ্ছাদনে কক্ষগুলি জাঁকজমকপূর্ণ। শ্বেত-মর্মরময় আধারের ওপর গোলাপের ক্ষুদ্র প্রস্রবণ। কক্ষের খিলানের নীচে রঞ্জিত স্ফটিকপাত্রে সদ্যরচিত সুবাসপূর্ণ সরস পুষ্পসমূহ সুরক্ষিত।

এ সবই বাদশাহী হারেমে অপর্যাপ্ত। আনারের তাতে কোন বিস্ময় নেই। সে জানে বাদশাহী ঐশ্বর্যের নানাবিধ ঐশ্বর্য উপকরণ বাদশাহী নিয়মে সমস্ত প্রাসাদ সজ্জিত করে রাখে! অগুরু সুবাস', কস্তুরীর সুগন্ধ, লোবানের মধুরতা ঘ্রাণের আকাশে সর্বদা আমেজের নেশা সৃষ্টি করে। তাই আনার তাতে কোন বিস্ময়বোধ না করে পুলকিত হল, তুষারধবল পর্বতের ওপর প্রস্তরময় কক্ষগুলি দেখে। সে যত মর্মর সোপানশ্রেণী অতিক্রম করতে লাগলো, সুনীল আকাশের তত কাছে যেতে লাগলো। তার ওপর কানে যাচ্ছে সুমধুর রাগে ভৈরবী সুরবাহার। সানাইয়ের সেই মধুর প্রাণদায়িণী সুর যেন আকাশের ঐ বিশাল বক্ষ থেকে বের হয়ে আসছে বলে মনে হল।

হঠাৎ আনারের মনে হল—সে কি অপ্সরের দেশে যাচ্ছে? ঐ আকাশের মেঘের ওপারে যে অপ্সর দেশ, সেই দেশে কি তার পৌঁছবার কথা? মনে হচ্ছে যেন আর বেশী দূর নয়, আরও কয়েকটি সোপান পার হলেই সেই স্বপ্নের দেশের মাটি মিলবে? আচ্ছা, সত্যিই যদি সেখানে সে এক্ষুনি পৌঁছে যায়? সেখানে কি মোগল সাম্রাজ্যের মত দৌলতের রোশনাই আছে? আছে সরাবী নেশার কোন উপাদান? নিশ্চয় আছে। তার চেয়েও বোধহয় আরো অনেক স্বর্গীয় উপাদান আছে, যা এই পৃথিবীর মানুষের সাধ্যের অতীত সংগ্রহ করা। এখানে তো মানুষে মানুষে খুনোখুনি করে রক্তস্রোতে স্নান করে আল্লার নির্বাচিত সিংহাসনে সম্রাট হয়ে বসে, সেখানে নিশ্চয় এই যাতনার কোন ইঙ্গিত নেই। সিংহাসনে বসবার অধিকার সবার, সবাই সিংহাসনে বসে, আবার সেই সিংহাসন তুচ্ছ করে সবাই তা ফেলে দেয়। সিংহাসনে বসে সমস্ত মানুষদের আপন হেফাজতে রেখে শাসন করবার কেউ নেই। সবাই সমান। সবাই শ্রেষ্ঠ।

এমনি এক রাজত্বের যদি সৃষ্টি হয় এই আল্লার পৃথিবীতে, তাহলে কত ভাল হয়! ঐ স্বর্গের পারিজাত কাননের মত এখানে গুলাব-বাগের পুষ্পিত কানন। সেই কাননের মাঝে ভ্রমরের আনাগোনা। সুগন্ধ বাতাসে চারিদিক আমোদিত হবে। সৌরভের ছড়াছড়ি থাকবে রমণী ও পুরুষের অন্তরে অন্তরে। কোকিল ডাকবে সানাইয়ের সুরকে অবনমিত করে। ভ্রমরাব গুণগুণানি, নৃত্যের ছন্দ, আপনতালে এসে পায়ের মাঝে দোলন জাগাবে। আক্রমণের কোন আশঙ্কা থাকবে না। শক্তি-প্রয়োগের কোন বাসনা থাকবে না। রমণী আপন ইচ্ছায় তার কামনাঘন মনের পুষ্পমাল্য নিবেদন করবে। পুরুষ সেই ইচ্ছার প্রাপক হয়ে গ্রহণ করবে রমণী-দান। আর রমণী তার যৌবনের উষ্ণদেহ-সুবাসে স্বর্গের সেই কুসুম সুবাস গন্ধময় করবে। তাই সেদিন যদি কখনও আসে? আনার আবেশে চক্ষু মুদলো।

এই সময় শাস্ত্রী পাহাবাদার থমকে দাঁড়িয়ে একটি খোজা প্রহরীকে কি বললো, খোজা প্রহরী মাথা নেড়ে সায় দিতে পাহারাদার চলে গেল। খোজা প্রহরী আনারকে ইঙ্গিত করলো অনুসরণ করতে। প্রহরী দু তিনটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করে একটি বাঁদীর হাতে সঁপে দিল আনারকে।

আনার বুঝলো এবার সে শাহজাদা খুরমের হারেমে প্রবেশ করছে। এবার তার ভাগ্য পরীক্ষা শুরু। কিন্তু আর বেশীক্ষণ তাকে ভাবতে হল না। হঠাৎ তার কানের মধ্যে প্রবেশ করলো বীণ-বাদন। কে যেন নিপুণহাতে বীণ বাজিয়ে মিষ্টিসুরে গান গাইছে।

'দেখ্‌নে কে সিবা তেরে তরফ্‌ কুছ্‌ উম্মেদ নহী।'

আনার মনে মনে গানের অর্থটি স্মরণ করলো। শুধু তোমার দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া আমার কোন আশা নেই। কে এ গান গাইছে? তবে কি মমতাজের কণ্ঠে এ গান ঝলকে উঠেছে? কিন্তু মমতাজের কণ্ঠ বলে তো বোধ হচ্ছে না? তাছাড়া মমতাজের দুঃখ কি? মমতাজ পূর্ণ। সে পেয়েছে দিলভরা এক দরদ, মনভরা এক খুবসুরত মরদ, আর হৃদয়ভরা এক সৌভাগ্য, যে সৌভাগ্য একদিন তাকে মহিষীর সম্মান দান করবে। 'মমতাজ, তোমার কথা স্মরণ হলেই আমার মনে ঈর্ষার সৃষ্টি হয় কেন? মনে হয় তোমার সৌভাগ্য ছিনিয়ে আমি আমার বক্ষে বন্ধ করি।' আনার কেমন যেন পাগল হয়ে গেল। তার রমণী মনের ঈর্ষার অগ্নিদীপ্তি সমস্ত অঙ্গের ধাপে ধাপে জ্বলে উঠে তাকে উন্মত্ত করলো। সে রক্তিম চোখের ঘূর্ণায়মান চাউনিতে অন্বেষণ করলো একটি বক্রাকৃতি ছুরিকা। যে ছুরিকার দ্বারা সে তার সৌভাগ্য ছিনিয়ে নেবে। মমতাজকে দেওয়ানা করবে।

হঠাৎ বাঁদী একটি কক্ষের দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে বললো—তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি হুজুরের হুকুম নিয়ে আসি। যে ঘর থেকে গীতের আওয়াজ ভেসে আসছিল, সে দ্রুত ঐ কথা বলে সে ঘরে ঢুকে গেল।

আনার দাঁড়িয়ে থাকলো বক্ষের ধুকধুকুনি নিয়ে। সে বার বার হৃত-সাহস সঞ্চয় করবার চেষ্টা করলো কি শুধু পড়তে লাগলো তার সেদিনের দৃশ্যটি। শাহজাদা খুরম

সেদিন তার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন। কেন হেসেছিলেন সে জানে না, তবে হাসির মধ্যে অনেক অর্থের সংযোজন ছিল। আজ মনে পড়ছে, তিনি যেন হেসেছিলেন একটি অর্থকেই উপলক্ষ্য করে। আচ্ছা, শাহজাদার কি সেদিনের কথা মনে আছে? মনে থাকা নিতান্তই অমূলক, কেন তিনি মনে রাখবেন? এ স্মৃতির কি খুব মূল্য আছে? অন্ততঃ ভাবী সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর কাছে? কত আওরত তাঁর জীবনে প্রত্যহ আনাগোনা করে, তাছাড়া আছে মমতাজ, মমতাজ একদিকে জননী, অপরদিকে প্রেয়সী, মমতাজ প্রেয়সীর পরীক্ষায় যে অনুত্তীর্ণ, একথা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এদের সবার সুরমালাঞ্ছিত চোখের আবেশ শিহরণ ছেড়ে তার কথা ভাববেন শাহজাদা? কেন? কেন? কেন?

কি তার আছে? যৌবন তার মত অনেক জোয়ানী আওরতেরই আছে। বক্ষের কুসুমাস্তীর্ণের দুধশুভ্র মাখন পেলবতা সব জোয়ানী আওরতেরই সম্পদ। মহব্বত আছে, সুরমা আঁকা চোখের চটুলভঙ্গিও আছে। আছে রূপ, রূপের প্রকট ভঙ্গিমাও আছে। দেহের আকাজ্ক্ষাও কোন অংশে কম নয়। তবে—কি তার আছে? রূপ আছে! সেরা রূপ নিয়ে সে হাজারো ঝাড়ের উজ্জ্বল আলোকেও ম্লান করতে পারে, চমক সৃষ্টি করতে পারে! শাহজাদাকে চমকে দিতে পারে! চমকে দিতে পারে কি? মমতাজ মমতাজও তো সুন্দরী। তাকে ছেড়ে শাহজাদা এই অপরিচিতা আওরতকে কি মহব্বত দান করতে পারেন? কে জানে তাঁর চোখেই এর বিচার হবে। একটি সৌভাগ্যবান মরদ যদি আচমকা দেখে চমকে ওঠেন, তাহলেই তার এই রূপ সার্থক, এই যৌবন সার্থক—এই দেহেব বৃন্তে আবার নতুন করে জৌলুসের রোশনাই জ্বলে উঠবে। আপাতত কিছুক্ষণ অদম্য তৃষ্ণা নিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আনার দরজার একটু ব্যবধানে দাঁড়িয়েছিল। জাফরানী রঙের একটি পুরু পর্দা মেহগনি দরজার ওপর ঝোলানো ছিল। দরজার দুপাশে ছিল রৌপ্য আধার, আধারের ওপর স্ফটিক জলের দুই সুবাসিত প্রস্রবণ। তার সামনে রঞ্জিত পুষ্পাধার। নানাবর্ণের সুবাসিত পুষ্পের দুটি আধার দু'জায়গায় রাখা। আনার যেখানে দাঁড়িয়েছিল, হর্ম্যতলে তাকাতে তার চোখ দুটি আবদ্ধ হয়ে গেল। শিল্পী সেখানে নিখুঁতভাবে নক্সা এঁকে তার ক্ষমতার নিদর্শন সৃষ্টি করেছে। শিল্পীর নিপুণ হাতের ছোঁয়াচ সর্বত্র, কিন্তু এই স্থানের নক্সা দেখে যেন আরো নিপুণ মনে হয়। শ্বেত পাথরের হর্ম্যতলে কারুশিল্পের নিদর্শন। এত অপরূপ, যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এ সবই কি জাহাঙ্গীরের নির্দেশে পালিত হয়েছে? যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে আকবর শার পর তাঁর পুত্রের সৌন্দর্যপ্রীতি জগতে চির অক্ষয় হয়ে থাকবে।

বদ্ধ কক্ষ থেকে তখনও গানের মিষ্টি সুর তরঙ্গ দরদীকণ্ঠে ভেসে আসছিল। সেই-সুরে পদ্মের গোলাপী পাপড়ী চোখ খুললো। গোলাপের বর্ণশোভায় দোলন জাগলো। রজনীগন্ধার শুভ্রতা যেন আকাশে ও হর্ম্যতলের মাঝে শয্যার মখমলের চাদর বিছালো। জোয়ানী আওরতের বক্ষের দুই দুধশুভ্রতায় রক্তাভার ঘোর ফুটে উঠলো।

রক্তময় হল প্রভাতের আলো। এখান থেকে সানাইয়ের সেই মিষ্টি সুর প্রাণ মন সিক্ত করছিল না। সে হয়ত থেমে গিয়েছিল কিম্বা মর্মরময় দেয়ালের গাত্রে আবদ্ধ সেই কটকের ধারেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেই মধুক্ষরা কণ্ঠের প্রেমসঙ্গীত। হয়ত ভাবী সম্রাট সামনে বসে আছেন। সেইজন্যে গায়িকার কণ্ঠে আরো সুর সংযোজিত হয়েছে। সে গাইছে এই সকালকে মধুময় করতে। ভাবী দিনটি মধুরতর করতে।

আনার জানতো শাহজাদা খুরম দরদীমনের পুরুষ। তিনি একদিকে যেমন অসিচালনায় সিদ্ধহস্ত, আততায়ীর রক্ত দেখতে আগ্রহান্বিত, তেমনি পীত চন্দনে দেহ সুবাসিত করে রক্ত গোলাপের আঘ্রাণ নিতে আগ্রহী। তিনি সময় পেলেই সঙ্গীত, নৃত্য, সরাবের পানপাত্রে সুখ সৃষ্টি করতে ভালবাসতেন। আর রমণীর প্রতি বেশী আকাঙ্ক্ষা কিনা—আনারের জানা সেই কারণ বাদশাহের কাছে থাকলে শাহজাদাদের ঐ ধরনের প্রীতিবোধ বড় একটা চোখে পড়তো না। তবে শাহজাদারা যে পিতার রক্তের অবমাননা করবে বলে মনে হয় না। তৈমুর বংশের অপমান করে শাহজাদারা রমণী বিরাগে জীবন নির্বাহ করবেন, এ অন্য কেউ বিশ্বাস করলেও আনার করে না। তার প্রমাণ আকবর শা। তাব প্রমাণ আকবর শার পুত্র জাহাঙ্গীর শা।

বাঁদী এসে জানালো—শাহজাদা আপনাকে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়েছেন।

আনার অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল, বাঁদীর কথায় নিশ্বাস ত্যাগ করে বললো—বহুৎ মেহেরবানী তোমাকে বাঁদী। আমার এখন একটু বিশ্রামের দরকার। তার আগে চলো শাহজাদার সঙ্গে দেখা করে নিই।

হঠাৎ এই ধরনের অনর্গল কথা বলার প্রয়োজন হত না। কিন্তু আনার বললো, তার কারণ সে মনে মনে সাহস সঞ্চয় করছিল। এবার তার চরম পরীক্ষার মুহূর্ত আসন্ন। দরজার অপর পারেই হয়ত শাহজাদার সেই দুটি সুন্দর চোখ তার আগমন অপেক্ষায় শুদ্ধ হয়ে আছে। সে দৃশ্যমান হলেই হয় শাহজাদা মৃদু হাসবেন, নয় কঠিন সন্দিগ্ধ চোখে ভুরু কুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করবেন—আওরত, কিসের অভিপ্রায় নিয়ে তুমি এই মাণ্ডু পর্যন্ত ছুটে এসেছ?

আর কল্পনার প্রয়োজন ছিল না। বাঁদী জাফরানী পর্দা সরিয়ে আনারকে পথ করে দিল। আনার পা পা করে গিয়ে কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়ালো। শাহজাহান মূল্যবান ফরাস বিছানো হর্ম্যতলে পায়ের ওপর পা দিয়ে বেশ মেজাজী ঢঙে বসেছিলেন। তাঁর খুবসুরত মুখের ওপর আপেলের রঙের শোভা। মনোরম চক্ষু দুটির তারায় প্রভাতের আলো গায়ে একটি বহুমূল্য রত্নখচিত গোলাপী-বর্ণের কামিজ। কণ্ঠে দুলছে একটি মুক্তার মালা। মুক্তার ঔজ্জ্বল্য মুখের ওপর প্রতিফলিত। একটু ব্যবধানে যে বসে বীণ বাজিয়ে গীত পরিবেশন করছিল, তাকে চিনতে পারলো না আনার। তাকে যে কখনও দেখেছে, তাও মনে হল না। মমতাজ যে নয়, তা কিন্তু দেখেই সে বুঝেছিল।

[বাকী অংশ পরের খণ্ডে]

কক্ষে প্রবেশ করতে বীণবাদনও থেমে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে তার গীতসুধাও।

শাহজাদা খুরম তাঁর মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি নিয়ে আনারের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আনারের সঙ্গে এর মধ্যে তাঁর বারকয়েক চোখাচোখি হয়ে গেল। শাহজাদার ঠোঁটের কোণে কি যেন স্ফুরিত হয়ে উঠে আবার মিলিয়ে গেল কিন্তু চোখের দৃষ্টির অর্থ তাঁর লুকোলো না, বরং প্রকট হয়ে মেলে ধরলো তাঁর বিস্ময়।

আনার সেই দেখে আরো ভীত হয়ে চোখ নামালো। মলিন ওড়নার আবরণ দিয়ে আগেই সে বক্ষবাস গোপন করেছিল, এবার আরো সঙ্কুচিত হয়ে কেমন যেন সরমে জড়োসড়ো হয়ে গেল। হঠাৎ সে দেখলো, দুটি পা তার কাঁপছে! পা কাঁপছে কেন? বিস্ময়ে সে ভাবলো। তবে কি আনন্দে পুলকে কাঁপছে পা, না চরম মুহূর্ত এসেছে বলে কাঁপছে? আরো অনুভব করলো, বক্ষের মধ্যেও কিসের যেন দাপাদাপি শুরু হয়েছে। কে যেন ড্রাম বাজাচ্ছে বুকের মধ্যে প্রবেশ করে। এত ক্লান্তি বোধ হচ্ছে কেন? তবে কি সে দাঁড়াতে পারবে না? কোন কথার উত্তর দেবার আগেই এই ফরাসের বুকে লুটিয়ে পড়বে?

হঠাৎ শাহজাদা খুরম ইসারায় সেই গায়িকাকে কক্ষ ত্যাগ করতে বললেন। গায়িকা দ্রুতপায়ে বীণহাতে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল। চলে যেতেই শাহজাদা খুরম আনারের দিকে তাকিয়ে বাদশাহী কন্ঠে অথচ মিষ্টস্বরে বললেন—তোমার আগমনের সংবাদ এখানে অনেক আগেই পেঁাছে গেছে। বাদশাহী দূত দুবার তোমার সন্ধানে এখানে এসেছিল। এই বলে শাহজাদা খুরম মৃদু হাসলেন। তারপর বিস্ময়ে বললেন—এত দুর্গম পথ ফৌজের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সামান্য এক আওরত তুমি, এই মাণ্ডুদুর্গে শাহজাদা খুরমের কাছে এলে কেমন করে বলো। তোমার অভিপ্রায় কি সুন্দরী? আমার যদি অসাধ্য না হয়, আমি নিশ্চয় তোমায় তা দেব।

শাহজাদা খুরমের স্নেহপূর্ণ আশ্বাসে আনারের মনের সমস্ত ভয় অপসারিত হল। সে মনে মনে বললো—এত পরিশ্রম, এত কষ্ট সব সার্থক হয়ে গেল। মনের সমস্ত দুশ্চিন্তা অপসারিত হল। এবার সে নিশ্চয় শাহজাদার কাছে অকপটে বলতে পারবে তার আগমনের অভিপ্রায়।

শাহজাদা আবার বললেন—বলো সুন্দরী, সঙ্কোচ করো না! এতদূর পথ যখন যাত্রা করে আসতে পারলে, তখন নিশ্চয় তোমার এমন কোন অভিপ্রায় আছে, যা আমার কাছে ব্যক্ত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় স্পষ্ট। আমি অভয় দিচ্ছি, এইমুহূর্তে আমি তোমার কাছে হিন্দুস্থানের বাদশাহের পুত্র শাহজাদা খুরম নয়, আমি সামান্য এক পুরুষ, বীরপুরুষ। যদি কেউ তোমার ইজ্জত লুন্ঠনের চেষ্টা করে থাকে, আমার অসি তার প্রাণসংহার করবে। যদি কেউ তোমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করে থাকে, তাহলে শাহজাদা খুরম সেই ষড়যন্ত্র ভাঙবার জন্যে নিজের প্রাণ সমর্পণ করবে। বলো তোমার মনের অভিপ্রায় কি? কী আর্জি তুমি বয়ে সুদূর পথ অতিক্রম করে এসেছ?

আনার তবু বলতে ইতস্ততঃ করতে লাগলো দেখে শাহজাদা আনারের মুখের ওপর তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন—শুনেছি তুমি ছিলে আমার পিতার নতুনবেগম সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের প্রিয়পাত্রী, তুমি কি সেই জেনানা কর্তৃক কোন অপমানিত হয়েছ? কিন্তু তোমার পিতা ইব্রাহিম খাঁ সেই সম্রাজ্ঞীর প্রধান উপদেষ্টা, তাঁর কন্যা হয়ে তোমার এই সম্মান কে নষ্ট করলো? বলো, বলো সুন্দরী তাছাড়া তোমাকে কেই বা আমার মত এক ভাগ্যহীনের কাছে আসার মন্ত্রণা দিল? আমি তোমার আগমনের কোন হেতুই অনুমান করতে পাচ্ছি না। তবে কি আমার জন্যে কোন দুঃসংবাদ বহন করে নিয়ে এসেছ রমণী? বুঝতে পাচ্ছি পিতার স্নেহপাশে আমার আর কোন স্থান নেই। আমাকে ঘিরে এক চক্রান্ত চারিদিকে তীব্র হয়ে উঠেছে, আর সেই চক্রান্তের প্রধান সহায়িকা পিতার বৃদ্ধজীবনের নয়াবেগম ঐ কুহকিনী মেহেরউন্নিসা। মেহেরউন্নিসা আমার পিতার দিল্ জয় করেছে, এখন সিংহাসন দখল করতে চায়, সেই সিংহাসনের জন্যেই এই ভীষণ চক্রান্ত। হঠাৎ শাহজাদা উত্তেজনা দমন করে সন্দিগ্ধ হয়ে আনারকে জিজ্ঞেস করলেন—রমণী, প্রথমে তুমি অকপটে বলো তুমি কোন্ দলে—আমার না সেই কুহকিনী মেহেরউন্নিসার! আবার নিজেই উত্তর দিলেন—আমার দলেই বা হবে কেন? তোমার পিতা যখন সেই কুহকিনীর উপদেষ্টা, তখন তুমি পিতাকেই অনুসরণ করবে।

হঠাৎ আনারের মুখ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল—কখনই না। কথাটা এত সোচ্চার হয়ে বেরোল যে আনার নিজেই লজ্জিত হয়ে মাথা নত করলো।

আর শাহজাদা খুররম হলেন দারুণ বিস্মিত। তিনি তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টে আনারের দিকে।

আনার তখন মাথা নত করে লজ্জিত হয়ে ভাবতে লাগলো। কি বলার জন্যে সে এখানে এসেছে? শাহজাদা তো সবই অবগত আছেন। তাঁকে ঘিরে যে এক ভীষণ ষড়যন্ত্র তাঁর প্রাণসংহার করতে চায়, সে কথাও শাহজাদা জানেন। তবে এমন কী সে গোপন কথা বলতে এসেছে? তার সমস্ত বলা যে গুরুত্বহীন হয়ে গেল! এজন্যে যখন তার মনে অনুৎসাহ জাগছিল, সেইসময় শাহজাদা তাকে কোন দলের জিজ্ঞাসা করতে তার মনের সমস্ত বিদ্রোহিনী ভাব হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, আর সেজন্যে সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে চীৎকার করে উঠলো। চীৎকার সে করবে না? তার পিতা চাকরীর খাতিরে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে সম্রাজ্ঞীর পক্ষাবলম্বন করতে পারেন, কিন্তু সে কেন করবে? সে ন্যায়কেই প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে, পিতার সিংহাসন পুত্রের প্রাপ্য জেনেই ছুটে এসেছে শাহজাদা খুররমের কাছে। সে কথা স্পর্দ্ধাভরে বলবার অহমিকা আছে। মোগলদের আইনে সত্যকথা যদিও কম বলা হয়। তবু যারা বলে থাকে, খুব স্পষ্ট ভাষায় বলে—আনার ভাবলো—সে স্পষ্ট ভাষাতেই এই সত্য কথাটা বলবে। সে উর্ধ্বশ্বাসে শাহজাদা খুররমকে বাঁচানোর জন্যেই এখানে এসেছে। যদিও শাহজাদার নিযুক্ত গুপ্তচর বাদশাহের প্রাসাদের সব গোপন তত্ত্ব শাহজাদার কাছে পরিবেশন করে গেছে—তবু তারা চর, তাদের মুখের কথায় চেয়ে

তার কথারই মূল্য দেবেন শাহজাদা। সেজন্যে সে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করবার জন্যে মনের সাহস সঞ্চিত করে হঠাৎ বার তিনেক অধীনার মত শাহজাদাকে কুর্নিশ করে বললো—গোস্তাখি মাপ করবেন শাহজাদা। আমি যদি কোন অন্যায় করে থাকি, গোঁসা করবেন না। এতক্ষণ আপনাকে তক্‌লিফ দিয়ে আমি চুপ করেছিলুম। তারজন্যে এই বেগুনা রমণীকে ক্ষমা করবেন। এই বলে আনার আবার কুর্নিশ করলো।

শাহজাদা খুরম কণ্ঠে দোদুল্যমান বৃহৎ মুক্তার মালাটি হাতের একটি আঙুলে অন্যমনস্ক হয়ে জড়াচ্ছিলেন। আনারের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে বললেন—তুমি এই ডিভানে বসো রমণী। অনেকপথ অনেক কষ্ট করে এসেছ, এখন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত —তাছাড়া তুমি কোমলা রমণী, তোমার এই পরিশ্রম আমাকে বিস্মিত করেছে। এখন দাঁড়িয়ে থেকে তোমাকে তক্‌লিফ ভোগ করতে হবে না।

আনার যদিও শাহজাদার সামনে বসতে কুণ্ঠিত হল, তবু না বসে পারলো না কারণ তার সত্যিই তকলিফ হচ্ছিল। একে একধারে দুরাত্রি পথশ্রম, তার ওপর অনাহার। এখানে এই অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল শুধু শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে। উত্তীর্ণ হলেই সে অনেকদিন বিশ্রাম নেবে। পরীক্ষা চলছে তখনও। তবে মনে হচ্ছে, পরীক্ষার ফল শুভ। তাই নিশ্চিন্ত হয়েই 'গোস্তাখি মাপ করবেন জনাব' বলে সে ফিরোজারঙের মখমল আচ্ছাদিত ডিভানের ওপর বসলো। বসে বললো—'আপনার কাছে সেই গভীর ষড়যন্ত্রের কথা বলবার জন্যেই আমি এসেছি। কিন্তু এসে দেখছি ভুলই করেছি, মহামহিম ভাবী সম্রাট অনেক কিছুই অবগত আছেন।

শাহজাদা সে কথায় কোন সম্মতি জ্ঞাপন না করে বললেন—তবু তুমি যা জানো বলো রমণী! আমি চর মুখে সে সংবাদ অবগত হয়েছি। তোমার মুখে শুনলে আরো বিশ্বাস করবো।

আনার বলে গেল আদ্যোপান্ত সম্রাজ্ঞীর চক্রান্ত—যা সে জানতো।

শাহজাদা সব শুনে কিছুক্ষণ কোন কথা বললেন না। শুধু গবাক্ষ দিয়ে সামনের আকাশের দিকে তাকিয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের শোভা দেখতে লাগলেন। সেই ধূসরবর্ণের মেঘের বিস্তারে সূর্যরশ্মির ঔজ্জ্বল্য তাকে কি যেন দান করলো কে জানে? শাহজাদা হঠাৎ সংযত হয়ে বললেন—কিন্তু আমার যদি প্রাণ গ্রহণের আয়োজন হয়ে থাকে, তুমি তাকে বাধা দিতে চাও কেন? হিন্দুস্তানের রত্নখচিত সিংহাসন যদি সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের হয়, তা হলে তোমার তো লাভ বৈ কোন ক্ষতি নেই। তোমার পিতা সেই সম্রাজ্ঞীর প্রধান উপদেষ্টা। সম্রাজ্ঞীর হাতে সিংহাসন এলে তোমার পিতাই লাভবান হবেন বেশী। তোমার পিতা লাভবান হলে তোমারও সৌভাগ্য! সুতরাং রমণী, তোমার এই রহস্যময় আগমন আমাকে বড় চিন্তার মধ্যে ফেললো। যদি অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে, তুমি যদি সম্রাজ্ঞী কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে আমাকে প্রলোভিত করে আমার জীবন গ্রহণ করতে চাও, তা

অকপটে বলো। আমি প্রস্তুত রমণী। তোমার প্রলোভনে সাড়া না দিলেও তুমি যদি আমার জীবন গ্রহণ করে কীর্তি রাখতে চাও—আমি সানন্দে তা উৎসর্গীকৃত করবো। কিন্তু এ ছাড়া যদি অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে, তা আমার অজ্ঞাত। শাহজাদা খুররমের চিন্তার বহির্ভূত কি সে উদ্দেশ্য আমাকে বলো—শত্রুর মুখের ওপর বিজাতীয় আক্রোশের চিহ্ন দেখলে আমি ধরতে পারি কিন্তু বন্ধুর মুখের সারল্য যে আমার অজানা। তুমি যদি আমার একান্ত সুহৃদ হও, তা'হলে এমন প্রমাণ উপস্থিত কর, যা দেখে আমি নিশ্চিন্ত হই।

শাহজাদা খুররম দণ্ডায়মান হয়ে দুটি হস্ত পিছনদিকে রেখে আনারের বিপরীতে বাইরের গবাক্ষের দিকে চেয়ে কথা বলছিলেন হঠাৎ শেষ কথা উচ্চারণ করে আনারের দিকে ফিরতেই তিনি চমকে উঠলেন।

আনার কাঁদছে। আনারের ক্লান্তমুখের ওপর দু চোখের অশ্রুবিন্দু মুক্তাবিন্দু হয়ে গণ্ডের পেলবতা পেরিয়ে নামছে। সে ডিভানের ওপর বসে মুখখানি একবার মাটির দিকে নামিয়ে দিচ্ছে, আবার শাহজাদার দিকে মেলে ধরে কাতর হয়ে মাথা নাড়ছে। শাহজাদা যদি এদিকে ফিরে কথা বলতেন, তাহলে অনেকক্ষণ আগেই তিনি স্তব্ধ হয়ে আনারের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যেতেন।

তবু শাহজাদা পরেও যখন তাকালেন, তিনি বিস্মিত হয়ে আনারের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তারপর উত্তেজনা সম্পূর্ণ দমিত করে সান্ত্বনা বাক্যে বললেন—আমাকে ক্ষমা কর রমণী, অজান্তে যদি কোন আঘাত করে থাকি তাহলে তার জন্যে ক্ষমাই একমাত্র পরিত্রাণের উপায়। তুমি রোদন বন্ধ করে আমার মনের সন্দেহ মোচন কর, আমার কাছ থেকে তুমি কি চাও? কি জন্যে তুমি এই সুদূর পথ অতিক্রম করে সমস্ত কষ্ট সহ্য করে আমার কাছে এসেছ? আমার যদি প্রাণরক্ষাই তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাও বলো কি উপায়ে তুমি আমার প্রাণরক্ষা করবে?

হঠাৎ আনার কান্না থামিয়ে দিয়ে অসংযতকণ্ঠে অভিমানিত স্বরে চীৎকার করে বললো—আমি ভুল করেছি শাহজাদা। এত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে জানলে কখনই এই দুঃসাহস প্রকাশ করতাম না। কি প্রমাণ দিয়ে আপনাকে বিশ্বাস করাবো যে, আমি বন্ধুত্বের মুখোশ পরিধান করে এখানে এসেছি?

শাহজাদা খুররম একেবারে আনারের অতি কাছে সরে এসে তাঁর বহু অভিজ্ঞ চোখের দৃষ্টি দিয়ে আনারের ক্রন্দন ভারাক্রান্ত অবয়বটি দেখতে লাগলেন। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন বহুক্ষণ। আনার সেই দৃষ্টির মাঝে সঙ্কুচিত হয়ে পড়তে লাগলো। শাহজাদার সেদিকে কোন খেয়াল নেই। তিনি দেখতে দেখতে উপলব্ধি করতে লাগলেন শরীরের মধ্যে কি এক অনুভূতি! মনে মনে স্বীকার করলেন—আওরত সুন্দরী, আওরত জোয়ানী, আওরতের প্রস্ফুটিত বক্ষের তুষার শুভ্রতায় রক্তাভসদৃশ চিহ্ন বিদ্যমান। তিনি মমতাজের সোহাগরঞ্জিত হৃদয়ের স্পর্শ অনুভূত হলেন। মমতাজ যেন আনারের প্রতিবিম্বে এই ডিভানে বসে তার যৌবনতনু সঁপে

দিতে চায়।

হঠাৎ তিনি এরই মধ্যে আবিষ্কার করলেন আনারের গোপন ইচ্ছাটা। আনার যে তার সঙ্গে মহব্বতের রঙে রাঙা হয়ে বিনিময় করতে চায় তার হৃদয়—সেই গোপন ইচ্ছাটা জানতে পেরে শাহজাদা খুররমের মধ্যে উল্লাস সংযোজিত হল। তিনি উল্লসিত হয়ে মনে মনে আওরতের দুঃসাহসকে সেলাম জানালেন। তারপর মনে মনে বললেন—আওরত তুমি শুধু দুঃসাহসী নও, বিরাট উচ্চাশা নিয়ে দাম্ভিকা। তুমি ভেবেছ, মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর শা যেমন রমণীর সুরত দেখলে আর থাকতে পারেন না, শাদীর ইন্তেজারে তাকে হারেম-বন্ধ করেন, তেমনি তাঁর পুত্রেরা। এই আওরতের অবশ্য কোন দোষ নেই, সে কেমন করেই বা জানবে, শাহজাদা খুররম সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাছাড়া মমতাজের মত গৃহলক্ষ্মী যার আছে, তার আর কিসের অভাব ?

শাহজাদা খুরম যখন আনারের গোপন ইচ্ছাটা বুঝতে পারলেন তখন তিনি এক বিরাট আলোর মাঝে ঢুকে সমস্ত অন্ধকারের কুয়াশা সরিয়ে দিলেন। মনে মনে বললেন—না তা হয় না। এ রমণীর ইচ্ছাকে সম্মান জানানোর সাধ্য তার নেই। একে ফিরিয়ে দিতে হবে। তাই তিনি সেখানে দাঁড়িয়েই কঠিনস্বরে বললেন—আওরত, তুমি আমাকে যে সাহায্য করেছ, তার জন্যে আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর। কিন্তু বিনিময়ে তুমি যে প্রতিদান চেয়েছ, তা আমার দেওয়ার ক্ষমতা নেই। আমি অবিশ্বাসী হয়ে একটি আওরতের মহব্বতের আশনাই ম্লান করে দিতে পারবো না।

হঠাৎ আনার সাহস সঞ্চয় করে বললো—নজরানা গ্রহণ করবেন না, হুজুর ?

শাহজাদা আনারের কথা শুনে আকাশ ফাটিয়ে হেসে উঠলেন। তাঁর হাসির প্রতিধ্বনি হাজার হাজার খন্ডে বিভক্ত হয়ে প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ সোচ্চার হয়ে অনেক কাছের ঐ আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ লাগলো সেই হাসির প্রতিধ্বনি নিশ্চিহ্ন হতে। আনার সভয়ে চতুর্দিকে তাকিয়ে কম্পিত হয়ে জীবন সংশয় মনে করলো। এমন করে শাহজাদাকে সে কখনও তো উন্মত্ত হয়ে অট্টহাসি করতে শোনে নি। তবে কি শাহজাদার প্রকৃতি কোন শয়তানের রক্তমাংস দিয়ে তৈরী! তিনি কিছুই গ্রহণ করতে চান না। সমস্ত গ্রহণের উর্ধ্বে উঠে সব কিছু তুচ্ছ করার ক্ষমতা তিনি জয় করেছেন। আনারের তাই মনে হল ভাবী সম্রাট শাহজাহানকে। শাহজাহানকে মনে হল তিনি জল্লাদ। জল্লাদ যেমন খড়্গ উত্তোলনের আগে পৈশাচিক অট্টহাস্য হেসে নামিয়ে দেয় খড়্গ, তারপর দু হাত রক্তে রঞ্জিত করে আবার অট্টহাস্য করে ওঠে, আর সেই অট্টহাস্যে শকুনরা ভীত হয়ে ত্রস্তে পলায়ন করে—তেমনি যেন শাহজাদা খুররম জল্লাদের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। আনারের মনে হল—সম্রাজ্ঞী নুরজাহান ভুলই করেছেন। তিনি যার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার জন্যে অগ্রসর হয়েছেন, তার সঙ্গে পেরে ওঠা তাঁর ক্ষমতার বাইরে। তাঁর সব ষড়যন্ত্র এই বীরপুরুষ তুচ্ছ করে দিয়ে দিল্লীর সিংহাসন করায়ত্ত করবেন।

আনার আবার ভাবলো, এবার সে বেশ কাতর হয়ে ভাবলো—সে কাকে

সাহায্যের জন্যে এতদূর পথ কষ্ট সহ্য করে এসেছে, তিনি তো কোন সাহায্যই গ্রহণ করতে চান্ না। সবই তুচ্ছ করে দিলেন, এমন কি যে যৌবনতনু গ্রহণ করবার জন্যে আমীর, ওমরাহরা লুব্ধ সেই যৌবতনু সে নজরানা দিতে চাইলো তাও শাহজাদা বালুকারাশির মত ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। আনারের মধ্যে কেমন যেন অপমানবোধ লাগলো। সে দারুণ অপমানিত হয়ে নিজেকে রক্তাক্ত করতে চাইলো। মাসুম মনের স্পর্শহীন পবিত্র দেহের ঐশ্বর্য নষ্ট করতে দিতে চাইলো। বাদশাহী প্রাসাদের সবাই বলতো, সম্রাজ্ঞীর সৌন্দর্যের সঙ্গে তার সৌন্দর্যের তুলনা মেলে। সম্রাজ্ঞীর সৌন্দর্য ছিল বলে হিন্দুস্তানের বাদশাহ তাঁর পায়ে লুটোলো, কিন্তু তার সৌন্দর্য দিয়ে কি হল? এই তো সে সামনে মেলে ধরে শাহজাদাকে প্রলোভিত করতে চাইছে। তার উত্তুঙ্গ বক্ষসৌন্দর্য লোলুপ করে, চোখে মায়ামদির চাউনির আবর্ত সৃষ্টি করে শাহজাদাকে অবশ করতে চাইছে কিন্তু শাহজাদা অবশ হচ্ছেন কোথায়? বরং সচকিত হয়ে বার বার আঘাত দিয়ে তার সমস্ত আশা ভেঙে দিচ্ছেন। এমন কি সে তার যৌবনতনু অতৃপ্ততার বাসনা নিয়ে শাহাজাদাকে নজরানা দিতে চাইলো, আর তার বিপরীতে শাহজাদা এমন অট্টহাস্য প্রকাশ করলেন যা শয়তানের মতই মনে হয়। তবে কি শাহজাদা তাঁর বংশের গৌরবকে ধুলায় ধুসরিত করে অন্য এক মানুষে পরিণত হতে চান? কিন্তু কেন? কেন? এ বৈরাগ্য তাঁর কেন? যিনি একদিন বাদশাহ হবেন, বাদশাহী তখ্‌তে বসে দেশ শাসন করবেন, তাঁর কত সহস্র রমণী হারেম অলংকৃত করবে, তিনি সর্বদা রমণী পরিবৃত হয়ে জীবনের রঙমহল রঙীন করে রাখবেন। আর তাঁকেই আজ দেখতে হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্যরকমের! কিন্তু কেন? তবে কি মমতাজ এই পুরুষের সমস্ত স্বাধীনতা হরণ করে তার দেহের বৃত্তে আটক করে রাখতে চান? তাজবেগম এত স্বার্থপর! যিনি একদিন হিন্দুস্তানের সম্রাট হবেন তাঁকে এমনি এক স্বার্থপর রমণী সমস্ত বিলাসের উপকরণ থেকে দূরে রেখে নিজের করে রাখবেন? আবার আনার ভাবলো—তাজবেগম অন্যায়ই বা কি করেছেন? সে যদি এরকম কোন সুযোগ পেত তাহলে কি তা চরিতার্থ করতো না! রমণী চিরকালই তার মনের মানুষ আপন বক্ষের সীমিতে আপন করে রাখতে চেয়েছে। যারা পেরেছে তারা পূর্ণ, যারা পারে নি তাদের চোখের অশ্রুই হয়েছে সম্বল। তবে বাদশাহের মহিষীর পক্ষে এসব চিন্তা অমূলক কারণ তারা জানে বাদশাহ কখনও একটি রমণীর বাহুবন্ধনে বাসা বেঁধে থাকবেন না। তাঁর যত দৌলত তত তাঁর রোশনাই, তত তাঁর খুবসুরত রমণীর প্রতি প্রবল আকাঙ্খা। সাধারণ মানুষের মত বাদশাহের ইচ্ছা ছোট হবে না, তাই তার জীবনে একটি রমণী চিরকাল থাকবে, এ যদি কেউ চিন্তা করে থাকে তাহলে সে ভুলই করেছে। তাছাড়া আবার মোগল সম্রাটদের বিলাসব্যসন, নৃত্যগীত, রমণীর যৌবন উপভোগ, একটু অধিকমাত্রায়। কিন্তু শাহজাদাকে স্বতন্ত্র দেখে তাই তার বিস্ময় বেশী জাগলো।

কিন্তু এসব কথা ভাবতে তার বেশী সময় লাগলো না। সে শুধু দূরে দন্ডায়মান শাহজাদার দিকে চাইলো। শাহজাদা পিছন করে গবাক্ষ দিয়ে বাইরের

আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। কুয়াশাচ্ছন্ন তুষার ধবল পর্বতের এক গিরিপ্রাচীরের ওপর সূর্যের রশ্মি প্রখরতর হয়েছে। বেলা যে বেড়ে চলেছে, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। সুনীল আকাশের কোলে পারাবতের ইতস্ততঃ বিচরণ দেখা যাচ্ছে। কক্ষের মধ্যে গোলাপ সুবাস।

হঠাৎ আনারের মনে হল—সব তুচ্ছ, সব তুচ্ছ। যেখানে সম্মান নেই, সেখানে এক মিনিটও থাকা উচিত নয়। অসম্মানের প্রাসাদে বাস করে যন্ত্রণায় নীল হওয়ার চেয়ে সম্মানের কুঁড়েঘরে বাস করা অনেক ভাল। যে আশা নিয়ে সে এই সুদূর পথ এসেছিল, সে আশা তার সফল হয়নি, সুতরাং এখানে আর একমুহূর্তও অপেক্ষা করা উচিত নয়। কিন্তু কোথায় যাবে সে? সে তো পিছনের আর কোন আশ্রয়ই রেখে আসে নি। বাদশাহের আশ্রয় চিরতরে ধ্বংস করে চলে এসেছে। পিতাও এখন সেখানে। সুতরাং আপন বলতে তিনকুলে একমাত্র পিতা। তিনি যদি অন্য জায়গায় থাকতেন, আশ্রয় দিতেন। কিন্তু তাঁরও আশ্রয় মিলবে না। এখন তার যাবার কোন ঠিকানাও নেই, এক আছে ওসমান। ওসমানকে যদি গ্রহণ করা যায়, তাকে নিয়ে অন্য কোন স্বাধীনরাজ্যে পালানো যায় কিন্তু তাও মন থেকে চায় না। তবে কী চায় তাও আনার ঐ মুহূর্তে চিন্তা করতে পারলো না।

শুধু তার চোখে আবার জল দেখা দিল। সে দিশেহারা হয়ে পড়লো। সে দাঁড়িয়ে উঠে কুর্নিশ করে বললো—শাহজাদা, আমাকে যেতে হুকুম দিন।

অনেক কথাই শাহজাদা তখন অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলেন। আনারের কথা নয়, পিতার কথা। পিতৃহৃদয়কে বধ করে পিতা কি করে এক কুহকিনীর মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে ভুললেন নিজের সন্তানকে! মানুষ বৃদ্ধবয়সে রমণীর বশীভূত হয়ে এমনি করেই কি ভোলে সব? তিনি কি বুঝতে পাচ্ছেন না, তিনি দিন দিন নিজের সমস্ত সত্তা হারিয়ে একজনের মুখাপেক্ষী হয়ে উঠছেন! সে আর কেউ নয়, স্বর্গীয় সৌন্দর্যের ভান্ডারী হয়ে স্বভাবে কলঙ্কিনী নূরজাহান। নূরজাহান তার পূর্বস্বামীর হত্যাকারীকে সাজা দেবার জন্যেই এই আচরণ করে চলেছে। আর তাঁর পিতা তা বুঝেও এমন বশীভূত হয়ে গেছেন যে পরিত্রাণের আশা ছেড়ে সিংহাসন, দৌলত, শাসন সব ত্যাগ করে রঙমহলে দিন রাত সরাবের নেশায় বুঁদ হয়ে আছেন।

চর মুখে খুরম এ সংবাদও পেয়েছিলেন—তাঁর পিতাকে দিনরাত নজরানা দেবার জন্যে সম্রাজ্ঞী দেশবিদেশ থেকে নয়া নয়া খুবসুরত জোয়ানী আওরত এনে হারেম পূর্ণ করেছেন। আর তাঁর পিতা জাহাঙ্গীর শা সরাবের নেশায় উন্মত্ত হলেই কৌশলে সম্রাজ্ঞী একটি একটি আওরত পাঠিয়ে দেন।

হঠাৎ শাহজাদা খুরম চীৎকার করে উঠলেন—না, না এ অসম্ভব! এ চিন্তা করাও সহ্যাতীত। যদি কখনও সেই শয়তান রমণীকে আয়ত্বে পাই, তাহলে তার শাস্তির জন্যে একযুগ চিন্তার সময় নেব। আর সেই একযুগ চিন্তা করে এমন এক শাস্তির ব্যবস্থা করবো যা শুনে সমস্ত পৃথিবী কাঁপতে থাকবে।

হঠাৎ শাহজাদা আনারের কথা শুনে চমকে আর একটি কথা ভাবলেন। এই

আওরতকেও তো নূরজাহান হারেমের সুখ প্রদান করেছিল। তবে কি এ আওরতও তাঁর পিতার শোণিতের আস্বাদ গ্রহণ করেছে? কিন্তু একথা সে জিজ্ঞেস করবে কেমন করে? লজ্জা করে না? সরম যে তার কণ্ঠ পর্যন্ত উঠে বাক্যরোধ করে দিতে চায়। ঘৃণা লাগলো তাঁর দারুণ। এমন ঘৃণা বুঝি কখনও তাঁর লাগে নি। শাহজাদা সেই ঘৃণার মাঝেই আবদ্ধ হয়ে আনারের দিকে ফিরে উৎসুকচিত্তে জিজ্ঞেস করলেন—আমার জিজ্ঞাসা করা অবশ্য অনুচিত তবু জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি কি আমার পিতার রঙমহলে কখনও প্রবেশ করেছ? কারণ সম্রাজ্ঞী বিনাস্বার্থে তোমাকে যে হারেমের সুখ-ঐশ্বর্য দান করেছে বলে মনে হয় না।

আনার মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়েছিল, আবার শাহজাদার কথায় আরো ক্ষিপ্ত হল। শাহজাদার সন্দেহে তার মনে ঘৃণার সৃষ্টি হল, কিন্তু মনে মনে এও ভাবলো—এখুনি ইচ্ছা করলে এই দাম্ভিক পুরুষকে আঘাত করা যায়। সে যদি বলে—হ্যাঁ বাদশাহ তাকে সুখ দিয়েছেন, সে বাদশাহের বক্ষে সোহাগ দান করেছে, তাহলে এই দাম্ভিকপুরুষ প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে টলে পড়বেন এই মর্মরসজ্জিত হর্ম্যতলে। কিন্তু তাহলে এই হবে, তার জীবন উচ্ছিষ্ট বলে প্রকাশ হবে। যদিও বা শাহজাদার অনুগ্রহ লাভের আশা আছে, কিন্তু তিনি পিতার স্পর্শকরা আওরতের প্রতি কোন আকাঙ্ক্ষা অনুভব করবেন না। সেজন্যে আনার মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়েও দুঃখিত হল শাহজাদার কথায়। শাহজাদা তার যৌবন যাচাই করে পরীক্ষা করে দেখছেন, সে যৌবন ঝুট না তার কোন মূল্য আছে। তবু সে একান্ত কাতরস্বরে উত্তর দিল—আমাকে দেখে কি মনে হয় আমার জীবনে অন্য কোন পুরুষের পদক্ষেপ হয়েছে?

শাহজাদা কোন দ্বিধা না করেই উত্তর দিলেন--আমার মনে হওয়াতে কিছু এসে যায় না। আমি শুধু জানতে চাই, আমার পিতার স্পর্শ তোমাকে রঞ্জিত করেছে কিনা! কারণ আমি শুনেছি পিতাকে রঙমহলে আবদ্ধ করে নয়াবেগম বাদশাহের জীবন পঙ্গু করে দিচ্ছেন, তুমি তার কোন সাহায্যকারিনী কিনা?

আনার আর কোন কথার উত্তর দিল না।

হঠাৎ শাহজাহান আনারের কাছে সরে এলেন, এসে মৃদুস্বরে শান্ত-কণ্ঠে বললেন—তুমি এখন বিশ্রাম নাও। পরে এ বিষয়ে আলোচনা হবে। তারপর বললেন—এখন আমার দুঃসময়, কেউ আমার ওপর বিরূপ হোক, আমি তা চাই না। এই বলে শাহজাদা খুররম আর অপেক্ষা করলেন না, দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন। অনতিবিলম্বে একটি বাঁদী এসে কুর্নিশ করে বললো—আপনাকে বিশ্রামের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন শাহজাদা।

আনার বাঁদীকে দেখে চমকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো—আচ্ছা, বলতে পারো, আমার সঙ্গে যারা এসেছিল তারা এখন কোথায়?

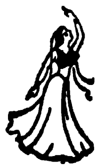
বাঁদী মৃদু হেসে বললো—তারা এখন স্নানাহার সেরে নিদ্রা যাচ্ছেন।

আনার নিশ্চিন্ত হয়ে আবার জিজ্ঞেস করলো—তোমাদের মালেকা কোথায় থাকেন বাঁদী?

বাঁদী বললো—তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হবে, তার আগে আপনি বিশ্রাম করে নিন। শাহজাদা হুকুম দিয়েছেন, আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত আপনার বিশ্রাম নেওয়াই এখন একান্ত দরকার।

আনার আর কোন কথা বললো না, বাঁদীকে অনুসরণ করলো।

আনার তখন ক্লান্ত ছিল সে যদি একটু সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতো তাহলে দেখতে পেত একজন গোপন স্থানে লুকায়িত থেকে আনার ও শাহজাদার সমস্ত কথোপকথন শুনে গা ঢাকা দিল।



সেদিন রাত্রে।

শাহজাদা খুররম তখনও শয়ন করতে যাননি। তিনি তখন নিজের রঙমহলে। রঙমহলে কেউ ছিল না, সম্পূর্ণ একা তিনি। তিনি কিছুক্ষণ আগে দারুণ অবসাদে ক্লান্ত হয়ে রঙমহলের মূল্যবান ফরাসের ওপর শুয়েছিলেন। যে কক্ষে প্রতিনিয়ত সঙ্গীত কিম্বা নৃত্যছাড়া রঙমহল একেবারে স্তব্ধ থাকে নি, সে রঙমহল আজ পূর্ণ সন্ধ্যা ও রাত্রি হাহাকারে ভরে উঠেছে। রঙমহলের মর্মরগাত্রে হীরকোজ্জ্বল দর্শনশোভা যেন নিজের আকৃতি দেখে আতঙ্কিত হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। রঙমহলের কারুকার্য খচিত স্তম্ভগাত্রে দোদুল্যমান পুষ্পস্তবক অনাদরে সৌরভহীন হয়ে কাঁদছে। যে কক্ষে সর্বদা চটুল নর্তকীর লীলায়িত ভঙ্গ সর্বদা নূপুর নিকণে পূর্ণ থাকতো, সে নিকণ শাহজাদার হুকুমে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। বাঁদী কতবার এসে কুর্নিশ করে জিজ্ঞাসা করে গেছে—হুজুর, সুকণ্ঠ গায়িকা ফরমাইস করবেন?

শাহজাদা খুররম অযথা ক্ষুব্ধ হয়ে চীৎকার করে উঠেছেন—না, না কোন সঙ্গীত না, কোন আনন্দ না। আমার এখন একান্ত নির্জনতা প্রয়োজন। আমার সামনে থেকে সব বের হয়ে যা দূর'হ।

তারপর বাঁদী চলে গেলে নিজের মনেই ভেবেছেন—রঙমহলের খুশীর হিল্লোলে, আর নর্তকীর সুঠাম দেহের বুক্তে আনন্দ আহরণ করবার এ সময় নয়, এখন তার প্রচুর ভাবনার সময়। এখন তার দুঃসময় উপস্থিত হয়েছে, চতুর্দিকে তাকে ঘিরে এক ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠেছে। চারিদিক থেকে সহস্রচক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে শাণিত কৃপাণ তুলে তাকে শাসাচ্ছে। তিনি এখন সম্পূর্ণ একা। আর তাকে ঘিরে সমস্ত শক্তিধররা ছুরিকা উত্তোলিত করে হত্যা করবার জন্যে ছুটে আসে। এই বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের প্রাণরক্ষা করার সামর্থ কোথায়?

পৃথিবীতে এক পিতা ছিলেন। মাতা অনেকদিনই স্নেহ খণ্ডিত করে বিদায়

নিয়েছেন। পিতার স্নেহই ছিল একমাত্র বল ও ভরসা। তাও গেল। এখন এই দুনিয়ায় অতি আপনার বলতে আর কে রইলো? সমস্ত দুনিয়ায় ভর্তি সব শত্রু! কেউ তাঁকে পিতামাতার মত আপন করবে না, বেগম অবশ্য আপন কিন্তু তারও স্বার্থ আছে। সে এখন মা, কয়েকটি পুত্র কন্যার জননী হয়ে সে এখন তাদেরই জন্যে ভালমন্দে ব্যস্ত। আর তাদের মঙ্গল দেখতে গিয়ে তাদের পিতার ওপর যতখানি কর্তব্য করা উচিত ততখানিই সে করে। না, না মমতাজ তাঁকে কোন অবমাননা করে না! বরং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যতখানি করা উচিত তার চেয়েও বেশী করে। মমতাজের তুলনা হয় না। তার নিবিড় সান্নিধ্যে যে আশ্রয়ের সৃষ্টি আছে তা একান্ত শান্তির—তবু সান্ত্বনা কোথায়? সান্ত্বনা যে এই বিরাট হিন্দুস্তানের কোথাও নেই। শাহজাদা খুররমের জীবন থেকে ঝাড়ের অত্যুজ্জ্বল আলোর শিখা অপসারিত হয়েছে। সূর্যরশ্মির দীপ্তমান শিখা আর তাঁর ললাটে খেলা করবে না। বরং শাহজাদা দেখতে পাচ্ছেন, নেমে আসছে এক জমাট কালির বর্ণ। বাদশাহের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করার জন্যে অভিশাপ তার হাত-পা মেলে দিয়েছে!

সেজন্যে আজ এই রঙমহলের এই কক্ষে আলো দিতে নিষেধ করে দিয়েছেন শাহজাদা। তিনি এই অন্ধকারের মধ্যে একাকী অবস্থান করে অখণ্ড ভাবনার মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন। সময় কাটিয়ে বের করতে চান পরিত্রাণের উপায়। আলো জ্বালাতে চান মনের দর্পণে।

কিন্তু আলোর শিখা না জ্বলে তাঁকে শুধু ভাবাচ্ছে কুটিল ভাবনা। শুধু কতকগুলি আতঙ্কিত দুশ্চিন্তা কালো আলখাল্লা পরিধান করে ঐ অন্ধকারে এসে ভাবী সম্রাটকে দংশন করছে। আর এক সময় পৈশাচিক অট্টহাস্য করে বলছে, তুমি কাপুরুষ খুররম, তুমি তৈমুরবংশের বংশধর হয়ে রক্ত দেখতে ভয় পাও? বিদ্রোহী হও! বীরত্বের সৃষ্টি করে অসির ঝনঝনানিতে সমস্ত হিন্দুস্থান কাঁপিয়ে দাও। রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়ে যাও। সেই রক্ত দেখে সমস্ত হিন্দুস্থান তোমার কাছে মাথা নত করে তোমার বীরত্ব স্বীকার করবে। আল্লার আশীর্বাদ পেয়ে ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী হয়ে সমস্ত দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হবে। ভুলে যেও না তোমার জন্ম যুদ্ধ করবার জন্যে। যুদ্ধ নিবারণের জন্যে যদি তোমার আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহলে সে আকাঙ্ক্ষা নির্বাপিত কর। যুদ্ধ না করলে নিজের জিনিস পাবে না। যুদ্ধ করে নিজের জিনিস নিজের করে নাও।

শাহাজাদা খুররমকে এই অবস্থায় এমনি কুটিল ভাবনাগুলি উত্তেজিত করতে তিনি হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে শূন্যে চীৎকার ছুঁড়ে দিলেন—তাই বলে আমি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হব? পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে আমি তাঁর সমস্ত স্নেহ হারাবো?

হঠাৎ খুররমের অন্তরাত্মা ব্যঙ্গ হেসে বললো—তোমার পিতা কি আর পিতা আছেন? এখন তিনি কুহকিনীর মায়াজালে পড়ে তারই মনোভিপ্রায় মত কাজ করছেন। এবার রাজত্ব শুরু হবে এক রমণীর। আর তোমার পিতা সেই রমণীর

বশীভূত হয়ে ক্রীড়নক হয়ে যাবেন। সেই পিতাকে অন্ততঃ মুক্তি দেওয়ার জন্যে তোমার মত সন্তানের অগ্রসর হওয়া উচিত—সিংহাসন শত্রু মুক্ত করার জন্যে প্রয়োজন যুদ্ধ।

খুররম আবার বললেন—আমার অন্যান্য ভাইরা আছে। বড়ভাই খসরুই এখন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, তার আগে তো আমি না। তাছাড়া পরভেজ, শাহরিয়া রয়েছে, আমি যদি সিংহাসনের জন্যে যুদ্ধ করি, তারাও করবে। তখন শান্তির সাম্রাজ্যে শুধু অশান্তিই সৃষ্টি হবে। লাভ কিছু হবে না বরং ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে অনেক বেশী।

আবার কে যেন উত্তর দিল—অত ভাবনার কি আছে? অশান্তির মাঝেই শান্তি খুঁজতে হবে। শান্তি চাইলেই কি শান্তি পাওয়া যায়? সাম্রাজ্যে সর্বদা অশান্তিই জেগে থাকে। এত বড় বৃহৎ সাম্রাজ্য বিদ্রোহহীন করে রাখতে গেলে সমস্যা অনেক। বহু অত্যাচারী রাজাও সেই অশান্তি দমন করতে পারে নি তো তুমি! আর তোমার ভাইদের জন্যে তোমার চিন্তা হচ্ছে, ভাবনার কি আছে? যারা সিংহাসনে বসবে তারা শক্তির পরীক্ষা দেবে। যে শক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, সিংহাসন তারই।

খুররম সেই অন্ধকারে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো—না, না, না, তবু না। সিংহাসনের বিনিময়ে এই অত্যাচার, এই অবিচার আমার দ্বারা করা সম্ভব হবে না। তবে পিতাকে বাঁচানোর জন্যে পুত্রের যেটুকু করা কর্তব্য তা আমি করবো। দাক্ষিণাত্য জয় করেছি শুধু সাম্রাজ্যের মঙ্গলে। সাম্রাজ্যের মঙ্গলে যদি আরো কিছু করা কর্তব্য হয়, অবশ্যই করবো। তবু বিশ্বাসঘাতকতা করে সাম্রাজ্যের মাঝে অশান্তির অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করবো না।

কিন্তু খুররম যতবারই নিজেকে সিংহাসনের লোভ থেকে বঞ্চিত করতে চাইলেন, পিতার বিরুদ্ধে অসি ধরতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে চাইলেন, ততবারই তাঁর অন্তরাত্মা তাঁকে উত্তেজিত করে সিংহাসনের সেই হীরা জহরত মণিমুক্তার ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন করাতে লাগলো। তার মনের মধ্যে লোভ জাগাতে লাগলো। বাদশাহী উষ্ণীষ মস্তকে পরে তিনি মোগল সূর্যের জ্যোতিমান পুরুষ মহামহিম আকবর শাহের মত নিজেকে বার বার মনে করতে লাগলেন। ফতেপুর সিক্রির সেই প্রাসাদের গরিমা, সেকেন্দ্রায় সমাহিত বীরপুরুষের সেই স্মৃতি বার বার তাঁকে সম্মুখে ঠেলে দিয়ে উত্তেজিত করতে লাগলো। সেই উত্তেজনায় শাহজাদার রক্তস্রোতে কেমন যেন তুফান উঠলো। রাহুর গ্রাস থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে নেবার জন্যে তাঁর কোষেভরা নিষ্প্রাণ তরবারী প্রাণ সঞ্চার করে চঞ্চল হয়ে উঠলো। শাহজাদার চোখে ভেসে উঠলো দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ। হাজার হাজার বীর সৈনিকদের তিনি ধরাশায়ী করেছেন। কিন্তু যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যের জন্যে। বাদশাহের আদেশে সে যুদ্ধে তাঁকে সেনাপতির পদ গ্রহণ করে যুদ্ধ জয়লাভ করতে হয়েছে। বিদ্রোহের হাত থেকে সিংহাসন মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু এবার যুদ্ধ করতে হবে নিজের জন্যে, সিংহাসন দখলের জন্যে। সে যুদ্ধের জয়লাভ সম্পূর্ণ তাঁর। তাঁর শৌর্যের বীর্যের পরিচয় চিরকালের জন্যে

প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। সে আনন্দ বড় সাংঘাতিক আনন্দ। তাঁর উপলব্ধি আলোর শিখা সৃষ্টি করবে। চতুর্দিকে তাঁর কীর্তি অঙ্কিত হয়ে তাঁকে লোকে সেলাম জানাবে। সেদিন যদি জীবনে কখনও আসে, তিনি খুশি হবেন।

কিন্তু সেদিনকে সেলাম জানাতে গেলে প্রয়োজন সবকিছু ত্যাগের। সবার স্নেহ হারিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অনেকের অভিশাপ নিয়ে তাঁর অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণসম আলোর পথ প্রশস্ত হবে, সেজন্যেই যা কিছু দ্বিধা। আর সেজন্যেই শাহজাদা খুররমের এই সন্ধ্যা ও রাত্রি একান্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে কাটছে।

কখন ভাবতে ভাবতে খুররম অলিন্দের ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন, তিনি জানেন না। হঠাৎ তিনি দেখতে পান চন্দ্রালোকিত আকাশের কোণে একখণ্ড কালো মেঘ ধীরে ধীরে চন্দ্রের ঔজ্জ্বল্য গ্রাস করছে। তিনি সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। দেখতে পেলেন কালো মেঘখণ্ড চন্দ্রের বর্ণ সুষমার ওপর আবরণ সৃষ্টি করে সমস্ত পৃথিবীর আলো কেড়ে নিল। শাহজাদার সামনে অলিন্দের অংশও অন্ধকারের ভয়ঙ্কর সরীসৃপ এসে কবলিত করলো।

রাত তখন কত হবে কে জানে? মাণ্ডু-দুর্গের চতুর্দিকে ঘুমের স্তব্ধতা। শুধু মাঝে মাঝে প্রাসাদের সিংহদরজার ওপর প্রহরীরা রাত্রির প্রহর ঘোষণা করছে। কিন্তু সে শব্দ কানে গেলেও শাহজাদা তখন অন্যমনস্ক। তিনি এতবেশী অন্যমনস্ক যে কেউ যদি পিছন থেকে তাঁর বুকে ছুরিকা বসিয়ে দিত তাহলেও বোধ হয় তাঁর কোন খেয়াল হত না। তার কারণ আগে দুবার খোজাপ্রহরী মনিবকে স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছিল রাত্রি অনেক হয়েছে বলে। তাছাড়া মমতাজ অন্দরমহল থেকে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন শাহজাদাকে, আর কতরাত্রি করবেন জনাব। কিন্ত যে সংবাদ নিয়ে এসেছিল সে শাহজাদার মানসিক অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে খোজাপ্রহরীর কাছে সে-সংবাদ গচ্ছিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে। আর খোজাপ্রহরী সেই সংবাদ পরিবেশনের জন্যে দুবার কক্ষে প্রবেশ করেছে কিন্তু অন্ধকারে শাহজাদার মুখের অবস্থা দেখে ভীত হয়ে নিঃশব্দে পালিয়ে গেছে।

এর মধ্যে অবশ্য দু'তিনবার শাহজাদা আনারের সংবাদ নিয়েছেন, কিন্তু সংবাদ পেয়েছেন আনার গাঢ় নিদ্রার কোলে সমাহিত। আনারকে তাঁর হঠাৎ দারুণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ তার আসবার কিছুক্ষণ পরেই একটি গুপ্তচর ধরা পড়েছে। সে এখন কারাগারে বন্দী হয়ে আছে। কোন কিছুই কবুল করে নি। তবে শাহজাদা বুঝতে পেরেছেন এ সম্রাজ্ঞীর গুপ্তচর। সংবাদ সংগ্রহের জন্যে এসেছিল বা তাঁর কোন অনিষ্টসাধন করতে এসেছিল। হয়ত বা তাঁকে বধ করার জন্যে অতর্কিতে এই দুর্গে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল। সেজন্যই তাঁর চিন্তা বেড়েছে। খুব তাড়াতাড়ি একটা কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে আরো বিপদে পড়তে হবে। এই গুপ্তচরের না হয় প্রাণদণ্ডের আদেশ দেবেন কিন্তু এমনি কত গুপ্তচর তাঁর সুহৃদের ছদ্মবেশে এই দুর্গে লুকিয়ে আছে কে জানে? যদি তারা শাহজাদাকে একটু অসাবধান অবস্থায় দেখে তাহলে আর রক্ষা নেই। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বাতাস বিদ্ধ করে ছুরিকা শানাবে।

সেজন্যে এতোরাত্রে শাহজাদার চিন্তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এবং তিনি ভেবে চলেছেন অনেক উপায়।

হঠাৎ তাঁর চিন্তা খন্ডবিখন্ড হয়ে গেল। সমস্ত প্রাসাদটা মুহূর্তে প্রচন্ডভাবে দুলে উঠলো। একটা নয়, বহু চীৎকার একসঙ্গে আতঙ্কিতস্বরে সমস্ত প্রাসাদের প্রস্তরময় ভিত কম্পিত করে উত্থিত হল। সঙ্গে সঙ্গে রমণীও পুরুষের আরো চীৎকার, আরো ক্রন্দন। কে যেন তীক্ষ্ম ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করলো কার বুকে। একটি পুরুষের আর্তস্বর প্রতিধ্বনি হল সমস্ত বাতাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তারপর তা স্তব্ধ হয়ে গেল। আবার একটি রমণীকন্ঠের আর্তস্বর সেই পুরুষ স্বরের সঙ্গে একত্রিত হয়ে সোচ্চার হয়ে উঠলো।

শাহজাদা আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। চঞ্চল হয়ে উঠলেন। দ্রুতপায়ে অলিন্দ থেকে ফিরে কক্ষ পার হয়ে বাইরের বিরাট লনে এসে দাঁড়ালেন। চেয়ে দেখলেন প্রাসাদের সমস্ত আলো জ্বালা হয়েছে। খোজা প্রহরীরা ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করছে। অনেক পায়ের শব্দ সোপানের পর সোপান অতিক্রম করতে করতে ওপরে উঠছে, আবার নীচে নেমে যাচ্ছে। শাহজাদা সবচেয়ে উঁচ অলিন্দের ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি সেখান থেকে দেখতে পেলেন বিরাট দুর্গের সমস্ত অট্টালিকাগুলির কক্ষ আলোকিত হয়ে উঠেছে, ওখানে আছে তাঁর বিরাটবাহিনী। অনেক উচ্চপদস্থ সৈনিক, সেনাপতি, আমীর, ওমরাহ তাঁরা তাঁদের পরিবারবর্গ নিয়ে এই দুর্গেই অবস্থান করছেন। তাছাড়া আছে অশ্বারোহী, পদাতিক বৃহৎ সৈন্যবাহিনী। তারা দাক্ষিণাত্য জয় করে এখানে এসে বিশ্রাম নিচ্ছে। এরা বাদশাহী সৈন্য। এদের ফেরৎ দেবার কথা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ফেরত দেন নি, তাঁর ইচ্ছা এই বাহিনী সঙ্গে নিয়ে তিনি কান্দাহার বিজয় করবেন। দেখতে পেলেন দুর্গের বিভিন্ন অংশ থেকে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা প্রাসাদের গোলমাল শুনে এইদিকে আসছে।

শাহজাদা ঘটনাটি জানবার জন্য খুব উদগ্রীব হয়েছিলেন, চঞ্চলতাও তাঁর মনের মধ্যে জেগেছিল কিন্তু বাইরের অলিন্দে এসে তিনি তা সংবরণ করে নিলেন, কারণ তিনি বুঝতে পারলেন এত সহজে চঞ্চলতা প্রকাশ করলে শত্রুপক্ষ তাঁর মানসিক অবস্থার গভীরতা বুঝতে পারবে, তখন তারা সেই গভীরতার পরিমাপ করে আরো তৎপর হয়ে উঠবে। তিনি এও বুঝতে পেরেছিলেন যে শত্রুপক্ষ তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। হয়ত এইরাত্রেই তাঁর পরিবারবর্গ ধ্বংস করে তাঁকে হত্যা করবে, কিম্বা বন্দী করে অন্ধকার কারাগারের মাঝে নিক্ষেপ করবে। পরিবারবর্গের কথা স্মরণ হতে তাঁর মনটা আবার চঞ্চল হল। তারা কেমন আছে জানবার জন্যে তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালিত করে কোন বাঁদীকে খুঁজলেন কিন্তু কাকেও কাছাকাছি দেখতে পেলেন না। দেখতে না পেতে তাঁর সন্দেহটা হঠাৎ বদ্ধমূল হল। তবে কি মমতাজের কিছু হল? রমণীকন্ঠের আর্তনাদ শুনেছিলেন কিন্তু সে-আর্তনাদ মমতাজের কন্ঠস্বর—এতো একবারও মনে হয় নি! মমতাজ তার তিনপুত্র ও এক কন্যা নিয়ে হারেমের মধ্যে বহু পরিচারিকা পরিবৃতা হয়ে বাস করছে। আজ তিনি সেই হারেমের মাঝে মমতাজের

পালঙ্কে শয্যা গ্রহণ করেন নি, এই সুযোগ নিয়ে যদি কোন আততায়ী মমতাজদের প্রাণ নিঃশেষ করে থাকে? সকলেই তো জানে, মমতাজের কিছু হলে শাহজাদা খুরমের শক্তি অনেকখানি খণ্ডিত হতে পারে। এই অনুমানেই শত্রুপক্ষ তাঁর অনিষ্ট-সন্ধানে মমতাজের প্রাণ গ্রহণ করতে পারে। কিম্বা কোন পুত্র, কন্যার প্রাণও বধ হতে পারে। জাহানারা এর মধ্যেই মাতার গুণগুলি আয়ত্ব করেছে, জাহানারাকে কেউ বধ করে শাহজাদার হৃদয়ে আঘাত হেনে তাঁর শক্তিহরণ করাও বিচিত্র নয়। আর বধ করাও খুব বিশেষ অসুবিধার নেই। হারেমে অগুণতি পরিচারিকা, রঙমহলে নর্তকী, সুগায়িকার অভাব নেই। তাদের মধ্যে কোন একজন সম্রাজ্ঞী কর্তৃক প্রলোভিত হয়ে এই নারকীয়যজ্ঞ সংঘটিত করা একেবারেই অসম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে হঠাৎ শাহজাদা খুরমের মনে পড়লো আনারকে। আনারকে মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চমকে উঠলেন। তবে কি আনার এইসব কাজের প্রধানা! আনার ছলনার আশ্রয় নিয়ে মহব্বতের রোশনী জেলে শাহজাদার কৃপা ভিক্ষা করলো। তারপর শাহজাদার মনে কোমলতার স্পর্শসৃষ্টি করে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করলো। এবং এই বিশ্বাসই তাকে শাহজাদার হারেমে থাকার স্থান ঠিক করে দিলো। আনার বুঝেছিল এখানে থাকা বেশীদিন চলবে না, তাই অতর্কিতে আজই বিশ্রামের পর তার কর্তব্য সমাধান করেছে!

শাহজাদা আরো বিস্ময়ে ভাবলেন—আওরত কি দারুণ ছদ্মবেশ পরিধান করে অভিনয়ের আশ্রয় নিতে পারে? এই সূত্রে আবার তাঁর মেহেরউন্নিসার কথা মনে পড়লো—ঐ তো আর একটি রমণী! কোথা থেকে এসে পিতার স্কন্ধে চেপে বসলো, পিতাকে একেবার মূষিক বানিয়ে নিজের সাম্রাজ্যের শাসন ভার হাতে নিল। এই জন্যেই আওরতকে তাঁর আজকাল দারুণ ভয় করে। হ্যাঁ, বলা উচিত নয় তবু বলতে হচ্ছে, মমতাজকেও তাঁর ভয় করে। মমতাজ যদিও খুব ভাল। তার হৃদয়, মন একই ছাঁচে তৈরী। তার সুরত আকাশের শুভ্র মেঘপুঞ্জের মত স্বচ্ছ। তার মহব্বত প্রেয়সীর মত রক্তিম, জননীর মত স্নিগ্ধ। তার সোহাগ জোয়ানী আওরতের মত নিবীড়, আবার স্পর্শের মধ্যে এমন এক শান্ত ও স্নিগ্ধভাব আছে, যা আওরতের উগ্রস্পর্শের মাদকতার উর্ধ্বে স্থান পেতে পারে।

তবু এই মমতাজকেও তাঁর কিছুদিন ধরে ভয় করতে শুরু হয়েছে। বার বার তাঁর কেমন যেন মনে হয়, মমতাজও ইচ্ছে করলে তার স্বামীর বুকে ছোরা বসাতে পারে। স্বার্থ, স্বার্থ মানুষের অনেক রকম থাকতে পারে। তাছাড়া মমতাজ আসফ খাঁর কন্যা। আসফ খাঁ এখন নূরজাহানের মন্ত্রী। নূরজাহানের পিতা ইত্‌মাদউদ্দৌলা ঘিয়াসবেগ মারা যাবার পর আসফ খাঁ এই নূতন পদ পেয়েছেন। পিতার প্ররোচনায় হয়ত কন্যা বাধ্য হবে স্বামীকে হত্যা করতে। মমতাজ হয়ত স্বামীর প্রতি আকর্ষণে ইচ্ছুক হবে না, তাছাড়া সত্যিই মেয়েটি বড় ভালবাসে। মহব্বতের গাঢ়রঙ তার সমস্ত দেহের প্রতিটি খাঁজে খাঁজে। মনের এই প্রকট সোহাগ তো লুকানো যায় না? তার রঙ, তার আকৃতি এত স্পষ্ট যে সবাই তার সত্যিকার

চেহারা দেখতে পায়। তেমনি শাহজাদা খুররমও মমতাজের নিবিড় সোহাগের কথা জানতেন। তবু তার কিছুদিন ধরে কি হয়েছে—তিনি সর্বদা আওরতের কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেন। অবশ্য মমতাজ কখনও টের পায় নি, পেলে যে কি করতো কে জানে? হয়ত অভিমানে একটা কান্ড করে বসতো।

এই সময় দুজন খোজা প্রহরী হন্তদন্ত হয়ে এসে দাঁড়ালো। তারা হাঁফাতে হাঁফাতে বললো—হুজুর বড় তাজ্জবকান্ড, কারাগার থেকে সেই দুশমন ভেগে গেছে।

শাহজাদা খুররম কোন চঞ্চলতা প্রকাশ করলেন না, শুধু সংযত কণ্ঠে বললেন আর হারেমের সংবাদ?

এই সময় হারেমের পথ দিয়ে আর একটি খোজা এসে শাহজাদা খুররমকে কুর্নিশ জানিয়ে বললো- হুজুর, একবার অন্দরমহলে বেগম সাহেবা সেলাম দিয়েছেন!

শাহজাদা খোজার কথা শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে মনে মনে বললেন—তাহলে বেগমসাহেবার কিছু হয় নি। তবে কি তার কোন পুত্র বা কন্যা? দারার কথা মনে আসতে তার মন দারুণ কাতর হল। দারাকে ঠিক পিতৃপুরুষ কবরশায়িত সম্রাট আকবরের মত দেখতে হয়েছে। তেমনি বলিষ্ঠ মন, আদর্শপ্রিয়, উদারচেতা, বীরপুরুষ। যদি কখনও সে সিংহাসন পায় নিশ্চয় সে হিন্দুস্তানের সমস্ত মাটিতে এক বিরাট পবিবর্তন সাধিত করতে পারবে। তার ওপর অনেক আশা পোষণ করেন শাহজাদা খুরম। তবে কি সেই হত হয়েছে? দন্ডায়মান খোজার কাছে জানতে ইচ্ছা করলো সেই দুঃসংবাদ। কিন্তু তাঁর স্বভাবের মধ্যে কৌতূহল বড় কম বলে তিনি শুধু খোজার দিকে তাকিয়ে বললেন---তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।

এই সময় সেই রাত্রিতে দুর্গের অন্য অংশ থেকে শাহজাদা খুরমের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা এসে ঔৎসুক্য নয়নে শাহজাদার দিকে তাকালেন। শাহজাদা শুধু হাত নেড়ে তাঁদের অপেক্ষা করতে বলে অন্তঃপুরের দিকে দ্রুত অগ্রসর হলেন।

অন্তঃপুরে যেতে গেলে বিরাট দেউড়ির পর অসংখ্য সোপানশ্রেণী। সেই সোপানশ্রেণী অতিক্রম করলে একটি গলিপথ, গলিপথের পর বাঁদীমহল, নর্তকীমহল তারপর সেগুলি পাশে রেখে খাসমহলে যেতে গেলে একটি ছোট আকারের মসজিদ, মসজিদের পর বাবুর্চীখানা, মানে খাসমহলের রান্নাগুলি ওখানেই হয়। শাহজাদা এই রান্নার খাদ্যই গ্রহণ করেন। আর মমতাজ নিজে রান্না তদারক করেন বলে বাবুর্চীখানার এখানেই ব্যবস্থা হয়েছে, না হলে বারমহলে রান্না হত আর রান্না করতো পুরুষবাবুর্চীরা। সেই বাবুর্চীখানার পর মমতাজের পুত্র কন্যার খবরদারীর জন্যে দুজন ধাত্রী থাকেন দুটি কক্ষে—অবশ্য এ কক্ষ দুটি খাসমহলের সীমানার মধ্যেই। আর আছে কয়েকটি বেওয়ারিশ কক্ষ—সুন্দরভাবে সেই কক্ষগুলি সাজানো। কোন রমণী অতিথি এলে সেখানে বাস করতে পারে বলে সেগুলি সর্বদা প্রস্তুত থাকতো। এরই একটিতে আনারের বাসস্থান নির্দিষ্ট করেছিলেন শাহজাদা খুরম। এর ঠিক পরেই খাসমহল। মমতাজ সেখানে তার পুত্রকন্যা নিয়ে বাস করেন আর শাহজাদা বিশ্রামের প্রয়োজন হলে যান কিম্বা একেবারে রাত্রিতে শয়নের জন্যে বেগমের মন্দিরে

গিয়ে প্রবেশ করেন। এই খাসমহলে অবশ্য আর একটি ভিন্ন মূল্যবান কক্ষও আছে সেটি প্রয়োজন হলে শাহজাদা নিজে ব্যবহার করেন। অবশ্য এই ব্যবস্থা দ্রুত মান্ডুদুর্গে এসে আস্তানা করতেই অস্থায়ীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল, যদি এখানে কিছুকাল থাকতে হয়, তাহলে শাহজাদার ইচ্ছে আছে, তিনি নিজের মত করে সাজিয়ে এখানে বাস করবেন, এই জায়গাটি বড় মনোরম।

শাহজাদা দ্রুতই চলছিলেন হঠাৎ সেই গলিপথের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। পাশে দেয়ালে রৌপ্যাধারে রক্ষিত অত্যুজ্জ্বল বর্তিকা। কিন্তু তিনি সেই আলোর দিকে না তাকিয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকালেন। তাকাতেই সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বিদঘুটে শব্দ করতে করতে আকাশের ওপর দিয়ে চলে গেল। শাহজাদা অন্যমনস্ক হয়েছিলেন, দারুণভাবে চমকে উঠে তিনি অন্ধকার আকাশের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে নিজের কোমরের বন্ধনীতে রক্ষিত কোষবন্ধে হাত দিলেন। তারপর নিশাচর পাখীর ঐ বিদঘুটে, বিশ্রী, ভয়ের আতঙ্কিত শব্দ উপলব্ধি করে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি নিজের মনে হেসে আবার চলতে লাগলেন। মনে মনে তিনি নিজের অবস্থার জন্য অনুতাপও করলেন—এত ভীরু, দুর্বল যদি কেউ বুঝতে পারে, তাহলে কি সে এই সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে বাঁচিয়ে রাখবে? সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে দেবে পৃথিবী থেকে। আচ্ছা, তিনি নিজে এত দুর্বল হয়ে পড়লেন কেন? হঠাৎ যেন তাঁর রক্তের তেজ কমে গিয়ে তাঁকে পঙ্গু করে দিল। অশ্বপৃষ্ঠে দিনের পর দিন সওয়ার হয়ে শত্রুর বক্ষে অসির অগ্রভাগ প্রবেশ করিয়ে ললাটে সেই রক্তের জয়লিপি এঁকেছেন—দাক্ষিণাত্য জয় যে তার জীবনের এক পরম বীরত্ব প্রকাশের সন্ধিক্ষণ—সেই মুহূর্তটি কিছুতে নষ্ট হতে দেন নি। দাক্ষিণাত্য জয় করেই তিনি প্রমাণ করেছেন, সিংহাসন যদি তিনি পান—তাহলে সঠিক অবস্থায়ই তাকে রক্ষা করার ক্ষমতা তিনি সঞ্চিত করবেন।

এই বীরত্ব যখন তাঁর প্রমাণ হয়ে গেছে তখন হঠাৎ আজ এই রাত্রিতেই বা এত তিনি দুর্বলতা অনুভব করছেন কেন?

সে প্রশ্নের উত্তর তিনি পেলেন না তখন তিনি অন্তঃপুরের অতিথি কক্ষের সামনে এসে পড়েছেন এবং সেই কক্ষের সামনেই যত আওরতের ভয়কাতর জটলা। শাহজাদা যেতেই তারা একটু সরে দাঁড়ালো। সরে দাঁড়াতেই যে পথটি হল, সেই পথের মাঝখানে শোয়ানো একটি রমণী রক্তাক্ত শরীর। একটি দীপদান এনে সেই রক্তাক্ত দেহটির কাছে রাখা হয়েছে। সেই আলোতে শাহজাদা দেহটি দেখে বুঝতে পারলেন সে মৃত। তাকে যে ছোরার আঘাতে হত্যা করা হয়েছে তারও চিহ্ন স্পষ্ট, কারণ একখানি ইস্পাহানি ছোরা রমণীটির কণ্ঠনালী ভেদ করে চলে গেছে।

রমণীটি মারা গেছে কিন্তু তার চক্ষু দুটি নিথর হয়ে তাকিয়ে আছে আতঙ্কে। শাহজাদা উপলব্ধি করলেন রমণীটি মরতে চায় নি কিন্তু যখন সে দেখলো আততায়ী তার ছুরিকা উত্তোলিত করেছে তখন সে নিবারণের জন্যে ভয়ে ও আতঙ্কে ঐরকম চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করেছিল।

হঠাৎ শাহজাদা গম্ভীর হয়ে বললেন—কে একে অত্যন্ত নৃশংস ভাবে হত্যা করেছে ?

এক ঝাঁক আওরতের ভেতর থেকে যে বেরিয়ে এসে উত্তর দিল তাকে সেই অল্প আলোয় খুরম দেখে চমকিত হলেন, সে আনার। আনার স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিল—আমি হত্যা করেছি শাহজাদা। তারপর সে রাজোচিত কায়দায় তিনবার সেলাম করে বললো—কিন্তু বাধ্য হয়েছি জাঁহাপনা। এ ছাড়া আমার কোন উপায়ও ছিল না। আমাকে যে হত্যা করতে এসেছিল, আমি আত্মরক্ষার জন্যে তার পিছনে তাড়া করি। সে অতর্কিতে কক্ষের বাইরে চলে আসতে আমিও আসি, কিন্তু অন্ধকার অলিন্দ, ঠিক ঠাহর হল না সে পালিয়ে গেল না লুকিয়ে রইলো। উদ্ধত ছুরিকা নিয়ে অল্প অনুসন্ধান করতেই তাকে দেখতে পেলাম একটি থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। আমিও অতর্কিতে তাকে আক্রমণ করে তার কণ্ঠনালী লক্ষ্য করে ইস্পাহানী ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করে দিই। নিমেষে সে ঢলে পড়ে এই মর্মরময় হর্ম্যতলে কিন্তু অল্প আলোয় তার অবয়ব দেখে আমি চমকে উঠি। একি করেছি আমি? এ তো তার কক্ষে আগত সেই আততায়ী নয়, এ যে অন্য এক রমণী? কই এ তো তাকে হত্যা করতে কক্ষে ছুরিকা হাতে প্রবেশ করে নি? যখন এমনি দিশেহারা হয়ে ভাবছি সেইসময় হঠাৎ অন্ধকারে কে যেন রমণীকণ্ঠে হি হি করে হেসে বললো—তুমি একটি নিরপরাধা আওরতকে হত্যা করেছ, এর জন্যে শাহজাদার বিচারের অপেক্ষায় থেকো। আর যদি শাহজাদা বিচার না করেন, তাহলে আল্লা তোমার বিচার করবেন।

তারপর সঙ্গে সঙ্গে দুটি বাঁদী ও দুটি খোজা প্রহরী ঘুম চোখে ছুটতে ছুটতে এসে এখানে উপস্থিত হল। সমস্ত প্রাসাদ কম্পিত করে আমাদের চীৎকার উত্থিত হয়েছিল, এ ছাড়া অন্যদিক থেকেও পুরুষকণ্ঠের আর্তস্বর ও দিকবিদিক পূর্ণ করলো। খোজা প্রহরী দুজন সেই শব্দ শুনে অন্যদিকে ছুটে গেল, আমি শুধু বাঁদী দুজনকে কম্পিতস্বরে বললাম—তোমরা এখানে মৃতদেহের পাহারায় অপেক্ষা কর, আমার বড় ক্লান্তি লাগছে আমি নিজের কক্ষেই আছি, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে—কে একে হত্যা করেছে তখন বলবে—আনারবিবি আত্মরক্ষার জন্যে হত্যা করেছে। আর শাহজাদা এলে, জবাব আমিই দেব।

আনার এই পর্যন্ত বলে স্তব্ধ হলে শাহজাদা চোখদুটি আনত করলেন। সহস্র আওরতের চোখ তার দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলো। শাহজাদা এরই মধ্যে আনারের রূপের রোশনাই দেখে চমকিত হলেন। বিশ্রামের পর আনারের যে রূপের খোলতাই হয়েছে, এ হারেমে তার জোড়া নেই। শাহজাদা আনারের রূপের প্রশংসায় মনে মনে মুখরিত হলেন। কিন্তু হঠাৎ এইরাত্রের ঘটনা স্মরণ করে ঐ সুন্দরী আওরতের প্রতি তার সন্দেহ বদ্ধমূল হয়ে উঠলো। আনারের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে একাধিক আওরত তার বিনা অনুমতিতে এই প্রাসাদে প্রবেশ করেছে কিন্তু আনার সত্যি কথা বলছে তারই বা প্রমাণ কি? সে একটা বানানো কাহিনীও তো

বলতে পারে! যে রমণী এতখানি পথ বাধাবিপত্তির মধ্যে অতিক্রম করে এখানে আসতে পারলো, সে একটা কাহিনী বানিয়ে বলতে পারবে না? যদি তাই হয়, তাহলে যাকে আনার খুন করেছে সেই রমণীটি কে?

প্রশ্নটি মুখের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে চারিদিকে তাকালেন শাহজাদা খুরম। মমতাজ একপাশে আতঙ্কিত চোখে, পান্ডুবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে তার আট বছরের জাহানারা, সাতবছরের দারা, ছ'বছরের সুজা ও সর্বকনিষ্ঠ চার বছরের ঔরঙ্গজেবকে সঙ্গে করে। সেই চারটি শিশু ব্যাকুল চোখে পিতার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। পিতার মুখের আদেশ শোনার জন্যে তাদেরও চোখে ঔৎসুক্যভাব।

খুরম হঠাৎ মমতাজের দিকেই তাকিয়ে বললেন—তাজবিবি, যে আওরতটি খুন হয়েছে, তাকে কি তুমি চেনো?

মমতাজ এগিয়ে এলেন স্বামীর কাছে, তারপর মৃত রমণীর চেহারাটি আলোতে ভালভাবে দেখে সুমিষ্টস্বরে বললেন—না শাহজাদা, একে কখনও দেখেছি বলেতো মনে হয় না। তবে তুমি যদি কোন নবনিযুক্ত আওরত প্রাসাদে নিয়ে এসে থাকো তাহলে বলতে পারবো না।

শাহজাদা উপস্থিত আওরতদের দিকে তাকিয়ে আদেশ দিলেন—সকলে সার বেঁধে দাঁড়াও। মমতাজবিবি পরীক্ষা করে দেখবেন, এর মধ্যে নতুন কোন আওরত প্রবেশ করেছে কিনা। তারপর আনারের দিকে তাকিয়ে শাহজাদা বললেন—মহিষী, এই একটিমাত্র আওরত আজ আমার অনুমতিতে এই হারেমে স্থান পেয়েছে।

ততক্ষণে সমস্ত আওরতগুলি সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মমতাজ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সমস্ত মুখগুলি পরীক্ষা করে মাথা নেড়ে বললেন—না শাহজাদা, আর কোন নতুন আওরত এর মধ্যে নেই।

শাহজাদা তাকালেন আনারের দিকে। তাঁর মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠলো।

আনারও সেই দৃষ্টির অর্থ বুঝে মাথা নত করলো।

শাহজাদা ধীরে ধীরে কঠিনস্বরে বললেন—যদি তোমার কথাই সত্য হয়, তাহলে যে তোমাকে হত্যা করতে এসেছিল, সে আওরতটি কোথায় গেল? বাইরে থেকে কোন আওরত প্রাসাদে প্রবেশ করা খুবই কঠিন ব্যাপার কারণ সতর্ক প্রহরী সর্বদা পাহারা দিয়ে চলেছে প্রাসাদ-ফটক। তারপর শাহজাদা বললেন—এই নিহত আওরতটিও কোত্থেকে এল তাও অবশ্য আমাদের অজানা। প্র

এইসময় একজন খোজা প্রহরী হন্তদন্ত হয়ে এসে শাহজাদাকে জানালো—হুজুর, সেই বন্দী ধরা পড়েছে কিন্তু তাকে কে যেন হত্যা করেছে, তাকে নিহত অবস্থায় আপনার রঙমহলের গলিপথে পাওয়া গেছে।

শাহজাদা খুরম সমস্ত ঘটনাটি একত্রিত করে মনে মনে সাজাতে লাগলেন। এরমধ্যে তার প্রাসাদে নবাগতা আনারকেই একমাত্র জীবিত পাওয়া গেল। যদি এই ঘটনার রহস্য উদঘাটন করতে হয় তাহলে আনারকেই সর্বাংশে দায়ী করা উচিত

কারণ আনার হত্যা করেছে একটি রমণীকে। সে স্বীকার করেছে তার অপরাধ। যে নিহত হয়েছে সে কোত্থেকে এল কেউ জানে না! এ প্রাসাদের সে কেউ নয়। তারপর আনারের গল্প যদি সত্য হয়, তাহলে যে রমণীটি আনারকে আক্রমণ করেছিল—সে কে? তাকেও কি আনার চিনতে পারে নি? তারপর বন্দীকে মুক্তি দিল কে? আর কী স্বার্থে তাকে হত্যা করা হল! একটি মানুষের পক্ষে এতগুলি কর্ম একই সময়ে পালন করা কি সম্ভব? তবু শাহজাদার মনে হল, এ সবের জন্যে আনারই দায়ী। আনার আজ প্রাসাদে প্রবেশ করার পর থেকেই এইসব ঘটনা ঘটেছে! আনারকে একবার ভালভাবে অনুসন্ধান করলেই মনে হয় অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে।

হঠাৎ শাহজাদা খোজা প্রহরীকে জলদগম্ভীরস্বরে আদেশ দিলেন—এই আওরতকে এখুনি কারাগারে নিক্ষেপ কর।

আনার হঠাৎ শাহজাদার আদেশ শুনে বিস্ময় ও বিস্ফারিতস্বরে বললো—জনাব এ আদেশের অর্থ?

শাহজাদাও সঙ্গে সঙ্গে কঠিনস্বরে স্পর্ধিত ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন—সম্রাট আকবরের পৌত্র, হিন্দুস্তানের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শাহজাদা খুররম ওরফে দাক্ষিণাত্য বিজয়ী বীর শাহজাহান কখনও কোন কাজের কৈফিয়ৎ দেয় না।

আনার চীৎকার করে কেঁদে উঠলো, বললো—শাহজাদা শুনুন আমি যা গোপন করেছি, বলছি। যে নিহত হয়ে পড়ে আছে সে বাদশাহী হারেমে আমার পরিচারিকা ছিল, তার নাম জুবেদা কিন্তু সে কেমন করে এখানে এলো, তা আমি জানি না। আপনি বিশ্বাস করুন শাহজাদা এর বেশী আর কিছুই আমি জানি না। আর যে রমণীটি আমার কক্ষে ঢুকে আমাকে হত্যা করতে এসেছিল সে বহুকাল আগে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের প্রধানা পরিচারিকা আমিনা ছিল। পরে তার চরিত্রের একটি কলঙ্ক প্রচারিত হতে তাকে বিতাড়িত করেন সম্রাজ্ঞী। আমিনা শুনেছি সেনাধ্যক্ষ জৈন-উল-আবেদীনের অন্দরমহলেই পড়ে থাকতো। সে এখানে কেমন করে এলো, আমি তার কিছুই জানি না। সে কার দ্বারা নিয়োজিত হয়ে আমাকে হত্যা করতে এলো, তাও বুঝতে পাচ্ছি না। অ স জৈন উল-আবেদীন সম্ভবতঃ এর পশ্চাতের সমস্ত কিছু পরিচালনা করছে। ...রবা শাহজাদা বললেন—ঠিক আছে আমি শুনলাম অনেক কিছু। পরে এ ...য়, তোমার দোষগুণ প্রমাণ করা যাবে। তার আগে তোমাকে কারাগারের ...গে আজকের মত রেখে আমাকে নিশ্চিন্ত হতে দাও। এই বলে শাহজাদা ...হয়ে বাঁদের ইঙ্গিত করতে তারা আনারকে শৃঙ্খলিতা করলো।

...রে আনার হঠাৎ কেমন যেন অসংযত হয়ে চীৎকার করে ক্রন্দনভারে বললো—শাহজাদা, আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। আপনি কি বুঝতে পারলেন না, ...নাকে ঘিরে একটি বিরাট চক্রান্ত আমাকে শেষ করে দিতে চাইছে।

তারা আনারকে নিয়ে প্রহরীরা চলে গেলে শাহজাদা মৃতদেহের সমুচিত ব্যবস্থার

আদেশ দিয়ে একরকম টলতে টলতে খাসমহলের দিকে এগোলেন। নিজেকে তাঁর বড় ক্লান্ত লাগছিল। একে সারারাত্রি চিন্তা, কেমন যেন পরিশ্রান্ত, তাঁর ওপর নিদ্রাহীন অবস্থায় তাঁকে রাত কাটাতে হয়েছে, এতটুকু বিশ্রাম পর্যন্ত মেলেনি, তারপর এই নৃশংস ঘটনা। হত্যা, চীৎকার, আতঙ্ক, ষড়যন্ত্র সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা কুয়াশার জাল সমস্ত প্রাসাদের জৌলুসের ওপর ধোঁয়ার রূপ সৃষ্টি করেছে। আর সেই ধোঁয়ার মাঝে পথ হারিয়ে শাহজাদা দিশেহারা হয়ে অচৈতন্যের মত শরীরটাকে টেনে টেনে খাসমহলের দিকে নিয়ে গেলেন।

তখন ভোরের আলো অল্প অল্প ফুটছিল। জৌলুস ছড়াচ্ছিল স্বর্ণাভা। দিনের মূর্তি অপরূপ আলোর আনন্দে ভূষিত হয়ে প্রাসাদের অন্ধকার অংশ, তার রহস্য মোচন করছিল।

কে যেন হঠাৎ শাহজাদার হাত ধরলো, শাহজাদা চমকে উঠে তার দিকে তাকালেন, দেখলেন জাহানারা তাঁর হাত ধরে বিশ্রামকক্ষে নিয়ে যাচ্ছে। বড় ভাল লাগলো শাহজাদা খুররমের। বড় শান্তি লাগলো কন্যার এই নীরব ভালবাসায়। সে বুঝেছে, তার পিতা দারুণ দুঃখিত হয়ে মরমে মরে গেছে এই বর্তমান মুহূর্তে—তাই নিজেই ছুটে এসেছে পিতার দুঃখের উপশম করতে। হঠাৎ শাহজাদা পরম আদরে কন্যাকে কোলে তুলে নিলেন, তারপর তার ছোট্টবুকে মুখটি লুকিয়ে কাতরকণ্ঠে ফিস ফিস করে বললেন—এমনি করে তুই যেন আমাকে সারাজীবন সান্ত্বনার মাঝে ধরে রাখিস্ বেটি! আমার জীবনে আরো অনেক অনেক এমনি দুঃসময় আসবে, সেদিন তোর যেন এই ছোট্ট বুকে আমাকে আশ্রয় দিয়ে তোর পিতার দুঃখের ভার লঘু করিস!

তারপর শাহজাদা খুরম কন্যাকে নিয়ে বিশ্রামকক্ষে ঢুকে তাকে পালঙ্কের একপাশে বসিয়ে তিনি শয্যার ওপর নিজের ক্লান্তদেহভার ঢেলে দিলেন। তারপর জাহানারাকে ফিসফিস করে বললেন—বেটি, তুই এখানে বসে আমাকে পাহারা দে। দেখিস কেউ যেন আমাকে জ্বালাতন করতে না সাহস করে?

একটি বৃহৎ কারাগারের মধ্যে আনার সম্পূর্ণ একা। সে ভাবছে এতো আয়োজন করে এসে শেষপর্যন্ত কি কপালে এই জুটলো? সম্মানের সিংহাসন থেকে নেমে একেবারে অবহেলার তীর্থে? অথচ মনে ছিল কত শাহজাদা হয়ত তার সুরত দেখে মনের মধ্যে উত্তেজনা অনুভব করবেন। মাদকতা, চোখে নেশার আমেজ অনুভব করে তার দেহের বুকে স্পর্শের আঁকবেন। আর সেই স্পর্শসুখে আনার মুগ্ধ হয়ে নিজের সৌভাগ্য করবে। এই আশায় প্রণোদিত হয়েই সে এখানে এসেছিল কিন্তু প্রথম

সে বিফল হল, শাহজাদা তার রূপে মুগ্ধ হলেন না বরং তিনি এমন সব প্রশ্ন করতে লাগলেন, যা শুনে আনার নিজেই মর্মাহত হল। তারপর শেষ পরিণতি এই। এই কারাগার-বাস। শাহজাদা সন্দেহ করেন এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে তারও কোন যোগাযোগ আছে! হায়, এই যদি মনে থাকতো, তাহলে এতদূর আসা কেন? সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের সঙ্গে দীর্ঘ সময়ের পরামর্শে এই পরিবারের ধ্বংস কি উপায়ে, কত সহজে সাধিত হতে পারে, তারই আলোচনা সে করতো। তাহলে যে জীবনের গতি অনেক সহজ খাদে এগিয়ে চলতো। এই সুদূর পথ অনেক অন্যায়ের মুসাবিদা করে বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে আসার প্রয়োজন হত না। আর যে শাহজাদার মহব্বত পাবার জন্যে তার এই আগমন—সে যদি মনের মধ্যে উচ্চাশা না জাগাতো তবে কিসের এই নির্যাতন?

আনারের মনে পড়লো ওসমানকে। ওসমান আশায় আছে তাকে পাবার জন্যে। ওসমানকে সে মিথ্যে প্রলোভন দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে, এ ছাড়া তার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। মিথ্যের আশ্রয় নিতে যেটুকু তাকে কপটতা গ্রহণ করতে হয়েছে, সে সবই একটি মানুষের জন্যে। এই একটি মানুষের জন্যে পৃথিবীতে আওরতরা যা করে আসছে, সে তাই করেছে, বেশী অবশ্য কিছু করেনি—তবে যা করেছে তা যদি সফল হত তাহলে তার এই পরিশ্রম সার্থক হত।

কিন্তু সবই তার ব্যর্থ হয়েছে। সমস্ত উদ্যমই অসার্থক। আর তার পরিণতি এই কারাবাস। শাহজাদা খুররম তার সম্মানের কোন মূল্য, ইজ্জতের কোন ইনাম না দিয়ে অপরাধীর সাজার জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

অপরাধীর সাজা। অপরাধিনীর শাস্তি। কঠিন বিচারের লৌহসম ব্যবস্থা। আনার মনে মনে শিহরিত হল। হঠাৎ যদি শাহজাদা বিচারের প্রহসন করে তার শাস্তি প্রয়োগ করেন চরমদণ্ড—তাহলে কি হবে? তারপর সে কাতর হয়ে ভাবলো—যাকগে এ জীবন থাকার চেয়ে যাওয়াই ভাল। অন্ততঃ এই সান্ত্বনা নিয়ে মৃত্যু হবে, যার জন্যে তার মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল, তারই হুকুমে তার মৃত্যু হয়েছে। সে মৃত্যু সুখের—সে মৃত্যু শান্তির। এর জন্যে মনে কোন আফশোষ নেই। যে রূপ তার শরীরকে বেষ্টন করে বিদ্যুতের বহ্নি জেলেছিল, যে শরীরে আওরতের ঐশ্বর্য থরে থরে সজ্জিত হয়ে সম্ভোগের জন্যে প্রলুব্ধ হয়েছিল, সেই দেহ-মন যাকে উৎসর্গীকৃত করবার বাসনায় প্রবল ছিল, সেই গ্রহণ করেছে অন্যোপায়, সুতরাং আফশোষ কোথায়?

আনার একরকম নিশ্চিন্ত হয়ে সমস্ত কারাগারটির বদ্ধকক্ষ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলো। আলোবাতাসহীন এই কারাগারে বেশীদিন থাকলে সে নিশ্চয় পাগল হয়ে যাবে। অপরিষ্কার একটি বদ্ধ কক্ষ। একটা বিশ্রী গন্ধ সমস্ত কক্ষটি পূর্ণ করে রেখেছে। কক্ষটির সামনের দরজায় লোহার গরাদ দেওয়া, তার সামনে একটি সিঁড়ি। সিঁড়ির নীচে অপরাধীর সাজার সরঞ্জাম। তাকে কবুল করানোর জন্যে নানারকম শাস্তির সরঞ্জাম থরে থরে সজ্জিত রয়েছে, শুধু কোন লোক নেই সেখানে। তারপর সেই সিঁড়ির সবচেয়ে উঁচু অংশে একটি দরজা, সেই দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

আনার জীবনে কখনও কারাগার দেখেনি, আজ কারাগারে আবদ্ধ হতে কারাগার দেখা হয়ে গেল। তবে এই কারাগার দেখে ভাবলো—এই রকম কারাগার কি বাদশাহী কারাগারের সঙ্গে তুলনা হয়? আনার শুনেছিল, সে কারাগার নাকি আরো ভীষণ, আরো ভয়াবহ। সেখানে অনেক দাগী আসামীই প্রবেশের আগে আতঙ্কে চীৎকার করে ওঠে। আনারের আরো মনে পড়লো, গোয়ালিয়র কারাদুর্গের কথা। সে কারাদুর্গ নাকি এত ভীষণ যে সম্রাট জাহাঙ্গীর যখন পুত্রের নির্বাসন দন্ড সেই কারাদুর্গে করেছিলেন তখন শাহজাদা খসরু কাতরস্বরে অনুরোধ করেছিলেন—পিতা, আমাকে আরো যেরকম ভীষণ শাস্তি হয় দিন, তবে গোয়ালিয়র কারাদুর্গে আবদ্ধ করবেন না।

গোয়ালিয়র কারাদুর্গ কি ধরনের হতে পারে এবং কত ভীষণ হতে পারে সেই কথা কল্পনা করে আনার আবার সমস্ত কারাকক্ষটি একমনে দেখতে লাগলো। দেখতে দেখতে নিঃসঙ্গ সে কক্ষে হঠাৎ তার দারুণ ভয় জাগলো—তার মনে হল—জুবেদা যেন মৃত্যুর জগৎ থেকে ফিরে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলছে—মালেকা, তোমারই হাতে শেষ পর্যন্ত আমার মৃত্যু লেখা ছিল! কিন্তু বলতে পারো—কি অপরাধে তুমি আমার প্রাণ এমনি ভাবে গ্রহণ করলে? আমি যে তোমারই মহব্বত ভুলতে না পেরে এই সুদূর পথ অনেক ছলনার আশ্রয় নিয়ে পার হয়ে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম তুমি যেখানে থাকবে চিরকাল তোমারই পরিচারিকা হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেব। আর সেই আশা মনে পোষণ করে শাহজাদার প্রাসাদে প্রহরীকে বশ করে তোমার কক্ষের দরজা পর্যন্ত আসি। প্রবেশ করতে দ্বিধা হচ্ছিল এইজন্যে যে দেখলাম কে যেন তোমার কক্ষে প্রবেশ কবলো। হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে তোমার চীৎকার শুনলাম, আর যে ঢুকে ছিল সে ঊর্দ্ধশ্বাসে বের হয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি এই ঘটনাগুলি ঘটে যে, আমি কিছু ভাববার আগেই বা কি করা উচিৎ চিন্তা করবার আগেই তুমি উন্মুক্ত ছুরিকা হাতে বের হয়ে এলে। তারপর অতর্কিতে আমাকে আক্রমণ করে আমার কন্ঠনালী লক্ষ্য করে বসিয়ে দিলে। আমি কিছু বলবার আগেই এই কান্ড ঘটে গেল। হঠাৎ তুমি যখন চন্দ্রের আলোয় আমার মুখের দিকে তাকালে, আতঙ্কে চীৎকার করলে—না না একি? এ তো সে নয়! জুবেদা তুমি এলে কেমন করে?

আমি তখন কিছু বলার চেণ্টা করলুম কিন্তু অত্যধিক রক্তক্ষরণে আমার দেহ অবশ হয়ে গেল, ঠোঁট নড়ল কিন্তু কথা বের হল না। তারপর সেই দেহ থেকে প্রাণ বের হয়ে নিথর হয়ে গেল।

আনার ক্ষিপ্রগতিতে নিজের কক্ষে এসে ভয়ে কক্ষের দরজা রুদ্ধ করলো। দু'হাত মুখের ওপর চেপে ধরে পালঙ্কে বসে পড়ে অস্ফুট স্বরে বললো—এ আমি কি করলাম? নিজের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে উত্তেজনাবশে হত্যা করে হাত কলুষিত করলাম! আর হত্যা করলাম, শেষপর্যন্ত নিজেরই পরিচারিকাকে!

কিন্তু জুবেদা এখানে এলো কেমন করে? আনারের মনে পড়লো—জুবেদার গলায় তার দেওয়া মালাটি ছিল! তবে কি জুবেদা তার অভাব পূরণ করতে না

পেরে তার কাছে ছুটে এসেছিল? কিন্তু কিছুই সে সময় সে ভাবতে পারে নি, সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে নিজের রক্তাক্ত হাতের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত হয়েছিল।

এই কারাগারের মধ্যে সেইরকম আতঙ্ক আবার তার জাগলো। আবার তার মনে এলো—জুবেদা বুঝি এই নিঃসঙ্গ কারাগারের মধ্যে ঐ মৃত্যু যন্ত্রণার সরঞ্জামের পাশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এবং ঘুরে ঘুরে কেঁদে কেঁদে বলছে—অপরাধীর শাস্তি যেন ঠিক মেলে। আমার আশায় ভরা জীবন যে বরবাদ করে দিলো, সে যেন নিজে আশাহত হয়ে আমার মত যন্ত্রণা ভোগ করে।

তাই বুঝি যন্ত্রণা শুরু হয়েছে আনারের মনে। আনার নিজের কলুষিত হাতের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। মস্তিষ্কে তার উত্তেজনা জাগলো। অগ্নিময় হল সমস্ত শিরা-উপশিরা হঠাৎ সে সেই কলুষিত হাতের পেশী দৃঢ় করলো, মুখটি বিকৃত করে দৃঢ় পেশীবহুল দু'হাতের দশটি আঙুলের ক্রীড়ায় নিজের কন্ঠনালীর ওপর চাপ দিল। মুখ দিয়ে তার বের হয়ে এল বিকট অট্টহাসি। সে হাসতে হাসতে সমস্ত কক্ষপূর্ণ করে দিয়ে কেমন যেন এক পৈশাচিক অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়লো। চোখের সামনে মৃত্যুর ভয়াবহতা জেগে উঠলো। অন্ধকার তার জমাট কালো আলখাল্লা পরিধান করে চোখের দৃশ্যমান সুন্দর বস্তুর দর্শন কেড়ে নিলো। আনার আরো জোরে কন্ঠনালীতে চাপ দিল। চেতনা হারানোর শেষ সীমায় যখন সে উপনীত হয়েছে, সেইসময় সে অতলান্ত থেকে শুনতে পেল, কারা যেন প্রচন্ড শব্দ করে কারাগারের দরজা খুলে ছুটে আসছে।

তারপর সে কথা শুনতে পেলো, একটি পুরুষকন্ঠ ও একটি রমণীকন্ঠ। পুরুষকন্ঠ চীৎকার করে বলছে—ভাল করে দেখো, বাঁদী মারা গেলে মালিক দুজনের গর্দান নেবেন। বলবেন—তোদের অসাবধানতায় এই অবস্থার সৃষ্টি হল। আনার তখন টলে পড়ে গিয়েছিল কারাগারের মেঝের ওপর। সে অনুভব করলো কে যেন তার বক্ষে এসে কান পেতে তার শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া পরীক্ষা করছে। আনার সেই অবস্থায় মনে মনে হাসলো—নিজেদের গর্দান যাবার ভয়ে তার প্রতি এই যত্ন, না হলে এত যত্ন করে কাকে এমনিভাবে পরীক্ষা করে?

আনার সেই অবস্থায় আরো শুনতে পেলো—পুরুষটি বলছে রমণীটিকে—তাড়াতাড়ি সুস্থ করে শাহজাদার কাছে নিয়ে যেতে হবে, দেখছো না শাহজাদা জলদি আনবার হুকুম প্রদান করেছেন। তারপর পুরুষটি আরো একটু চাপাস্বরে বললো—শাহজাদার মতিগতিই বোঝা মুষ্কিল। কালরাত্রে এই আওরতকে কঠিনস্বরে কারাগারে আটক রাখবার নির্দেশ দিলেন, আর আজ তার রূপের কথা চিন্তা করে তাকে ভোগ করার জন্যে জলদি ফরমাইস দিয়ে আনতে হুকুম দিলেন। এখন যদি তাড়াতাড়ি না নিয়ে যাওয়া হয়, ঠিক গর্দানের হুকুম দেবেন।

আনার তাকাবার চেষ্টা করছিল কিন্তু খোজাটির কথা শুনে আবার চোখ দুটি জোর করে বন্ধ করে রাখলো। সে কি শুনলো? শুনলো কি? যা শুনলো তা কি বিশ্বাসযোগ্য? শাহজাদা তার প্রতি আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেছেন? এ যে

কল্পনার মত মনে হচ্ছে? স্বপ্নের মতও। মনে হচ্ছে যেন স্বপ্নের রঙীন দৃশ্য চোখের ওপর হীরকোজ্জ্বল জ্যোতি নিয়ে প্রতিভাত হচ্ছে। শাহজাদা তার নজরানা গ্রহণ করবেন। তার যৌবনের মূল স্বীকৃত হবে মোগল সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর বাহু বন্ধনে। আনন্দে আনারের উঠে দাঁড়াবার ইচ্ছে জাগলো। উত্তেজনায় ছুটে যেতে ইচ্ছা করলো। সেইমুহূর্তে তার মনে হল, এই কারাগারে বুঝি তার জীবনের ফুলবাসর তৈরী হয়েছিল। এই কারাগারে না এলে পুষ্পোদ্যানের সে সৌরভ অনুভূত হত না। শাহজাদার মহব্বত পাওয়া বুঝি দুর্লভ হত! আনন্দে তার দেহের যন্ত্রণা অপসারিত হল। এই কিছুক্ষণ আগে যে এই নিঃসঙ্গ কক্ষের দৈত্য তাকে মৃত্যুর ইসারা করেছিল তাও অপসারিত হল। হঠাৎ সে চোখ চেয়ে সামনে একটি খোজা ও বাঁদীকে দেখে বললো—তোমরা কি জন্যে এসেছ?

বাঁদী বললো—শাহজাদা আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে হুকুম দিয়েছেন।

কেন? আনার শুনতে চাইলো পূর্বের আলোচনার পুনরাবৃত্তি।

কিন্তু বাঁদী বা খোজা সে কথা বললো না, বাঁদী বললো—আমরা জানি না হুজুরালী। আমরা শুধু হুকুম তামিল করবার জন্যে এসেছি।

বেশ তাহলে চলো। এই বলে আনার উঠে দাঁড়ালো।

বাঁদী ও খোজা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করে আনারের সামনে পিছনে সার বেঁধে অনুসরণ করলো।

আনারের তখন আর একমুহূর্ত কারাগারের সেই বন্ধ কক্ষে থাকতে ইচ্ছে করছিল না, তাছাড়া হঠাৎ সৌভাগ্য উপস্থিত হয়েছে, এ সৌভাগ্য যদি আবার মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়, এইজন্যে সে তৎপর হয়ে উঠলো! শাহজাদার মানসিক অবস্থা যদি পরিবর্তিত হয়ে থাকে তাহলে এখুনি সেখান গিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হওয়া দরকার। সামনে গিয়ে শারীরিক পরিবর্তন আরো সাধিত হবে এবং তিনি মনের মধ্যে উন্মাদনা অনুভব করলে তার ফল হবে শুভ। এই কথা ভেবে আনার আরো খুশী হয়ে উঠলো। কিন্তু খুশী হতে আবার তার মনে এল সে কি একেবারে সুলভ হয়ে গেল নাকি? বাঁদীর মত বেওয়ারিশ জীবন নিয়ে সুলভ দেহদানের আশায় আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলো? হোক্ না তিনি ভাবী সম্রাট শাহজাহান তবু তো মরদ—মরদের কাছে এক খুবসুরত জোয়ানী আওরতের মূল্য অনেক মহামূল্যের চেয়ে বেশী। মরদই চেষ্টা করবে সেই আওরতকে আপন করার। অথচ এখানে মরদ আপন অহংকারের সিংহাসনে বসে নিজে গাম্ভীর্য অবলম্বন করলো, আর আওরত নিজের ঐশ্বর্যের বর্ণাঢ্য নিয়ে লোলুপ হয়ে উঠলো।

সেইমুহূর্তে আনারের এই কথা ভেবে দারুণ লজ্জা করলো। শাহজাদা যদি তাকে গ্রহণ করেন তাতেও সে মরমে মরে যাবে আর যদি গ্রহণ না করে বিতাড়িত করেন তাতেও তার দারুণ লজ্জা। আওরত আপন ইজ্জত রাখবার জন্যে যে অহমিকার আবরণ সৃষ্টি করে থাকে সে আবরণ অনায়াসে অপসারিত হয়েছিল বলে তার এইরকম অবস্থা হল।

যা কিছুই হোক মান, সম্মান থাক বা না থাক এখন এইমুহূর্তে আর কিছু চিন্তা করার দরকার নেই। যদি বাঁদী ও খোজার কথা সত্য হয়, তাহলে আগামী জীবনের রত্নময় ঔজ্জ্বল্যের মাঝে জীবন মধুময় হবে। আর সেই মাধুর্যের মাঝে আপন প্রস্ফুটিত পুষ্পকোরক উন্মোচিন হবে।

আনার আর ভাবতে পারলো না। শুধু সে আনন্দ সাগরে ভাসমান হয়ে অগুরু চন্দন সুবাসিত দীর্ঘদেহের বর্ণসুষমাব মধ্যে বিলীন হতে লাগলো। মরদ, সেই মরদ, যে মরদ দুনিয়ার সমস্ত সৌভাগ্য নিয়ে আবির্ভূত, তার কন্ঠলগ্ন! সৌভাগ্যের মাঝে স্পর্শ সৃষ্টি করলে সৌভাগ্য আপন থেকে উপস্থিত হয়—কিন্তু এই কথায় হঠাৎ আনারের স্মরণ হল—শাহজাদা যদি তার রমণী ঐশ্বর্য গ্রহণ করে সৌভাগ্য প্রদান না করেন তাহলেই জীবন বরবাদ। আচ্ছা এতখানি অবহেলাই কি করবেন শাহজাদা? তার সুরত, তার যৌবন, তার সুরভিত তনুসম্ভার গ্রহণ করে তিনি বেইমানী হবেন কিম্বা সাধারণ এক বাদীর শস্তা যৌবন উপঢৌকনের মত তার যৌবন গ্রহণ করবেন।

হঠাৎ সেই মুহূর্তে আনার মনে মনে শপথ গ্রহণ করলো—বেগমের ইস্তেজার দিয়ে যদি শাহজাদা তার সম্মান রক্ষা করেন তবেই এই অতৃপ্ত কামনা তার চরিতার্থ হবে নতুবা এই দেহ, এই মন, এই যৌবন উৎসর্গীকৃত হবে সেই ওসমানের মত সৈনিকের বাহুবন্ধনে। সে হারিয়ে যাবে, সে নিঃশেষিত হবে তবু ঐ অসম্মানের পুষ্পাহার কন্ঠে ধারণ করবে না। সে ইব্রাহিম খার কন্যা। বীরপুরুষদের রক্ত তার শিরার শিরায়, সেও কোন অংশে কম নয়—বীরাঙ্গনা। তবে তার শিরায় বীর রক্তের সম্মান অন্য অর্থে ব্যবহৃত হবে। যদি সম্মান সে না পায় তাহলে যে ছুরিকা দিয়ে সে নিরপরাধী জুবেদার বক্ষবিদীর্ণ করেছে, সেই রকম আর একখানি ছুরিকা দিয়ে এই পরিবারের শান্তিহরণ করবে। প্রয়োজন হলে দাম্ভিক শাহজাদার জীবনের শান্তি ঐ মমতাজের জীবন নষ্ট করে অশান্তির মাঝে নিক্ষেপ করবে। আর তার সন্তানগুলি অকালে হারাবে পৃথিবীর হীরকজ্যোতি। সে কি ঐ সন্তানগুলির দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেবে? হঠাৎ আনার দারুণভাবে চমকে উঠলো। না না সে একি ভাবছে? এমন কোন নৃশংসতা সে গ্রহণ করতে পারবে না। তার কি হৃদয় নেই? নাকি সে পাগল হয়ে গেল? পুষ্পের মত সজীব, আকাশের মত সুনীল, হীরকের মত ঐ জ্যোতির্ময় সব শিশুর দল—তাদের জীবন ধ্বংসের কথা সে ভাববে? সে না আওরত? তার না মাতৃত্ব আছে? সে কি চিরকাল মাতৃত্বহীন আওরত হয়ে থাকবে বলেই অস্থায়ী এক মোহের কাঙাল হয়ে উঠলো?

হঠাৎ তার চিন্তাধারায় বাধা পড়লো, বাদী জানালো—মালেকা, এই কক্ষেই শাহজাদা অপেক্ষায় আছেন! এই বলে সে একটি কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে আনারকে নির্দেশ করলো।

আনার প্রথমদিনের মত আবার তাকালো সেই মেহগনি দরজার দিকে। দরজার ওপরে রক্তবর্ণের মখমলের ঘেরাটোপ। সেই ঘেরাটোপ সরিয়ে

অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে গিয়ে প্রথমদিনের মত আবার আনারের লজ্জা দেখা দিল। সে সরমজড়িত চরণে দাঁড়িয়ে রইলো একযুগ। তারপর হঠাৎ বাঁদীর দিকে ফিরে বললো—গোসলকে লিয়ে ঠাণ্ডা পানি। এই বলে সে অপেক্ষা না করে নিজের দেহ পরিষ্কার করে নতুন বসনে নতুন সাজে শাহজাদার সামনে আবির্ভূত হবার জন্যে নৃত্যছন্দে এগিয়ে গেল স্নানঘরের দিকে। শুধু যাবার সময় মৃদু হেসে বলে গেল—খোদাবনকে বলো, আমি শাহজাদার মনোমত করে নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে তার সামনে উপস্থিত করছি। তারপর বাঁদীর গালে হেসে টোকা মেরে বললো—ঠিক কাবুলী চিড়িয়া কা মাপি! এই বলে সে আর অপেক্ষা না করে দ্রুত প্রস্থান করলো।

পরদিন শাহজাদা খুরম পারিষদবর্গের মাঝে গতরাত্রের ঘটনা নিয়ে গোপন আলোচনা করছিলেন। তাছাড়া কিছুক্ষণ আগে এসেছে বাদশাহের সীলমোহর অঙ্কিত জলদগম্ভীর আদেশ। বাদশাহ জাহাঙ্গীর শাহপুত্রের ওপর এতটুকু অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন নি, কঠিন স্বরে আদেশ দিয়েছেন, 'বাদশাহী হুকুম অবমাননার জন্যে তোমার সম্মান ক্ষুণ্ণ করা হল এবং যতরকম সৌভাগ্যের বলে তুমি বলীয়ান হয়ে আছো তাও আস্তে আস্তে খর্ব করে তোমার প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা জ্ঞাপন করা হল। যে কান্দাহার অভিযানের জন্যে আদেশ প্রদান করা হয়েছিল, সেই আদেশ নাকচ করে তোমাকে জানানো হচ্ছে যে, সমস্ত সৈন্যসামন্ত তুমি অবিলম্বে দরবারে পাঠিয়ে দাক্ষিণাত্যে চলে যাও। আর আগ্রা, আজমীর ও লাহোরে তোমার যেসব জাগীর আছে তা আজ থেকে হস্তান্তরিত হল, পরিবর্তে জাগীর দাক্ষিণাত্য, মালব ও গুজরাট থেকে নিতে পারো।'

শাহজাদা খুরম বসেছিলেন পারিষদ সমভিব্যাহারে ঐশ্বর্যমণ্ডিত সিংহাসনের মত একটি উচ্চ বেদীময় স্থানে। তার মস্তকের উষ্ণীষের ওপর হীরকখচিত জ্যোতির্ময় ঔজ্জ্বল্য। দেহের ঐশ্বর্যময় কামিজের ওপর থেকে স্বর্ণময় দ্যুতি প্রতিফলিত হচ্ছে। শাহজাদাকে মনে হচ্ছিল যেন সম্রাট। তিনি সম্রাটের মত গাম্ভীর্য নিয়ে গত রাত্রের ঘটনা ও অধুনাকার বাদশাহের পত্রের বিষয় আলোচনা করছিলেন। শাহজাদাকে বেষ্টন করে অন্যান্য পারিষদবর্গ। তাঁরাও মূল্যবান পোষাক পরিবর্তন করে স্ব স্ব পদমর্যাদায় আসন গ্রহণ করেছিলেন। সে আসনের মধ্যে শাহজাদা খুরমের দেওয়ান আফজল খাঁ। আর একজন লোক ছিলেন সে হল দরিয়া খাঁ। দরিয়া খাঁ শাহজাদার পক্ষে জয়লাভ করে কিছুক্ষণ আগেই ঢোলপুর থেকে আগমন করেছেন। তিনি জানালেন, ছোট শাহজাদা শাহরিয়ার পক্ষের সেনাপতি শরীফ-উল-মুল্ক নিজের চক্ষু

হারিয়ে ঢোলপুর থেকে পলায়ন করেছে। ঢোলপুর আমাদের বিনা আক্রমণেই একরকম অধিকার ভুক্ত হয়েছে।

শাহজাদা শুনে বললেন—বলপূর্বক জাগীর অধিকৃত করা অবশ্য শক্তির প্রকাশ কিন্তু আমি তা চাই নি। পিতা যদি এমনিভাবে আমাকে বঞ্চিত না করতেন তাহলে আমি পিতার অনুমতি ব্যতীত কোন জাগীরই গ্রহণ করতাম না। আমি পাঠালুম এত্তেলা তাঁর অনুমতির জন্যে কিন্তু পরিবর্তে তিনি পাঠালেন সৈন্য, আমাকে বাধা দিয়ে ঢোলপুর নিজের অধিকারভুক্ত রাখার জন্যে।

কে একজন এই সময় বলে উঠলেন—এর জন্যে অবশ্য বাদশাহকে অপরাধী করবেন না, বাদশাহ ছাড়া এখন অন্যশক্তি সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনা করছেন যার জন্যে এইসব অশুভ ঘটনা ঘটছে। তাছাড়া ছোটশাহজাদা শাহরিয়াকে উত্তেজিত না করলে তিনি কখনই ভ্রাতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে সাহস করতেন না।

শাহজাদা খুরম চিন্তিত হয়ে বললেন—আমি জানি কে এই সমস্ত অশুভ ঘটনার অধিকর্তা ? তবু আমি যদি এখন প্রাসাদে ফিরে যাই তাহলে হয়ত শত্রুপক্ষ আর এগোতে সাহস করবে না। ভাবছি পিতার আদেশ মত অধিকৃতস্থান দাক্ষিণাত্যে গমন করবো, না হঠাৎ অতর্কিতে সৈন্যসামন্ত নিয়ে বাদশাহের কাছে গিয়ে পেঁাছবো ?

শাহজাদার এইরূপ ইচ্ছা শুনে পারিষদবর্গ সমস্বরে বলে উঠলেন—না, না এরকম কাজ করবেন না শাহজাদা। আমরা বুঝতে পাচ্ছি, সেখানে গুপ্তঘাতক ছুরিকা নিয়ে ওৎ পেতে অপেক্ষায় আছে। আমরা ভাবী সিংহাসনের সম্রাটকে এমনিভাবে হারাতে কিছুতে পারবো না।

তারপর আফজল খাঁ বললেন শাহজাদা যদি অনুমতি প্রদান করেন, তাহলে আমি নিজে গিয়ে বাদশাহের কাছে একবার সর্ববৃত্তান্ত প্রকাশ করি।

শাহজাদা মৃদুহেসে বললেন—আমার জীবনের বিনিময়ে আপনার জীবন উৎসর্গ করতে আমি কি উৎসাহী হব দেওয়ান আফজল খাঁ ?

আফজল খাঁ লজ্জিত হয়ে কুর্নিশ করে বললেন—অপরাধ নেবেন না জনাব। আপনার জীবন আর আমার জীবনের অনেক তফাৎ। আপনার জীবন মহামূল্যবান, আপনি একদিন মোগল সিংহাসনে আসীন হয়ে সমস্ত হিন্দুস্থানের বাদশাহ হবেন, আপনি যদি এখুনি দুনিয়া থেকে চলে যান ক্ষতি অনেক। তাই আমি আর্জি জানাচ্ছিলাম, আমার এই তুচ্ছ জীবন উৎসর্গ করে যদি পিতার সঙ্গে আপনার বিবাদ মিটিয়ে দিতে পারি তাহলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করবো। এই মহৎকার্য করতে গিয়ে যদি প্রাণ বলি দিতে হয়, তার জন্যে আফজল খাঁ ভীরুতা প্রকাশ করবে না। আপনি আমার মত দীন এক দেওয়ান অনেক পাবেন।

শাহাজাদা পরিহাসের ছলে বলতে চাইলেন, দেওয়ান অনেক পাবো বটে তবে আফজল খাঁকে পাবো না ; কিন্তু তা না বলে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন—বেশ, এ সম্বন্ধে আমি চিন্তা করে দেখবো আফজল খাঁ। তবে নিজের জীবন বিপন্ন করাও যেমনি উচিত মনে করি না, আমার কোন পদস্থ কর্মচারীর জীবন বিপন্ন

হোক্—তাও আমি চাই না। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে গাঢ়স্বরে বললেন—বন্ধুগণ, এখানে আপনারা যারা উপস্থিত আছেন, আপনারা সকলেই আমার একমাত্র আপন জন—আপনারা জানেন আজ আমার বড় দুর্দিন। এই দুর্দিনে যদি আপনাবা আমার পাশে এসে দাঁড়ান, যদি আমাকে প্রাণপণে সাহায্য করেন, তবেই আমি এই বিপদমুক্ত হব। আমার চারিদিকে শত্রুপক্ষের তীক্ষ্নদৃষ্টি সতর্ক পাহারা দিযে চলেছে। তারা চায আমার ধ্বংস এবং আমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে। আমার পিতা বাদশাহকেও তারা বশীভূত করেছে। আমি পিতার কাছে এখন বেদৌলৎ অথাৎ ভাগ্যহীন উপাধি পেয়েছি। গতরাত্রের ঘটনা আপনারা অবগত আছেন, সুদূর দিল্লী থেকে ছদ্মবেশে গুপ্তচর এসে আমার প্রাসাদে অতর্কিতে ঢুকেছে। আমি বুঝতে পাচ্ছি আব চিন্তার অবকাশ নেই। আশমানের একদিক থেকে কালিমাবর্ণ মেঘপুঞ্জ সমস্ত আশমানকে আচ্ছন্ন করবার জন্যে দ্রুত ছুটে আসছে। এসময় আপনারা আমার প্রতি যদি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, সমস্ত বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে এগিয়ে আসেন, তাহলে অন্ততঃ বুঝবো আমার পাশে এমন কয়েকজন আছেন, যাঁরা আমার শক্তিবৃদ্ধির প্রধান সহায়ক। আপনাদের কাছ থেকে সেইধরনের কোন স্বীকৃতি পেলে আমি শত্রুপক্ষের সমস্ত কৌশল নষ্ট করবার চিন্তা করতে পারি। আর যদি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করা আপনাদের মনের অভিপ্রায় না হয় তাও বলে দিন। কারণ মনের মধ্যে কোন দ্বিধা নিয়ে আমার মুখের কথায় সমর্থন করতে হবে না। আমি বিশ্বাসঘাতককে বড় ঘৃণা করি। অকপট সত্য কথা এখন তিক্ত লাগলেও পরে যে সুফল দান করে এ নিশ্চয় আপনাদের অজানা নয়। তাই আপনারা স্পষ্টকথা বলুন—আপনারা আমার পক্ষাবলম্বন করবেন, না বাদশাহ দরবারে ফিরে যাবেন? তবে আমি হলফ করে বলতে পারি, বাদশাহের বিরুদ্ধে যাবার কোন দুষ্ট মতলব আমার নেই। পিতা যতদিন বেঁচে থাকলেন ততদিন মোগল সিংহাসনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট হয়েই তিনি থাকুন তাতে আমার কোন দুঃখ নেই, তবে পিতার সিংহাসন অপরব্যক্তি কর্তৃক অনধিকারভাবে অধিকারভুক্ত হলে তার বিরুদ্ধে অবশ্য বিদ্রোহঘোষণার প্রয়োজন। আমি সেই সিংহাসন পিতার হাতে পুনরায় ফিরিয়ে দেবার জন্যেই অভিযান করবো, তার আগে আত্মরক্ষারই বিশেষ প্রয়োজন কারণ শত্রুপক্ষ এখন সরাসরি আমাকে আক্রমণের জন্য এই মান্ডুদুর্গের চারিদিকে গুপ্তঘাতক লুকিয়ে রেখেছে। তাই আমি এই মান্ডুদুর্গ খুব শীঘ্র ত্যাগ করে পিতার আদেশ মত দাক্ষিণাত্যে চলে যাব।

শাহজাদা খুরম সব কজন পারিষদবর্গের মুখের দিকে পর পর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চেয়ে তারপর বললেন—আপনাদের জবাব কিন্তু আমি এখনও পাই নি। আপনাদের জবাব পেলেই আমি আমার কর্তব্য ঠিক করবো। তখন পরামর্শ করবো অন্য বিষয়ের। এখন শুধু আমার এই বিক্ষিপ্ত মনে আপনারা শান্তি প্রদান করে আমাকে আগামী অভিযান সম্বন্ধে সুষ্ঠুভাবে ভাবতে সুযোগ দিন।

এই সময় আফজল খাঁ বললেন—আমাদের সম্বন্ধে আপনার কোন চিন্তার কারণ

নেই শাহজাদা। আপনি যে পথ অবলম্বন করবেন, আমরাও সেইপথে যাবো।

শাহজাদা খুরম আফজল খাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললেন—না, একথাও খুব সমর্থনযোগ্য নয় খাঁ সাহেব। আমি যে পথ অবলম্বন করবো আপনারা আমার বিশ্বাসে সেই পথ অবলম্বন করবেন। যদি সে পথ মঙ্গলের না হয়? যদি আমি সাম্রাজ্য অধিকার করবার জন্যে পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি? আপনারা কি আমার এই অন্যায় অধিকার সমর্থন করে আমার পাশে থাকবেন?

সেনাধ্যক্ষ কতলু খাঁ বললেন—সিংহাসন যদি অরক্ষিত হয়। যদি দুশমনের চক্রান্তে সেই সিংহাসন বেদখল হয়। তাহলে অবশ্যই উত্তরাধিকারী হিসাবে আপনার সিংহাসন অধিকার করার ক্ষমতা আছে।

শাহজাদা উত্তর দিলেন—বহুৎ সুক্রিয়া মেহমান কতলু খাঁ। আপনার কথায় আমার এই সাহস সঞ্চিত হচ্ছে যে যদি সিংহাসন বেদখল হয়, তাহলে উত্তরাধিকারী হিসাবে সেই সিংহাসন আমি অধিকার করতে পারি। তাহলে সেই কার্যে আপনাদের কোন অসন্তোষের কারণ হবে না! তারপর বললেন—তাহলে আমি কি নিশ্চিন্ত হতে পারি যে আপনাদের পূর্ণ সমর্থন আমার ওপর আছে।

হঠাৎ কক্ষপূর্ণ সমস্ত পারিষদবর্গ একস্বরে চীৎকার করে বললেন— আপনি নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন শাহজাদা, প্রাণ থাকতে আপনার বিরুদ্ধাচরণ আমরা করবো না।

শাহজাদা সন্তুষ্ট হয়ে আবার বললেন—শপথ করছেন?

পারিষদবর্গ একস্বরে আবার উত্তর দিল—শপথ করছি ধর্মের নামে, আল্লার নামে।

কোন অবস্থায় বেইমানি করলে?

গর্দান।

তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি?

হ্যাঁ।

সভাভঙ্গ হল।

যাবার আগে দেওয়ান আফজল খাঁ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—হুজুর আমার কথাটা একবার ভেবে দেখবেন। অযথা আপনি পিতার বিরুদ্ধে যান, আমার তা ইচ্ছা নয়। তাছাড়া বাদশাহকেও তো আমি চিনি, তিনি আপনার বিদ্রোহের কথা শুনলে মরমে মরে যাবেন। একে জ্যেষ্ঠপুত্র খসরুর জন্যে তাঁর মনে ক্ষত আছে, তারপর আপনার কথা শুনলে তিনি একেবারে শয্যাগ্রহণ করবেন।

শাহজাদা খুরম বৃদ্ধ দেওয়ানের কথায় কাতর হয়ে বললেন—কিন্তু দেওয়ান-সাহেব, আপনি যা বললেন আমি অস্বীকার করি না। তবে পিতা যদি আগের মত স্নেহময় থাকতেন তাহলে এসবের কিছুই মনে হত না। আমি ছুটে গিয়ে তাঁর চরণ-বন্দনা করতাম তাহলে সব মাপ হত কিন্তু এখন পিতার কাছে যেতেই আমার ভয় করে। তাছাড়া পিতার এখন মস্তিস্কেরও কিছু ঠিক নেই। দিনরাত বেধড়ক সরাব পান

করেন, আর রঙমহলের বিলাসের শয্যায় শুয়ে থাকেন। রাজকার্য এখন সব একটি রমণীর দ্বারাই পরিচালিত হয়। আপনি কি জানেন না, পিতা মোহরাঙ্কিত করা ছাড়া আর কিছুই করেন না? সেই পিতার ওপর বিশ্বাস করে আমি কেমন করে চুপ করে থাকি বলুন! তবু থাকতুম যদি পিতা আমার ওপর কঠিন আদেশ জারী করে আমার শক্তি খর্ব না করতেন। দাক্ষিণাত্য বিজয়ের আনন্দে যে পিতা আমাকে 'শাহজাহান' উপাধিতে ভূষিত করেন, সেই পিতার কাছ থেকে একবার কান্দাহার অভিযানের আদেশ পাই আবার সেই আদেশ নাকচ হয়ে আমার প্রতি আদেশ আসে প্রাসাদে ফিরে যেতে। তারপর আমি যেতে অস্বীকার করলে তিনি আমার সমস্ত জাগীর আমার অধিকারচ্যুত করেন। যেখানে এত বড় অন্যায়, অবিচার সংঘটিত হতে পারে, সেখান থেকে আর কি প্রত্যাশা করেন দেওয়ান আফজল খাঁ বাহাদুর।

শাহজাদা খুররম উত্তেজিত হয়েছিলেন, হঠাৎ উত্তেজনা প্রশমিত করে লঘুস্বরে বললেন—আসুন দেওয়ানসাহেব, আপনি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, আপনার প্রস্তাব সম্বন্ধে আমি চিন্তা করে দেখবো।

দেওয়ান আফজল খাঁ কুর্নিশ করে চলে গেলে শাহজাদা খুররম মনে মনে শান্তি অনুভব করলেন। সান্ত্বনাও যেন পেলেন অনেক। গত রাত্রের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর মনে যে বিক্ষুব্ধ ভাব সৃষ্টি হয়েছিল, তার অনেকখানি যেন উপশম হল আজকের এই পরামর্শে। তবে শাহজাদা এও ভাবলেন এর মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ তাঁকে সমর্থন করলেও আসলে তারা যে কোন মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। তাদের সুকৌশলে সরিয়ে দিতে হবে দল থেকে। এমন কি দুনিয়া থেকেও যদি সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়, তাও তাঁকে করতে হবে।

এবার তাঁকে উপযুক্ত সাজে সজ্জিত হয়েই আসরে নামতে হবে। আর এরই জয় পরাজয়ের ওপর নির্ভর করছে তার ভাগ্যলিপি। হয় সিংহাসন, নয় মৃত্যু। হয় রাজত্ব, নয় ধ্বংস।

শাহজাদা একদৃষ্টে গবাক্ষ দিয়ে মাণ্ডুর তুষারধবল পর্বতের গিরিমালার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অসামান্য সূর্যরশ্মির হীরকমুকুট পরিধান করে ঐ গিরিমালার স্বর্ণচূড়াগুলি। নির্মেঘ আকাশ। সুনীল আকাশের উপকূল যেন সমুদ্রের মত মনে হচ্ছে। অসীম সে সমুদ্র উপকূল। অসামান্য দিগন্ত। আকাশের ঐ অসীমের প্রান্ত দিয়ে বলাকার সারি উড়ে চলেছে। ওরা কোথায় চলেছে? শাহজাদা অন্যমনস্কের মত ওদের গন্তব্যস্থল চিন্তা করতে চাইলেন। তারপর নিজের কথা ভাবলেন—আজ তিনি ঊনত্রিশ বৎসরে পদার্পণ করেছেন। এই দীর্ঘদিন ধরে এই পৃথিবীতে এসে তিনি কি পেয়েছেন? তিনি বাদশাহের পুত্র। ধনদৌলত অপর্যাপ্ত এবং সেই অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিতপালিত হয়ে শুধু আতঙ্কই মনে পোষণ করেছেন। সে আতঙ্ক অন্যকিছু নয়, প্রাণের ভয়। উত্তরাধিকারী হিসাবে আগামী-দিনের সিংহাসনের অধিকারীকে কেউ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়! তারপর উপযুক্ত

হয়েছেন, রণকৌশল আয়ত্ত করেছেন, বাদশাহের সম্মান রক্ষার্থে শাহজাদার সুনাম অর্জন করেছেন। বাদশাহের সিংহাসন শত্রুমুক্ত করার জন্যে বাদশাহের আদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করেছেন, তার বীরত্বের কথা সবার মুখে প্রচার হলে শত্রুপক্ষ আতঙ্কিত হয়।

শত্রু আর কেউ নয়, পিতার বৃদ্ধবয়সের এক রমণী, যে রমণীকে দেখে পিতা সাম্রাজ্যের ও সম্রাটের সমস্ত কর্তব্য ভুললেন। সেই রমণী যে সাম্রাজ্যের লোভেই পিতাকে গ্রহণ করেছিল, এ অনেক আগেই শোনা গিয়েছিল। কিন্তু কে বলবে সে কথা বাদশাহকে? এখন সেই রমণী নিজমূর্তি প্রকাশ করেছেন, দেখছেন খুররম দিন দিন যেরকম প্রতাপশালী হয়ে উঠছে, তাতে তাঁকে শায়েস্তা না করলে রাজত্ব নিষ্কণ্টক হবে না।

নূরজাহানের প্রসঙ্গ এসে পড়তে হঠাৎ শাহজাদা খুররমের চকিতে একটি কথা স্মরণ হল। স্মরণ হল তাঁর আনারকে। আনারকে স্মরণ হতেই তিনি আপন কামিজের মধ্যে থেকে প্রত্যুষে আসা একটি পত্র বের করলেন। এই পত্রটি অতি প্রত্যুষে এক দ্রুতগামী অশ্বারোহী এসে দিয়ে গেছে। তিনি তখনই পত্রটি পাঠ করে বিস্মিত হয়েছিলেন। আরও একবার পত্রটি তিনি পাঠ করলেন।

পত্রটি সম্রাজ্ঞী নূরজাহান সরাসরি লিখেছেন শাহজাদা খুররমকে। লিখেছেন রমণীর কোমল মনের অনুকম্পা দিয়ে নয়, পুরুষের মত জলদগম্ভীর স্বরে আদেশের ভঙ্গীতে। লিখেছেন আনারের সম্বন্ধে।

'তুমি আমার মনোনীত খুবসুরত আওরত নিজের বিলাসী মনের চঞ্চলতাকে সেলাম জানাতে এই হারেম থেকে প্রলোভিত করে নিয়ে গিয়েছ। আমি সংবাদ পেয়েছি, সে একটি বিশ্বাসঘাতক সৈনিক ওসমানের দ্বারা তোমার আশ্বাসে পুলকিত হয়ে আমার সমস্ত বিশ্বাস নষ্ট করে তোমার কাছে পেঁাছেচে। তুমি তার যৌবনতনু ভোগ্যাহিসাবে গ্রহণ করবার আগে যদি ফেরত দাও তাহলে এ নিয়ে আর মিছে গন্ডগোল করবো না। না হলে বাদশাহকে বলে আমি রমণী হরণের দায়ে তোমায় অভিযুক্ত করবো। মনে রেখো ক্ষিপ্ত বাঘিনীকে আরো ক্ষেপিয়ে তুললে তার পরিমাণ কি? আমি রমণী হলেও সেই রমণী নয়, যে শুধু সৌন্দর্যের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করে হারেম শোভা করে? ......এই পত্রপ্রাপ্তি থেকে তিন দিবসের সময় দিলাম, সেই তিন দিবসের মধ্যে যদি আনার সসম্মানে হারেমে প্রত্যাবর্তন না করে, তাহলে আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করে তোমার শাস্তির আয়োজন করবো।'

যখন পত্রখানি প্রথম পেয়েছিলেন, পাঠ করে খুররম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, এখনও হলেন। এখন আরো ক্ষিপ্ত হয়ে দাঁত চেপে বললেন—বাঘিনী, আমাকে ভয় প্রদর্শন করে কার্যোদ্ধার করতে চাও? তারপর বললেন না, না কখনও না। শরীরের একবিন্দু রক্ত থাকতে আনারকে কেউ নিতে পারবে না।

তারপর চিন্তা করলেন—এই আনার এখন কারাকক্ষে। তাকে গতরাত্রে একান্ত উত্তেজনাবশে কারাগৃহে নিক্ষেপ করতে হয়েছে। ভুল যে হয়েছে অস্বীকার করবার

উপায় নেই কিন্তু ঐ বিশ্রীমুহূর্তে এ ছাড়া উত্তমচিন্তা আর কি আশা করা যেত? আজ সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আনার হারেম শোভা করবে। আনার ভোগ্যা হবে। তার সুরত বাদশাহ জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাদা খুরম পান করবে। আনার ভোগ্যা হবে শুধু ঐ বাঘিনীর রক্তচক্ষুকে অবমাননা করবার জন্যে। অন্ততঃ সে জানবে, পৃথিবীতে একজনও তার শত্রু আছে, যে তার সমস্ত দর্প চূর্ণ করে দিতে পারে।

শাহজাদা খুরম হঠাৎ প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে কেমন যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তাঁর শিরার শোণিতধারায় কেমন যেন প্রবল চঞ্চলতা অনুভূত হল। তিনি মনে মনে বললেন—বাদশাহের পুত্রের চরিত্র নিয়ে অবশ্য কেউ আলোচনা করবে না বরং বলবে বাদশাহের ইজ্জতই রেখেছে পুত্র। তবু তাঁর ভয় করলো, মমতাজের জন্যে। তাজবেগমের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তিনি, নর্তকীর নৃত্য তিনি উপভোগ করতে পারেন, তার চটুলদেহের ভঙ্গি প্রদর্শন করতে পারেন কিন্তু তার বেশী নয়, যেন কোন ভোগের স্বর্গ তৈরী করে শাহজাদা চরিত্র কলুষিত না করেন। হারেমের শোভা করার জন্যে বাদশাহের নিয়ম রক্ষার্থে নয়া নয়া খুবসুরত জোয়ানী আওরত দেশ-বিদেশ থেকে আনানো হতে পারে কিন্তু হারেমের শোভা ছাড়া তাদের কর্ম আর কিছু নেই। তাজবেগমের সতর্ক চোখ সর্বদা এইদিকে লক্ষ্য রেখেছে শাহজাদা যদি কোন সুযোগ গ্রহণ করে কোন আওরতের যৌবনতনু ভোগের স্বর্গে রাঙা করেন তবে তাজবেগমের কোন অভিযোগ তাঁকে কণ্টকিত করবে না, শুধু তার মহব্বতের বিশ্বাস চিরকালের জন্যে নষ্ট হবে।

মমতাজের মহব্বত, মমতাজের নিবীড় সান্নিধ্য, মমতাজের মনে কোন বেদনা দিতে তিঁনি সর্বদাই অনিচ্ছুক। তাই আদিম প্রবৃত্তি তাঁর মনের মধ্যে মাঝে মাঝে উজ্জ্বল মূর্তি ধরলেও তিনি সংযমের বলয় পরিয়ে নিজেকে রোধ করেন। এতকাল কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না বলে তিনি মমতাজের ঐ বেদনাটুকুকে উপলক্ষ্য করে বাদশাহী নিয়মের বাইরে থেকে চারিত্রিক উজ্জ্বলতায় মহীয়ান ছিলেন।

আর আজ সেই সমস্যার মাঝে বিপরীত একটি সমস্যা এসে তাঁকে চিন্তিত করে তুললো।

এতদিন ওদিকের কোন ভাবনায় তাকে যন্ত্রণা পেতে হয় নি। এমন কি আনার আসার পর তার অভিপ্রায় অবগত হয়ে তিনি যে অহঙ্কার প্রকাশ করেছিলেন, সে সবই ঐ পূর্বজীবনের স্রোতধারা।

আজ সেই সঙ্গীতের মৃত্যু হবে। যে মধুর সুরের মায়াজালে একটি আবর্ত সৃষ্টি হয়ে আছে, তার সুর তাল ভঙ্গ হয়ে মৃত্যু ঘটবে। শাহজাদা খুরম দুঃখিত হলেন এইজন্যে। অথচ উপায় কি! প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে, সাম্রাজ্যের মঙ্গল সাধনের জন্যে, নিজের সম্মান বজায় রাখার জন্যে এ কাজ তাঁকে করতে হবে। অন্ততঃ সেই রমণী তীরবিদ্ধ বাঘিনীর মত যন্ত্রণায় তোলপাড় করবে [illegible] হাজারো ঐশ্বর্যমণ্ডিত বিস্তৃত প্রাসাদ প্রাঙ্গণ, আর প্রতিশোধের জ্বালায় [illegible] মুহূর্মুহু নানান

পরিকল্পনা তৈরী করবে আর ভাঙবে—কল্পনায় সেই চিত্র দেখে কি এই কার্য থেকে নিবৃত্ত হওয়া যায়? তাই শাহজাদা ঠিক করলেন আনারকে তিনি গ্রহণ করবেন। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের মনোনীত সেরা খুবসুরত আওরত সম্রাজ্ঞীর উচ্চাশার জীবনের পরম শত্রু মহামহিম সম্রাট আকবরের জ্যেষ্ঠপুত্র বাদশাহ জাহাঙ্গীরের প্রিয়পুত্র শাহজাদা খুরম ওরফে ভাবীসম্রাট শাহজাহান ভোগ্য হিসাবে গ্রহণ করবে। গ্রহণের পর, রাত্রের সেই, মোহিনীমুহূর্ত শেষ হবার পর, পানপাত্রের গুলাবী রঙবাহার নিঃশেষিত হবার পরদিন আগত হলে যখন দ্রুতগামী দূত আনারউন্নিসার একটি ওড়না নিয়ে সম্রাজ্ঞীর কাছে নজরানা দিয়ে আসবে তখনই কি সেই ক্ষিপ্ত রমণী বুঝবে না—তিন দিবসও গত হল না, উত্তর সসম্মানে পৌঁছে গেল প্রাসাদে!

প্রতিহিংসার তীব্র হলাহল পান করে হঠাৎ শাহজাদা খুরম পরিকল্পনায় উদ্ভূত হয়ে চীৎকার করে ডাকলেন—কই হ্যায়!

একটি খোজা প্রহরী এসে লাখোবার কুর্নিশ জানিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

শাহজাদা খুরম বললেন—আনারবিবির সঙ্গে যে সৈনিকরা এসেছিল তাদের মধ্যে যার নাম ওসমান, তাকে আমার সেলাম জানাও!

খোজা প্রহরী কুর্নিশ জানিয়ে চলে গেলে শাহজাদা ভাবলেন—ওসমানকে আসতে বললুম কেন? তারপর নিজেই উত্তর দিলেন—আনারের সম্বন্ধে পূর্ণভাবে জানার জন্যে তাকে দরকার। আনার কত ভাল, কত তার সুরতের রোশনাই বাদশাহী রোশনীবাগে অগ্নিদীপ্তি প্রকাশ করেছিল, তাঁর জেনে রাখা দরকার। তাছাড়া এই অত্যধিক মূল্যবান আওরতটি হঠাৎ যখন শাহজাদার স্পর্শসুখে অভিনন্দিতা হবে, তখন সেই আওরতের মান নির্ণয়ে কিছু সময় অতিবাহিত করা উচিত। ওসমান এলে জিজ্ঞেস করতে হবে, তুমি এই আওরত সম্বন্ধে কতটুকু জানো বলো? তুমি এই আওরতের সঙ্গ কেমন করে বাদশাহী অন্তঃপুরের অবরোধ-প্রথা চূর্ণ করে পরিচিত হলে? না, না তিনি কোন সন্দেহের বশবর্তী হয়ে এ কথা জিজ্ঞেস করবেন না! তারপর ভাবলেন—না, তাই বা কেন? সন্দেহ যদি হয় তা অমূলক কোথায়? সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যে শাহজাদা আনারের তনুসম্ভার আপন অঙ্গের স্পর্শে বিমোহিত করবেন, সে তনুসম্ভার যদি বহু মরদের স্পর্শসুখে বিনিন্দিত হয়ে থাকে এবং সে মরদগুলি হয় ভাগ্যবান বংশের শাহজাদর চেয়েও নিম্নস্তরের—তাহলে কখনই এই আওরতকে শাহজাদা খুরম গ্রহণ করবেন না। ইজ্জতের মূল্যই শাহজাদার কাছে সবচেয়ে বেশী। সম্মান যেখানে থাকলো না, দেহভোগের আকাঙ্ক্ষা সেখানে বড় নয়। এমন কি কোন সমস্যার যূপকাষ্ঠে বলি হলেও শাহজাদা সেই আওরতকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। যদিও এই আওরতকে গ্রহণের পেছনে অনেক বড় একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত আছে। পিতার সেই রমণীর অহংকার চূর্ণ করবার জন্যে তাঁর অস্বাভাবিক উদাম সঞ্চিত হয়েছে। এই সুযোগ তিনি অবহেলিত করবেন না বলে বদ্ধপরিকর। এমন কি মমতাজের হৃদয়ে বেদনা সৃষ্টি করতেও তিনি এগিয়েছেন শুধু যদি আনার বহু বিনিন্দিতা হয় তাহলে অবশ্য সে ত্যাজ্য। সেই

বহুবিনিন্দিতা রমণী যদি অপরূপ যৌবনদেহের বিচিত্র রহস্যময় বাঁকে নানান বিজলীর চমক সৃষ্টি ক'রে শাহজাদাকে মুগ্ধ করে আর যদি শাহজাদা বিমোহিত হয়ে সেরাজী পানের আবেশে বিভোর হন, তবু সেরাজীই তিনি গ্রহণ করবেন, সেরাজীর বিনিময়ে উচ্ছিষ্ট যৌবন পেয়ালা নয়।

শাহজাদা খুররম আনারের পূর্ব কথোপকথন স্মরণ করলেন। রমণীটি তার বহু প্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অনেক কৌশলের অবতারণা করে এসেছিল। এসেছিল অবশ্য বিরাট একটি সংবাদ বহন করে কিন্তু উপলক্ষ্য ছিল শাহজাদার অনুগ্রহ। আনারের সঙ্গে প্রথমদিনের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন স্মরণ করে শাহজাদা মনে মনে হাসলেন।



আনার ভেবেছিল হয়ত শাহজাদা ষড়যন্ত্রের কথা শুনে সচকিত হয়ে অভিভূত হয়ে যাবেন। এবং সকৃতজ্ঞচিত্তে সেই সংবাদদাত্রীকে কৃতজ্ঞতার পুরস্কার স্বরূপ জিজ্ঞেস করবেন,—আওরত এর বিনিময়ে তুমি কি চাও?

আনার তখন নিজের স্বাভাবিক সরমে সংকুচিত হয়ে অবনত করবে মস্তক। তারপর আওরতের স্বাভাবিক লজ্জা ত্যাগ করে তাম্বুল রঞ্জিত অধরে মৃদু হাসির রেখা টেনে প্রগলভ হয়ে বলবে—আমার আশা বড় উচ্চাশা খোদাবন্দ। আপনি শুনলে হয়ত গোসা করবেন তবু বলতে হবে এইজন্যে যে, দিলের কাছে আমি হার মেনে এতদূর পথ এসেছি। আপনার কৃপাপ্রার্থিনী শাহজাদা!

শাহজাদার স্মরণে পড়লো এমনি আর একটি কাহিনী। এমনি আর একটি আওরত আনারের মত তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে মহব্বতের সুন্দর সুন্দর কথা শোনাতে এসেছিল। সেও এমনি বলেছিল,—আমি আপনার কৃপাপ্রার্থিনী শাহজাদা!

শাহজাদার ধমনীতে তখন যৌবনের রক্ত আগুনের তাপে ফুটছে। মমতাজ তখনও জীবনে আসে নি। রমণীর যা স্পর্শ শরীরে এঁকে ছিল আলপনা, তা দাগ কাটার অবসর পায় নি। তখন তাঁর আঠারো বসন্তের জীবনে একটা দারুণ চাঞ্চল্য, দারুণ উম্মাদনা। প্রতিটি পায়ের পদক্ষেপে যেন পর্বতচূর্ণ করবার শক্তি। দু'চোখে সবকিছু তুচ্ছ করবার আকর্ষণ। নিঃশ্বাসে উষ্ণতার প্রাবল্য। বক্ষে অনেক আশা ও উদ্দীপনা।

তাছাড়া তখন পিতা জাহাঙ্গীর নিজের ক্ষমতার ওপর আসীন হয়ে সর্বদাই প্রমাণ করতে ব্যস্ত—তিনি তৈমুরবংশের উত্তরসাধক। হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠবিজয়ী বীর আকবরের পুত্র। আর ঠিক সেই মুহূর্তে শাহজাদা খুররমও ভেবেছিলেন—তাঁর অভাব কি? তিনি বিরাট এক সৌভাগ্য নিয়ে দুনিয়াতে আবির্ভূত হয়েছেন! এক

মুঠি দৌলতের তিনি অধিকারী নন, একটি বিরাট সাম্রাজ্যের একজন অংশীদার তিনি। থরে থরে সজ্জিত আছে রত্নাগারে হীরা-চুনি-পান্না-জহরতের অফুরন্ত সম্ভার।

শাহজাদা তখন ভাবতেন অনেক বড় বড় আশা। অনেক অকল্পিত স্বপ্নও দেখতেন জাগরিত অবস্থায়। সেই অকল্পিত স্বপ্নের মধ্যে তাঁর আর একটি আশা সংযোজিত হয়েছিল—তিনি বহুভোগের আশা মনে পোষণ না করে, বাদশাহী নিয়মকে লঙ্ঘন করে, এমন এক রমণীকে জীবনসাথী করবেন, যার প্রেমসাগরে তিনি চিরকাল নিমজ্জিত থাকতে পারবেন। অমর রাখবেন সেই স্মৃতি, যে স্মৃতি কখনও কোন রাজত্বে কোন মহামহিম ভাগ্যবান পুরুষ রাখেন নি। এই ইচ্ছা মনে পোষণ করে অহঙ্কারের উচ্চসিংহাসনে আরূঢ় হয়ে আদিম প্রবৃত্তি সংকুচিত করেছিলেন।

হঠাৎ একদিন এই অবসরে একটি ঘটনা ঘটলো। অবশ্য এ ঘটনা তাঁর সমস্ত জীবনের কোন স্থানেই চিহ্ন সৃষ্টি করে নি। রেখাঙ্কিত করে নি জীবনের কোন উজ্জ্বল মুহূর্তে। শুধু মাঝে মাঝে মনে হত। মনে হত আর হাসি পেত শাহজাদার। শাহজাদা মমতাজের সঙ্গে শাদীর পর তাকে এ কাহিনী শুনিয়েছিলেন।

মমতাজ অবাক দুটি চোখে রাজ্যের বিস্ময় সৃষ্টি করে শুধিয়েছিল —তারপর!

তারপর আর কি—আমার আর তাকে মনেই ছিল না। কালের স্রোতে সে কোথায় হারিয়ে গেল, কে জানে? হয়ত অন্য কোন সৈনিকের বাহুবন্ধনে বাঁধা পড়ে সে তৃপ্ত করলো শাহজাদার সোহাগআকাঙ্ক্ষা কিনা, তাও জানি না!

আওরতটি এসেছিল অন্তঃপুরে সম্রাট আকবরের কোন এক বেগমের কাছে। বেগমের আত্মীয়া সে। রমণীটি দেখতে খুব সুন্দর ছিল। নাম জানার অবকাশ মেলে নি। তবে কৌতূহলী হয়ে পরে জেনেছিলেন শাহাজাদা—নাম কোয়েলা।

নামের মত স্বভাবটি সুন্দর হল না কেন? শাহজাদা সে কথাও সেদিন ভেবেছিলেন।

তবে স্বভাব মন্দ, এ কথাই বা কে বললো? কিশোরীটি সবে রমণী হয়ে উঠেছে। রমণীর মত পেয়েছে নানাবিধ অঙ্গসৌষ্ঠব। সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত অসামান্য যৌবন-সৌন্দর্য নিয়ে সে ভ্রমরের আকাঙ্ক্ষায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ সেইমুহূর্তে সে দেখলো শাহাজাদাকে।

তখন শাহাজাদা সবে তাঁর রূপবান দেহকে ঘিরে চন্দনের সুবাস সুরভিত করেছেন। আপেলের মত গাত্রবর্ণ ঘিরে অস্বাভাবিক এক ঔজ্জ্বল্য। তিনি সুন্দর বলে প্রাসাদের সবার দৃষ্টি তাঁর ওপর ছিল। রমণীর মত গাত্রবর্ণ দেখে অনেকেই মন্তব্য করতো—শাহাজাদা বোধহয় শাহজাদী হতে গিয়ে পালটে গেছেন। শাহজাদার আরো ছিল দুর্লভ দুটি চোখ। চোখের মধ্যে যে বিজলী জ্বলে শাহাজাদাকে না দেখলে বোঝা যায় না। তাছাড়া তাঁর দুটি উদ্ধত ভুরুযুগল, তীক্ষ্ন ও বলিষ্ঠ নাসিকা, আওরতের মত গোলাপী পুরু ঠোঁট। সেই পুরু ঠোঁটের মাঝে রাজ্যের সংযম বাঁধা পড়ে শাহজাদার গাম্ভীর্যকে আরো গভীর করেছে।

শাহজাদা যখন অসিচালনা শিক্ষা করতেন সেই সময় উত্তেজনায় তাঁর ঐ দুটি

পুরুঠোট কাঁপতো। একদিন এই অসিচালনার প্রাঙ্গণেই ঘটনাটি ঘটে গেল।

সেদিন শিক্ষাকেন্দ্রে খুরম, পারভিজ, শাহরিয়া তিনি ভ্রাতা শিক্ষগুরু যোদ্ধা আবুসাহিবের কাছে অসিচালনা শিক্ষা করছিলেন। শিক্ষার অবশ্য কিছু ছিল না, নতুন নতুন প্যাচ আবুসাহিবের মাথায় এলে তিনি শাহজাদাদের ডেকে রপ্ত করিয়ে দিতেন। সেদিন সেই ঘেরাও প্রাঙ্গণের একপাশে দুটি মখমল আচ্ছাদিত কেদারায় পারভিজ ও শাহরিয়া বসেছিলেন। শাহজাদা খুরম আবুসাহিবের সঙ্গে অসিযুদ্ধ করছিলেন।

যুদ্ধ পূর্ণোদ্যমে চলছিল। এক একটি নতুন কৌশল আবুসাহিব প্রকাশ করছিলেন আর শাহজাদা খুরম পরাজিত এবং অসিচ্যুত হয়ে হতবুদ্ধি হয়ে যাচ্ছিলেন। সেই হতবুদ্ধি ভাবকে উল্লাসে খন্ড খন্ড করে দিয়ে আবুসাহিব তাঁকে নতুন কৌশলটি আয়ত্ত করিয়ে দিচ্ছিলেন।

পারভিজ ও শাহরিয়া মাথা নাড়ছিলেন, তাঁরাও উল্লাসে হাততালি দিয়ে হাতের কৌশলে নতুন প্যাচটি আয়ত্ত করে নিচ্ছিলেন।

এদিকে খুরমের মনে নতুন নতুন প্যাচ আয়ত্ত করে কেমন যেন নেশা ধরে গিয়েছিল। তিনি তাঁর শিক্ষা গুরুকেই সে নতুন কৌশল দ্বারা ঘায়েল করে আনন্দ উপভোগ করছিলেন। পরিশ্রমের উত্তেজনায় তার দেহের শোণিতে কেমন যেন তান্ডব শুরু হয়েছিল। থর থর করে কাঁপছিল ঠোঁটদুটি। তৈলাক্ত শরীর চুইয়ে ঘর্মের স্রোত বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল। বিশাল বক্ষের ওপর দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া অস্বাভাবিক দ্রুততায় ওঠানামা করছিল। তবু শাহজাদা খুরম থামলেন না। তিনি তাঁর বীরত্বের প্রমাণ দেবার জন্যে মুহুর্মুহু আক্রমণে আবুসাহিবকে বিপর্যস্ত করে তুললেন। যেন আবুসাহিব তাঁর পরম শত্রু। শত্রুকে ঘায়েল না করলে পরিত্রাণ নেই। এর ওপরই তাঁর জীবনের জয়পরাজয় লিখিত—এমনি চিন্তার নাগপাশে আটকে গিয়ে তিনি ক্ষিপ্রগতিতে তরবারী চালনা করে চললেন।

আর আবুসাহিব শিষ্যর উন্মত্ততা দেখে মনে মনে খুশী হয়ে সংযত ভঙ্গিতে শুধু খুরমকে প্রতিহত করে চললেন। তাঁর মনে কোন উত্তেজনা নেই, তিনি প্রবীণ। রক্ত তাঁর অনেকদিন শান্ত হয়ে গেছে। শুধু নবীনদের শিক্ষিত করে তোলবার জন্যেই তাঁর যত অধ্যবসায়। এ পরিবারে তাঁর চাকরী বহুকালের। একেবারে সেই আকবরের সময়—আকবরই তাঁর রণকৌশলতায় মুগ্ধ হয়ে এ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। তখন তিনি ছিলেন নবীন, আজ তিনি প্রবীণ। এই নবীন ও প্রবীণের মাঝামাঝি সময়গুলি তাঁর এই প্রাসাদেই কেটেছে। তাই দেখেছেন তিনি অনেক। শিক্ষা দিয়েছেন তিনি অনেক যুবরাজদের। আজ কি আর যিনি বাদশাহের সিংহাসনে আসীন সেই সেলিম জাহাঙ্গীর তাঁর শিষ্য-[illegible] তাই যুবরাজদের নবীন রক্তের স্রোতকে তিনি সম্মান করতেন। কিন্তু আজ শাহজাদা খুরমের হঠাৎ অস্বাভাবিক উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়ে তিনি ভীত হয়ে উঠলেন।

শাহজাদা খুরম যেরকম এলোমেলোভাবে অসিচালনা করছেন তাতে মনে হচ্ছে শত্রু তার সামনে উপস্থিত—তাঁকে নিহত না করলে উপায় নেই।

কিন্তু এই অবসরে আবুসাহিব ভাবলেন—তিনি ইচ্ছে করলে এখুনি একটি নূতন কৌশলে এই শাহজাদার মুন্ড ধড় থেকে নামিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁর হাজার মাথা চাড়া দিযে উঠলেও কার্যে পরিণত করতে পারেন না। কারণ তাঁর সুনাম বহুকাল ধরে এই পরিবারের মধ্যে আলোচিত হয়ে আসছে। সুনাম গেল তো, বেঁচে থেকে লাভ কি? এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের আক্রমণ বার বার প্রতিহত করে নিজেকে তিনি বাঁচাচ্ছিলেন কিন্তু ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রকে নতুন করে আক্রমণ করার স্পৃহা তাঁর হচ্ছিল না।

হঠাৎ তাঁর সংযম-বলয় ছিন্ন হল, তিনি কেমন যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন, অবশ্য তার মধ্যে ছোট্ট একটি ঘটনা ঘটেছিল, কাঁধের একটি জায়গায় অসাবধানে খুরমের অসির আঘাত লেগেছিল, তাজা রক্ত বের হচ্ছিল সেই ক্ষতস্থান দিয়ে। তিনি সেই রক্ত দেখেই ক্ষিপ্ত হলেন এবং এমনভাবে কৌশলে আক্রমণ করলেন যার আঘাতে শাহজাদা খুরমের উত্তেজনা ছিঁড়ে গেল, চেতনা উদয় হল, শাহাজাদা তখন অত্যাধিক পরিশ্রমে দারুণভাবে হাঁফাচ্ছিলেন।

এদিকে এই অবস্থা দেখে পারভিজ ভীত হয়ে খাপ থেকে তরবারী বের করে ভ্রাতাকে বাঁচানোর জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন। শাহরিয়া ভীরু। তিনি পারভিজকে নিবারণ করবার জন্যে উঠে দাঁড়িযে তাঁর তরবারী শুদ্ধ হাত চেপে ধরেছেন।

ঠিক এই সময়ে, হ্যাঁ ঠিক এই সময়ে সেই ঘটনা ঘটলো। হঠাৎ একটি অপরিচিতা রমণী আতঙ্কে চীৎকার করতে করতে আবুসাহিব ও শাহাজাদা খুরমের মধ্যস্থানে এসে দাঁড়ালো।

মুহূর্তে যুদ্ধ স্থগিত হয়ে গেলো। মৃত্যু এসে সেই প্রাঙ্গণের এককোণে দাঁড়িয়েছিল, সে একছুটে পলায়ন করলো সেই জায়গা থেকে।

আবুসাহিব সামনে বাধা উপস্থিত হতে অসি ছুড়ে দিয়ে লজ্জিত হয়ে দাঁড়ালেন। আর শাহাজাদা খুরম সামনে এক অপরিচিতা রমণীকে দেখে বিস্মিত হয়ে অথচ বিরক্তির কণ্ঠে বললেন—কে তুমি? এখানে কি জন্যে এসেছ? আমাদের বাধা দিলে কেন?

রমণীটি নির্বাক হয়ে শাহাজাদা খুরমের মুখের দিকে তাকিয়েছিল, সে অবাক হয়ে দেখছিল শাহাজাদার অপরূপ সৌন্দর্য। শুধু অস্ফুটস্বরে বললো—এত রূপ পুরুষের হয়?

শাহজাদা খুরম উত্তর না পেয়ে বিরক্ত হয়ে আবার বললেন—আওরত, আমার কথার উত্তর দাও, তুমি কে? তোমাকে তো দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।

রমণীটি হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠলো, হাসতে হাসতে বললো—উত্তর কি অতো সহজে মেলে বাহাদুর? আগে যোদ্ধার বেশ ত্যাগ কর, অসি ফেলে গোলাপ পুষ্প হাতে নাও—তবে উত্তর দেব।

শাহজাদা অপরিচিতা রমণীর প্রগলভতায় বিস্মিত হয়ে বললেন—তোমার তো দুঃসাহস কম নয় আওরত? অপরাধ করেও আবার পরিহাস প্রকাশ করছো?

রমণী তার পূর্ব মেজাজেই উত্তর দিল—অপরাধ যদি করে থাকি—তবে শাস্তি দিন প্রভু। অপরাধ গ্রহণে আমি প্রস্তুত জানবেন।

রমণীর এরূপ কথাবর্তার ধরনে আবুসাহিব, পারভিজ ও শাহরিয়া হাসতে হাসতে স্থান ত্যাগ করলেন।

রমণী আবার কথা বললো—এত রূপ আপনি কোথায় পেলেন শাহজাদা? আমার যে দারুণ একটি আশা মনে জেগে উঠেছে।

খুরম হতবুদ্ধির মত রমণীর বাচালতায় ক্রুদ্ধ হচ্ছিলেন কিন্তু কিছু বলতে পাচ্ছিলেন না তার পরিচয় না জেনে। বাঁদী যে নয় তাও তিনি ভেবেছেন। বাঁদী হলে এত সাহস প্রকাশ করতো না তাও তিনি জানেন, তবু কে যে এই রমণী ভেবে ভেবে একটি আনুমানিক পরিচয় সংগ্রহ করছিলেন! কিন্তু সঠিক পরিচয় না পেতে আবার বললেন—আওরত পরিচয় দাও, তোমার বাচালতা আমার সহ্যাতীত হয়ে উঠছে। পরিচয় না দিলে আমি ক্ষুব্ধ হয়ে চলে যেতে বাধ্য হব। তারপর পরিচয় সংগ্রহ করে তোমার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা আরোপিত করবো।

রমণীটি তবু হেসে বললো, আপনি—বাদশাহ ঠিকই হতে পারবেন শাহজাদা। কিন্তু আমার পরিচয় জেনে আপনার কি হবে? বিনা পরিচয়ে যদি উভয়ে উভয়ের হৃদয়বিনিময় উৎসব সম্পন্ন হয়—মন্দ কি? আমি কিন্তু শাহজাদা অকপটে স্বীকার করছি, আপনাকে দেখার পরই আমার আওরতজীবনের কামনা তীব্রতর হয়েছে। আমি আপনার কৃপাপ্রার্থিণী শাহজাদা!

রমণীটি যে তাকে দেখে সত্যিই কাতর হয়ে মুখরা হয়ে উঠেছে—এই চিন্তা করেই হতবুদ্ধি শাহজাদা হঠাৎ চকিত হয়ে উঠলেন এবং তাঁর গর্বিত মনে আঘাত দেওয়ার বাসনা তীব্র হতে তাচ্ছিল্যের অট্টহাসি হেসে সেই প্রাঙ্গণ মুখরিত করে তুললেন। হাসলেন শাহজাদা নিজের রূপবান সৌন্দর্যের অহঙ্কারের জন্যে। হাসলেন শাহজাদা নিজে ভাগ্যবান পুরুষ জেনে। হাসলেন শাহজাদা রমণীটির স্বভাববিরুদ্ধ উক্তি শুনে। হাসলেন শাহজাদা নিজের মূল্যবান পৌরুষের কথা ভেবে। তাছাড়া আরো হাসলেন এইজন্যে যে, তার এই সুন্দর দেহসৌষ্ঠব দেখে কত আওরত তার যৌবন নিবেদিত করতে পারে ভেবে।

হাসতে হাসতে শাহজাদা একরকম দৌড়ে পলায়ন করলেন সেই প্রাঙ্গণ ছেড়ে। আর সেই অপরিচিতা এক বিরাট আশা মনের মধ্যে নিয়ে হতবুদ্ধির মত স্থির হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলো।

শাহজাদা খুরম তারপর অনুসন্ধান করে জেনেছিলেন আওরতটির আসল পরিচয়। জেনে তার ইচ্ছা হয়েছিল তাকে শাস্তি দেওয়ার। কিন্তু সেদিনের সেই তাচ্ছিল্যের হাসির কথা স্মরণ হতে প্রকৃতস্থ হয়ে এই ভেবেছেন—ঐ হাসির মধ্যেই তো তাকে চরম সাজা দেওয়া হয়েছে!

আজ আনারের কথা তাঁর তাই মনে হল। আনারও যথেষ্ট শাস্তি পেল। কিন্তু বাধ্য হয়ে সেই শাস্তি তাঁকে প্রত্যাহার করে স্বীকার করতে হচ্ছে। স্বীকার করতে হচ্ছে শুধু একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে—না হলে কখনই এই বিরুদ্ধ স্বভাবের কার্য তিনি করতেন না।

সামনে খোজাপ্রহরী এসে দাঁড়ালো। কুর্নিশ জানিয়ে বললো—হুজুর, মহম্মদ ওসমান বাহাদুর হাজির!

শাহজাদা খুরমের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান ওসমানের দিকে তাকালেন। তাকিয়ে বিস্মিত হলেন ও সপ্রশংসদৃষ্টিতে দীর্ঘদেহ ওসমানের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে মনিবের মেজাজে বললেন—তুমিই আনারউন্নিসার সঙ্গে এসেছ?

ওসমান কক্ষে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই হাজারো কুর্নিশ পেশ করেছিল, তারপর কুর্নিশ পেশ করে নির্ভীককন্ঠে বললো—হ্যাঁ হুজুর, আমার কয়েকটি অনুচর সঙ্গে করে আনারউন্নিসাবিবিকে আমি নিয়ে এসেছি।

স্বার্থ?

ওসমান হঠাৎ আচমকা এই প্রশ্নে থতমত খেয়ে গেল, কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে প্রকৃতস্থ করে বললো - তিনি আপনার বিপদের কথা বলতে আমার প্রাণ কেমন করে উঠেছিল।

শাহজাদা খুরম গর্জে উঠে বললেন—খাঁমোশ, মিথ্যে কথা! আমি বিশ্বাস করি না, আমার বিপদের কথা শুনে কারো প্রাণ কাঁদতে পারে? বলো, সত্যিকথা বলো, কি উদ্দেশ্য নিয়ে বাদশাহের বিদ্রোহী হয়ে আমার এই প্রাসাদে এসে উপস্থিত হয়েছ!

এই অবস্থায় সহস্র লোক ধূর্ত হলেও তিরস্কারের গুরুগম্ভীর স্বরে হতচকিত হয়। তাছাড়া প্রাণেরও ভয় আছে, মিথ্যে কথা প্রমাণিত হলে গর্দান যাওয়া বিচিত্র নয়। শাহজাদা যেমন ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাতে মনে হয় আনারবিবির অবস্থা খুব শুভ নয়। লোক মুখে সে উড়ো কথা শুনেছিল—আনারবিবি এখন কারাগারে। তাই ওসমান দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে নিজেকে রক্ষার জন্যে আনারের নামেই শত দোষ চাপিয়ে দিল, দিয়ে বললো—হুজুর আমি মিথ্যে কথা বলি নি, আনারবিবি আমাকে এমন করে ধরলো যে আমি না করতে পারলুম না।

মনে মনে শাহজাদা হেসে প্রকাশ্যে গাম্ভীর্য নিয়ে বিচারকের মত আবার জিজ্ঞেস করলেন—তোমার সঙ্গে আনারউন্নিসার পরিচয় কি? বাদশাহী অন্তঃপুরের অবরোধ ভেঙে তোমরা কি করে মিলিত হতে!

ওসমান আবার অন্তরে ভয় পেয়ে গেল। মনে মনে সে বললো—তবে কি শাহজাদা সব জানতে পেরেছেন? তাহলে তো প্রাণ যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী! সে কেমন যেন প্রাণভয়ে ভীরু হয়ে উত্তর দিল—আমি মিলিত হই নি শাহজাদা। আনারবিবি একদিন অন্তঃপুরের বাহির দরজার কাছে আমাকে দেখতে পেয়ে ডাকলো, এবং ডেকে কাতর হয়ে বললো এই ষড়যন্ত্রের কথা।

শাহজাদা কথাটা লুফে নিয়ে বললেন আর তুমি ওমনি এক বিরাট ঝুঁকি নিয়ে যাত্রা করলে? তারপর ধমক দিয়ে বললেন—মোগলসাম্রাজ্যের কেউ বিনাস্বার্থে উপকার করে, একি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

ওসমান দেখলো আর পরিত্রাণের কোন আশাই নেই। সে কাতর হয়ে হাজারো কুর্নিশ পেশ করে বললো—হুজুর, আমি সত্যি কথাই বলছি। আমার স্বার্থ একটি ছিল কিন্তু হুজুরের কাছে বলতে সরম লাগছিল বলে এতক্ষণ বলিনি।

শাহজাদা খুবম ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে বললেন—বেশ বলো, সে স্বার্থ কি?

ওসমান বললো—হুজুর, আমাকে আনারবিবি বলেছিল, শাহজাদার এই উপকার করতে পারলে তিনি আমাদের খুশী হয়ে ইনাম দেবেন। আমি হুজুর বাদশাহের সৈন্যবিভাগের এক নগণ্য সৈনিক ছিলাম। আপনার কাছে যদি কোন উচ্চপদ পাই, এই আশায় এত ঝুঁকি নিযে আনারবিবিকে সঙ্গে করে এসেছি।

হঠাৎ শাহজাদা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—ঠিক আছে, তোমার এই স্বার্থে আমার বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। তুমি উচ্চপদই অলংকৃত করবে। যাও উপস্থিত বিশ্রাম নাও, সময়ান্তরে ব্যবস্থা জানাবো।

ওসমান কুর্নিশ জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করলো।

শাহজাদা তারপর খোজা প্রহরীকে ডেকে আদেশ দিলেন— একজন বাঁদী সঙ্গে নিয়ে কারাদক্ষের কাছে গিয়ে আমার হুকুম জানিয়ে আনারবিবিকে মুক্ত করে এখানে নিয়ে আসবে।

খোজা প্রহরী চলে গেলে আরো দীর্ঘ সময় শাহাজাদা আনারের আশায় বসে থাকলেন। এবং আনার এলে তাকে কেমন করে অভ্যর্থনা করবেন সেই বিষয়ে মুসাবিদা করলেন।

তারপর একসময় বাঁদী এসে কুর্নিশ জানিয়ে বললো—আনারবিবি গোসল করতে গেছেন। গোসলের পর আপনার সঙ্গে এসে দেখা করবেন।

শাহাজাদা হাসলেন বাঁদীর কথায়। তারপর বললেন—আচ্ছা তুমি যাও।

বাঁদী চলে গেলে শাহজাদা ভাবলেন—আনার কি বুঝতে পেরেছে শাহজাদার মত পরিবর্তিত হয়েছে? না বুঝতে পারলে এই বেয়াদপির মত দেখা না করে গোসল করতে গেল কেন? তবে কি বুঝতে পেরে নতুন করে আবির্ভূতা হবার জন্যে নতুন সাজ পারবান করতে গেল?

যাই হোক, আপাততঃ আনারের প্রসঙ্গ স্থগিত রেখে শাহজাদা খাসমহলে যাবার জন্যে ক ক্ষত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন।

খাসমহলের কাছে গিয়ে দেখলেন তাঁর তিনপুত্র দারা, সুজা, ঔরঙ্গজেব তুমুল যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। তিনখানি তরবারীর ঘর্ষণের শব্দে প্রচণ্ডধ্বনির সৃষ্টি হচ্ছে। সে কী পরিত্রাহী যুদ্ধ! দারা ও সুজা পরস্পরকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানবার চেষ্টা করছে। তাদের মুখচোখে বিজাতীয় এক ঘৃণা। তাদের অসি

ধরার কৌশলে, চালনার কেরামতিতে দক্ষ রণকুশলী বলে মনে হচ্ছে। তাদের তাকাবার অবসর নেই, দারা সুজাকে আক্রমণ করে এক একবার বিপর্যস্ত করছে, তখন দারাই একা একশ—আবার যখন সুজা সুযোগ পাচ্ছে তখন সেও আক্রমণ করে দারাকে নাস্তানাবুদ করছে। আর ঔরঙ্গজেব কি করবে ভেবে না পেয়ে যখন যে দলের জয় দেখছে, সেইদলে যোগদান করে অপরপক্ষকে তরবারীর দ্বারা বারবার আঘাত হানছে। ঔরঙ্গজেবের ধূর্ততায় শাহজাদা খুরম চমকিত হলেন এবং স্মরণ করলেন এক জ্যোতিষীর কথা,—'এই পুত্র কৌশলের দ্বারাই নিজের ভাগ্য পরিবর্তিত করবে।'

উন্মুক্ত আশমানের তলায় তিনটি ক্ষুদ্র বীরপুরুষের যুদ্ধ। কাছাকাছি কেউ নেই। যদি হঠাৎ কোন জয়ী বীর পরাজিতের বক্ষ লক্ষ্য করে তরবারীর অগ্রভাগ প্রবেশ করিয়ে দেয়, তাহলে বাধা দেবার কেউ নেই। পরাজিতের রক্তে রাঙা হয়ে উঠবে এই রণক্ষেত্র। উন্মুক্ত আশমানের বিশাল প্রান্তর জুড়ে শুধু হাহাকার। আর জয়ী তার জয়োল্লাস প্রচারিত করে বলিষ্ঠভঙ্গিতে এগিয়ে চলবে সম্মুখদিকে। সে একবারও তাকাবে না সেই পরাজিত নিহতদের দিকে। নিহতের প্রতি কোন অনুকম্পা না। বরং জয়ীকে সবাই উৎসাহ দেবে, সবাই জয়ের সূর্যকে আশমানের ঐ শিখরদেশে উজ্জ্বল হয়ে থাকতে দেখবে, তার জন্যেই জয়োধ্বনি করবে, জয়ের জন্যই উৎসব করবে, এবং জয়ের পিছনেই সমস্ত মানুষের উদ্যম ব্যায়ত হয়ে জয়ীকে সিংহাসনের উচ্চবেদীতে বসাবে। কিন্তু যে পরাজিত হল, সে আহত বা নিহত হল। তার প্রতি কারো কোন দায়িত্ব নেই। কেউ একবারও থমকে ভাববে না, এই পরাজিত ব্যক্তিই যদি জয়ী হত? হলে অবশ্য সেই সমস্ত অভ্যর্থনা পেত। অথচ হয় নি বলে দুনিয়ার সবার অবহেলা তার প্রতি।

এই কথা শাহজাদা খুরম পুত্রয়ের যুদ্ধের মুহূর্তে চিন্তা করলেন। চিন্তা করে তার সঙ্গে নিজের কথা ভাবলেন। তিনি যদি কোন অবস্থায় কখনও পরাজিত হন, তাহলে সবার অবহেলা তার ওপর বর্ষিত হবে। আজ যে বাহিনী তার সঙ্গে আছে, তাদের আশা আছে বিরাট, উদ্যম আছে অপর্যাপ্ত। তারা শাহজাদা খুরমের জয়লাভে নিজেদের শক্তি বর্দ্ধিত করেছে। কিন্তু যদি কখনও তিনি পরাজিত বোধ করেন, তাহলে এই বাহিনীর মানসিক অবস্থা কোন্ পর্যায়ভুক্ত হবে? তারা কি আর এই ভাগ্যহীন নওজোয়ানের সঙ্গী থাকবে? না থাকবে না। তিনি বেশ হলফ করে বলতে পারেন, ভাগ্য যখনই বিদায় নেবে, সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যের অনুচরগুলিও ত্যাগ করবে সমস্ত সম্বন্ধ।

তাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন জয়লাভ তাঁকে করতেই হবে। শুধু যুদ্ধে জয়লাভে নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে। এবং সেই জয়লাভ করতে গেলে যত রকম কৌশলের অবতারণা করতে হয়, তিনি করবেন। তার জন্যে চারিত্রিক শুচিতা বিনষ্ট হলেও হবে, চরিত্র নিয়ে কি হবে—সৌভাগ্যের রোশনাই যদি জীবনের মধ্যবিন্দুতে ঔজ্জ্বল্য দান না করলো তবে জীবন কি?

শাহজাদা জীবনের লক্ষ্যপথ তৈরী করে নিশ্চিন্ত হয়ে পুত্রদের রণক্ষেত্রের পাশ দিয়ে মমতাজের কক্ষে গিয়ে ঢুকলেন।

জাহানারা ছুটে এলো কাছে। এসে পিতার কন্ঠালগ্ন হয়ে বললো—পিতাজী, তুমি এতো বিলম্বে মহলে এলে কেন?

কন্যার কথায় শাহাজাদা হাসলেন, বললেন—তুমি কি কৈফিয়ত চাইছো বেটি?

না পিতাজী, তোমার জন্যে আমরা এখনও খানা গ্রহণ করি নি, আম্মাজান তোমার আশায় বসে আছেন।

কিন্তু তোমার আম্মা কোথায়? এই বলে খুররম কক্ষের চতুর্দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

জাহানারা বললো—এখানেই আছেন আম্মা, হয়ত ধাত্রী আম্মার কাছে গিয়েছেন।

বলতে বলতে তাজবিবি এসে কক্ষে প্রবেশ করলেন।

শাহজাদার সঙ্গে চোখাচোখি হতে মমতাজ মৃদু হাসলেন। হাসিতে তাঁর চোখের জ্যোতি ঝলমল করে উঠলো। যেন ঝাড়ের কাঠ-গেলাসের ওপর আলো পড়ে জ্যোতি প্রকাশ হল।

জাহানারা আস্তে আস্তে পিতার কন্ঠ ছেড়ে দিয়ে নিঃশব্দে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল। নিয়ম ছিল, পিতামাতা এক জায়গায় মিলিত হলে পুত্রকন্যারা কেউ সেই কক্ষে থাকবে না, যদি পিতা বা মাতা কেউ থাকতে আজ্ঞা দেন তবেই থাকবে, নতুবা নিয়মানুযায়ী কক্ষত্যাগ করে চলে যাবে। জাহানারা সেই নিয়মই পালন করলো।

জাহানারা চলে গেলে মমতাজ অভিমানভরে বললেন—আমি কী অপরাধ করেছি শাহজাদা, যে আজ দুদিন তোমার সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত থাকলুম?

শাহজাদা খুররম মৃদুহাস্য প্রকাশ করে বললেন—কোন অপরাধই তুমি করনি বেগম? শুধু মানসিক স্থৈর্য লুপ্ত হয়েছিল বলে আমি কর্তব্য পালন করতে পারি নি।

মমতাজ বললেন—আমার ওপর কি তোমার শুধু কর্তব্যই আছে? এ ছাড়া মনের কোন আকাংখা নেই?

শাহজাদা হঠাৎ পূর্বকথা স্মরণ করে সংশোধন করবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললেন—আমি কথাটা ভুল বলেছি বেগম! মনের আকাংখা ঠিকই ছিল, শুধু প্রাণের চঞ্চলতায় তোমার কাছে আসতে পারি নি।

মমতাজ তবু অভিমানী হয়ে বললেন—ছাই মনের আকাংখা ছিল। তুমি আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে এই সব কথা বলছো। আসলে তোমাকে সেই সিংহাসনের মোহে পেয়েছে। আমার কথা মনে রাখতে তোমার বয়েই গেছে।

শাহজাদা খুররমের ইচ্ছা করলো তিনি একটি বিরাট বক্তৃতা দিয়ে প্রেয়সী মমতাজকে বুঝিয়ে দেন—এখন সুখশয্যায় শুয়ে বাদশাহের পঙ্গু সন্তানের মত বিলাসীজীবনের স্বপ্ন দেখে সময় নষ্ট করলে হবে না, হবে না প্রিয়তমা বেগমের

সোহাগস্পর্শে মুহূর্ত অতিবাহিত করে ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করা। এখন সামনে ভীষণ বিপদ, আগুনের লেলিহান শিখা তার দাহিকা শক্তি নিয়ে তেড়ে আসছে, নিজেকে ও নিজের পরিবারকে রক্ষা না করতে পারলে সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। এ সব কথা মমতাজকে বলে সাবধান করার ইচ্ছা জাগলেও গতরাত্রের কথা স্মরণ করে শাহজাদা নিরুত্তর রইলেন। নিজেকে ছাড়া বিশ্বাস তিনিই কাকেই বা করবেন। এমন কি অনেক সময় নিজেকেও তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। নিজের ওপর যার বিশ্বাস নেই, প্রিয়তমা বেগমের ওপর তার বিশ্বাস থাকবে না, এতে আর বিচিত্র কি? তবু তিনি এই দুর্যোগে প্রিয়তমা বেগমকে বিশ্বাস করতে পাচ্ছেন না বলে তাঁর মনে দারুন বেদনা আছে। হয়ত এই বেগম তাঁর কোন ক্ষতির কারণ নয়। সে হয়ত সমস্ত ষড়যন্ত্রের ওপরে স্বামীর পাশে থেকে স্বামীকে সাহায্য করার জন্যেই প্রস্তুত—তবু রমণী বলে শাহজাদা খুররম মমতাজকে অবিশ্বাস করেন। কারণ তিনি জানেন না, এই মমতাজের পিতা নূরজাহানের মন্ত্রী আসফ খাঁ এখন কোন দলে থেকে তাঁর নিজের স্বার্থসিদ্ধি করবেন, বোঝা মুস্কিল। যদি তিনি শাহজাদার বিপক্ষে যান, তাহলে কন্যার কাছ থেকে সাহায্য চাওয়াও বিচিত্র নয়! কিন্তু একটা কথা, কন্যা কি তার নিজের জীবনের সুখশান্তি নষ্ট করে পিতার সাহায্যে আত্মনিয়োগ করবে?

শাহজাদা খুররম মমতাজের কথার জবাব না দিয়ে পালঙ্কের ওপর বসে আরো গভীর ভাবে ভাবতে চাইলেন; শাদীর পূর্বে আওরতের কাছে পিতামাতাই আপন হয়, কিন্তু শাদীর পর স্বামী। স্বামীর সোহাগের পরিমাণের ওপর রমণীর মানসিক শান্তি তৈরী হয়, জীবন সুখের হয়—এবং রমণী নিজে সারাজীবন ধরে চেষ্টা করে স্বামীর মনোরঞ্জন করতে, কারণ মনোরঞ্জনের ওপরই স্বামীর মহব্বত স্থায়ী হয়। এই যদি সত্য হয়, তাহলে মমতাজ কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বামীর অমঙ্গল চাইবে না। সে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বামীকে সাহায্য করবে। এই বিশ্বাসই সাধারণতঃ মনের মধ্যে থাকলে কোন ক্ষতি ছিল না কিন্তু কিছুদিন ধরে রমণীর ওপর কি রকম একটা বিজাতীয় বিদ্বেষ মনে ধোঁয়ার আকার নিতে মমতাজের নিবীড় করে পাওয়া সোহাগও তাঁর ইদানিং তরল হয়ে গেছে, মমতাজের দেহান্তরে সোহাগের সৃষ্টি করেছেন বটে সে শুধু কর্তব্যের খাতিরে কিন্তু সেই কর্তব্য ছাড়া কোন বৈষয়িক আলোচনা তিনি আর করেন নি। এই গোপনতার লুকোচুরি খেলা মমতাজ বুঝতে পেরেছে কিনা তিনি জানেন না। বুঝতে পারলেও তাঁর করবার কিছুই নেই। তবে এটুকু তিনি জানেন, মমতাজ বুঝতে পারলেও কখনও প্রকাশের দ্বারা অভিযোগ আনয়ন করবে না। তাই তিনি সে নিয়েও বিশেষ মাথাব্যথা প্রকাশ করেন না।

এই সন্দেহের জন্যে যাতনা তাঁর অনেক। তিনি বার বার এজন্যে নিজের মনকে জিজ্ঞেস করেছেন—এ সন্দেহ কি তার কোনদিনও নিরশন হবে না? নিজের শয্যার গহনে শত্রুর পদধ্বনি শুনে তিনি কতকাল নিজেকে শান্ত করে রাখবেন!

একদিন না হয় স্পষ্ট করে মমতাজকে জিজ্ঞেস করে বলেন এবং অকপট যদি নিজের মনের সন্দেহ প্রকাশ করেন, ক্ষতি কি? কিন্তু তাও তিনি ভেবে দেখেছেন যদি তাঁর সন্দেহ অমূলক হয়, তাহলে চিরতরে পত্নীর বিশ্বাস হারাবেন। তখন দুজনের মাঝে যে নিবীড় সম্বন্ধ যোগসূত্র স্থাপন করে বেহেস্তের সুখ সৃষ্টি করেছে, তা অপসারিত হয়ে মাঝখানে একটি দুর্গের কঠিন প্রাচীর সৃষ্টি হবে। আর উভয়ের মনের মধ্যে সৃষ্টি হবে অশান্তি। সে অশান্তি নিয়ে বেঁচে থাকা দুষ্কর হবে। তাতে শক্তি লোপ পাবে। শান্তি বিঘ্নিত হবে। সে এক বিশ্রী অকল্পনীয় অবস্থার সৃষ্টি হবে।

তার চেয়ে কিছুকাল অপেক্ষা করে দৃষ্টি সজাগ রেখে দেখা ভাল। সন্দেহ যদি সত্য হয়, তার পরিনাম তো আছেই। তখন সঠিক ভূমিকা গ্রহণ করে দৃঢ় হস্তে শাসনদন্ড ধরলেই হবে। এখন শুধু শুধু যাতনা বর্ধিত করে, তার কৈফিয়তের মাঝে পড়ি কেন?

মমতাজ স্বামীকে গভীব চিন্তার মধ্যে দেখে আর নিজের কথার জবাব না পেয়ে মনে মনে আরো অভিমানী হলেন। এবং অভিমানিনী হয়ে অনেকক্ষণ নিরুত্তর থেকে স্বামীর চিন্তাশীল মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি দুঃখিত হলেন এই ভেবে যে, রাজপুত্র হয়ে স্বামীর জীবনটা ধ্বংস হয়ে গেল। দিনরাত বৈষয়িক চিন্তা, যুদ্ধবিগ্রহ, ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ দমন এই নিয়েই স্বামীকে কাটাতে হচ্ছে। এছাড়া একটু নির্বিঘ্ন হয়ে শান্তিতে দুদিন অতিবাহিত করবেন, তারও ফুরসৎ নেই। নিজের কথা না হয় ছেড়ে দিলেন, পুত্রকন্যাদের কুশল প্রশ্নেরও তাঁর সময় নেই। সঙ্গে লোক আছে অনেক, একটা বিরাট বাহিনী নিয়েই তাঁকে এদেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি দিতে হয়; এই বাহিনীর মাঝে তাঁর পরিচালক মূর্তিটি সর্বদা গম্ভীর ও চিন্তাক্লিষ্ট। সর্বদা তাঁকে ভাবতে হয় এই বিরাট সংসারের জন্যে। তার ওপর আছে যুদ্ধের জয়-পরাজয়। অবশ্য পরাজয় কখনও হয় নি, জয়ই হয়েছে কিন্তু এই জয়ের পূর্বের ইতিহাস ভাবলে? কত বিনিদ্র রাত যে শাহজাদা এর জন্যে কাটিয়েছেন, সে তো জানে।

তাই এই সব দেখে তাঁর বার বাব মনে হয়েছে এর চেয়ে বুঝি সৈনিকের জীবনও অনেক শান্তির, অনেক স্বস্তির। তবু সৈনিক যুদ্ধের সময় যুদ্ধ করে বাকী সময় নিশ্চিন্তে কাটাতে পারে। তাকে যুদ্ধের আগে শাহজাদার মত নির্ঘুম অবস্থায় কাটাতে হয় না। সেই জন্যে এক এক সময় মমতাজ ভাবে—শাহজাদা যেন কখনও বাদশাহ না হন। বাদশাহ হলে তো তাঁকে সিংহাসন রক্ষার জন্যে আরো ভাবতে হবে, তখনকার অবস্থাটা কল্পনায় ভেবে মমতাজ মনে মনে আল্লার কাছে প্রার্থনা করেন—যেন তার স্বামী বাদশাহ কখনও না হন। বাদশাহ হলে যে স্বামীর নাগাল মমতাজ আর পাবে না।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে শাহজাদা খুররম কথা বললেন—তাজবিবি, আমাদের দু একদিনের মধ্যেই দাক্ষিণাত্যে ফিরে যেতে হবে, তুমি তার মত তৈরী থেকো।

মমতাজ স্বামীর দিকে বিস্ময়ে তাকালো, কোন প্রশ্ন করলো না।

কিন্তু শাহজাদা উত্তর দিলেন—বাদশাহর হুকুম এসেছে, আগ্রা, আজমীর ও লাহোরের সমস্ত জাগীর আমার হস্তান্তরিত হল, পরিবর্তে জাগীর দাক্ষিণাত্য, মালব, গুজরাট থেকে নিতে পারি—অর্থাৎ যে জায়গার মূল্য কম তারই অংশীদার হয়ে বেশী মূল্যের জায়গা ছেড়ে দেওয়ার হুকুম।' বাদশাহ পিতা হঠাৎ আমার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে এই শাস্তি প্রয়োগ করেছেন।

এবার মমতাজ বিস্মিত হয়ে বললো—তোমার অপরাধ !

ম্লান হেসে শাহজাদা বললেন—অপরাধ যথার্থ কী—তা আমি জানি না। যেটুকু প্রকাশ হয়েছে তা এই, আমি বাদশাহের আদেশ অমান্য করেছি। অর্থাৎ তিনি সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে দরবারে হাজির হতে বলেছিলেন, পরবর্তী কান্দাহার অভিযানের জন্যে। আমি তার উত্তরে জানিয়েছিলাম—এখন সামনে বর্ষাকাল, যাওয়া মুস্কিল। আমার কাছে যা অবশিষ্ট সৈন্য আছে তাই নিয়ে আমি এখান থেকেই কান্দাহার অভিযান করবো। আপনি নিশ্চিন্তে আমাকে হুকুম দিলেই বাধিত হব। তারপর পরবর্তী আদেশ এল অতি নির্মম ও কঠোর অথচ আমি বেশ ভাল জানি—পিতা আমাকে কতখানি স্নেহ করেন। এর মধ্যে যে বিরাট একটা ষড়যন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তা আমি বুঝতে পাচ্ছি, এবং আমার প্রতি পিতার এই আকস্মিক বিদ্বেষ এর মূলেও যে কে, তাও আমার অজানা নয়।

শাহজাদা হঠাৎ থেমে মমতাজের দিকে তাকালেন কিন্তু মমতাজ তার আগেই মাথা নত করেছেন। মমতাজ বুঝতে পেরেছেন শাহজাদা কার কথা বলতে চাইলেন। তারপর যখন তিনি মাথা তুললেন তাঁর দুচোখ জলে পূর্ণ। মমতাজ কাতরভাবে বললেন—এর জন্যে কি আমি দায়ী শাহজাদা ?

মমতাজের চোখে জল দেখে শাহজাদা সে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবার চেষ্টা করলেন, বললেন—না, তুমি কেন দায়ী হবে তাজ বেগম ? আমি বলছি শুধু সেই শত্রুতার কথা। পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হলাম তার জন্যে যে যাতনা ভোগ করবো তাও সহ্য হবে কিন্তু বাদশাহের পুত্র হয়ে বিদ্রোহীর মত স্থানে স্থানে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে ঘুরে বেড়াবো, তার জন্যেই যত অশান্তি।

তাজবেগম নিজের চোখের অশ্রু স্বর্ণবুটি দেওয়া গোলাপী ওড়নার প্রান্তভাগে মুছে বললেন—আমারও কি তার জন্যে কি কোন চিন্তা নেই ? তুমি বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, আর আমি হারেমের নরমশয্যার গহ্বরে আরাম উপভোগ করবো—এই কি তোমার ধারণা !

না, তাজবেগম, ধারণা আমার কি তা আমি বলতে পারবো না—তবে তোমার কাছে আমার অনুরোধ—তুমি যখন আমার জীবনের উজ্জ্বল মুহূর্তে সোহাগ দিয়ে রাঙা করছ, আমার অন্ধকার দিনগুলিতে বর্তিকা প্রজ্বলিত করে আমাকে পথ দেখাও। আমার শক্তি আছে সাহস আছে—শুধু নেই উৎসাহ। তুমি সেই উৎসাহ আমার মধ্যে জাগিয়ে আমার সেই শক্তি ও সাহসকে দৃঢ় কর।

আপন প্রিয়তমা পত্নীর কাছে আমার আর একটি অনুরোধ—আমি যদি কখনও এই যুদ্ধে পরাজিত হই, জানি সেদিন সবাই আমাকে ছেড়ে চলে যাবে, তুমি যেও না।

হঠাৎ মমতাজ কেমন যেন অস্বাভাবিককণ্ঠে কেঁদে উঠে চীৎকার করে বললো—একী বলছো তুমি শাহজাদা? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? আমি কি তোমার সঙ্গে সেরকম কোন ব্যবহার করেছি?

বিচলিত না হয়ে শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন শাহজাদা—কর নি, করতে পারো। তুমি তো মানুষ তাজবেগম! আজ আমি বাদশাহের পুত্র আছি বলে তোমার পিতা পরমসন্তুষ্ট হয়ে আমাকে কন্যাসম্প্রদান করেছেন, তুমিও আমাকে বাদশাহের পুত্র ভেবে আপন হৃদয়ের কুসুম নির্যাস দান করে ভালবেসেছ। যখন বাদশাহের সমস্ত সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে পথের ফকির হব, তখন কি তোমার এই গুলাব সুরভিত মহব্বত পাবো? যদি পাই তাহলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবো। তবে না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

মমতাজ শাহজাদার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। শুধু তার সুন্দর দুটি চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুবিন্দু মুক্তাবাশির মত মসৃণ গাল বেয়ে নেমে চললো। তার দুইকর্ণের দুটি রক্তাভ চুনি জ্বল জ্বল করে জ্বলতে লাগলো।

শাহজাদা দেখলেন মমতাজ কোন কথা বললো না। বললো না বলে তাঁর বলার ইচ্ছা আরো প্রবল হয়ে উঠলো। এমন কি যে কথা বলবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, যে আগুন জ্বালাবেন না বলে অন্ধকার চেয়েছিলেন, সে-আগুনই শেষপর্যন্ত জ্বেলে ফেললেন। অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন—তোমার পিতা আসফ খাঁ এখন বাদশাহের মন্ত্রী, আর সেই বাদশাহের সিংহাসন এখন তোমার পিতার ভগ্নীর! তুমি কি বলতে চাও—তোমাদের এই দলীয়রা তোমার সাহায্য ব্যতীতই মোগল সাম্রাজ্যের সেই বিশাল সিংহাসন করায়ত্ব করবে? আমি শুধু সেই ভেবেই আতঙ্কিত হচ্ছি, কী করে নিজের বক্ষে শত্রুধারণ করে এই ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন করবো?

শাহজাদা থামলে মমতাজ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো—এ বেশ ভালই হল? তুমি যদি গোপন করে রাখতে এই সন্দেহ, তাহলে আমাদের দুজনের মাঝে ব্যবধান হত সমুদ্র-সমান। বললে বলে আমারও কিছু বক্তব্য পেশ করার সুযোগ হল। তোমার মনোভিপ্রায় অনুযায়ী আমার ওপর যে অভিযোগ করলে তা বাস্তবিক অন্যায় নয়। আমার পিতা বা পিতার ভগিনীর এই আচরণ পরিবর্তন করার সাধ্য আমার নেই। তবে তোমায় এ কথা বলতে পারি, আওরতের শাদীর পর সে তার স্বামীর সৌভাগ্যই বাঞ্ছা করে।

এর উত্তরে শাহজাদা কি বলবেন? তিনি আর কি বলতে পারেন? মমতাজের একথা যে অনেক বেশী সত্য। তাই তিনি শুধু অবাক হয়ে মমতাজের দিকে

তাকিয়ে রইলেন। তারপর নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে ছুটে গিয়ে মমতাজকে ক্রোড়ে তুলে পালঙ্কের ওপর স্থাপন করে তাকে আপন অঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করলেন। দুটি চোখ ভরে জল এসে পড়লো। মমতাজের মুখখানি একদৃষ্টে দেখতে দেখতে শাহজাদা চোখে অশ্রু নিয়েই বললেন—আমাকে মার্জনা কর বেগম? তুমি মার্জনা না করলে আমার স্বস্তি আসবে না?

মমতাজ শুধু চোখ দুটি বুজিয়ে স্থির ধীর শান্ত কণ্ঠে বললো, ও কথা বলো না শাহজাদা। তুমি অনেক মহান, আমি ক্ষুদ্র, তোমার অনেক সৌভাগ্য, আমি সেই সৌভাগ্যের একটি কণামাত্র। তোমাকে সুখী করতে পারলেই আমার সুখ।

শাহজাদা মমতাজকে বাহুবন্ধনের মাঝে স্থাপন করে তাকে সহস্র সোহাগ জানাতে লাগলেন। চুম্বন করলেন মমতাজের তাম্বুলরঞ্জিত অধর। সৌরভ নিলেন মমতাজের অপূর্ব তনুর রাগ সুবাভির। তারপর বললেন—আমি তোমার মত এত সুন্দর বেগমকেও দুঃখ দিই। এর জন্যে আমার শেষ পরিণাম যে কি হবে, তাই ভাবি।

অনেক পরে একসময় মমতাজ বললো— তোমার পুত্রকন্যারা এখনও খানা গ্রহণ করে নি, তারা তোমার জন্যেই বসে আছে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে শাহজাদা বললেন—সেকি, এ কথা তুমি আগে বলনি কেন?

মমতাজ মৃদু হেসে বললো—বলতে কি সময় দিয়েছিলে?

অনতিবিলম্বে মমতাজের আদেশে বাঁদী এসে শাহজাদার মখমলের জাঁকজমক পোষাক পরিবর্তন করার জন্যে নতুন পোষাক সঙ্গে নিয়ে এসে দাঁড়ালো।

শাহজাদা খুররম বিশ্রামের জন্যে পরিধান করলেন শুভ্র মখমলের রত্নখচিত পোষাক।

তারপর হৈ চৈ করতে করতে পুত্রকন্যারা এসে পড়লে তাদের নিয়ে আহারের জন্য কক্ষান্তরে অদৃশ্য হলেন।



সেদিন সন্ধ্যার পূর্বমুহূর্তে শাহজাদা খুররম দুর্গরক্ষীদের দৃঢ়স্বরে আদেশ প্রেরণ করলেন, দুর্গের মধ্যে যেন কোন পরিচিত ব্যক্তির আবির্ভাব না ঘটে। সতর্ক প্রহরী যেন সর্বদা লক্ষ্য রাখে এইদিকে। যদি রাত্রের অন্ধকারে গতরাত্রের মত কোন ঘটনা সোচ্চার হয়ে ওঠে তাহলে দুর্গরক্ষীর গাফিলতির সাজা সে পাবে।

এই আদেশ প্রচার করে শাহজাদা খুররম সেদিন অপরূপ বেশবাসে নিজেকে সজ্জিত করে রঙমহলের নাচকক্ষে প্রবেশ করলেন। তিনি নিজেকে সাজালেন রক্তাভ-বর্ণের রত্নখচিত বহুমূল্য সুগন্ধিময় পোষাকে। কণ্ঠে দোলালেন সবচেয়ে মূল্যবান

হীরার কণ্ঠহার। বক্ষের সীমিতে সুরভিত করলেন অগুরু চন্দনের সুবাস। দু'বাহুতে মাখলেন গুলাববাসিত মনোরম নির্যাস।

রঙমহলকে সাজাতে হুকুম দিলেন নানাবর্ণের মসলিন বসনে, জুঁই, চামেলী রজনীগন্ধা, গোলাপ নানান ফুলের সমন্বয়ে। সমস্ত কক্ষের মাঝে স্ফটিকাধারে পূর্ণ হল সুবাসিত সব মাদকদ্রব্য। সেরাজীব সঙ্গে মেশালেন গুলাববাস, অগুরু সুবাস, লোবানের মিষ্টিমধুর গন্ধ।

তারপর হুকুম দিলেন—আনার, আনারউন্নিসা!

খোজা প্রহরী ছুটলো খাসমহলের দিকে। সেখানে গিয়ে বাঁদীকে সংবাদ জানাতে বাঁদী ছুটলো আনারের কক্ষের দিকে।

আর সেইসময় আনার দীর্ঘ দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বেশ পরিবর্তনের জন্যে নানাবর্ণের বসন নির্বাচনে ব্যস্ত। কোন্ বর্ণের বসনে সে নিজেকে সজ্জিত করবে? সেই নিয়ে তার অযথা সময় ব্যয়িত হচ্ছে। অন্তত এমন একটা সুপরীক্ষিত মার্জিত রঙের দরকার যে রঙের জৌলুসে তার দেহের রোশনাই বর্ধিত হবে। শাহজাদা খুররম তাকে গ্রহণ করবেন বলেছেন। এ গ্রহণ ঐ নর্তকীর মূল্যহীন দেহের স্পর্শসুখ নয়, এ গ্রহণের মাঝে সুপরিকল্পিত একটি সমর্থন আছে। দুজনের সমর্থনেই আজ-রাত্রে এই দুর্গের একটি সুবাসিত কক্ষে তারা মিলবে। তার মধ্যে কোন মোহের হঠাৎ সংঘর্ষ নয়, মোহ ধীরে ধীরে স্পর্শের মাদকতায় সেরাজীর নেশায় বক্ষের সীমিতে গিয়ে আকুল হয়ে উঠবে। এবং এর জন্যই বসন ভূষণ চমকদার হওয়া চাই। অন্ততঃ বাদশাহীর রুচির জাঁকজমকে পূর্ণ ঐশ্বর্যমণ্ডিত হবে সে ভূষণ। শাহজাদা একজন ভাগ্যবান পুরুষ, তিনি একদিন সিংহাসনে বসবেন, তিনি হবেন এই বিশাল হিন্দুস্থানের সম্রাট—তাকে নিজের জীবনের কুমারী রত্ন বিতরণের আগে উত্তম বেশবাসে সজ্জিত না করলে চলে!

আর শাহজাদারও ইচ্ছানুযায়ী তাকে সজ্জিত করতে হবে তাঁর মনোমত। তিনি বাঁদীর হাতে যেমন জানিয়েছেন সন্ধ্যার পর আমন্ত্রণ তেমনি তার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন অগুণতি পোষাকের সম্ভার! অলঙ্কারের রোশনাই। সুবাসের বরণডালা।

আনার তাই দর্পনের সামনে কক্ষের হাজারো বর্তিকা-উজ্জ্বল আলোর মাঝে দাঁড়িয়ে বক্ষবাস উন্মোচিত করে কাঁচুলি বন্ধনের চেষ্টা করতে লাগলো। নিজের সমুদ্র উত্তাল দুই রক্তাভ স্তনযুগলের দিকে চেয়ে সে মৃদুহেসে শিহরিত হল। মাসুম আওরতের স্পর্শাকাঙ্ক্ষায় তীব্র সোচ্চার হৃদয় যেন অব্যক্ত বেদনায় কেঁদে উঠলো। বললো—এতদিনের সাধনা তাহলে সফল হল। যে হৃদয়কুসুম আবির্ভাবের পর থেকে নীরব আকাঙ্ক্ষায় শুধু সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থেকেছে, তার আজকের এই পাওয়া যে হবে বহুকালের চাওয়ারই ফল। সে তার পূর্ণতার ক্ষণ আগত দেখে রক্তাভ হয়ে উন্মুখ হয়ে উঠলো।

আনার গোলাপী-আকাশী-ফিরোজা বর্ণের কাঁচুলি বক্ষের সৌন্দর্যে পরাতে চাইলো, তারপর তা পরিত্যাগ করে চন্দ্রসুবাসিত রুপোলীবর্ণের কাঁচুলি বক্ষে

পরালো। গায়ে দিলো সেই বর্ণের ছোট জামা। জামার বুকে তারার ঔজ্জ্বল্যের মত স্বর্ণের বুটি। তারপর আর একটি মনোমতবর্ণের সালোয়ার পরে, একটি ওড়না দিয়ে দেহ আচ্ছাদিত করলো। সমস্ত দেহে অগুরুসুবাস ছড়িয়ে দিয়ে দুই চোখে আঁকলো সুরমা অঞ্জন। বাঁদী এই কাজে সাহায্য করতে চেয়েছিল, কিন্তু সে তাকে বিদায় দিয়ে নিজেকে নিজে সাজালো। কারণ নিজের দেহ যার ভোগে নিবেদনের ইচ্ছা, সে দেহ সজ্জিত করতে অপরের হস্তক্ষেপ সমীচীন নয় মনে করেই নিজেই সাজলো মনের মত করে। তারপর সমস্ত অঙ্গে হীরা-চুনি-পান্না-জহরতের অলঙ্কার সজ্জিত করে দর্পণের মাঝে দেখলো—সম্রাজ্ঞী হওয়ার আর কিছু বাকী আছে কিনা! নুরজাহান যদি আজ পাশে দাঁড়াতেন, তাহলে রূপের সৌন্দর্যে পরাভব স্বীকার করে পলায়ন করতেন। আর মমতাজ এখানেই আছেন। তাকে একবার এই সুরত দেখিয়ে এলেই হয়। দেখিয়ে বলবে নাকি—তুমি যে পুরুষের সোহাগে পূর্ণ হলে আমিও সেই সোহাগ আজ লাভ করবো!

কিন্তু মমতাজের সঙ্গে সেই ধরনের কিছু করতে এখন মন চাইলো না। যদি এর পরিণাম অন্য হয়ে যায়? মমতাজ ক্ষিপ্ত হয়ে আজকের এই জ্যোৎস্নালোকিত আশমানের মাঝে অন্ধকার বিস্তার করেন? তাঁর সোহাগের অংশ খণ্ডিত হচ্ছে এই আক্রোশে যদি তাঁর হৃদয় ক্ষিপ্ত হয়ে একটা অশান্তির ধূম ছড়িয়ে দেন?

এই সময় বাঁদী এসে কুর্নিশ জানিয়ে বললো—শাহজাদা সেলাম জানিয়েছেন বিবিসাহেবা?

বাঁদীকে বিদায় দিয়ে আবার শিউরে উঠলো আনারউন্নিসা। এবার তার সারা শরীর ছেয়ে এলো লজ্জার আবরণ। সে লজ্জায় রাঙা মুখমণ্ডল নিয়ে নিজের শয্যার ওপর বসে পড়লো। নিজেকে সরমজড়িত মনে জিজ্ঞেস করলো, লজ্জা কেন? তুমি তো বহুকাল ধরে এই চেয়েছিলে! এখন সেই শুভমুহূর্ত উপস্থিত হতে অযথা সময় ব্যয় করছো কেন? যাও, তাড়াতাড়ি যাও শাহজাদা অপেক্ষায় আছেন। তিনি ভাগ্যবান বলিষ্ঠ পুরুষ। তুমি আজ মহা ভাগ্যবানের প্রশস্ত বক্ষের মাঝে মাথা রাখবে। তিনি স্পর্শ দেবেন, তুমি মোহিত হবে। তিনি সোহাগ দেবেন, তুমি রাঙা হবে। তিনি উন্মাদ হবেন, তুমি তাঁর উন্মাদনা উপশম করবে। এজন্যেই তো এতদিন ধরে বহুজনের আগ্রহকে চাবুক দিয়ে নিজে অপেক্ষমানা ছিলে! তবে আর চিন্তার কি—এগিয়ে যাও এই রাত্রিকে সেলাম জানিয়ে ঐ অজস্র নক্ষত্রের যৌবন উজ্জ্বলতা মেখে জ্যোৎস্নালোকিত আশমানের মাঝে শয্যার অংশীদার হও।

আনারের অন্তরাত্মা আবার বললো—মনে পড়ে জৈন-উল আবেদীনকে! যে কোন-অংশে তোমার অপছন্দ হওয়ার ছিল না। তার কাছে গেলে এতদিনে সে হয়ত তোমাকে অনেক সৌভাগ্য দান করতো। তারপর ওমরাহ আলাউদ্দিন একদিন দেখে তাঁর সব দৌলত দিতে চেয়েছিলেন। অবশ্য তিনি ছিলেন বয়সে প্রৌঢ়। তাঁর রক্তের সঙ্গে তোমার রক্ত মিলতো না বলে তুমি তাঁর বেয়াদপির সাজা দিয়েছিলে—সম্রাজ্ঞী নুরজাহানকে বলে দিয়ে। সম্রাজ্ঞী নুরজাহান তাঁর কি ব্যবস্থা করলেন বলা

যায় না, তবে সেই ওমরাহকে আর কখনও প্রাসাদে দেখা যায় নি। আর ওসমানের কথা তো সবাই জানে তবে ওসমানের দুঃসাহস বর্ধনে তোমারই উৎসাহ ছিল বেশী। তুমি তোমার স্বার্থের জন্যেই ওসমানকে অতখানি লুব্ধ করেছিলে। সেদিন রাত্রে সেই পর্বত সানুদেশে অতর্কিতে আক্রমণের কথা আনারের স্মরণে এলো। ওসমান সেদিন তাকে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, সেদিন যদি ওসমান সেই ক্ষিপ্ততার শেষসর্গে গিয়ে উপনীত হত, তাহলে আজকে আর এই নিবেদনের শুচিতা উৎসর্গীকৃত হত না। সে উচ্ছিষ্ট যৌবন নিয়ে ভীত হয়ে থাকতো, আর শাহজাদার তীক্ষ্ন চোখের সামনে সে বলে ফেলতো তার কোরবাণীর ইতিহাস। সেই কথা স্মরণ করে এই মুহূর্তে আনার শিউরে উঠলো।

ওসমানের অবশ্য সেদিন কোন দোষ ছিল না। সে উৎসাহ পেয়েছিল বলে অমনি লোলুপ হয়ে উঠেছিল। আর আনার তারও কোন দোষ ছিল না; সে নিরুপায় হয়েছিল বলে সৈনিককে তার ইজ্জতের প্রতি লোলুপ করে তাকে দিয়ে নিজের উদ্দেশ্যসাধন করিয়েছিল। সৈনিককে যদি আর কিছু সে বিনিময় করতে চাইতো তাহলে সে এত বড় দুঃসাহসের কাজ করতে চাইতো না। সেজন্যে এই প্রলোভনের উক্তি।

আনার ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তেই কক্ষত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিল, হঠাৎ প্রাঙ্গণের সামনে পর্বতের শিখরদেশে চন্দ্রের সুষমা প্রতিফলিত হতে চমকিত হয়ে নিজের বর্তমানে ফিরে এলো। এসে সে নিজের দিকে তাকিয়ে দ্রুত পা চালালো।

অলিন্দের ওপর চন্দ্রের সুষমা বাদশাহের ঐশ্বর্যের রোশনাই দান করছে। খেলা করছে যেন হীরার ঔজ্জ্বল মর্মরময় সোপানের ওপর। বাতাসে পুষ্পের বিচিত্র মধুর সুবাস। এক জায়গা দিয়ে যেতে যেতে আনার দেখলো একটি বিরাট মর্মরময় ফোয়ারাধার থেকে নিঃসৃত হচ্ছে গুলাবজলের স্রোতধারা। সেই ফোয়ারা ধারার ওপর রজত শুভ্র আলো পড়ে বিচিত্ররূপ প্রকাশ হয়েছে। ঠিক সেই ফোয়ারা ধারার পরেই দুর্গের সুউচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরের ওপাশ থেকে একটি বিরাট মাথাভর্তি পত্র-বিশিষ্ট বৃক্ষের দেহ এপাশে এসে পড়েছে। আনার সেই সবুজবর্ণের পত্রগুচ্ছের ওপর রজতশুভ্র আলোর বর্ণ দেখে মুগ্ধ হল। আশমান স্তব্ধ। দুর্গপ্রায় নিঝুম। শুধু কানে ভেসে আসছে সঙ্গীতের সুরতান। সে সঙ্গীতের মধুরধ্বনি যে রঙমহল থেকে আসছে আনার বুঝতে পারলো। আনার আরো বুঝতে পারলো, ওখানে এখন আছেন শাহজাদা খুররম। তার আজকের রাত্রের প্রিয়তম। কে জানে এই প্রিয়তম তার সারাজীবনের হবে কি না! যদি সারাজীবনের না হয় তাহলে শুধু একটি রাতের জন্যে সে নিজেকে উৎসর্গ করবে না।

আনার আবার ভাবলো—শাহজাদা এখন কি করছেন? তার বিলম্ব দেখে হয়ত নর্তকীর অর্ধনগ্ন নৃত্য দেখে আনন্দ উপভোগ করছেন। আর হয়ত প্রচুর সেরাজী পান করছেন। তিনি কি সেরাজীর নেশায় অভিভূত হয়ে তার সঙ্গে রোমাঞ্চকর মুহূর্তসৃষ্টি করবেন?

এইসব প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যে আগ্রহী হতে সে দ্রুত পা চালালো। আর তাছাড়া অযথা কালক্ষেপের প্রয়োজন যন্ত্রণার সামিল মনে হতে সে সমস্ত চিন্তা, ভাবনা ত্যাগ করে বক্ষের ওড়নাখানি ভালভাবে স্থাপন করে রঙমহলের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলো এবং যে কক্ষ থেকে যন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্যময় তান ছুটে আসছিল, সেই কক্ষের মধ্যে বেগে উপস্থিত হল। কক্ষে প্রবেশ করতেই তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সে মুহূর্তকাল কিছু দেখতে পেলো না, সব অন্ধকার। তারপর সে ভাব অন্তর্হিত হলে সে দেখলো বিদ্যুতের রোশনাই। হাজারো বাতির ঝাড়ের আলো রঙমহলের বিস্তৃত কক্ষকে দিনের প্রখর আলোর বর্ণাঢ্য দান করেছে। বাদশাহী রঙমহল এর আগে সে দেখেনি, দেখার ইচ্ছে ছিল কিন্তু ভয় ছিল বলে সে ইচ্ছাকে সংযত করেছিল। অবশ্য সম্রাজ্ঞী নূরজাহানকে এ ইচ্ছা জানালে কি হত—কে জানে - যাই হক শাহজাদার রঙমহল দেখে সে সেই বাদশাহী রঙমহল না দেখার আক্ষেপ মেটালো।

প্রথমদিন যে কক্ষ মধ্যে শাহজাদার সঙ্গে সে মিলিত হয়েছিল, ঠিক সেইরকমই আজকের এই কক্ষটি। তবে সে কক্ষের চেয়ে এ কক্ষটি আরো ঐশ্বর্যপূর্ণ করে সজ্জিত। স্বর্ণখচিত সেই কক্ষের দেয়ালের চতুর্দিকে দর্পণের বিচিত্র অবস্থান। তার ওপর ঝাড়ের আলো প্রতিফলন সৃষ্টি করে অলংকারের রোশনাই দান করেছে। কক্ষের বিভিন্ন কোণে রৌপ্যপাত্রে সদ্যচয়িত নানাবর্ণের সুবাস। জুঁই, বেলা, চামেলী, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, গোলাপের বিচিত্র সৌরভ। শাহজাদা বসেছিল সেই ঐশ্বর্যের মাঝে একজন বিলাসী পুরুষের মত।

মেঝের ওপর দামী কাশ্মিরী ফরাস পাতা। ফরাসের ওপর শুভ্র মসলিনের ঘেরাটোপ। সেই শুভ্রচাদর বিছানো ফরাসের একপাশে ভিন্ন ভাবে আর একটি বিচিত্র আসন, সে আসনটি একটু উঁচুতে। সেই উচ্চবেদীতেই শাহজাদা একটু আড়ভাবে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছেন। তার সামনে সাকী উদ্ভিন্ন যৌবন শোভা অর্ধউন্মুক্ত করে শাহজাদাকে গুলাব সুরভিত সেরাজী পরিবেশন করে চলেছে।

নৃত্য করছে একটি নৃত্যপটিয়সী। সে অন্যকক্ষ থেকে ভেসে আসা সঙ্গীতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যৌবন তনুতে পুষ্পের মাধুর্য সৃষ্টি করে শাহজাদার সামনে নেচে চলেছে।

শাহজাদা কোন কথা বলছেন না, বা কোন উল্লাস। তার মুখের ওপর দারুণ এক গাম্ভীর্যের বর্ম। তিনি শুধু একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন নর্তকীর দিকে। কিন্তু তার চোখ থাকলেও দৃষ্টি যে ছিল না, চক্ষের পলকেই বুঝতে পারা গেল। আর বাঁদীর হাত থেকে শুধু পানীয় নিয়েই চলেছেন, পূর্ণপাত্র নিঃশেষ করে ফেরত দিলে আবার পাত্র। তিনি কোন নিষেধও করছেন না, আর বাঁদী পরিবেশন করা সেজন্যে থামাতেও পারছে না।

এইসময় আনার কক্ষে প্রবেশ করলে শাহজাদা হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠে বসে জলদগম্ভীরস্বরে বললেন—খামোশ!

তারপর সব থেমে পড়লে বললেন—চলে যাও !

মুহূর্তে সকলে কুর্নিশ জানিয়ে কক্ষত্যাগ করে চলে গেল।

বিরাট কক্ষের মাঝে শুধু আনার ও শাহজাদা খুররম। আর অখণ্ড আলোর ঔজ্জ্বলামান দ্যুতিশোভা।

আনারের সমস্ত দেহ আবার কেঁপে উঠলো—কি যেন এক অনুভূতির জন্যে ! সে কম্পিত দেহে শাহজাদার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে কুর্নিশ করলো কয়েকবার, তারপর ভীতকণ্ঠে বললো—হুজুর ডেকেছেন আমাকে ?

শাহজাদার চোখে তখন সেরাজীর নেশা। তিনি নেশামত্ত চোখে জড়িতকণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ আনারবিবি, আমি ডেকেছি তোমাকে। তারপর একদৃষ্টে আনারের সম্পূর্ণ দেহটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন—তোমার সুরত আমাকে বশীভূত করেছে। তুমি মোগল হারেমের ইজ্জতের রোশনাইকে আরো উজ্জ্বল করতে আবির্ভূতা হয়েছ। এসো, কাছে এসো সুন্দরী—তোমার স্পর্শ দিয়ে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাদা খুররমের হৃদয় আপ্লুত করে দাও। এই বলে শাহজাদা বেদীতে উপবিষ্ট অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে দিলেন।

আনার তখন সেই মুহূর্তে ভাবছিল। ভাবছিল কোন্ পন্থা অবলম্বন করবে ? নিজেকে একেবারে নিঃশেষে সঁপে দেবে না-এই সময় শাহজাদাকে বশীভূত করে কতকগুলি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেবে। অবশ্য তার জীবনে আর এ সুযোগ আসবে না। একবার যদি তার সমস্ত অমূল্যরত্ন বিতরিত হয়ে যায়, তাহলে কিসের বিনিময়ে সে পরে নিজের ভাগ্যনিরূপিত করবে ? সেজন্যে আনার দূরে দাঁড়িয়েই শাহজাদার দিকে তাকিয়ে বললো—শাহজাদা গোস্তাখি নেবেন না, আমার একটি নিবেদন আছে। কিসের জন্যে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে আমাকে সৌভাগ্য দান করছেন ?

শাহজাদা হঠাৎ নেশার আমেজে হো হো করে হেসে উঠে বললেন—বিস্মিত হচ্ছ আওরত ! তৈমুরের বংশধর মোগল সন্তানের মানসিকতার পরিবর্তন এত সহজে যদি কেউ বুঝতো তাহলে হিন্দুস্থানের সিংহাসন অনেক আগেই শত্রুকর্তৃক অধিকৃত হত। তাই এসব প্রশ্ন কর না আওরত—আজকের এই রাত্রিকে জীবনের পরম শুভলগ্ন জ্ঞান করে শাহজাদার সোহাগে রাঙা হয়ে নিজে সৌভাগ্যবতী হও। তাছাড়া তুমি তো এই চেয়েছিলে রমণী, যখন মনের মধ্যে আমার প্রতি দুর্বলতা নিয়ে সুদূর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছ, তখন আর প্রশ্ন সৃষ্টি করে মিছে সময় নষ্ট করছো কেন ? জানো তো, শাহজাদার চোখের সুরমা অঞ্জন বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। নেশা কেটে গেলে সে আবার রাজকার্য নিয়ে সব ভুলে যাবে। তখন শত চেষ্টাতেও তাঁর মনে আকর্ষণ জাগাতে পারবে না।

আনার তবু বললো—কিন্তু শাহজাদার মনে এই ক্ষণিকের মোহের উপাদান হতে তো আমি চাই নি হুজুর ! আমি চাই শাহজাদার মনে চিরকালের সুরভি হতে। যে সুরভির সুবাসে মুগ্ধ হয়ে শাহজাদার প্রিয়তমা বেগম মমতাজমহল জীবনের স্থিতি পেয়েছে।

হঠাৎ শাহজাদা আনারের দুঃসাহসের কথা শুনে চমকিত হলেন, হয়ে ক্রুদ্ধ হলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধভাব হঠাৎ সংযত করে বললেন—তুমি তো বহুৎ ধূর্ত আওরত আনারউন্নিসা! নিজের ভবিষ্যৎ তৈরী না করে মোহের স্বর্গে প্রবেশ করে যৌবন ব্যয় করতে ইচ্ছুক নও! তারপর খুশী হয়ে শাহজাদা বললেন—বেশ আমি কথা দিচ্ছি আওরত। আমার জীবনের এই দুর্দিন অপসারিত হলে তোমাকে তোমার যোগ্য উপাধিতে ভূষিত করবো।

আনার তবু বললো—প্রমাণ!

শাহজাদা মৃদু হেসে বললেন—শাহজাদার কথাই কি যথেষ্ট নয়!

না জনাব।

তবে সাক্ষী থাকলো আজকের এই রাত্রি ও এই মুহূর্ত। যদি কখনও তা বিস্মৃত হই, তাহলে তুমি আমাকে মনে করিয়ে দেবে।

শাহজাদা প্রতিজ্ঞার কথা উচ্চারণ করে মনে মনে শংকিত হলেন এবং আপন মনে বললেন—এই আওরতের দুঃসাহস দেখে চমকিত হচ্ছি, যদি নুরজাহানের ওপর প্রতিশোধ নিতে একে প্রয়োজন না হত, তাহলে আজ রাত্রের পর দুনিয়া থেকে একে সরিয়ে দিলেই ভাল হত। অথচ তা করলে এত বড় একটা সুযোগ থেকে তাঁকে বঞ্চিত হতে হত।

আনারউন্নিসা নিজের ভবিষ্যৎ এই মুহূর্তে মোহের উত্তেজনায় না ভুলে বরং সমুজ্জল করতে পেরে খুশী হয়ে শাহজাদার আরো কাছে সরে গেল, গিয়ে বললো—আপনি কি রাগ করলেন শাহজাদা? তারপর ব্যথিতকণ্ঠে বললো—আওরত চিরকালই লাঞ্ছিত হয়ে আসছে। আপনার এই অনুগ্রহ আমি জীবনে কখনও ভুলবো না। আপনার সুদিন সৃষ্টির জন্যে আমার যদি কোন সাহায্য আপনার কাজে লাগে, আপনি গ্রহণ করতে কার্পণ্য করবেন না শাহজাদা!

শাহজাদা কোন উত্তর দিলেন না, তিনি তখন অন্যদিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিলেন। তারপর এক সময় বললেন—তুমি আমার প্রধানা বেগম ও তার পুত্র-কন্যার পরিচালিকা হয়ে তার সঙ্গে একত্রই বাস কর। আমার সঙ্গে যে সম্বন্ধটা তোমার থাকলো, সেটা উপস্থিত গোপনেই থাকুক। প্রয়োজনে আমি তা প্রকাশ করে স্বীকৃতি জানাবো।

আনার বুঝতে পারলো, শাহজাদা এখন মমতাজের মনে কোন বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চাননা। তাছাড়া মমতাজকে তিনি পেয়ার করেন, এ সকলেই জানে। তাই আনার মনে মনে সেই মুহূর্তে আর একটি সংকল্প গ্রহণ করে চুপ করে থাকলো।

আর শাহজাদা তখন ভাবছেন, মমতাজই এখন তাঁর চিন্তা। মমতাজ কখনও যে ক্ষুব্ধ হবে, এ মনে হয়না। তবে মমতাজের আত্মীয়রা তাঁর কোন দুর্বলতা দেখলে সেই উপলক্ষ্য করে তাকে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করবে। সমস্যা সর্বমুহূর্তে। রাজনীতি রক্তের শিরায় শিরায় সর্বদা যেন কৌশলের ভূমিকা গ্রহণ করছে। আনার সমস্যা। মমতাজ দুশ্চিন্তা। নুরজাহান তাঁর ধ্বংস চায়। দুনিয়ার

সমস্ত আওরতগুলি কি তাঁর ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় বসেছে? মেজাজের কোন পরিমাণ না করতে পেরে, তাছাড়া সেরাজীর নেশা ফিকে হয়ে যেতে শাহজাদা স্বর্ণভৃঙ্গার থেকে সেরাজী পাত্র পূর্ণ করবার জন্যে এগিয়ে গেলেন।

তাই দেখে তাড়াতাড়ি আনার এগিয়ে গিয়ে স্বর্ণপাত্র পূর্ণ করে শাহজাদার দিকে সেরাজী এগিযে দিল।

শাহজাদা তা পান করে আবার চাইলেন। আবার আনার পাত্র পূর্ণ করে দিল। সুগন্ধময় রক্তাভ সেরাজী সমস্ত দেহ মুগ্ধ করে উদরের অগ্নিকুন্ডে গিয়ে পড়তে লাগলো। শাহজাদা আস্তে আস্তে নেশার আমেজে অভিভূত হয়ে নিঃঝুম হয়ে গেলেন। তাঁর রক্তস্রোতের উন্মাদনা তীব্রতর হল। দেহের শিরায় শিরায় উত্তেজনা অগ্নিদীপ্ত পেল। সমস্ত শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে তিনি কেমন যেন অসহায় অবস্থায় আনারের দিকে তাকালেন। খপ্ করে আনারের হাতটি নিজের বক্ষে স্থাপন করে কাতর হয়ে উঠলেন। জড়িতস্বরে তাঁর মুখ দিয়ে শুধু বের হল—আমি বড় অসহায় প্রেয়সী, আমার ওপর তুমি গোসা কর না। এই দুনিয়ায় নিজের বলতে আমার কেউ নেই। অভিশপ্ত সিংহাসনের মোহে আমার জীবন বরবাদ হয়ে গেল।

এই সময় প্রাসাদের নহবতখানায় প্রহর ঘোষণা হল। কক্ষের মধ্যে অসামান্য আলোর মাঝে আনার সেদিন শাহজাদাকে অনেক কাছে পেয়ে বুঝতে পারলো—তিনি কত অসহায়! তাঁর মুখ দিয়ে নেশার আমেজে যে কথা বের হচ্ছে সে কথাগুলি প্রলাপের মত নয়, তার যথেষ্ট মূল্য আছে। তিনি সজাগ অবস্থায় যা পৌরুষের শক্তিতে গোপন করে রাখেন, তা অচেতন অবস্থায় উচ্চারিত হয়ে তাঁর মনের ছবি প্রকাশ করলো।

আনার হঠাৎ শাহজাদাকে অনেক কাছে পেয়ে কেমন যেন অভিভূত হয়ে গেল। সে ভাবলো এমনি সহজ মানুষটিকে যদি সে কখনও সব সময় কাছে পেতো? এমনি মানুষের প্রতি সোহাগ যে তার চিরকালের! সে শাহজাদার কাছে গিয়ে নিজেকে সঁপে দিল।

শাহজাদা আনারকে আপন বক্ষের সীমিতে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে তাকে নিয়ে পাশের এক কক্ষে প্রবেশ করলেন।

রঙমহলের এই বিলাসী কক্ষ সেদিন সারারাত্রি আলোর বর্ণাঢ্য নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করলো। দু-চারবার খোজা প্রহরী কক্ষে উঁকি দিয়ে দেখে গেছে কিন্তু ব্যাপারটা অনুধাবন করে মুচকি হেসে সরে পড়েছে। তাছাড়া শাহজাদার হুকুম না হলে যে রঙমহল এই অবস্থায় থাকবে—তাই ভেবেই তারা যে যার কাজে চলে গেছে।

সেদিন রাত্রি এমনি ভাবেই শেষ হয়েছিল।



শুধু পরদিন প্রত্যুষের আলো আশমানের চতুর্দিকে সোনা রঙ ছড়ালো একটি

দ্রুতগামী অশ্বারোহী মান্ডুদুর্গের ভেতর থেকে বের হয়ে দিল্লীর পথ ধরলো। তার সঙ্গে ছিল আনারের একটি ওড়না। সে চলেছে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানকে আনারের ওড়নাটি উপহার দিতে। এ হুকুম শাহজাদা খুররমের। হুকুম তামিল করতে চলেছে দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈনিক।

তারপর সেদিনই শাহজাদা খুররম মালবে অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত না মনে করে দাক্ষিণাত্যে পাড়ি জমালেন। তবে যাবার আগে দেওয়ান আফজল খাঁকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর আর্জি মঞ্জুর করে বললেন—দেওয়ান খাঁ সাহেব, আমি আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীই হবো। মোগলবংশের রাজপুত্র হয়ে ভীরু কাপুরুষের মত বশ্যতা স্বীকার করলে বংশের শোনিতের অপমান করা হবে। তাই অসিই ধরবো। পিতার বিরুদ্ধেই দাঁড়াবো। যে পিতা সন্তানের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ না প্রদর্শন করে বরং অত্যাচার শুরু করেন, সে পিতার ওপর আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই।

তারপর হঠাৎ শাহজাদা অস্বাভাবিক কণ্ঠে চীৎকার করে বললেন- আমি কি চেয়েছি পিতার ওপর অশ্রদ্ধা করতে? সকলে মিলে আমাকে তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য করাচ্ছে। আর পিতারও প্রতিটি কার্য আমাকে অশান্তির হোমাগ্নিতে নিক্ষেপ করছে।

আপনি বলুন দেওয়ান খাঁ সাহেব—শাহজাদা আফজল খার দিকে ফিরে বললেন —আমি কি কখনও পিতার প্রতি কোন অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছি? সন্তানের পিতার ওপর যতখানি শ্রদ্ধা জানানো উচিত—আমি কি তার চেয়েও বেশী জানাইনি? আজ হয়ত আমার এই বিদ্রোহে সকলে মনে করবে আমি সিংহাসনের ওপর লুব্ধ হয়েই পিতার জীবিত অবস্থায় পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করতে চাইছি! জানি, এ অপরাধ আমি চীৎকার করে কবুল করলেও কেউ বিশ্বাস করবেনা। কোরাণ শপথ করে জানালেও বলবে আমি লোভী, আমি বেদৌলৎ—আমি সমস্ত বিচারের বাইরে এক ঘৃণ্য পুরুষ। তারপর শাহজাদা ম্লান হেসে বললেন—নসিব যার দুশমনের ছুরিকাঘাতে রক্তাক্ত হয়ে গেছে তার নসিবের জন্যে আক্ষেপ করলে কি হবে! যাইহক আপনাকে আমি যেতে হুকুম দিলাম এই জন্যে যে যদি সুযোগ পান, পিতাকে আমার মানসিক অবস্থা বুঝিয়ে বলবেন। বলবেন, আপনি সারা হিন্দুস্থানের প্রতিটি মনের সংবাদ জানেন, আর নিজের পুত্রের মনের অবস্থা বুঝতে পারেন না! সে আপনারই সন্তান, আপনারই মত উদার মন তার। শুধু একটি বিরাট চক্রান্ত তাকে ঘিরে আবর্ত সৃষ্টি করেছে বলে আপনি তাকে ভুল বুঝছেন।

শাহজাদা একটু স্তব্ধ থেকে আফজল খাঁর দিকে কাতর হয়ে তাকিয়ে বললেন— খাঁ সাহেব, আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করবেন। আপনাকে বোঝানো আমার বাতুলতা। আপনি বহুকাল ধরে আমাকে দেখছেন। আপনি পিতার একান্ত সুহৃদ। পিতৃতুল্য। পিতার মতই মন আপনার। আপনাকে আমি আর কি বলবো? শুধু আমার মানসিক অবস্থাটুকু তুলে ধরলাম। আমার অভিপ্রায়টুকু ব্যক্ত করলাম।

আপনি যা ভাল মনে করবেন, বলবেন। তারপর আর একবার থেমে শাহজাদা বললেন—কিন্তু পিতার মন আপনি জয় করতে পারবেন কিনা সন্দেহ! কারণ তার আগেই পিতার মন জয় করে এমন এক আকর্ষনীয় বস্তু বসে আছে, যার তুলনা দুনিয়াতে বিরল। বলতে কুন্ঠিত হই তবু বলছি, রমণীদেহের প্রতি পিতার এই লোভ আজন্ম-কালের। আর এ ছাড়া শুনেছি বর্তমানের সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে পিতার বাল্য অনুরাগ সঞ্চিত ছিল। সেই অনুরাগই পরবর্তীকালে নিবীড়তার ছোঁয়াচে সংযুক্ত হয়। পিতা এই রমণীর সঙ্গসুখের জন্যে বিরাট অন্যায়কে আশ্রয় করে রমণীর পূর্বস্বামী শের আফগানকে হত্যা করিয়েছিলেন। সে যাক্‌গে, এই সব কাহিনী আমার বলা শোভা পায় না। আমি শুধু বলতে চাইছি, 'সেই রমণী যদি আজ পিতাকে বশীভূত করে হিন্দুস্থানের সিংহাসনের সর্বেসর্বা হয়, তাহলে অপরাধ কোথায়? সে তার পূর্বস্বামীর ঔরসজাত কন্যা লডিলীর সঙ্গে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহরিয়ার শাদী দিয়েছে। সে এই শাহরিয়ার সিংহাসন প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত করবার জন্যেই এই ষড়যন্ত্র করছে। সেখানে তার স্বার্থ, শাহরিয়ার ক্ষমতার ওপর তার কর্তৃত্ব আছে, সিংহাসন শাহরিয়া পেলেও সেই চতুর রমণীর পাওয়া হল। দেখছেন না খাঁ সাহেব, পিতা বর্তমানে সম্রাজ্ঞীর ওপর কতখানি নির্ভরশীল হয়ে মুদ্রার ওপর নিজের নামের সঙ্গে সম্রাজ্ঞীর নাম যুক্ত করেছেন। যাইহক, আপনি গিয়ে পিতাকে বুঝিয়ে বলুন—যদি কোন কাজ হয় তো ভাল—নতুবা আমার ব্যবস্থা আমি করবো। আমি সেই রমণীকে বুঝিয়ে দেবো, সে পিতাকে তার যৌবন দিয়ে বশীভূত করেছে কিন্তু আমাকে হুঙ্কার দিয়ে বশ করতে পারবে না!

আফজল খাঁ শাহজাদার কথা শেষ হলে বললেন—আমায় তাহলে যাত্রার আজ্ঞা দিন্ শাহজাদা! আল্লার কাছে প্রার্থনা করি, আমার যাত্রা যেন শুভ হয়।

শাহজাদা মাথা নেড়ে বললেন, তাই করুন খাঁসাহেব। আমি আপনাকে বিদায় দিয়ে দাক্ষিণাত্যে চলে যাচ্ছি। সেখানে আপনার জন্যে অপেক্ষায় থাকবো, আপনার জয়পরাজয়ের ওপর আমার কার্যের গতি নির্ভর করবে। আপনি ফিরে এলেই আমি আমার কর্মনীতি ঠিক করবো। তবে আর একটা কথা খাঁ সাহেব—সম্মান কখনও বিসর্জন দেবেন না। সম্মান রক্ষা করেই রাজপ্রাসাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করবেন। আপনার যাত্রার উপযুক্ত আয়োজন আমি এই মুহূর্তে সম্পন্ন করে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি ততক্ষণ কক্ষে গিয়ে বিশ্রাম নিন।

দেওয়ান আফজল খাঁ আর কোন কথা বললেন না, উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে শাহজাদাকে হাজারো সলাম পেশ করে কক্ষত্যাগ করলেন।

আর একা সেহ নির্জনকক্ষে দাঁড়িয়ে শাহজাদা কেমন যেন অশ্রু ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। সেদিনের সেই মুহূর্তটি ইতিহাসের কোথাও লেখা নেই। যদি থাকতো, তাহলে সমগ্র দেশবাসী শাহজাদার এই মানসিক অবস্থা দর্শনে কাতর হত।

শাহজাদা সেই মুহূর্তে হাটু গেড়ে বসে গবাক্ষপথে সূর্যের দিকে তাকিয়ে বলেছেন, পিতা তুমিই আমার খোদা, তুমিই আমাকে এই দুনিয়াতে এনেছ। তোমার

জন্যে আমার এই দেহ, এই চক্ষু, এই জ্ঞান, সব পেয়েছি। আজ তোমার এই অবিচার কেন আমাকে যন্ত্রণায় নিঃশেষিত করছে? বলো বলে দাও কি অপরাধ করেছি, যার জন্যে সন্তানকেও ক্ষমা করা যায় না! জানি তোমার বিচারে কোন অপরাধীর ক্ষমা নেই, বাদশাহকে সবার জন্যে একই বিচারের প্রহসন করতে হয়। তবু আমার অপরাধ কি খুবই চরম?

শাহজাদার দুচোখ ভরে অশ্রু ছাপাছাপি হয়ে সাগরের দুকূল ভরিয়ে তুললো। অশ্রুধারা সুন্দর গালের দুই প্রান্ত বেয়ে নেমে এলো কন্ঠের কাছে। শাহজাদা তাদের বাধা দিলেন না, তারা আপন গতির স্বাধীনতা পেয়ে নেমে গেল সাঁপলধারায়। শাহজাদা তাকিয়ে রইলেন অমিত তেজশালী সূর্যের প্রখরমান জ্যোতির দিকে। গবাক্ষ দিয়ে সূর্যের নির্ভীক জ্যোতিবলয় কক্ষের মাঝে এসে নেমেছিল। শাহজাদা সেদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে স্মরণ করলেন—স্বর্গত জননীকে। জগৎ গোঁসাইনী বেগমকে। যিনি গর্ভে ধারণ করেছিলেন। যিনি তাঁর দেহের পুষ্টি দিয়ে দশমাস গর্ভে ধারণ করে তারপর এই পৃথিবীর আলোয় ভূমিষ্ঠ হতে সাহায্য করেছিলেন। আজকের এই সূর্যের একই রশ্মিমালা সেদিনও এমনি বিক্রমে তার স্বর্ণবর্ণ জ্যোতি আবির্ভূত করেছিল। তিনি প্রথম ভূমিষ্ঠ হবার পর এই আলোয় চোখ মেলে দেখেছিলেন। সেদিন জীবনের কি আনন্দ ছিল! আজ সেই আলোয় দুঃখের প্রবাহ মনের সমস্ত গ্রন্থি শিথিল করে দিচ্ছে। আম্মাজান কোথায় গেলেন? আম্মাজান তাঁকে ছেড়ে গেলেন কেন? তবে কি তাঁর এই দুর্দিন একদিন আসবে চিন্তা করেই তিনি পালিয়ে গেলেন।

শাহজাদা খুরম উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে লাগলেন। দু'হাত পিছন দিকে আড়া-আড়ি ভাবে স্থাপন করে কক্ষের হর্ম্যতলে সজ্জিত কার্পেটের ওপর ধীরে ধীরে চলাফেরা করতে লাগলেন। চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালেন—শুধু দুটি চোখ, সমুদ্রের অতল সীমাহীন দৃষ্টি নিয়ে দুটি চোখ তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

শাহজাদা সেই দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন আশঙ্কায় শিউরে উঠলেন। ফিস ফিস করে বললেন—সম্রাট আকবর তুমি কি ঐ গভীর দৃষ্টি দিয়ে আমার ভবিষ্যতের সর্বনাশা চিত্র অংকন করছো? তুমিই গড়েছিলে এই হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ কীর্তিময় সুবিশাল সাম্রাজ্য। জীবনে অনেক শ্রম স্বীকার করেছ, অনেক শক্তির পরীক্ষা দিয়েছ, অনেক শক্তিকে আপন-শক্তির বাহুবলে পরাভূত করে সূর্যের ঐ অমিতবিক্রমশালী তেজনৈপুণ্যের মত শ্রেষ্ঠ হয়েছ। কিন্তু সেই সুবিশাল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎও কি তুমি ছকে অংকন করে গিয়েছিলে? জানি না তোমার ভবিষ্যতের ছবিটি কি? তবে আজ দেখতে পাচ্ছি, পিতার শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়ে অন্যহাতে সরে গেছে। তোমার পুত্র হতে তোমার গড়া সাম্রাজ্য রসাতলে যাবার মত। তুমি যা আপন মেহনতে গড়ে গেলে তাকে রক্ষা করবার মত সুব্যবস্থা করে গেলে না! লোকে আজও বলে—তোমার শক্তির তুলনা করা যায় না। আমি

বিশ্বাস করি তোমার শক্তির মর্ম। কিন্তু সেই শক্তি তোমার দেহাবসানের পর ধূলায় লুণ্ঠিত হবে তাই যদি জানতে—তাহলে এই শক্তির অযথা প্রসারের কি প্রয়োজন ছিল? যা রক্ষা করা যায় না, তা সৃষ্টি করাও তো দুর্বলতার সামীল বলে বিবেচিত হয়। তুমি একদিকে যেমন শক্তিধর ছিলে—অন্যদিকে যে একেবারে দুর্বল—এই প্রমাণই যে এখন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। যে সাম্রাজ্য গড়লে, সেই সাম্রাজ্য একপুরুষ ভোগ করবার আগেই অভিশাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তাকে রক্ষা করবার জন্যে আর একবার সেকেন্দ্রার সমাধি গহ্বর থেকে উঠে এসো। যদি না উঠে আসো, তাহলে বুঝবো—তোমার আত্মসুখই বড় ছিল। নিজের সুখ চরিতার্থ হয়ে যাবার পর, তা ধ্বংস হয়ে যাক্—এই চিন্তা করেই তুমি সাম্রাজ্যের এমান অরক্ষিত অবস্থা সৃষ্টি করে গিয়েছিলে। আর তুমি তো জানতে, বর্তমানের এই দিন খুব বেশীদূরে নয়। দিন ঐ আগত। সমস্ত সাম্রাজ্য বেষ্টন করে আগুনের রক্তবর্ণ শিখা তার অসীম শক্তি নিয়ে ঐশ্বর্যমণ্ডিত এই বিশাল সাম্রাজ্যের মর্মরময় ভিত ধসিয়ে দেবে।

একটি বিরাট তৈলচিত্র। স্বর্ণনির্মিত ফ্রেমের মধ্যে কোন বিদেশী চিত্রকরের তুলিতে আঁকা। সম্ভবতঃ সম্রাট আকবরই এই চিত্রখান তৈরি করেছিলেন। চিত্রকর খুবই দক্ষ। তাই তুলিতে সম্রাট আকবর জীবন্ত হয়ে তৈলচিত্রের মধ্যে ধরা পড়েছেন। শাহজাদা খুরম এই তৈলচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে পিতৃপুরুষের গাম্ভীর্যময় মূর্তিকে নানান আলোচনার মাঝে পরীক্ষা করে তাঁর দেশজোড়া নামের কারণ সন্ধান করছেন। তিনি আজীবন ধরে এই বীরপুরুষকে শ্রদ্ধা করেন। সেলাম জানান। তার রাষ্ট্রনীতি চিন্তা করে মনে মনে শাহজাদা খুরম সেই নীতির প্রতি বিশ্বাসভাজন হন। এই তৈলচিত্রটিও সেজন্যে তাঁর কাছে আছে। তাঁর কাছে আসার পিছনে একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। জাহাঙ্গীর শা এই চিত্রটি পুত্রকে দিতে চান নি। কারণ তিনি বলেছিলেন, এমন একটি জীবন্ত চিত্র পিতার আর নেই। কিন্তু শাহজাদা খুরম অনেক যুক্তির অবতারণা করে শেষে একদিন কোন একটি উৎসব উপঢৌকন স্বরূপ এই চিত্রটি পিতার কাছ থেকে গ্রহণ করেন। তারপর থেকে এই চিত্রটি শাহজাদা খুরমের পরিবারবর্গের সঙ্গে অন্যান্য আসবাবের মত স্থানে স্থানে ঘুরে ঘুরে চলেছে।

শাহজাদা খুরমের মনে মনে কল্পনা—যদি কখনও তিনি সিংহাসন পান, তাহলে দাদু সম্রাট আকবরের নীতিই তিনি প্রবর্তন করবেন। আকবরের মতই হবেন যোদ্ধা, রণকুশলী, সাম্রাজ্য বিস্তারের নিপুণ শাসন পরিচালক। সেজন্যে তিনি আজন্মকাল ধরে তরবারী চালনার সমস্ত কৌশল আয়ত্ব করেছেন। রণক্ষেত্রে শত্রুকে কি করে পরাজিত করতে হয়, রণক্ষেত্রে গিয়ে তার নানাবিধ কৌশল পরীক্ষা করেছেন। একটি ক্ষুদ্র দেশকে বিদ্রোহদমনের মধ্যে দিয়ে আপন ক্ষমতার মাঝে কি করে রাখা যায়—তার নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ করেছেন।

আকবরের যতগুলি গুণ তিনি ছোটবেলায় দেখেছেন, পরিণত বয়সে শুনেছেন,

প্রায় সবগুলি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছেন। সম্রাট যখন দেহ রাখেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র বারো। সেই বারতেও তাঁর যে বুদ্ধি ছিল, সে কথা আজও স্মরণ হয়।

একবার সম্রাট আকবরের একটি চোখের ভয়ংকর দৃষ্টি দেখে বালক খুররম আঁতকে উঠেছিলেন। বাদশাহের স্বাভাবিক চোখের দৃষ্টিতে যখন ক্ষুব্ধভাব জাগতো, তখন দৃষ্টি শোভার এমন বীভৎস অগ্নিদীপ্তি জেগে উঠতো, যা দেখে মরামানুষের প্রাণ কেঁপে ওঠে। আকবর এই বীভৎস দৃষ্টি নিয়ে ঘৃণার মাঝে শত্রুর ওপর পদাঘাত করতেন। তাছাড়া তাঁর বাম চক্ষু ও বাম পদটি একটু খাটো ছিল। এই বিকৃতিই বোধ হয় তাঁকে দুনিয়ার সেরা ভাগ্যবানে পরিণত করেছিল।

শাহজাদা খুররম বালকাবস্থায় অনেকবারই সম্রাটের ক্রুদ্ধভাব দর্শন করেছিলেন কিন্তু সেদিন কেমন যেন তাঁর ভীরুমনে আতঙ্ক এসে বাসা বাঁধলো। তিনি চীৎকার করে শুধু বলেছিলেন—বাদশাহ দাদু, তোমার ঐ চোখের ভয়ংকর দৃষ্টি সহজ কর, না হলে আমি এখুনি চেতনা হারিয়ে ফেলবো।

সেদিন বাদশাহ দারুণ ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। এক বেইমানের শাস্তির পরিমাণ চিন্তা করতে করতে ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রূপ পরিবর্তন হচ্ছিল। অন্যদিন হলে বাদশাহ পরক্ষণে সংযত হয়ে হাস্য প্রকাশ করে বলতেন—যা, পালা ভীরু কাপুরুষ লেড়কা! বাদশাহের বংশে জন্মে রক্তে কাপুরুষতা! কলংক, কলংক,—যা পালা! কিন্তু সেদিন তিনি তার ঠিক বিপরীত আচরণটি করলেন—ছুটে গিয়ে ঠাস্ করে সেই বালকের গন্ডে এক চপেটাঘাত করে বললেন—বেরো দূরহ! যত সব বেল্লিক শয়তানের দুষ্টচর! আর যদি কখনও আমার কক্ষে এসেছিস্ তাহলে ঘাতকের কাছে প্রেরণ করে কেটে টুকরো টুকরো করার আদেশ দেব।

শাহজাদা সেদিনের কথা আজও ভোলেন নি। সেদিনের সেই তিরস্কারও ভোলেন নি, আর সম্রাটের সেই বীভৎসদর্শন চক্ষু। আজ সেই চক্ষুই তাঁকে সবচেয়ে মনে করিয়ে দিল—সাম্রাজ্যের বর্তমান অবস্থা। সেই তিরস্কারের পর অবশ্য সম্রাট তাঁকে ডেকে পিঠ চাপড়ে শান্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মনে মনে শাহজাদা শান্ত হন নি। তখন অবশ্য সম্রাটের বিশাল বক্ষের আড়ালে মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিলেন, কিন্তু ভালভাবেই জানতেন—তিনি ভয়ে সজ্ঞানে মিথ্যা কথা বলছেন। মিথ্যা কথা ছাড়া আর কি? যে তিরস্কারে রক্তের মত আগুন জ্বালিয়েছিল, সে রক্তের সান্ত্বনা আগুনের দীপ্তি নিষ্প্রভ করে?

তাই সেই তিরস্কারও আজীবন ধরে তাঁর মনে আছে। আর সেই চোখ।

সেই চোখই আজ তাঁকে এই দুর্দিনে আবার জানিয়ে দিল আতঙ্কিত হতে। তবে সেদিন আতঙ্ক কাপুরুষতার শাস্তিরূপে মিলেছিল। আর আজ আতঙ্ক উপস্থিত হচ্ছে—দুঃসাহসী হয়ে পৌরুষতাকে তীক্ষ্ম করে ষড়যন্ত্র চুরমার করে দিতে। কিন্তু বিরাট একটি শয়তানী বাহিনীকে কি করে সরাবেন? তারা সরবে, না নিজেই শেষ পর্যন্ত সরে গিয়ে তাদের পথ পরিষ্কার করে দেবেন? এতকাল সিংহাসনের মাথার ওপর রত্নখচিত কারুকার্যময় চন্দ্রাতপের মাঝে সূর্য কিরণ প্রত্যক্ষ করেছেন, এবার সেখানে

দীপ্তিশোভা মিলবে না। শোভামণ্ডিত হবে বীভৎসতার চরমতম এক বশ্রী কালিমানবর্ণের ভয়ঙ্কর রূপ। তিনি আরো আতঙ্কিত হয়ে যেন চোখের ওপর দেখতে পেলেন—তৈমুর চলেছেন জিঘাংসায় তীব্র ঘৃণায় পিছিল পথ দিয়ে নরমুণ্ডের পাহাড় ডিঙিয়ে। আর সেই নিহত দুর্বল মানুষগুলির বক্ষ থেকে ভীরু করুণাসিক্ত দীর্ঘনিশ্বাস বাতাসের মাঝে মিশে সমস্ত দুনিয়ার আবহাওয়া বিষাক্ত করে দিয়ে দুনিয়াকে সর্বনাশের মুখোমুখি নিয়ে গিয়ে ফেলতে। তৈমুর নিজেও জানতেন, তাঁর এই অভিশপ্ত বংশ কখনও শান্তিতে দিন অতিবাহিত করবে না। যতদিন যাবে ততদিন তাঁর পাপের শাস্তিস্বরূপ নিরপরাধ মানুষগুলির ক্রন্দন প্রেতলোক থেকে অনুচ্চারিত হয়ে সমস্ত বাতাস ভারী করে রাখবে। আর অভিশপ্ত বংশধররা কোথায় শান্তি, কোথায় শান্তি বলে চীৎকার করে নিজেদের ব্যর্থ জীবনের হাহাকার নিয়ে ঐশ্বর্যের মাঝে ঔজ্জ্বল্যহীন জীবন পরিগ্রহ করবে। আর আল্লাকে ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারবে না, তার কারণ মুক্তি মিলবে না বলেই আল্লার প্রার্থনাও ক্ষমতার বহির্ভূত বলে মনে হবে।

শাহজাদা এবার স্থির লক্ষ্যে উপনীত হয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঠিক করলেন—এ বংশ যখন লোপ পাবার মুহূর্তে এসে পৌঁছেচে তখন চিন্তার কি আছে। একদিন সুবিশাল মর্মরময় সৌধ প্রাসাদ যখন মাটির তলায় প্রবেশ করবে, তখন এই বংশের গৌরবও যদি সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যায়, ক্ষতি কি?

এই সময়ে একটি প্রহরী এসে সেলাম জানিয়ে বললো—হুজুর, দেওয়ান খাঁ সাহেব অপেক্ষায় আছে!

শাহজাদা তাড়াতাড়ি অস্থির হয়ে বললেন—খুব ভুল হয়ে গেছে, আচ্ছা তুমি যাও, আমি এখুনি যাচ্ছি।

প্রহরী আবার বললো—দাক্ষিণাত্যে যাত্রার আয়োজন সব সমাপ্ত। আপনি কখন মান্ডু প্রাসাদ ছেড়ে যাবেন, জিজ্ঞাসা করতে পাঠিয়েছেন বিবিসাহেবা?

শাহজাদা প্রহরীর দিকে সচকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—তুমি যাও, সে উত্তর আমি যথা সময়ে প্রেরণ করছি?

প্রহরী চলে গেলে শাহজাদা আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলেন না, দ্রুতগতিতে কক্ষত্যাগ করে আফজল খাঁর দিল্লী যাত্রার আয়োজন ও নিজেদের দাক্ষিণাত্যে স্থান পরিবর্তনের ব্যবস্থা করতে গেলেন।

সেদিন কিছুক্ষণের মধ্যে বিরাট একটি বাহিনী—অশ্বারোহী, পদাতিক সৈন্য নিয়ে কয়েকখানি শিবিকা পরিবেষ্টিত হয়ে দাক্ষিণাত্যের পথে যাত্রা করলো।

মান্ডুপ্রাসাদ পড়ে রইলো আবার জনমানবহীন হয়ে। আবার তার বিশাল বক্ষে শূন্যতার হাহাকার জমা হতে লাগলো। শাহজাদা অবে যাবার সময় পর্বতোপরি সেই বিরাট প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে অশ্রুসজল কণ্ঠে বলে গেলেন যদি আমি বেঁচে থাকি, আর আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, তাহলে আবার এই প্রাসাদে ফিরে আসবো। এখানে পড়ে থাকলো আমার সমস্ত দিনের সোহাগী কুমকুম।

সে রাত্রের পর আনারের জীবনে নতুন করে ফুটেছে নবরঙে বিভূষিত প্রস্ফুটিত গোলাপকোরক। সে তৃপ্ত। তার সমুদ্র উত্তাল যৌবনভান্ড পূর্ণ। সে চেয়েছিল যা, পেয়েছে তা। তার এই বহুদিন ধরে অপেক্ষা করার সার্থকতা স্বীকৃত হয়েছে। রমণী যখন আপন ইচ্ছাকে প্রসারিত করে পূর্ণতার রূপে সম্পূর্ণ হয়, তার চেয়ে ভাগ্যবতী এই পৃথিবীতে বিরল। আনার ভাগ্যবতী। আনার ঐশ্বর্যময়ী। সে ঐশ্বর্য দান করেছেন শাহজাদা খুররম সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী, সে সিংহাসন হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্যের সিংহাসন, যার পরিধি সুবিশাল। সামান্য এক দেশীয় রাজার রাজপুত্রের সোহাগী হয়ে নিজেকে কলুষিত করে নি। কোন সৈনিকের ব্যর্থজীবনের সোহাগ নিয়ে সে পূর্ণ হয়নি, হয়েছে দারুণ এক সৌভাগ্য-বানের স্পর্শে নতুন মানুষ, নতুন আওরত।

নুরজাহান যখন জানতে পারবেন তখন তিনি এই সম্বন্ধটি কিরকম ভাবে গ্রহণ করবেন? তিনি আক্রোশে নিজের কোমল হস্তেই কি নিজের দন্তপংক্তি দিয়ে কামড় দেবেন না! যদি দেন তাহলে শোণিত কিরকম ধারায় বের হবে! সেই ধারায় কি তিনি স্নান সেরে শান্তিলাভ করবেন। সেই ধারা কি তাহলে রোশনীবাগের অপরূপ কারুকার্যমন্ডিত স্নানাগারের গুলাবী প্রস্রবণের ধারাকে হার মানাবে! আনার যখন এই কথা চিন্তা করে তখনই তার মধ্যে কেমন যেন উল্লাস পরিলক্ষিত হয়! তার মনে হয়, সে যেন দেখতে পাচ্ছে, সম্রাজ্ঞী তাঁর ক্ষুব্ধ চোখের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করে হারেমের সবচেয়ে আরামদায়ক কক্ষের হর্ম্যতলে পায়চারী করতে করতে দাঁতে দাঁত চেপে আক্রোশে ফুলছেন, আর ভাবছেন— এর প্রতিশোধ কেমন করে নেওয়া যায়!

শাহজাদা পরদিন সকালে গতরাত্রে ব্যবহৃত নিষ্পিষ্ট ওড়নানি বাঁদীর দ্বারা চাইতে পাঠিয়েছিলেন।

সারারাত্রির নির্ঘুম দুটি চোখের বিস্ময়ই তখন প্রকট হয়ে উঠেছিল। মনে ছিল না আনারের গতরাত্রের এই বিষয়টি। সে তখন স্পর্শ সুখানুভূতিতে আচ্ছন্ন। লজ্জার মেদুর ছায়ায় রক্তিম। তারপর শাহজাদার কথাটি মনে পড়তে আরো তার সরম মনে বাসা বাঁধে। সে সরম ভাব কাটিয়ে যখন সে ওঠে তখন দেখতে পায় বাঁদী তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। আনার আবার চোখ নামায়। আবার তার মধ্যে সরম এসে তাকে সঙ্কুচিত করে দেয়। পুষ্প যেন সঙ্কুচিত হয়ে রক্তিমতনু শোভায় আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তারপর সেই সরম জড়িত দেহে হঠাৎ জাগে প্রতিহিংসার উষ্ণস্পর্শ। উষ্ণ তপ্তভাব মনের প্রতিটি রেখায় রেখাঙ্কিত হয়ে তাকে লজ্জা থেকে অব্যাহতি দেয়। সে হঠাৎ সম্রাজ্ঞীর ভূমিকায় বাঁদীকে আদেশ দেয়—

যেখানে তার গতরাত্রের পরিত্যক্ত পোষাক রাখা আছে, সেখান থেকে ওড়নাটি নিয়ে যাবার জন্যে।

বাঁদী ওড়নাটি নিয়ে গেলে সে ভাবে নূরজাহানের কথা। নূরজাহান তার একার শত্রু নয়, শাহজাদা খুররমেরও শত্রু।

গতরাত্রে যে কথা শাহজাদা বলেছিলেন সেকথা তখন সেরাজীর বেহুঁশী প্রলাপ বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু পরদিন প্রভাতে লোক পাঠাতে আনার বুঝেছিল— সে রাত্রে শাহজাদা সচেতন অবস্থাতেই ছিলেন। এবং সচেতন মনেই তাকে গ্রহণ করে তিনি পূর্ণতার মাঝে সৌরভ সৃষ্টি করেছেন।

তবে তাই যদি হয়, সে রাত্রে শাহজাদা তো অনেক কথাই বলেছিলেন, তবে কি সবগুলিই সত্য কথা? উত্তেজনার মুহূর্তে আবেগের স্রোতে মাধুর্যময় পরিবেশে আতরের খসবুর আঘ্রাণ নিতে নিতে পৌরুষহীন পুরুষের প্রলাপ বকেন নি?

তাহলে যদি তাই হয়, অনেকগুলি অবিশ্বাস্য কথা তো বিশ্বাস উৎপাদনে চমৎকৃত করে মনের অলিসন্ধি!

শাহজাদা তাকে আপন বক্ষে স্থান দিয়ে গোলাপী সুবাসিত ওষ্ঠের ওপর ওষ্ঠ স্থাপন করে বক্ষের যৌবন কৌমার্যে আলপনা আঁকতে আঁকতে ......। না থাক্ সে কথা সর্বসমক্ষে বলার প্রয়োজন নেই। যা একান্ত গোপনীয়, তা নিজেরই সঙ্গোপনে থাক্।

আনার সে রাত্রের শাহজাদার সান্নিধ্যের কাহিনীটুকু একান্ত নিজের করেই রাখলো। এমন কি সে রাত্রের অনুভূতিটুকু ছাড়া সে কোন কথাই নিজের মনের মধ্যে রোমন্থন করলো না। সে রাত্রের ঘটনাটুকু মনের রক্ত মখমল আচ্ছাদিত পেটিকার মধ্যে সঙ্গোপনে রাখলো।

শুধু শাহজাদার কথাগুলি বিস্ময়ে স্মরণ করলো। হ্যাঁ, বিস্ময়েই স্মরণ করার মতো, শাহজাদা সে রাত্রে অনেক কথাই বলেছিলেন। রাতভোর পর্যন্ত কথা। ঘুমোন নি একটুও। বলেছিলেন—আগামীকল্য আমাদের এ প্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে হবে। জানি না, আর কখনও এখানে ফিরবো কি না! ·· তোমায় আজ যে জীবন দান করলাম, ভেবো না এ জীবন তোমাকে দেওয়া শাহজাদার খেয়াল মাত্র। এর পিছনেও বিরাট একটি উদ্দেশ্য নিহিত আছে। এই বলে তিনি জানালেন নূরজাহানের লিখিত চিঠির মর্মার্থ।

আনার তার উত্তরে জানিয়েছিল—তাহলে কি সেই জন্যেই আপনি আমাকে সম্মান দান করলেন?

শাহজাদা অকপট সত্য কথা বললেন—কতকটা অবশ্য তাই। তবে তোমার আকাঙ্ক্ষাও আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তুমি যখন এসেছিলে তখন সমস্ত রমণী জাতির ওপর আমি বিশ্বাস হারিয়েছিলাম। বিশেষ করে পিতার সেই রমণী মেহের-উন্নিসার ব্যবহারে আমি মর্মাহত। তাছাড়া হারেমে আছে মমতাজ। মমতাজ আমার প্রিয়তম বেগম, তবু আমার বিশ্বাস—মমতাজ যে কোন সময়ে অবিশ্বাসের কাজ

করতে পারে। তাদের সমস্ত আত্মীয়স্বজন এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত। তার পিতা এখন বাদশাহের মন্ত্রীপদ অলংকৃত করে আছেন। আমি জানি মমতাজ স্বামীর ভাগ্যের জন্যে সাহায্য করবে। কিন্তু রমণীমন অনেক সময় কুয়াশার মাঝে বিচরণ করে তার স্বভাব গোপন করে রাখে, মমতাজ অবিশ্বাসিনী হলে আমি আশ্চর্য হব না।

আনার সেইমুহূর্তে ভাবলো—মমতাজের আজ শাদী হয়েছে প্রায় দশ বৎসর। তিনি এখন চারটি সন্তানের জননী। তাঁর প্রতিও শাহজাদার অবিশ্বাস! তাহলে তো তার প্রতিও শাহজাদার অবিশ্বাস বোধ জাগতে পারে? আবার পরক্ষণে ভাবলো—অবিশ্বাস না হলে তার আগের দিনে প্রাসাদের ঘটনা নিয়ে তিনি তাকে কারাগারে পুরলেন?

আনার যখন এইসব কথা ভাবছিল, শাহজাদাই তার ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে উত্তর দিলেন,—এই সময় তোমাকে আমার বিশেষ দরকার ছিল। এমন একটি রমণীকে আমার দরকার ছিল যে আমার সমস্ত মনের অবস্থা বুঝে আমাকে সাহায্য করবে। মমতাজ নূরজাহানের আত্মীয়া না হলে তার সাহায্যই আমার সবচেয়ে বেশী কাজে লাগতো। কিন্তু তার প্রতি দারুণ বিশ্বাসে তনুপ্রাণিত হয়েও কেমন যেন বিশ্বাস রাখতে পারি না। সেজন্যে তোমার উপস্থিতি আমার এই ঘোর দুর্দিনে পরম বন্ধুর মত মনে হচ্ছে। আর সেজন্যেই আজকের এই মুহূর্তের ভূমিকা। আমি যদি কখনও জয়ী হই রমণী, তাহলে সম্রাটের ভূমিকায় আসীন হয়ে তোমাকে অবমাননা করবো না। প্রেমিকের মত বক্ষের আলিঙ্গনে আজকের রাতের মতই তোমাকে সম্মানের উচ্চাসনে স্বীকৃতি জানাবো। যদিও মমতাজের কাছে আমি অবিশ্বাসী হব, তবু তোমার ওপর বেইমানী করে তোমার যোগ্য আসন থেকে তোমাকে বঞ্চিত করবো না।

সেই মুহূর্তে আনারের হঠাৎ একটি কথাই মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল, কেন গেল সে তা জানে না। সে বললো—শাহজাদা, আমি যদি অবিশ্বাসিনী হই?

হঠাৎ শাহজাদার দুটি চক্ষু শয়তানের মত জ্বলে উঠলো, বললেন, তার জন্যে ভাবনার কারণ নেই। মোগল বাদশাহের বিচারে যেমন চরমদণ্ডের ব্যবস্থা আছে, শাহজাদাও সেই দণ্ড দিতে কার্পণ্য করবে না।

আনার আবার বললো—আমাকে তাহলে এখন পরিচারিকার ছদ্মবেশ পরিয়ে রাখলেন কেন?

তার কারণ মমতাজের কাছে আমার বিশ্বাস স্থাপনার জন্যে। তাছাড়া তার সন্তানগুলির ভার তোমার ওপর থাকলে সে ভারমুক্ত হবে। তবে সবার চেয়ে আসল কারণ তোমার উপস্থিতিটি এমনভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে রাখতে চাই, যদি কোন ষড়যন্ত্র কোথাও পাকিয়ে ওঠে, তাহলে তুমি তা আমার কাছে যথাসময়ে ব্যক্ত করবে।

আরো অনেক কথাই শাহজাদা বলেছিলেন তবে সে কথা ব্যক্ত না করলেও চলবে। তাছাড়া আর কোন কথার ওপর আনারের কোন চিন্তা ছিল না, যতটা ছিল মমতাজের জন্যে।

আনার তারপরে মমতাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। মমতাজের মাতৃত্ব, মমতাজের রমণী মনের প্রতিচ্ছবি দেখে সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পের সঙ্গেই তুলনা করেছে। সেখানে নিজেকে মনে হয়েছে বড় ম্লান, বড় নিষ্প্রভ। মমতাজ যেন সম্রাজ্ঞী হবার জন্যেই জন্মেছে। সম্রাজ্ঞীর মত সমস্ত অলংকার তার দেহের প্রতিটি অঙ্গে। তবে ঐশ্বর্য-মন্ডিত মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী নয়, শাহজাদার পবিত্র মনের অগুরু সুবাসিত মহব্বতের রানী। আনার মমতাজের সঙ্গে কথা বলে আর ভাবে এই রমণীকে শাহজাদা কেমন করে অবিশ্বাস করলেন? এর যে তুলনা দুনিয়াতে বিরল! শরীরে রাগ এতটুকু নেই। বরং ক্ষমার মাঝে তিনি মহিয়সী। তিনি কি জানেন না—আনারের আসল পরিচয় কি? আনারের চালচলন আদবকায়দা, তার ওপর শাহজাদার সঙ্গে তার নিভৃতে কথাবার্তা বলা—এ সব দেখে কি মমতাজের অজানাই থাকে কিছু?

মমতাজবিবি কিছু না বললেও বুঝতে পারে আনার—তিনি সবই জানেন। কিন্তু কোন অনুযোগ স্বামীর কাছে প্রকাশ করেন না কেন – চিন্তা করে আনার বুঝতে পারে না এর আসল অর্থ? শাহজাদা তাকে সবার মাঝে স্বীকৃতিও দেননি। কিন্তু তার এখনই মনে হচ্ছে, সবার মাঝে প্রকাশ করে নিজের অধিকার বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে মমতাজবিবির আসন কেড়ে নেয়? মমতাজবিবি তার শত্রু, শত্রুস্থানীয়াকে আধিপত্য বিস্তার না করতে দিয়ে তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে নিজের যোগ্য আসন অধিকার করে। সে যখন এমনি ভাবছে, মমতাজ বিবি এধরণের একটি কথাও হয়তো ভাবছেন না।

অবশ্য এই সমস্যায় একটি প্রশ্নই মনে উদয় হয়—মমতাজবিবি হয়ত ভেবেছেন আনার রঙমহলের নর্তকী, সুগায়িকা বা ভোগের নিমিত্ত খুবসুরত আওরত। এরকম কতই তো বাদশাহের হারেম শোভা করে থাকে। হয়ত সেইরকম একজন কেউ বা তার চেয়ে আর একটু বেশী। কিন্তু তাই যদি ভেবে মমতাজবিবি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকেন তাহলে কিছু ভাবার নেই। তবে তাতে সন্দেহ হয়। মমতাজবিবি সবই জানেন। কিন্তু কিছু তিনি বলতে চান না।

যে কদিন ধরে আনার তাকে দেখছে, দেখে তার এই উপলব্ধি হয়েছে এই রমণীটির স্বভাব বড় অদ্ভুত। বরফের মত ঠান্ডা, শিশিরের মত স্নিগ্ধ, পুষ্পের গন্ধময় আবার ঐশ্বর্যের মত উজ্জ্বল। অহমিকা হয়ত একটু আছে কিন্তু তার চেয়ে বেশী আছে তাঁর সহনীয় ক্ষমতা। তিনি শান্ত, কমনীয়, সহানুভূতি চিত্তে সবকিছু আপন বক্ষে ধারণ করতে সক্ষম।

এই মমতাজবিবিকে এমন স্বভাবের রমণী দেখে আনারের পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। এ সে কি করলো? এই রমণীর সে কেন প্রতিদ্বন্দ্বিনী হলো?

আনার ভাবছিল দাক্ষিণাত্যের প্রাসাদের একটি অলিন্দের ধারে দাঁড়িয়ে। চমক ভাঙলো তার, আশমানের ওপর দুটি পারাবত পরস্পর অঙ্গীভূত দেহ মুক্ত করবার মুহূর্তে বিচিত্র শব্দ করতে। আর চমক ভাঙলো জাহানারা এসে পাশে দাঁড়াতে। সে বললো—বিবিজী, তুমি এখানে একা দাঁড়িয়ে আছো, আর আমি সারা প্রাসাদ

তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি ?

আনার দেখতে লাগলো একদৃষ্টে জাহানারাকে। ঠিক মমতাজের মুখের আদল। ঠিক মমতাজের স্বভাবের প্রতিচ্ছবি। জাহানারা এর মধ্যেই তার খুব অনুগত হয়ে গেছে। সর্বদা চোখের সামনেই ঘুরে বেড়ায়। জাহানারা কেন, তার তিন ভ্রাতা দারা, সুজা, ঔরঙ্গজেবও কেমন যেন তার বশ্যতা স্বীকার করেছে।

আনার বুঝতে পারে না কেন এরা তার এত বশীভূত হল। তার স্বভাব এমন কিছু ভাল নয়, যার জন্যে স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ সৃষ্টি হয়। সে এমন কিছু নিবীড়ভাবে আহ্বান করে নি, যার জন্যে ওরা ধাত্রীর স্নেহ, আম্মাজানের স্পর্শের মাদকতা ভুলে তার কাছে ছুটে আসবে। অথচ তবু তারা এল। আনার যদি কয়েক ঘণ্টা অন্তরালে অবস্থান করে, ওরা চারজনেই খুঁজতে খুঁজতে এসে তাকে ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ত চায়।

ভাবনা তার আর বেশীদূর অগ্রসর হল না। জাহানারা তার সালোয়ারের খুঁট ধরে বললো—ও বিবিজী, তুমি কি আমাকে দেখতে পাওনি ?

তাড়াতাড়ি আনার জাহানারার চিবুক ধরে হেসে বললো— হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তোমায় আমি দেখতে পেয়েছি জাহানারা ?

তবে তুমি কি ভাবছিলে ?

না, ভাবছিলাম কই ?

হ্যাঁ, তুমি তো ভাবছিলে কিছু। আমি দেখলুম, তুমি যেন মনে মনে কি বিড় বিড় করছিলে ?

জাহানারার কথায় আনার হাসলো।

বালিকা ধরেছে ঠিকই। ভাবনার কি তার শেষ আছে ? ভাবনা অনেক। কিন্তু সে ভাবনার বিষয়গুলি এই বালিকাকে বলা যায় না। শাহজাদা এখন বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে দাক্ষিণাত্যের মর্মরময় প্রাসাদের কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ছটফট করে বেড়াচ্ছেন। দেওয়ান আফজল খাঁ দিল্লীর দরবার থেকে প্রত্যাবর্তন করেন নি। এমন কি কোন সংবাদও আসে নি। আফজল খাঁর প্রত্যাবর্তনের ওপর শাহজাদার কর্মপদ্ধতি নির্ভর করছে। হয় বিদ্রোহ নয় বশ্যতা। পিতা যদি সন্তানের প্রতি স্নেহের প্রাবল্যে বক্ষে স্থান দেন, তাহলে শাহজাদা ঠিক করেছেন তিনি দরবারেই ফিরে যাবেন এবং গিয়ে পিতাকে বলবেন—আমার মূল্যবান জাগীরগুলি আপনি হস্তান্তরিত করলেন কিন্তু আমার সমস্ত ব্যয়নির্বাহ হবে কেমন করে ? পিতা যদি পুত্রের ওপর স্নেহ ভাবাপন্ন হন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য জাগীর দিয়ে তাঁকে আবার বিপদমুক্ত করবেন। কিন্তু এসব ভাবনাও এখন অলীক। এর বিপরীত সম্ভাবনাই বর্তমানে প্রবল।

শাহজাদা ভাবছেন দেওয়ান আফজল খাঁ না শেষপর্যন্ত কারারুদ্ধ হয়ে বাদশাহের বিচারের সম্মুখীন হন! কারণ নূরজাহান আনারের ওড়নাটি হাতে পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন এবং সম্মুখে দেওয়ান খাঁ সাহেবকে পেয়ে তাঁর ওপরই প্রতিশোধ নিয়ে বুকের যন্ত্রণার উপশম করবেন। হয়ত দেওয়ান খাঁ সাহেবকে এমন অপমান

করবেন যার তুলনা দুনিয়াতে বিরল। এমনি অনেক কিছু আবোল-তাবোল দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে নিয়ে শাহজাদা আতঙ্কিত হয়ে আশঙ্কায় দিন গুনছেন।

আনার সেই কথাই ভাবছে অহরহ। আর আল্লার কাছে প্রার্থনা করছে, হে মেহেরবান খোদা, তুমি মঙ্গল সংবাদ এনে দাও।

এই সময় সেই অলিন্দের কাছে দারা, সুজা, ঔরঙ্গজেব ছুটে এল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে প্রাসাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তির আগমন হৈ চৈ গন্ডগোলে সোচ্চার হয়ে উঠলো। আনার সচকিত হয়ে তাড়াতাড়ি সামনের এক প্রহরীকে আদেশ করলো—দেখতো প্রাসাদে নতুন কারা এসে পৌঁছলো!

উত্তর আর আনারকে প্রহরীর দ্বারা নিতে হল না। সংবাদ কিছুক্ষণের মধ্যে চারদিকে প্রচারিত হয়ে গেল। দেওয়ান আফজল খাঁ ফিরেছেন তাঁর দলবল নিয়ে এবং ফিরেই তিনি শাহজাদার সঙ্গে দেখা করতে মন্ত্রণাকক্ষে প্রবেশ করেছেন। মন্ত্রণা-কক্ষের দরজা প্রহরীর দ্বারা কড়া পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু কক্ষের গোপন আলোচনা আর গোপন থাকে নি, কিছুক্ষণের মধ্যে তা বাতাসের সঙ্গে মিশে চারদিকে প্রচারিত হয়ে গেছে।

সংবাদ খুব শুভ নয়। সংবাদ যদি শুভ হত, তাহলে এতক্ষণ নহবতখানায় সানাইয়ের মধুর সুর আকাশ বাতাস মথিত করে প্রাসাদের প্রতিটি মানুষের মন ও প্রাণ কেড়ে নিত। এমন কি হয়ত শাহজাদাই রঙমহলের নাচমহল অপরূপ সাজে সজ্জিত করে সহস্র আলোর রোশনাই জেলে ইরানী এক খুবসুরত জোয়ানী নর্তকীকে আসরে আনতে ফরমাইস দিতেন; কারণ এই নর্তকীটি অনেকদিন ধরে শাহজাদার ভরণপোষণে এই নর্তকীমহলের শোভা বর্ধিত করে রেখেছে। শুধু তার নৃত্য পরিবেশনের কোন আনন্দমুহূর্ত শাহজাদার জীবনে আসে নি বলে সে অপেক্ষায় আছে।

যাই হক সংবাদ শুভ ছিল না বলে ঐ সব প্রশ্নেরও কোন প্রয়োজন ছিল না। ঐসব আনন্দ উপকরণেরও কোন হেতু ঘটে নি।

শুধু সংবাদ পরিবেশনের পর শোকের ছায়া কালো আলখাল্লা পরিধান করে প্রাসাদের চারদিকে ঘুরতে লাগলো। শুধু দীর্ঘ নিঃশ্বাসের এক বুকচাপা বাতাস গড়িয়ে গড়িয়ে সমস্ত কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে চলে ফিরে বেড়াতে লাগলো। শকুন অহেতুক দুঃসংবাদ বহন করে প্রাসাদের মাথার উপর চক্রাকারে অমঙ্গল ঘোষণা করলো। নিহত মানুষের কান্না যেন কবর থেকে গুমড়িয়ে গুমড়িয়ে উঠে চতুর্দিক পূর্ণ করে দিল।

কেউ কাউকে কোন সংবাদ জিজ্ঞেস করলো না। অথচ প্রত্যেকের মুখের ওপর কে যেন একটি সংবাদই প্রচার করে দিয়ে গেল—বাদশাহ দেওয়ান আফজল খাঁকে বিতাড়িত করেছেন, বাদশাহ নয়, তাঁর মহিষী নূরজাহানই একান্ত অপমানিত করে দেওয়ান সাহেবকে প্রাসাদের বাইরে বের করে দিয়েছেন। আফজল খাঁ কোন আর্জিই বাদশাহকে পেশ করতে পারেন নি। অবশ্য বাদশাহ তাঁর আগমন সংবাদ পেয়েও

কোন উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। বাদশাহের এই ব্যবহারে আফজল খাঁ চমকিত নয়, মর্মাহত হয়েছেন। তিনি যে উৎসাহ নিয়ে রাজদরবারে গিয়েছিলেন, সে উৎসাহ তাঁর সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে গেছে। তিনি ফিরেছেন সম্পূর্ণ অসুস্থ হয়ে। একেবারে মরণোন্মুখ হয়ে শাহজাদার কাছে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করে শয্যা গ্রহণ করেছেন। এমন যে হবে তাঁর কল্পনার অতীত ছিল, কিছু মন্দ অবস্থার সৃষ্টি হবে, তা তিনি জানতেন কিন্তু এতটা হবে তা তিনি জানতেন না।

জাহাঙ্গীর শাকে তিনি আজকে দেখছেন না, আর রাজপরিবারে তিনি আজ থেকে চাকরী করছেন না। কিন্তু পরিবারের অবস্থা এরকম হবে তিনি চিন্তা করতেই পারেন নি। কেমন যেন রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকে গোপনতার চুপিচুপি। কেমন যেন সবার চোখে চোখে কিসের ইসারা। কেমন যেন আততায়ী ছুরিকা শানিয়ে পিছন পিছন ঘুরছে। দেওয়ান সাহেব ছিলেন মাত্র তিনটি রাত্রি কিন্তু এই তিন রাত্রিই তিনি কক্ষের মধ্যে সতর্কতার সঙ্গে বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন। তাঁর কেবলই মনে হয়েছে, তাঁকে হত্যা করবার জন্যে আততায়ী ভারী পর্দার আড়ালে আত্মগোপন করে অপেক্ষা করছে।

অবশ্য সে ধরণের কিছুই তাঁর জীবনে ঘটেনি। এমন কি কোন ঘটনাও প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য হয়নি, যতদিন তিনি রাজপ্রাসাদের অতিথি হয়েছিলেন। শুধু মনে হয়েছে এই ধরণের পরিস্থিতি। অবশ্য মনে হবার কারণ সম্রাজ্ঞীর ঔদ্ধত্য ও তাঁর অধিকারের অধিকাংশ লোকজনই প্রাসাদের চতুর্দিকে নিঃশব্দে চলে ফিরে সবকিছু করায়ত্ত করার সুযোগে ঘুরছে।

তাছাড়া দেওয়ান আফজল খাঁকে দেখেই সম্রাজ্ঞী শ্লেষমিশ্রিতকণ্ঠে বললেন—কি খাঁ সাহেব, কি মনে করে? বাদশাহের বেদৌলৎ পুত্র বেসরম হয়ে বাদশাহের কাছে আর্জি পেশ করবার জন্যে পাঠিয়েছে বুঝি? তারপর তাঁর দুই চক্ষু জ্বলে উঠেছে— মিছে অপমানিত হতে এসেছেন কেন দেওয়ানজী? খুরম কি ভেবেছে বাদশাহের প্রিয়তমা মহিষীকে অপমান করে সে বাদশাহের অনুগ্রহে লালিত হবে? না কখনই না। সম্রাজ্ঞী নুরজাহান গর্জে উঠলেন এবং সর্পিনীর মত ফণা উত্তোলন করে বললেন—আগুন যখন জ্বলেছে, সে জ্বলবেই। বরং তাকে নেভানোর চেষ্টা না করে আরো যাতে প্রজ্বলিত হয়, সেরূপ অগ্নিপ্রজ্বলিত উপাদানের ব্যবস্থা করবো। তাকে গিয়ে বলবেন তার এই ঔদ্ধত্য ক্ষমার অযোগ্য। বাদশাহ বেঁচে থাকাকালীন সে যেরকম কুপুত্রের মত ব্যবহার করছে তাতে বাদশাহ তো ক্ষিপ্তই এবং সারা দেশবাসী তার ওপর বিক্ষুব্ধ।

আফজল খাঁ তবু সম্রাজ্ঞীকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে বললেন—কিন্তু একবার বাদশাহের সঙ্গে দেখা করবার হুকুম দিন সম্রাজ্ঞী, শাহাজাদার কিছু আর্জি আছে, মেহেরবান বাদশাহকে তা জানানোর জন্যে তিনি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

হঠাৎ সম্রাজ্ঞী সামান্য রমণীর মত অট্টহাস্য করে বললেন—না, কোন প্রয়োজন নেই। বাদশাহ আমাকে হুকুম দিয়ে রেখেছেন, খুরমের কোন আর্জিই দরবারে

গৃহীত হবে না। বাদশাহ তাঁর বেদৌলৎ পুত্রকে ঘৃণা করেন।

আফজল খাঁর বলতে ইচ্ছা করলো সে তো আপনারই জন্যে সম্রাজ্ঞী। আপনার স্বার্থের যূপকাষ্ঠে শাহজাদাকে তাঁর বাদশাহ পিতার কাছে ঘৃণ্য করে তুলেছেন। কিন্তু সেই শাহজাদার মানসিক অবস্থা চিন্তা করেই কাতর হয়ে অনুরোধ করলেন সম্রাজ্ঞীকে—আপনি একবার বাদশাহের সঙ্গে দেখা করতে দিন মালেকা, শাহজাদার হাজারো তসলিম বাদশাহকে জানিয়ে আমি চলে যাব।

নূরজাহান তীক্ষ্নস্বরে চীৎকার করে বললেন—না, না কখনই আপনার আর্জি মঞ্জুর হবে না। বাদশাহের কঠোর আদেশ অবমাননা করে আমি আপনাকে আদেশ দিতে পারবো না। তাছাড়া বাদশাহ এখন খুরমের সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষুব্ধ, এ সময়ে দেখা করলে তিনি উত্তেজনা অনুভব করবেন, আর তাঁর তবিয়ৎ খারাপ হয়ে যাবে।

আফজল খাঁ বুঝলেন, এই পাষাণ হৃদয় রমণীর কাছে অযথা কাতর অনুনয়ের কোন সুফল নেই। তিনি বাদশাহকে এমনভাবে আড়াল করে রাখতে চাইছেন, যা তাঁর স্বার্থই বেশী সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। যাই হক, এই আচরণেই বোঝা গেল, বাদশাহ আজ একরকম বন্দী, সিংহাসনও একরকম পরহস্তগত। আর শাসন পরিচালনা যা চলছে, তা সম্রাজ্ঞীর আদেশই সেখানে পূর্ণমাত্রায়।

আফজল খাঁ তারপর ঘুরে ঘুরে চতুর্দিক দেখতে লাগলেন। প্রাসাদের অবস্থা অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। সংবাদ সংগ্রহ করতে লাগলেন। কিন্তু দৃষ্টি তাঁর চারদিকে সতর্কতার প্রতিফলন যেলে চলতে লাগলো। কেউ তাঁকে লক্ষ্য করছে কিনা দেখতে লাগলেন।

পুরনো কর্মচারী বলে অনেকে কুশল জিজ্ঞাসা করলো।

আফজল খাঁ মাথা নেড়ে হাসলেন শুধু। মন তাঁর ভাল নেই, তাই স্বতঃস্ফুর্ত হযে কারো সঙ্গে আলাপ জমাতে পারলেন না। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল, অনেক আশা নিয়ে তিনি রাজপ্রাসাদে এসেছিলেন, এখন গিয়ে তিনি শাহাজাদাকে কি জানাবেন? এই কথা ভাবতে ভাবতেই তাঁর বার্দ্ধক্যের শরীরে অসুস্থতার ভাব এল। তিনি যেন কেমন ভেঙে গুড়িয়ে গেলেন।

এর মধ্যে শাহজাদা শাহরিয়ার সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তিনি গোপনে খাঁ সাহেবকে ডেকে নিয়ে বললেন—ভাইজানকে বলবেন, এরমধ্যে আমার কোন ষড়যন্ত্র নেই। সে জানে আমার সিংহাসনের ওপর কোন লোভ নেই, অথচ সকলে মিলে আমাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে প্রতিষ্ঠিত করছে। আমি প্রাণের তাগিদে সম্রাজ্ঞীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেছি বটে তবে সিংহাসনের ওপর আমার কোন লোভ নেই। দুনিয়াতে সূর্য ও চন্দ্র আলোর ঐশ্বর্য নিয়ে প্রতিভাত হোক্—ফুলের সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত হোক্—সঙ্গীতের সুরমাধুর্যে চারিদিক ভরে উঠুক, এই আমার কাম্য। অথচ দেখছি এরা আমার সঙ্গে ভাইজানের কলহ সৃষ্টির জন্যে তার জাগীরগুলি আমাকে দিয়ে জটিল করে তুলছে। হঠাৎ শাহরিয়া আরো চাপাস্বরে খাঁ সাহেবকে বললেন—জানেন, এরা চেষ্টা করছে ভাইজানের

জাগীরগুলি কেড়ে নিয়ে তাকে ফকির করে দেবে !

আফজল খাঁ হঠাৎ চমকে উঠলেন শাহজাদা শাহরিয়ার কথায়। তারপর কাতর হয়ে বললেন—এর কি পরিত্রাণের কোন উপায় নেই ?

শাহরিয়া ম্লান হাসলেন, উপরদিকে হাত তুলে শুধু বললেন—ঐ খোদা। তারপর কাতরস্বরে বললেন—আমার করার কিছু নেই খাঁ সাহেব। শক্তি যদি থাকতো, তাহলে এই চক্রান্তকারীদের শায়েস্তা করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু শক্তি থাকলেও এদের সঙ্গে পারা মুস্কিল। তারপর আর কোন কথা না বলে দ্রুত সেস্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন।

আফজল খাঁ শেষপর্যন্ত মরীয়া হয়ে মমতাজের পিতা বাদশাহের প্রধানমন্ত্রী আসফ খাঁর সঙ্গে গোপনে দেখা করলেন। কিন্তু তিনি আফজল খাঁকে দেখে শুধু কুর্নিশ জানিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করলেন। তারপর মৌনব্রত অবলম্বন করে শেষে বললেন—আমি সবই জানি খাঁ সাহেব। শাহজাদার এ দুর্দিনে তার পাশে দাঁড়াতে পারলে খুশী হতাম। তারপর চতুর্দিকে তাকিয়ে নিম্নস্বরে বললেন—খাঁ সাহেব, এক্ষুনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে আপনি চলে যান। হয়ত বিলম্বে অঘটন ঘটতে পারে। শাহজাদাকে আমার নাম করে বলবেন, বিদ্রোহই একমাত্র সহজ উপায়। এখানে কোন অনুগ্রহ পাবার চেষ্টা বৃথা।

এ সব কথা শাহজাদার প্রাসাদের সবারই জানা।

আফজল খাঁ সমস্ত কাহিনী অশ্রুজলে ব্যক্ত করে গিয়ে শয্যা নিয়েছেন। তারপর চারদিন তাঁর জ্ঞান ফেরেনি। হাকিম এসে পরীক্ষা করে দাওয়াই দিয়েছেন। বলেছেন—জ্ঞান হলেই যেন উত্তেজনা জাগানো না হয়।

শাহজাদা খুরম বার বার দেওয়ান সাহেবের কক্ষে এসে তাঁকে দেখেছেন। দেওয়ানের আরোগ্য লাভের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। দেওয়ান আরোগ্য লাভ করলে তাঁর কর্মনীতি নির্বাচিত হবে। তাই তিনি পরম যত্নে প্রহর প্রহর হাকিমকে উত্ত্যক্ত করে নানারকম ওষুধ পরিবর্তনে আফজল খাঁর আরোগ্য লাভের পথ সুগম করেছেন।

যে কদিন জ্ঞান ফেরে নি আফজল খাঁর, সমস্ত প্রাসাদ ঘিরে একটা শোকের ছায়া আবর্ত সৃষ্টি করে সবার ম্লান মুখের ওপর প্রতিফলিত হয়েছে। কারো মুখের কোন কথা সোচ্চারে প্রাসাদ মুখরিত করে নি। কেউ হাসে নি উচ্চৈঃস্বরে, যার জন্যে সমুদ্রের জলস্রোতে দোলা জাগে, মর্মরময় প্রাসাদ প্রাচীরে প্রতিধ্বনি ওঠে। কোন উৎসব না, কোন বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি না। শুধু গম্ভীর একটি ম্লান ছায়া মেঘলা আকাশের মত প্রাসাদ ঘিরে চলেছে। আর নিঃশব্দে সকলের কান তীক্ষ্ন হয়ে একটি দুঃসংবাদ শোনার জন্যেই অপেক্ষমান। সে হল আফজল খাঁর মৃত্যু সংবাদ।

শাহজাদা বার বার মসজিদে গিয়ে খোদাকে ডাকতে লাগলেন—দেওয়ান সাহেবের যেন মৃত্যু না হয়। পিতার মত যিনি বুকের আড়ালে তাঁকে ধরে রেখেছেন, তিনি

যেন চলে না যান! আজ আপন পিতা সন্তানকে বিনা দোষে ত্যাগ করেছেন কিন্তু দেওয়ান খাঁ সাহেব ত্যাগ করেন নি। এই দুর্দিনে তিনিই এই নসীবহারা শাহজাদার দুনিয়া। শাহজাদার দু'চোখ দিয়ে অশ্রুবিন্দু টপ্ টপ্ করে মসজিদের প্রাঙ্গণের ওপর পড়লো। বোধ হয় শাহজাদার কাতর প্রার্থনা আল্লা শুনলেন। আফজল খাঁর জ্ঞান ফিরে এল। তারপর আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে একদিন তিনি ফিরে এলেন।

শাহজাদা জানতে চাইলেন, তিনি কি করবেন? বিদ্রোহ না নতি স্বীকার?

আফজল খাঁ বললেন—নতি স্বীকার করলে সম্রাজ্ঞীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পথ প্রশস্ত। কারণ তিনি চাইছেন, অমানুষিক অত্যাচারে যদি শাহজাদা দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে তাঁকে বাধাদানের আর কেউ থাকবে না। আর যদি শাহজাদা বিদ্রোহী হন, তাতেও সম্রাজ্ঞীর কোন আশঙ্কা নেই, পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে বলে শাহজাদা লোকের অশ্রদ্ধার পাত্র হবে, আর সম্রাজ্ঞীও নিজের লোকজনের সাহায্যে সিংহাসন নিজস্ব করে নিতে পারবেন। তারপর আফজল খাঁ বললেন—কনিষ্ঠ শাহজাদা শাহরিয়ার কথা আপনি শুনেছেন শাহজাদা, তিনি বিনা দোষে এদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে শত্রু বর্ধিত করছেন। তাঁর নিরুপায় অবস্থাটা চিন্তা করলে দুঃখ হয়। তিনি সিংহাসন চান না, অথচ তাঁকে সিংহাসনের প্রার্থী সৃষ্টি করে সম্রাজ্ঞী নিজের চাল চালছেন।

শাহজাদা হঠাৎ কুর্নিশ জানিয়ে বললেন—অহলে যুদ্ধই ঘোষণা করা হোক। সৈন্যদের তৈরী হতে আদেশ দিই! কিছুসংখ্যক রাজপুত সৈন্যও যোগাড় হয়ে যেতে পারে।

আফজল খাঁ বললেন—আর বিলম্ব নয়, সেনাপতি দরিয়া খাঁকে নির্দেশ দিন—অবিলম্বে নর্মদা অতিক্রম করে আসীর দুর্গ আক্রমণ করুক। সংবাদ পেলে নিশ্চয় বাদশাহ তুর্কী সেনাপতি মহাবৎ খাঁকে বিরাট বাহিণী দিয়ে প্রেরণ করবেন। তাঁর আসার পূর্বেই আসীর দুর্গ জয় করে অন্যদিকে সরে পড়তে হবে।

শাহজাদা আর বিলম্ব করলেন না, দেওয়ান সাহেবের কথামত নিজের আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্যে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিতার বিরুদ্ধে অসি ধরলেন।

সেনাবাহিনীর মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। অসির ঝনঝনানিতে চতুর্দিক মুখরিত হল। সবারই মুখে ফুটে উঠলো আবার মৃত্যুর ছায়া। এবার বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। বাদশাহের ফৌজ হয়ে বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অনেকেরই মনে লাগলো কিন্তু শাহজাদার জলদগম্ভীর বক্তৃতাতে পিতার অবিচারে বাধ্য হয়ে এই বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হচ্ছে জানতে পেরে সমগ্রবাহিনী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল—এই অন্যায়ের প্রতিকার কল্পেই তারা লড়বে।



একদিন আনার সুযোগ বুঝে শাহজাদার পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

শাহজাদা তখন সামরিকবেশে সেনাবাহিনী পরিদর্শন করতে যাচ্ছেন। সারা-দেহে বর্মের ছাউনি, মাথায় সূর্যসন্নিভ শিরস্ত্রাণ, কোষবদ্ধে শাণিত অসি। তিনি বীরদর্পে প্রাসাদের সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে নয়াবাগের ফুলবীথিকার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আনার হঠাৎ দেখতে পেল! শাহজাদার দেখাই সে চাইছিল কিন্তু দেখা পাচ্ছিল না বলে খুব উদ্বিগ্ন ছিল।

আজকাল বড় একটা শাহজাদা অন্তঃপুরে আসেন না। দেওয়ান আফজল খাঁ দিল্লীর রাজপ্রাসাদ থেকে ফেরবার পর তিনি একেবারেই অন্তঃপুরে আসা ছেড়ে দিয়েছেন। সর্বদা কি একটা ভাবে যেন তিনি বিভোর! কি যেন চিন্তার বেষ্টনীতে প্রবেশ করে তিনি বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে চঞ্চল। অবশ্য চঞ্চল হওয়াই স্বাভাবিক। শাহজাদার মানসিক অবস্থার কথা আনার জানে। পিতা বিনা দোষে তাঁকে ত্যাগ করেছেন। এমন কি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলেও তাঁর কোন অধিকার নেই। সে যাক্‌গে—সিংহাসন ভাগ্যে না জোটে শাহজাদার ক্ষতি নেই কিন্তু পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হতেই তাঁর যত দুঃখ। সেই দুঃখই আজ অভিমান থেকে ক্রোধে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই তিনি বাহিনী সাজিয়ে পিতার অধিকারভুক্ত জাগীরগুলি দখল করতে চলেছেন। সমস্ত বাদশাহী ফৌজ যা সঙ্গে আছে, সব আজ তাঁর দলে।

সবই জানে আনার। শুধু জানে না, শাহজাদা হঠাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করা বন্ধ করে দিলেন কেন? শুনেছে অনেক রাত্রি পর্যন্ত প্রতিদিন মন্ত্রণা সভা বসে। মন্ত্রণার পরও তো শরীরে ক্লান্তি আসে, তখন না হয় অন্তঃপুরে ফিরে আসবেন। অন্তঃপুরে এলে মনের অশান্তির চেয়ে শান্তিই তিনি পাবেন। মমতাজ কি তাঁকে কোন সুখই এ যাবৎকাল প্রদান করেন নি? কে জানে এ কি রহস্য? মমতাজকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন—বহিন, এ সব নিয়ে আলোচনা কর না। স্বামী যদি অন্তঃপুরে আসা পছন্দ না করেন, তাহলে কেন তাঁকে বিরক্ত করা?

ঐ এক রমণী, কখনও কিছু চেয়ে নেবে না, দিলে হাসিমুখে গ্রহণ করবে। না দিলে কোন কৈফিয়ত নেই।

আনার নিজের জন্যে এক এক সময় ভাবে—তারও কি কোন মূল্য নেই? আবার পরক্ষণে ভাবে—না, এ সময় তার মূল্যের পরিমাণ যাচাই করতে যাওয়া অন্যায়। শাহজাদার কথা স্মরণ হয়, তিনি বলেছিলেন, এ দুর্দিনে তুমি আমার সহায় হও, আমার বিশ্বাসভাজন হও, দুর্দিন যদি কেটে যায়, তাহলে তোমার যোগ্য সম্মান তুমি পাবে। সেই কথা স্মরণ করে আনার শাহজাদাকে বিরক্ত করতে সাহস করে নি।

কিন্তু বর্তমানে বাধ্য হয়ে বিরক্ত করতে সাহসী হয়েছে এজন্যে যে, মমতাজ আসন্ন প্রসবা। শাহজাদা হয়ত তাঁর পরিবারবর্গের কথা বিস্মৃত হয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছেন। কিন্তু যুদ্ধ করবেন কাদের জন্যে? যদি স্ত্রীপুত্র পরিবারবর্গের নিরাপত্তা চিন্তা না করেন, তবে জয়ের আনন্দ কে ভোগ করবে? অথচ শাহজাদা এত বড় বিচক্ষণ ব্যক্তি হয়ে কেমন যেন নেশার আমেজে সমস্ত ভুলে সৈন্য সাজিয়ে আগামী প্রত্যুষে নর্মদার বিশাল জলস্রোত পার হবার আয়োজন করেছেন। এই

অভিযান শুরু হবার মধ্যে যেমন বীরত্ব আছে, তেমনি সর্বদাই বিপদকে সঙ্গী করে নিয়ে চলতে হবে। কতকাল যে এমনি বিরাটবাহিনীর সঙ্গে সমস্ত পরিবারবর্গকে ঘুরে বেড়াতে হবে কে জানে? তাই আনারের শংকা, মমতাজের সংবাদটা শাহজাদার কর্ণগোচর করা ভাল। যদি তিনি শুনে যাত্রা স্থগিত করেন তাহলে অন্ততঃ তাই সুখের হবে যে, এই রক্তারক্তি, এই হানাহানি, এই মৃত্যুর মহোৎসব আপাততঃ স্থগিত হবে। হয়ত সময়ান্তরে বাদশাহের কোন অনুকূল আদেশ আসতে পারে। অবশ্য সে সব চিন্তা অনেক দূরের। তবে মমতাজের এই পূর্ণ মাতৃত্বের সংবাদ পরিবেশন করা একান্তই প্রয়োজন এই জন্যে যে, শাহজাদার আগামী সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষেত্র কি রণভূমিতেই হবে?

সেজন্যে কদিন ধরেই আনার শাহজাদার সাক্ষাৎ লাভের আশায় ঘুরছে। একবার এক খোজাপ্রহরীকে দিয়ে সংবাদ পাঠিয়েছিল কিন্তু উত্তর এসেছে—'সময় বড় সংক্ষেপ, সাক্ষাতের অভিলাষ বর্তমানে মুলতবী রাখো।'

সেই শাহজাদাকে হঠাৎ দ্রুতগতিতে ফুলবীথিকার পাশ দিয়ে যেতে দেখে সে পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

শাহজাদা আচমকা বাধা পেয়ে আনারের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন—কি ব্যাপার আনারবিবি! হঠাৎ বাধা দিলে কেন?

আনার মৃদু হেসে বললো—বাধা দেবার অধিকার আছে বলেই দিতে এলাম।

ভণিতা রাখো আনার, সময় বড় অল্প—কি প্রয়োজন বলো?

আনার ভেবেছিল অনেকদিন পরে মনের মানুষের সঙ্গে দেখা—একটু কৌতুক করেই শাহজাদাকে দাঁড় করিয়ে রাখবে কিন্তু শাহজাদার মুখের দিকে তাকিয়ে সে হঠাৎ অন্তরে অভিমানী হয়ে উঠলো। কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ না করে বললো—প্রয়োজন আছে বলেই আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি।

কি প্রয়োজন?

আনার শাহজাদার মুখের দিকে তাকালো। মস্তকের ওপরে স্বর্ণ নির্মিত উষ্ণীষের গাত্রে সূর্যরশ্মি লেগে অপরূপ শোভা পেয়েছে। শাহজাদার মুখেও সেই শোভার মাধুর্য। মনে মনে আনার বীরকে কুর্নিশ জানালো, তারপর বললো—এ সময় আপনাকে বিরক্ত করা সত্যিই অন্যায়, তবু কর্তব্যকালে বিরক্ত করছি বলে মার্জনা করবেন। আপনার মহিষী মমতাজবিবির কথা বলতে এসেছিলাম।

হঠাৎ শাহজাদা বেশ চাপাস্বরে হুংকার দিয়ে বললেন—সে কথা অন্তঃপুরেই শোভা পায়, এখানে নয়। পথ ছাড়। সৈন্যবাহিনী আমার অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করছে।

আনার তাড়াতাড়ি বললো—আপনি স্থির হন শাহজাদা। আমার কথা সম্পূর্ণ হয় নি।

শাহজাদা আনারের কথায় চুপ করলেন।

আনার বললো—আপনি যে পুনরায় সন্তানের পিতা হতে চলেছেন, তার কি ব্যবস্থা

করছেন ?

শাহজাদা বিস্মিত হয়ে বললেন—তার মানে !

আনার বললো—মানে হল, আপনি আগামী প্রত্যুষে বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন এই বিদ্রোহ কবে থামবে তার কোন ঠিক নেই। পথে পথেই হয়ত চলতে হবে এই যাযাবর পরিবারবর্গকে। এ সময় যদি কোন দুর্গম স্থানে আপনার মহিষী নয়া সন্তান প্রসব করেন, তাহলে উপায় কি হবে ?

শাহজাদা সত্যিই ভুলেছিলেন এই নব আবির্ভাবের সূচনাটি। তাই আনারের কথায় দারুণ বিস্মিত হলেন। স্তব্ধ হয়ে তিনি ভাবলেন—সেই নতুন সন্তানের আবির্ভাব কি কোন শুভ সংবাদ নিয়ে আসছে না অশুভবার্তার প্রতিনিধি হয়ে শয়তানের বেশে আগমন করছে ? শাহজাদা জানেন না—কোন্‌টা ঠিক ? তবে দারার জন্মের পর তাঁর উন্নতি হয়েছে, তিনি পেয়েছেন বাদশাহের কাছ থেকে নতুন উপাধি, নতুন জাগীর। জাহানারার সময়েও তাঁর ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। পর পর প্রতিটি সন্তানের আগমনের সময়ই একটা না একটা পরিবর্তন সাধিত না হয়ে থামে নি। আর আজকের এই সন্তান কি বিনা পরিবর্তনে প্রাসাদ আলোকিত করে আবির্ভূত হবে ? তবে সে পরিবর্তন মনে হচ্ছে, অশুভ সংবাদ বহন করেই আসবে। কারণ তাঁর বিশ্বাস, —বিরাট বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে তিনি পেরে উঠবেন না। তাঁর পরাজয় হবেই। পরাজয় যখন হবে তখন কেন এই অভিযান ? এই কথা চিন্তা করে আবার শাহজাদা খুররম আত্মসমাহিত হলেন। তারপর বিরক্ত হয়ে ভাবলেন—এসব কথা ভাবার এখন সময় নেই। সৈন্য প্রস্তুত। বিদ্রোহ আগামীকল্য প্রত্যুষেই শুরু হবে। সমস্ত হিন্দুস্তান দেখবে, বাদশাহ জাহাঙ্গীর শার পুত্র শাহজাদা খুররম সেই বিদ্রোহের প্রধান নায়ক। মোঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এ বিদ্রোহ প্রথম নয়। পিতা জাহাঙ্গীর শাও সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তবে সম্রাট আকবর ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি, তিনি পুত্রকে বশ করে আবার তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। শাহজাদা ভাবলেন কোন সময় যদি এমন দিন আসে, পিতা তাঁকে কি ক্ষমা করবেন না ? তবে সন্দেহ হয়, পিতার তাঁর এখনও মনের মধ্যে অনুশোচনা তীব্র, কিন্তু পিতার ঐ রমণীই পিতার হৃদয়ে পাথর বসিয়ে তাঁকে উত্তেজিত করে তুলছে। শাহজাদা আবার সেই অসচ্চরিত্র রমণীর চিন্তার আবর্তে প্রবেশ করছেন দেখে তাড়াতাড়ি বিরক্ত হয়ে বর্তমানে ফিরে এলেন। এসে আনারের দিকে তাকিয়ে বললেন—এখন আর আমার ভাববার কোন সঙ্গতি নেই। বিপদ যদি আসে, সে বিপদকে বরণ করেই এই অভিযান আমাকে চালাতে হবে। তুমি মিছে আমাকে যাত্রাপথে বাধা দিয়ে শক্তিহীন করে দিও না। বরং অন্তঃপুরে যাও, অন্তঃপুরের ভার গ্রহণ করে আমাকে চিন্তাশূন্য কর। আজ আমি স্ত্রীপুত্র পরিবার সব ভুলতে চাইছি। চাইছি ভুলতে নিজের সত্তাকে। আমি যে কোন বাদশাহের সৌভাগ্যবান পুত্র, তাও ভুলতে চাইছি। আমি এখন সৈনিক। আমার সামনে আছে ত্রিশ সহস্র সৈনিক। তাদের পরিচালনা করে নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়াই আমারই কাজ। যদি কোনদিন এযুদ্ধে জয়লাভ করতে পারি

তবে আবার স্মরণ করবো আমার মহিষীকে, তোমাকে, হারেমের অন্যান্য আওরতদের। আমার জীবন থেকে এখন সুখ, আহলাদ, আনন্দ, আরাম সব বিদায় নিয়েছে। আমি এখন বেদৌলৎপুত্রের ভূমিকা নিয়ে তামাম হিন্দুস্তানের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াবো। মোগল সাম্রাজ্যের মর্মরময় ঐশ্বর্যপূর্ণ সিংহাসনের ভিত ভঙ্গুর করবার জন্যে আমার চেষ্টা থাকবে অসীম। আমি নদী, নালা, পাহাড়, পর্বত, দুর্গম অরণ্য, উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ মরুভূমির ওপর দিয়ে দুর্দামবেগে নিরুদ্দেশের পথে ছুটে চলবো। হয় জয়লাভ নয় মৃত্যু। এ ছাড়া বীরের পক্ষে আর কোন নতি স্বীকার নেই। তুমি যাও আনার, আমার অবস্থাটা চিন্তা করে অন্তঃপুরের মাঝে যাও। কোন সমস্যাই আমাকে জানাতে এস না, যদি কোন সমস্যা উদয় হয় নিজে তার সমাধানের ব্যবস্থা কর। যদি এ দুঃসময়ে তোমার কোন সাহায্য পাই, সুদিনে তা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ফেরত দেব।

এই সময় হঠাৎ প্রাসাদের বাইরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বিরাট সৈন্যবাহিনীর জয়ধ্বনি শোনা গেল।

শাহজাদা বললেন—ঐ, ঐ ওরা আমায় ডাকছে আনার, আমি যাই। অনেক রাজপুত সৈন্য নতুন যোগদান করেছে আমাদের বাহিনীর সঙ্গে—তারা জয়ধ্বনি দিচ্ছে আমার। জয় আমার হবেই। আমি যাই। কেমন যেন নেশায় মত্ত মাতালের মত শাহজাদা খুররম দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন প্রাসাদ সিংহদ্বারের দিকে।

আর আনারের দু'চোখ সেই মুহূর্তে জলে ভর্তি হয়ে গেল। সে তাদের বাধা না দিয়ে ঝাপসা চোখে নয়া বাগের নতুন নতুন দোদুল্যমান ফুলের দিকে তাকিয়ে রইল। কানে তার তখনও সেই একাধিক পুরুষকণ্ঠে জয়ধ্বনি বাজছিল। জয় শাহজাদা খুরমের জয় .... হঠাৎ সে শুনতে পেল সেই প্রাসাদের বহির্ভাগ থেকে যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠলো। কাড়ানাকড়া, দুন্দুভি, দামামার প্রচন্ড শব্দে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। তার সঙ্গে একাধিক সৈনিকের পরিত্রাহি উল্লাসধ্বনি। সেই হট্টগোলের মাঝে আনারের মনে হল মৃত্যুর উৎসব শুরু হয়েছে। মরণের আর্তনাদে সমস্ত আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে গেছে। সৈনিক মরছে কাতারে কাতারে। রক্তস্রোতের নদী বয়ে চলেছে সামনের পথ দিয়ে দ্রুতগতিতে। কী ভীষণ দৃশ্য সেই রণভূমির! আর সেই রণভূমির মাঝে দাঁড়িয়ে উন্মুক্ত অসির ঝণঝণাতিতে মুখর করে শাহজাদা খুরম পঞ্চাশ ইঞ্চি বক্ষের পেশী ফুলিয়ে হাঃ হাঃ রবে অট্টহাস্য হাসছেন। তাঁর চোখের সামনে মৃতদেহের পাহাড়। লাল তাজা রক্তের নদী রণ-ক্ষেত্র আবরিত করে বয়ে চলেছে। কোন অনুশোচনা নেই শাহজাদার—কোন অনুতাপ। তিনি বরং উল্লসিত। শুধু উল্লসিত নয়, উৎফুল্ল। কয়েক সহস্র মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পেরেছেন বলে প্রবল আহলাদে বক্ষস্ফীত করে জয়ের হাসি হাসছেন। এরই নাম কি জয়? এই করতেই কি বাদশাহর পুত্রেরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হন? শয়তানের বেশে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে অথচ অনুতাপহীন জীবন যাপন করে বেঁচে থাকেন! আনার বুঝতে পারে

না—এদের শরীরে কী ধরনের শোণিত প্রবাহিত। তাদের শোণিত কি সবার শোণিতের মত লাল নয়?

মমতাজবিবির তিনটি পুত্র আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠেছে। এরাও তো একদিন এমনি শাহজাদার ভূমিকা নিয়ে রক্তের খেলায় মাতবে। আবার আর এক সন্তান গর্ভের মধ্যে বেড়ে উঠছে, সে যদি পুত্রসন্তান হয়ে ভূমিষ্ট হয় তাহলে সেও তো এমনি রক্তের খেলা খেলবে। আনার ভাবলো,—এদের দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলেই ভাল হয়, এরা বেঁচে থাকলে তো দুনিয়ার অনেক মানুষের ক্ষতির কারণ হবে, সুতরাং বিষ প্রয়োগে এদের সরিয়ে দেওয়া উচিত। এই ভেবে আনার চিন্তা করলো—কেমন করে এদের বিষ প্রয়োগ করা যায়? তারপর অনেকক্ষণ সেই সম্বন্ধে চিন্তা করে সে হাসলো, হেসে মনে মনে বললো—অবান্তর চিন্তাই মনের মধ্যে কল্পনার চিত্র আঁকে? শাহজাদাদের বিষপ্রয়োগ করবার শক্তি তার কোথায়? তাছাড়া খুররমের সন্তানগুলিকে না হয় সে বধ করলো, অন্যান্য শাহজাদার সন্তানদের? তাদের বধ করলে কি সে এই মরণ উৎসব নিশ্চিহ্ন করতে পারবে? মরবার জন্যে যাদের জন্ম তাঁরা মরবেই। যুদ্ধের জন্যে যাদের প্রাণ, তাদের প্রাণ যুদ্ধক্ষেত্রে যাবেই। সুতরাং এই চিন্তায় ক্ষতবিক্ষত হওয়ার চেয়ে নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করা ভাল।

নিজের সম্বন্ধে সে আর কি চিন্তা করবে? এখন শাহজাদার দুর্দিন উপস্থিত। তার যৌবন সেই দুর্দিনের আওতায় পড়ে স্তব্ধ। সে সুখের জন্য অনেক প্রত্যাশা নিয়ে শাহজাদার কাছে এসেছিল, কিন্তু শাহজাদা তার যৌবনের প্রতি সেলাম দিয়ে তাকে অপেক্ষায় রাখলেন, শুধু অপেক্ষায় নয় এমন এক দায়িত্ব দান করলেন যা নিতান্ত গুরুদায়িত্ব। শাহজাদার অন্তঃপুরের সমস্ত কর্তৃত্ব তার। মমতাজবিবি, তাঁর পুত্রকন্যা, হারেমের অন্যান্য আওরতের প্রতি সে হুকুম চালাতে পারে। যা খুশী তাদের নিয়ে করতে পারে। কিন্তু আবার কিছুই করতে পারে না। আসলে কিছুই করার নেই। যা শাহজাদা পারেন, সে তা পারে না।

অথচ শাহজাদা অন্তঃপুরের সমস্ত কর্তৃত্ব তাকে প্রদান করে গেলেন। অনেক বড় বিশ্বাস নিয়ে তিনি তাকে পরীক্ষার মাঝে ফেলে গেলেন। যদি এই পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হয়, তবে ভবিষ্যতে তার জীবনে মিলবে স্বীকৃতি। আচ্ছা, শাহজাদা কি কখনও তাকে বেগম করবেন?

এই প্রশ্ন যখন তাকে হঠাৎ থমকে দাঁড় করিয়েছে, সে সময় সামনে কে যেন এসে আনারকে কুর্নিশ জানালো।

আনার তার দিকে তাকাতেই চমকে উঠলো—কে কে?

উচ্চপদস্থ সৈনিকের বেশে ওসমান আনারকে তখনও কুর্নিশ করছে।

আনার আতঙ্কিত হয়ে বললো—কি চাও ওসমান খাঁ?

ওসমান দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বললো—বহুৎ সেলাম আর সুক্রিয়া আনারবিবি। তোমার দেওয়া উপাধি পেয়ে আমি তোমায় ধন্যবাদ জানাতে এলাম। আর একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি, আগামীকল্য যুদ্ধে যাত্রা করছি, আমার

নজরানা এখনও আমি পাইনি।

আনার হঠাৎ ওসমানের কথা শুনে আরো আতঙ্কিত হয়ে চীৎকার করে বললো—আর, আর কি চাও ওসমান খাঁ? তোমার উপযুক্ত উপাধিই কি তুমি পাও নি?

না। ওসমান যেন আরো কাছে সরে আসতে চাইলো, বললো—তোমার প্রতিজ্ঞা শুধু একটাই ছিল না।

হঠাৎ আনার ওসমানের কাছ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে ছুটতে লাগলো। নয়াবাগের ফুলবীথিকা থেকে অন্তঃপুর পর্যন্ত। মনের মধ্যে তার দারুণ উত্তেজনা। ভয়। দারুণ ভয়। সেই দুর্গম অরণ্যক্ষেত্রের চিত্রটি তার স্মরণে এল। সেই বিশ্রী রাত্রি। ঝরণার ধার। পর্বতের সানুদেশ। ওসমান সেদিন তার বসন উন্মুক্ত করতে চেয়েছিল। আজও যেন তেমনি তার আতঙ্ক উপস্থিত হল। ওসমান এই দিনের বেলায় বুঝি তার ওপর বলপ্রয়োগ করতে আসছে। এমনিভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সে ছুটতে লাগলো। অথচ যদি সে একবার ফিরে দেখতো, তাহলে দেখতে পেতো ওসমান সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে, পিছুতে ধাওয়া করেনি। কিন্তু সে পিছুতে না তাকিয়েই ভাবতে লাগলো, ওসমান তার পিছু পিছু আসছে।

তারপর সে অন্তঃপুরে ঢুকে একেবারে আপন কক্ষের মধ্যে গিয়ে নিজেকে আবদ্ধ করলো। তখনও তার সমস্ত শরীর বেয়ে আতঙ্ক ঝরে পড়ছিল। কেমন যেন উত্তেজনায় কাঁপছিল সারা শরীরটা। ছোট বুকটার মধ্যে রাজ্যের আলোড়ন। মনে হচ্ছিল কে যেন তাকে হত্যা করবার জন্যে শাণিত ছুরিকা নিয়ে ছুটে এসেছিল, আর সে বাঁচবার আশায় পাগলের মত সেই আততায়ীর কবল থেকে ছুটে এসে এই কক্ষের মধ্যে নিজেকে বন্ধ করেছে। আনার কক্ষের মধ্যে বসেও ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলো। ওসমান এই হারেমে ঢুকে তার কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে—এমনি ধারণা তার হল।

তারপর সমস্ত উত্তেজনা শান্ত হলে সে ভাবতে চেষ্টা করলো—হঠাৎ এমনি স্নায়বিক দৌর্বল্য তার মধ্যে এল কেন? ওসমান তো তার প্রতি কোন অশোভনীয় আচরণ প্রকাশ করেনি? সে শুধু তার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছিল। আর সে সেই প্রতিজ্ঞার কথা শুনে হঠাৎ নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে ওসমানের কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়লো? ওসমান তার ব্যবহারে কি ভাবলো? নিশ্চয় সে মনে মনে খুব হাসলো।

না, ওসমানের এই ঔদ্ধত্যও অক্ষমণীয়! কেন সে এই ধরনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে অপমান করবে? সে কি জানে না, এখন আনারউন্নিসা আর মাসুম আওরত নেই। এখন সে বাদশাহের তৃতীয়পুত্র শাহজাদা খুররম ওরফে শাহজাহানের সোহাগ। তার দেহের প্রতি আর কারো লুব্ধ হওয়া উচিত নয়, সেই দেহ এখন গ্রহণ করেছেন শাহজাদা।

ওসমান নিশ্চয় জেনেছে সে সব কথা। সমস্ত হিন্দুস্থানের লোকের কাছে যখন

সে কথা অজানা নয়, তখন ওসমানের অজানা থাকবে কেন? সে যে উচ্চপদ পেয়েছে সে তো আনারের দৌলতেই। আনারের ওপর শাহজাদার প্রসন্ন ভাবেতেই ওসমান পেয়েছে সৌভাগ্য। কারণ আর কারো অবিদিত নয়, ওসমান আনারকে শাহজাদার কাছে আনতে সাহস করেছিল বলেই তার এই নয়া পুরস্কার। অথচ সে সব জেনেও আজ তাকে পূর্বকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল? ওসমান কি ভেবেছে, আনারউন্নিসা তার ইজ্জত দিয়ে সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করবে?

না, আর নয়। এই শয়তানের উপযুক্ত শাস্তিরই ব্যবস্থা করতে হবে। তার ঔদ্ধত্যের উচিত মূল্যই দিতে হবে। শাহজাদা প্রকৃতস্থ হলে সে ওসমানের শাস্তির ব্যবস্থা করবে। তাছাড়া ওসমান বেঁচে থাকলে সে হয়ত তার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিহিংসা গ্রহণে সাহসী হতে পাবে। কারণ আনারের যৌবনের ওপর তার আকাঙ্ক্ষা প্রবল। তাই সে হয়ত কল্পিত গল্প তৈরী করে শাহজাদার কাছে পেশ করে আনার উচ্ছিষ্ট এই প্রমাণ কবতে পারে। তখন হাজার কৈফিয়ত দিলেও শাহজাদার বিশ্বাস উৎপাদনে সে কৃতকার্য হতে পারবে না।

এই চিন্তা করেই বোধ হয় ঐ অশুভমুহূর্তে হঠাৎ আনার আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। এখন ওসমানের সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা ঠিক করে সে নিশ্চিন্ত হল এই ভেবে যে শাহজাদা একটু শান্ত হলে আর সামনের বিপদ কেটে গেলে সে ওসমানকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে। ওসমানকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে না দিলে তার জীবনে কণ্টক অপসারিত হবে না। জীবনে সুখ আসবে না।

এই যখন সে ভাবছে, সে সময় বেগম মহল থেকে কেমন যেন উচ্চৈঃস্বরে কথা-বার্তা কানে এল। তার কক্ষের কাছ থেকে বেগম-মহল বেশী দূর নয়, তাই কথা-বার্তা স্পষ্ট কানে এল। আনার কর্ণদ্বয় তীক্ষ্ন করে অনুমান করবার চেষ্টা করলো কিসের গোলমাল ও কাদেব গোলমাল! একবার ভাবলো, নিশ্চয় শাহজাদার তিনটি পুত্র ধাত্রী আম্মার কোন অঘটন করেছে, সেজন্যে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে মমতাজবিবির কাছে পুত্রদের নামে বক্তৃতা দিচ্ছেন। কিন্তু কান পেতে ধাত্রী আম্মার কণ্ঠস্বর নয় বুঝে আনার ভাবতে চেষ্টা করলো কার কন্ঠস্বর! তবে কি রঙমহলে কোন অহঙ্কারী নর্তকীর আরামের কোন ব্যাঘাত হয়েছে বলে সে এসে ঐ রকম ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বক্তব্য পেশ করছে? কিন্তু কণ্ঠস্বরে কোন ক্ষুব্ধভাব না দেখে বরং কাতরতা পরিলক্ষিত হয়ে আনার আরো বিস্মিত হল। যে রমণীর কন্ঠস্বর পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল সে যে জেনানা মহলের ছাপান্নটি আওরতের কেউ নয় একথা আনার বেশ বুঝতে পারলো। কারণ কন্ঠস্বরটি সম্পূর্ণ নূতন ও অভিনব। আনার এই নতুন কন্ঠস্বরটি শুনে হঠাৎ চিন্তা করলো এই দুর্দিনে এমন কে শাহজাদার অতিথি হয়ে এলো এই হারেম শোভা করতে? যাদের মৃত্যু আগামী প্রত্যুষ থেকে শুরু হবে দীর্ঘকালের জন্যে? কিছু না বুঝতে পেরে তাই সে হতবুদ্ধির মত কক্ষের বাইরের পথে পা বাড়ালো।

এই সময় এক বাঁদী এসে আনারাক বললে--বেগমসাহেবা আপনাকে সেলাম দিয়েছেন বিবিজী।

আনার আর কোন প্রশ্ন না করে বাঁদীকে ইসারায় অনুসরণ করতে বলে সে দ্রুত বেগমমহলের পথে পা বাড়ালো।

গিয়ে দেখলো আরাম কক্ষের মখমলশোভিত এক কেদারায় একটি যৌবনবতী খুবসুরত রমণী বসে আছে, তার অনতিদূরে অপর একটি কেদারায় পরিচারিকার কোলে একটি সদ্যজাত শিশু। আনার সমস্ত কক্ষের দিকে, সব মানুষগুলির মুখের দিকে তাকিয়ে শিশুটির ওপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করলো। শিশু সে অনেক দেখেছে, কিন্তু এই শিশুটির অভিনবত্ব দেখে চমকিত হল এজন্যে যে, এমন সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট শিশু আর কখনও সে দেখেনি। এই অল্পসময়ের মধ্যে তার ডাগর দুটি চোখ সমস্ত মুখের সৌন্দর্য বর্ধিত করেছে। মুখখানি শুধু গোলাপী নয়, দেহের সর্বাংশে অপরূপ গোলাপ ফুলের বর্ণ। হাত-পাগুলি গোল গোল, মুখখানিতে যেন কোন খানদানীবংশের গাম্ভীর্য শোভা পাচ্ছে। শিশুটি অবাক হয়ে কক্ষের সৌন্দর্য অবলোকন করছিল।

আনার এইসব দেখে গোপনে একবার নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। তার রমণীমন আজ মাতৃত্ব আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে। সে এখন চায় মাতৃত্ব। তার এই মাতৃত্বের প্রকাশ, শাহজাদার সন্তানগুলি লালন পালন করতে করতে বর্ধিত হয়েছে। তাছাড়া সে মাত্র একবারই শাহাজাদার দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে পূর্ণ হয়েছে, এখন তার রমণীমনের সম্ভোগ তৃষ্ণা অনেক তৃপ্ত। রমণীর প্রথম আকাঙ্ক্ষা থাকে নিজের মনের মত দয়িত—তারপর সে দয়িত পেয়ে পূর্ণ হলে তার প্রয়োজন মাতৃত্ব। এখন আনার মাতৃত্ব অভিলাষী। কেন সে মাতৃত্ব চায় জিজ্ঞেস করলে অবশ্য তার উত্তর মিলবে না। তার অপরূপ সৌন্দর্যের তাপ দমিত হয়েছে কিনা তাও সে জানে না। তার মাসুম বক্ষের সমুদ্র তুফান দুই স্তম্ভযুগলের বিচিত্র উম্মাদনা কমেছে কিনা—জিজ্ঞেস করলে তাও সে বলতে পারবে না। তবু তার মাতৃত্ব দেহের রন্ধ্রে বিচিত্র অনুভূতি সৃষ্টি করে তাকে আবার বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে। আর সে অনুভূতি আরো প্রবলভাবে দেখা দিল যখন সে সামনে মাখনের মত, দুধের মত, গোলাপের মত একটি শিশুকে অবলোকন করলো।

আবার সে সমস্ত কক্ষের মাঝে তাকালো। মমতাজবিবি কক্ষের অন্যপ্রান্তে একটি রক্তবর্ণ মেহগনি ডিভানের ওপর শান্তভাবে বসে আছেন। তার পাশে ধাত্রী আম্মা আয়েসা, দুজন বাঁদী জাফরী কাটা গবাক্ষের কাছে। জাহানারা মমতাজবিবির কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। আর একজন রয়েছে, সে কেন আছে আনার বুঝতে পারলো না। আসমান। দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পর মালিক অম্বর সন্ধির শর্ত অনুযায়ী এই কোকিলকণ্ঠীকে শাহজাদা খুরমের কাছে নজরানাস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। আসমানের মতই রূপ। তবে আসমানের মত অতো স্বচ্ছ নয়। এখানকার আসমান একটু উগ্র তাই তার প্রতি আনারের কোন শ্রদ্ধা নেই। রূপ তারও আছে, যৌবন তার কোন অংশে কম নেই, তাই বলে সেই যৌবনের অহঙ্কার অসহনীয়! তাছাড়া শাহজাদা খুরম তার প্রতি কোন যত্নদান করছেন. না বলে সে

ক্ষিপ্ত। কোকিলকণ্ঠী আসমানতারার গজল গীত একদিন আনার শুনেছিল, মেয়েটি গায় বেশ ভালই—তবে গুণ থাকলে অহঙ্কারে সব বস্তু তুচ্ছ করবে এই বা কেন? সেই আসমানতারা এই পরিবেশে কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছে ভেবে ঠিক করতে না পেরে আনার বিস্মিত হল! তারপর সে দেখলো সম্পূর্ণ অপরিচিতা সেই রমণীকে। রমণীকে দেখে মনে হল রাজপুত। পরণে একখানি বহুমূল্য স্বর্ণবুটির কারুকার্য করা মুর্শিদাবাদী বসন। কানের দুটি সুবর্ণময় কুন্ডলে হীরকজ্যোতি। কণ্ঠে বহুমূল্য একটি জহরতের নেকলেশ। হাতে চুনি-পান্নার সমন্বয়ে জড়োয়া অলঙ্কারের শোভা। এসব চিন্তা করতে আর দেখতে খুব বেশী সময় লাগলো না।

হঠাৎ মমতাজবিবি আনারকে দেখে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন বহিন্ এই রমণীর সঙ্গে তুমি পরিচিত হও। ইনি মেবারের রাণা অমরসিংহের বংশসম্ভূতা। দিল্লী থেকে আসছেন। সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের কাছে গিয়েছিলেন, তিনি এঁকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মমতাজবিবি থেমে ইতস্ততঃ করতে আনার বিস্মিত হয়ে বললো—তারপর!

সেই রমণীটি এবার সপ্রতিভ হয়ে বললো- তার পরেরটা বেগমসাহেবার বলতে লজ্জা করবে—আমিই বলছি শুনুন। কিন্তু তার আগে আমার কাছে পরিচয় দিতে হবে—আপনি কে?

আনার কেমন যেন অবাক বিস্ময়ে রমণীর দিকে তাকালো, তারপর সেও বলিষ্ঠভঙ্গিতে বললো—আমি কে আপনার জানার প্রয়োজন কি?

রমণী বললো—প্রয়োজন না থাকলে কি জিজ্ঞেস করছি? তাছাড়া প্রয়োজন আছে বলেই জানতে চাইছি।

আনার আরো বিস্ময়ে বললো—কারণ।

রমণী তেমনি ঔদ্ধত্য সহকারে বললো—কারণ এখনিই জানতে পারবেন। জানলে কিন্তু চমকাবেন না যেন! ঐ যে পরিচারিকার ক্রোড়ে শিশুপুত্র দেখছেন, ওর পরিচয় কি জানেন? তারপর মমতাজের পাশে উপবিষ্ট জাহানারার দিকে তাকিয়ে বললো—ওর পরিচয় দুনিয়াতে যা, আর এই শিশুর পরিচয় দুনিয়াতে তাই। তারপর মমতাজের দিকে তাকিয়ে বললো—উনি যেমন ঐ কন্যার আম্মা, আমি তেমনি এই শিশুর জননী। তবে দুজনের পিতাই এক।

হঠাৎ আনার শেষের উক্তি শুনে ক্ষিপ্তস্বরে গর্জে উঠে বললো—খবরদার! জিহ্বা সংযত কর রমণী!

রমণীও তেমনি কণ্ঠ আরো চড়িয়ে দিয়ে বললো -আমিও তোমায় বলছি আওরত—এই ঔদ্ধত্যের জন্যে তোমাকে সাজা পেতে হবে। তুমি কাকে কি কথা বলতে হয় জানো না দেখে আমি তোমাকে নির্বোধ জ্ঞানে ক্ষমা করতে পারি। তবে তার আগে উত্তর দাও—কে তুমি? তুমি কি বেগমসাহেবার মত কোন সম্মানী আওরত? তারপর হেসে বললো—না হারেমের কোন শোভাময়ী পরিচারিকা?

আনার আবার গর্জে উঠে বললো—তুমি যদি তোমার জিহ্বা সংযত না কর—

তাহলে আমি বাধ্য হব—প্রহরী আহ্বান করে তোমাকে এই প্রাসাদের বাইরে পাঠিয়ে দিতে।

রমণী তার উত্তরে বললো—সম্মানে আঘাত দেবার শাস্তি তুমি অবশ্যই পাবে। শাহজাদাকে সংবাদ দাও, তিনি এলেই সব সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাবে।

আনার বললো—শাহজাদা এখন ব্যস্ত। তাঁকে এ সময় সংবাদ দিলেও তিনি আসবেন না।

রমণী মৃদু হেসে বললো—আসবেন, আসবেন। তাঁকে শুধু গিয়ে বললেই হবে ভগবতী তার শিশুপুত্রকে নিয়ে এসেছে। তিনি এই কথা শুনলেই হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও চলে আসবেন।

এতখানি স্পর্ধাভরে উক্তি করতে আনার মনে মনে দারুণ সঙ্কুচিত হল। সে ভেবে পেল না—সত্যিই কি শাহজাদা শুনলে চমকিত হয়ে ছুটে আসবেন? অথচ তিনি যে এই কিছুক্ষণ আগে নযাবাগের ধারে বলে গেলেন—আনার অন্তঃপুরের কোন সমস্যাই আমাকে জানাতে এস না, এখন আমি এসব কিছুই ভাবতে পারছি না। এখন আমি বিদ্রোহীর বেশে বাদশাহের সাম্রাজ্য লুন্ঠন করতে যাচ্ছি, এই শুধু জানি। তুমি যদি অন্তঃপুরের কর্তৃত্বভার নিয়ে ব্যবস্থা করতে পারো করো, নতুবা জানাতে এস না কিছু।

সেই শাহজাদা শুনলেই চলে আসবেন, এই রমণী বলছে। এতখানি স্পর্ধিতভাবে সে যখন বলছে তখন নিশ্চয় কোন রহস্য আছে। রমণী জানে, শাহজাদা এই প্রাসাদেরই অন্য অংশে আছেন, তিনি এলে যে সব কৌশল ধরা পড়ে যাবে, জেনেও যখন রমণীর এতো দুঃসাহস—তখন শাহজাদাকে সংবাদ প্রেরণ করাই ভাল। আবার পরক্ষণে আনার ভাবলো—কিন্তু শাহজাদা যদি এই ব্যাপারটি একটা চাতুরী ছাড়া আর কিছু নয় বলে গুরুত্ব না দেন, তাহলে তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে আস্থাহীন হবেন—তখন সে কি করে নিজেকে বাঁচাবে? শাহজাদার বিশ্বাস আবার সৃষ্টি করে কি করে তার স্নেহভাজন হবে?

কিন্তু নিজের ভাবনা সে স্থগিত রেখে অপরিচিতা রমণীটির কথাই ভাবলো—এই রমণী হঠাৎ এই দুঃসময়ে এখানে এসে উপস্থিত হল কেন? শাহজাদার যদি সত্যিই সে কোন বেগম হয়, তাহলে এই দুর্দিনে এখানে এসে সে কি পাবে? বরং এই দুর্দিনে যত আপনজন আছে দূরে থাকবারই চেষ্টা করে। তবে কি এও একটা ষড়যন্ত্র? সম্রাজ্ঞী নতুন কৌশল প্রয়োগ করে শাহজাদার অন্তঃপুরে অন্তর্বিপ্লব সৃষ্টি করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

তবু আনার ভাবলো—সম্রাজ্ঞী কি এতটা অধঃপাতে নেমে যাবেন? অবশ্য গুপ্তচরের মুখে সবই তিনি অবগত হন। হয়ত শুনেছেন, আনার সেখানে নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়ে শাহজাদার হারেম শোভা করে আছে। এইসময় শাহজাদার ওপর এক কুকার্যের প্রমাণ প্রদর্শন করলে আনারের এই নিশ্চিন্ত অবস্থা বিচ্ছিন্ন হবে এবং সে শাহজাদার ওপর সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে নিজের স্বপ্ন হারাবে। আনার

ভাবলো—সম্রাজ্ঞী বোধ হয় এক তীরে দুটি পাখী বধ করবার পরিকল্পনা করে এই ভগবতী ও তার শিশুপুত্রকে শাহজাদার সম্পত্তি হিসাবে সৃষ্টি বরে পাঠিয়েছেন। আনার মনে মনে এরূপ ভেবে এবং সম্রাজ্ঞী নূরজাহান এইরকম কৌশল করতে পারেন চিন্তা করে, সে এদিকের ভাবনায় কতকটা নিশ্চিন্ত হল।

কিন্তু আবার অন্য দিকে চিন্তা করলো হয়ত এই রমণী আসলে শাহজাদা কর্তৃক সম্মানিতা এবং এই শিশুপুত্রও শাহজাদার ঔরসজাত। বাদশাহের পুত্রদের এমনি গোপনে মিলিত হওয়ার নিদর্শন অনেক আছে। এও হয়ত তাই। কিন্তু শাহজাদা খুররমের কথা ভেবে আবার আনারের দ্বিধা হল—শাহজাদা কি এতই অসংযমী স্বেচ্ছাচারী পুরুষ? সে যতদূর শাহজাদার স্বভাব দেখেছে, তাতে এমনি হঠাৎ কোন রমণীকে গ্রহণ করে নিজের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবেন বলে মনে হয় না। বাদশাহের পুত্র হিসাবে তার যেমনি আত্মসম্মান আছে, বাদশাহের পুত্রহিসাবে লাম্পট্যতাকে প্রশ্রয় দিতেও তাঁর দ্বিধা হওয়াই স্বাভাবিক। তবু তার সন্দেহ থাকলো—হয়ত যা সে ভাবতে পাচ্ছে না তাই তবে সত্যি! এই রমণী মমতাজবিবির মতই এই অন্তঃপুর আলোকিত করবার অংশীদারী! শাহজাদা শুনলেই হয়ত ছুটে আসবেন এবং এসে বলবেন—এ বেশ ভালই হল। যখন এসে পড়েছে, একসঙ্গেই মৃত্যুর উপাসনা করুক! দুনিয়াতে শাহজাদা খুররমের কোন চিহ্ন না থাকাই মঙ্গল।

যখন আনার এইসব আবোল তাবোল ভাবছে, তখন মমতাজবিবি সেই উপবিষ্ট অবস্থায় বললেন—বহিন, মিছে দুশ্চিন্তার প্রয়োজন কি! শাহজাদার কাছে কোন খোজাকে পাঠিয়ে তাঁকে সংবাদ প্রেরণ কর।

সঙ্গে সঙ্গে সেই ভগবতী বললো—তাই করুন বিবি। আপনারা যখন আমার ও আমার শিশুপুত্রের পরিচয় স্বীকার করতে পারছেন না, স্বামীকে সংবাদ পাঠান, তিনি এলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

আনার আর কোন দ্বিরুক্তি না করে একটি বাঁদীকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলে একটি খোজাকে শাহজাদার কাছে পাঠাবার নির্দেশ দিল।

বাঁদী বের হয়ে গেলে আনার বললো—যদি শাহজাদা সংবাদ শুনে আসেন তাহলে এ ব্যাপারের যবনিকা এখানেই হবে, আর যদি না আসেন তাহলে ভগবতী তুমি যে কোন শাস্তিগ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হও।

ভগবতীও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—যদি এই ব্যাপার সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তুমিও শাস্তিগ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হয়ো! আমি শাহজাদাকে প্রথমেই তোমার বিচার শেষ করতে বলবো।

আনার কোন উত্তর না দিয়ে দাঁত দিয়ে রক্তাভ ঠোঁটটি চেপে ধরে নিজেকে সংযত করলো, তারপর মনে মনে বললো—সম্রাজ্ঞী বেশ সুপটু রমণী নির্বাচন করেই শাহজাদার আশ্রয়ে প্রেরণ করেছেন। এর অভিনয়ে ধরবার সাধ্য নেই। কারণ তার কিছুতে বিশ্বাস হচ্ছিল না, শাহজাদা এ কাজ করতে পারেন! তাহলে যে তার সমস্ত বিশ্বাস চুরমার হয়ে যাবে!

কিছুক্ষণের মধ্যে খোজা উত্তর নিয়ে এসে বললো—হুজুর এখন খুব ব্যস্ত। একটি গুপ্তচর ধরা পড়েছে, তাকে দোষ কবুল করিয়ে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিচ্ছেন। তবে শুনে বললেন—কিছুক্ষণ পরে যাচ্ছি, তুমি তাদের অপেক্ষা করতে বলো।

মমতাজবিবি খোজার কথা শুনে আস্তে আস্তে কক্ষত্যাগ করে চলে গেলেন। সেই রমণী ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা টেনে কক্ষত্যাগ করলো। আর আনার মরমে মরে গিয়ে মাথা নীচু করে অপমানিত মুখখানি যথাসম্ভব গোপন করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

এই সময় সেই শিশুটি হঠাৎ বাবাগো কেঁদে উঠলো। তার কান্নার অস্বাভাবিক ধ্বনিতে কক্ষের ছাদ থেকে দোদুল্যমান কাঠ গেলাসের ঝাড়ের কাঠিগুলি নড়ে চড়ে বিচিত্র শব্দ জাগিয়ে তুললো। প্রাসাদের মর্মরময় দেয়ালে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রতিধ্বনি উঠলো বিরাট।

এদিকে সেই সময় শাহজাদা ঘাতকের কাছে আদেশজারী করে প্রেরণ করছেন গুপ্তচরকে।

আর ভাবছেন গুপ্তচরের কাছে শোনা কথাগুলি। সম্রাজ্ঞী নুরজাহান, তাঁর শ্বশুর আসফ খাঁ গুপ্তচরকে পাঠিয়েছিলেন সৈনিকের বেশে শাহজাদার সৈন্যবাহিনীর মাঝে বিদ্রোহ জাগাতে। তারা যেন শাহজাদার অধীনতা স্বীকার করে সম্রাটের বিরুদ্ধে না যায়। কিন্তু আশ্চর্যভাবে ধরা পড়ে গেল, ধরিয়ে দিল শাহজাদার এক সাধারণ সৈনিক। সৈনিককে পুরস্কৃত করে গুপ্তচরের শাস্তি মৃত্যুদন্ডই দেওয়া হল।

শাহজাদা তখন ভাবছিলেন গুপ্তচরের মৃত্যুদন্ড নয়, ভাবছিলেন শেষকালে মমতাজ বেগমের পিতা আসফ খাঁও তাঁর বিরুদ্ধে গেলেন? নিজের চাকরি বজায় রাখার জন্য নিজ কন্যার সোহাগকে ধ্বংস করা কি তাঁর উচিত হয়েছে? তারপর গুপ্তচরের মুখে শুনলো আর একজনের কথা—সে হল ইব্রাহিম খাঁ। সে লোকটি নাকি নানা চক্রান্ত সৃষ্টি করে সম্রাজ্ঞীকে পরিবেশন করছে, আর সম্রাজ্ঞী দ্বিধাহীন ভাবে সেগুলি প্রয়োগ করে ষড়যন্ত্র আরো গভীর করে তুলছেন।

এই ইব্রাহিম খাঁকে চিনতো না শাহজাদা খুরম—আনার আসার পর তিনি ভাল-ভাবে চিনেছিলেন। এখন তাঁর কথা শুনে তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন—সুযোগ পেলে এই শয়তানকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। হোক্ আনারের পিতা, যে শত্রু—তার প্রতি কোন ক্ষমা না। কিন্তু মমতাজের পিতার তিনি কী ব্যবস্থা করবেন? কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, গুপ্তচর এসে যা সংবাদ দিল্, তা যদি

বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে আসফ খা চরমতম শত্রু। দু পক্ষেরই গুপ্তচর গোপন-ভাবে আসা যাওয়া করছে। ধরা যারা পড়েছে, ফিরছে না। গুপ্তচরের জীবন বড় ঝুঁকির জীবন। ধরা পড়লে আর পরিত্রাণ নেই। এমনি শাহজাদারও তিন চারটি গুপ্তচর আর ফেরেনি। শেষে যে লোকটি ফিরলো, তার কাছে যে সংবাদ পেলেন তাতে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ওরা জানতে পেরেছেন শাহজাদা আগামী প্রত্যুষে নর্মদার পারে গিয়ে শিবির স্থাপন করেছেন। সেজন্যে সম্রাট নিজে প্রধান সেনাপতি মির্জা আবদর রহিম খান্‌খানান, আসফ খা, মহবত খাঁ, মহারাজা গজসিং, ফজল খাঁ, রাজা রামদাস প্রভৃতি উচ্চপদস্থ যোদ্ধাদের ডেকে পুত্রের বিরুদ্ধে আশী হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে পাঠাচ্ছেন। তাঁরাও আগামী প্রত্যুষে নর্মদার তীরে এসে শিবির সংস্থাপন করে শাহজাদাকে বাধা দেবে। সম্রাট জানেন, তাঁর তৃতীয় পুত্র অসমসাহসী, বীর ও রণনিপুণ, সেজন্যে সাবধানতা অবলম্বনের জন্যে এই বৃহৎ সৈন্য মোতায়েন করে বড় বড় যোদ্ধা সমভিব্যাহারে পাঠাচ্ছেন। শাহজাদা গুপ্তচরের মুখে আরো শুনলেন, সঙ্গে সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র খসরু ও দ্বিতীয় পুত্র পারভেজও কয়েক হাজার সৈন্য নিয়ে ভ্রাতাকে বাধা দিতে আসছে। আর সম্রাট তাঁদের বেশ কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে লাহোর অভিমুখে যাত্রা করবেন কারণ সম্রাজ্ঞী সেখানে একটি সমাধি মন্দির তৈরীর কাজে দেখাশুনা করতে যাচ্ছেন বলে সম্রাটেরও ইচ্ছা সেখানে বসে পুত্রদের অবস্থা অবলোকন করেন।

তারপর গুপ্তচর কুর্নিশ করে আরো একটু সরে এসে চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টির আলো ফেলে শাহজাদাকে চাপাস্বরে বললো—নর্মদার তীরে যখন দুটি শিবির সংস্থাপিত হবে, সেসময় প্রধান সেনাপতি আবদর রহিম খানখানান আপনার পক্ষে যোগদান করবেন বলে জানিয়েছেন। শুধু আপনাকে একটু কৌশল অবলম্বন করতে হবে—একটি অপরূপ সুন্দরী নর্তকীকে খানখানানের শিবিরে পাঠিয়ে দিতে হবে, তার কাজ হবে মীর্জা রহিম খানখানানকে নাচ দেখিয়ে, আর সরাব পান করিয়ে বেহুঁশ করে দেবে। তারপর তিনি নর্তকীর যৌবন উপভোগ করে, সরাব পান করে একেবারে অচৈতন্য হয়ে পড়লে তখন সেই নর্তকী তার লুকায়িত রক্ষীর দ্বারা খান-খানান সাহেবকে আপনার শিবিরে নিয়ে আসবে। গুপ্তচর আরো বললো, খান-খানান সাহেব এই নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, শাহজাদাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলবে, তাকে কৌশলে নিয়ে যেতে পারলেই তার এক তৃতীয়াংশ সৈনিক তিনি অধিকার করতে পারবেন।

গুপ্তচর এই বলে কুর্নিশ জানিয়ে অদৃশ্য হলে শাহজাদা ভাবতে লাগলেন—এ বেশ মন্দ বুদ্ধি নয়। এদিকে গুজরাটের শাসনকর্তা তাঁর বন্ধুত্ব স্বীকার করে সৈন্য নিয়ে তাঁর সাহায্যার্থে ছুটে আসছেন, আবার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে প্রধান সেনাপতি মীর্জা খানখানানের আমন্ত্রণ। চতুর্দিক দিয়ে শুভ সংবাদ যখন ছুটে আসছে, তখন তাঁর জয় সুনিশ্চিত। অন্ততঃ পিতা দেখবেন তিনি বীরপুত্রের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধরেছেন। তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য পুত্রের বিদ্রোহে যখন দুলে উঠেছে

তখন পুত্রকে নিবৃত্ত না করলে তাঁর সম্মান বজায় থাকবে না। হয়ত পিতা ভীত হয়েই পুত্রকে স্বীকার করে এত্তেলা পাঠাবেন ক্ষান্ত হতে। এই কথা ভেবে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে শাহজাদা হাসলেন।

এই সময় খোজাপ্রহরী কুর্নিশ জানিয়ে বললো অন্তঃপুরের সংবাদ।

শাহজাদা চমকিত হয়ে মনে মনে বললেন—ভগবতীবাঈ! মেবারের রাণা অমর-সিংহের বংশসম্ভূতা! কিন্তু সে এলো এখানে কেমন করে? তাছাড়া সে তো আজ মৃত! হ্যাঁ, বেশ ভালভাবে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছে। ভগবতী তাঁর দ্বারা ভোগ্যা হয়ে এক বৃদ্ধা মহিলার কাছে গচ্ছিত ছিল। তারপর যখন শাহজাদার কাছে সংবাদ এল যে ভগবতী অন্তঃসত্বা। শাহজাদা আর দ্বিরুক্তি করলেন না, গুপ্তঘাতক প্রেরণ করে ভগবতীকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে তিনি নিজের পথ পরিষ্কার করে নিলেন। কিন্তু আজ সে কোথা থেকে এল? এখন বিপদের সময়, এতদিন না এসে হঠাৎ কোথা থেকে এসে উপস্থিত? তবে কি সেদিন ভগবতীর মৃত্যু হয় নি? চক্রান্ত সেদিন থেকেই শুরু হয়ে আজ বাইরে রূপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লো? শত্রু তার সর্বদা পিছনে ঘুরে ঘুরে তাঁর অন্যায়ের নিদর্শনগুলি যোগাড় করে রেখে-ছিল। শাহজাদা বুঝে উঠতে পারলেন না—এখন তিনি কি করবেন? যদি ভগবতী সত্যিই বেঁচে থাকে, তাহলে তার সামনে দাঁড়িয়ে কি করে অস্বীকার করবেন—যে এক-রাত্রে সম্পূর্ণ অশুভ মুহূর্তে তিনি তাকে গ্রহণ করেছিলেন। শুধু একটি রাত্রিই নয়, তারপর পর পর কটি রাত্রিই শাহজাদা তাকে গ্রহণ করেছিলেন। সমস্ত সম্মান, প্রতিপত্তি, বংশমর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে ভগবতীকে সেদিন তিনি আলিঙ্গনাবদ্ধকরে-ছিলেন। তখন মেবার জয়ের আনন্দ, কাঙড়া দুর্গ আক্রমণ করতে যাচ্ছেন—ঠিক তখনকারই এই ঘটনা। সে ঘটনা খুব বেশীদিনের নয়—এইতো দাক্ষিণাত্য জয়ের পূর্বের ঘটনা। ভগবতী গর্ভবতী না হলে হয়ত সে বধ হত না কিন্তু যখন তিনি তার এই সৌভাগ্যের কথা শুনলেন, তখন আর স্থির থাকতে পারলেন না—অবৈধ সন্তানের পিতা হবার আতঙ্কে তিনি গুপ্তঘাতককে ভগবতী হত্যার জন্যে প্রেরণ করলেন। সে তো মৃত। হ্যাঁ সে মৃতই। সে যদি বেঁচে থাকে, আর যদি সত্যিই এখানে এসে থাকে, তাহলে যেমন করে হোক্ তাকে বিতাড়িত করতে হবে। শাহজাদা কেমন যেন অস্থির হয়ে পায়চারী করতে লাগলেন।

অন্তঃপুরে আছে মমতাজ। তার পিতা না হয় অপরাধী কিন্তু সে তো এখনও কোন অপরাধ করে নি। সে যখন এই ব্যাপারে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাঁকে দেখবে তখন তিনি কি করবেন? অবশ্য মমতাজ চীৎকার করে কোন ঘৃণা প্রকাশ করবে না। তবে আনার প্রকাশ করবে। আনারউন্নিসার বিশ্বাস নষ্ট হলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করবে। অবশ্য আনারের কথায় কিছু যায় আসে না। কিন্তু এখন আনারকেই তাঁর প্রয়োজন বেশী। আনারই নর্তকীর ছদ্মবেশে খানখানানকে বেঁহুশ করে শত্রু-শিবির থেকে তুলে নিয়ে চলে আসবে। আনার ছাড়া কোন রমণীই তাঁর হারেমে নেই, যে এই দুঃসাহসিক কাজ করতে পারবে। সুতরাং আনারকে তাঁর একান্ত দরকার।

আনারের শ্লেষবাক্যও তাঁকে হজম করতে হবে। এদিকে ভগবতীর অস্তিত্ব আর্জ প্রমাণিত হলে অন্তঃপুরের মাঝে তাঁর সম্মান ক্ষুন্ন হবে। সকলে কৌতুকে মৃদু মৃদু হাসবে তাঁর দিকে চেয়ে। তিনি যে তৈমুর বংশের রক্তের ধারা বজায় রেখেছেন সেজন্যেই তারা হাসবে। 'চরিত্র' বাদশাহ বংশের কারুরই থাকে না, সে সবাই জানে। আর শাহজাদা চরিত্র রাখবার জন্যেও এত গোপনতা অবলম্বন করতেন না, শুধু আজকের বিশ্বাস সৃষ্টির জন্যে। কারণ এই বিশ্বাসের ওপর সমস্ত মানুষেরই অনুগ্রহ তাঁর ওপর প্রযোজ্য হবে। এখন একটি পক্ষীর পর্যন্ত অনুগ্রহ তার কাজে লাগবে। বিরাট সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যখন তাঁর অভিযান, সমস্ত সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রাণীর সাহায্য যাতে মেলে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

শাহজাদা আর ভাবতে পারলেন না, বেগম মহলে অবিলম্বে যাবেন বলে তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। যাবার পথে সামনে পড়লো সেই গুপ্তচরের বধ্যভূমি।

তিনি বধ্যভূমির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, গুপ্তচর খড়্গের দ্বারা মুন্ডহীন হয়ে বধ্যভূমিতে রুধিরাক্ত দেহে পড়ে আছে। জল্লাদ সেখানে নেই, সে বোধ হয় তার কাজ সাঙ্গ করে নিজের কক্ষে গিয়ে আরাম উপভোগ করছে। সমস্ত ক্ষেত্রটি কেমন যেন নিস্তব্ধতার মাঝে সমাহিত। শুধু কটি শকুন তাদের বীভৎস দর্শন আকৃতি নিয়ে রক্তাক্ত বধ্যভূমির মাঝে ছুটে আসছে তারপর মুন্ডহীন দেহের ওপর ঠোক্কর দিয়ে চলে যাচ্ছে। কাকেরও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে মাঝে মাঝে। শাহজাদা দেখলেন সেই গুপ্তচরটির ধড়হীন মুন্ডটি। এ ছাড়া আরো খণ্ড দেহ সেখানে পড়েছিল, পড়েছিল অনেক মুন্ড, তাদের চোখগুলি বিরাট দৃষ্টি দিয়ে এইদিকে তাকিয়েছিল। সেখানে কেমন একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ ছড়িয়ে আছে। মক্ষিকাদের আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। তিনি তাড়াতাড়ি নাসিকার ওপর সুবাস মুক্ত বসন প্রয়োগ করে বধ্যভূমি অতিক্রম করে চলে এলেন।

তারপর বেগম মহলে ঢুকতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মমতাজবিবির দেখা হল। মমতাজ-বিবি মৃদু হেসে কুর্নিশ জানিয়ে বললেন—তবিয়ৎ আচ্ছা আছে শাহজাদা?

কিন্তু মমতাজ আর অপেক্ষা না করে, উত্তর গ্রহণ না করে দ্রুতপায়ে অন্য কক্ষের পথে চলে গেলেন।

শাহজাদা সেইমুহূর্তে অভিভূত হয়ে কেমন যেন লজ্জিত মস্তক অবনত করলেন। তারপর যখন মস্তক তুললেন তাঁর দু'চোখে প্রতিজ্ঞার দৃঢ়কাঠিন্য। কিন্তু তিনি আর ভাবতে চাইলেন না বা ভাবতে পারলেন না, শুধু তাঁর মনে অস্থিরতা নেমে এল।

একটি বাঁদী শাহজাদাকে লক্ষ্য করে পথ দেখিয়ে বেগমমহলের সেইকক্ষে নিয়ে গেল, যেখানে আনার আর ভগবতী শাহজাদার জন্যে অপেক্ষায় ছিল।

শাহজাদা কক্ষে প্রবেশ করতেই এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো, সেই ভগবতী নাম্নী রাজপুত রমণীটি ছুটে এসে শাহজাদার পা জড়িয়ে ধরে আর্তস্বরে কেঁদে উঠে বললো—তোমার না শরীরে রাজপুত রক্ত, তুমি কি অস্বীকার করতে পারো, আমি তোমার

বেগম নয়? তাড়াতাড়ি বলো ওরা বিশ্বাস করতে চাইছে না যে আমি তোমার সেই সোহাগিনী ভগবতী! যেবার জয়ের পর যে তোমার হৃদয়ে সোহাগ সৃষ্টি করে বিজয়িনী হয়েছিল, যার সুফল স্বরূপ ঐ সৌভাগ্যবান পুত্র দুনিয়াতে ভূমিষ্ট হয়েছে।

রমণী কেঁদে কেঁদে দুটি পা জড়িয়ে ধরে আরো অনেক কথা বলতে লাগলো, আর শাহজাদা অনুসন্ধিৎসু চোখে দৃষ্টি দিয়ে রমণীকে দেখতে দেখতে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে ভাবতে লাগলেন—এ তো সে নয়, ভগবতী তো এর চেয়ে আরো খুবসুরত ছিল, এবং তার মুখের আদল এত স্পষ্ট ছিল না। তবে এ কে? একে ভগবতীর নাম দিয়ে অভিনয় করতে কে এখানে পাঠালো?

শাহজাদা একবার সমস্ত কক্ষের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, আনার ছাড়া অধিকাংশই পরিচারিকা—আনার মুখখানি অবনত করে দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে আছে সম্ভবত তাঁর উত্তর শুনতে। উত্তর শোনবার পর সে কোন কথা না বলে কক্ষত্যাগ করে চলে যাবে।

কিন্তু শাহজাদা একদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবে যে এ ভগবতী নয়। এ ভগবতীর ভূমিকা গ্রহণ করে তাঁকে প্রলোভিত করতে এসেছে। সম্ভবত এর মাঝে বিরাট এক চক্রান্ত আছে। আর চক্রান্তের নায়িকা সেই অসমসাহসিকা রমণী সম্রাজ্ঞী নূরজাহান।

হঠাৎ শাহজাদা তাঁর স্বভাব অনুযায়ী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, উঠে গর্জন করে বললেন—প্রহরী, এই রমণীকে বন্দী কর।

ভগবতী নাম্নী রমণী হঠাৎ ক্রন্দন থামিয়ে দিয়ে সর্পিনীর মত ভঙ্গী করে বললো—তুমি এমনি বেইমান শাহজাদা! একদিন আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে তোমার দিলের সুখ গ্রহণ করলে, আর আজ বন্দী করে তুমি তোমার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করছো?

শাহজাদা আবার গর্জে উঠলেন—কই হ্যায়। এই বেসরম আওরতকে এক্ষুনি কারাগারে নিক্ষেপ কর, আর ঐ শিশুপুত্রকে বাঁদীমহলে প্রেরণ করে আপাতত এই সমস্যার সমাপ্তি কর—তারপর একদিন এর বিচার করা যাবে।

ভগবতী নাম্নী রমণী তবু ক্ষিপ্ত হয়ে বললো—এর শাস্তি তুমি পাবে। শাহজাদা আমার সম্বন্ধ অস্বীকার করে আমার প্রতি অবিচার করছো! একদিন তোমার গগনে যে সূর্যের জ্যোতি পূর্ণভাবে প্রকাশ হয়েছিল শুধু তোমার এই স্বভাবের জন্যে আজ তা অস্তমিত। একদিন যে সিংহাসন তোমার হবে বলেই সকলে আনন্দ প্রকাশ করেছিল, আজ তারা আতঙ্কিত হয়ে তোমার সর্বনাশ কামনা করছে।

হঠাৎ শাহজাদা আরো জোরে চীৎকার করে বললেন—রক্ষী, জলদি এই বেসরম আওরতকে আমার সামনে থেকে নিয়ে যাও।

রক্ষী শাহজাদার পরবর্তী হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল, হুকুম পেতে আর বিরুক্তি না করে বাঁদী সহযোগে সেই ক্ষিপ্ত রমণীকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। আর তার সঙ্গে সেই শিশুপুত্রও বাঁদীর দ্বারা অপসারিত হল।

সকলে চলে গেলে শাহজাদা আনারের আনত মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—একটা বিরাট সাম্রাজ্যে অনেক লোক, অনেক লোকের অনেক রকম স্বভাব। বাদশাহকে সেই বিভিন্ন স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে চলতে হয়। তেমনি বাদশাহের মত শাহজাদার দায়িত্বও অনেক। শাহজাদাকেও অনেক বিপদ রক্ষা করে যেতে হয়। শাহজাদা যদি সাধারণ মানুষ হত, তাহলে এসব সমস্যা উদয় হত না। আর নানামুখী সমস্যা এসে তাকে ক্ষতবিক্ষত করতো না। আজ আমার দুর্দিন, তাই অনেক বিপদ এসে আমাকে খন্ডবিখন্ড করছে। আমার অন্তঃপুর যদি সমস্ত বিশ্বাস সৃষ্টি করে শাহজাদাকে সাহায্য করে, তাহলে তাঁর দ্বারা অনেক অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে।

এই বলে শাহজাদা প্রস্থানোদ্যত হতে আনার তাড়াতাড়ি মাথা তুলে বললো, আমি রমণীকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে পারতুম। কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে তাই আমি সাহস করিনি।

শাহজাদা শুধু একবার আনারের দিকে একঝলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কোন কথা না বলে কক্ষত্যাগ করে চলে গেলেন।

পরদিন ভোরের আলো দুনিয়ার বুকে প্রকাশ হবার আগেই শাহজাদা দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করে নর্মদার অভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে তাঁর বিরাট বাহিনী, বড় বড় যোদ্ধা, দেওয়ান আফজল খাঁ, দরিয়া খাঁ, মহম্মদ ইসমাইল, ওসমান, রহমান। বহু অশ্বারোহী, হস্তীপৃষ্ঠে মাহুত পরিবেষ্টিত বিরাট যোদ্ধা। বহু অশ্ব ও হস্তীবাহিনী সঙ্গে নিয়ে শিবিকায় ও তাঞ্জামে হারেমের সমস্ত রমণী। মমতাজ তাঁর সন্তানদের নিয়ে একটি শিবিকায়, সঙ্গে আনার ও একজন পরিচারিকা। তাছাড়া অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য, কখানি কামান। একটি যুদ্ধের সমস্ত সরঞ্জাম। একটি বিরাট সংসারের সমস্ত সামগ্রী নিয়ে শাহজাদা খুররম চলেছেন নর্মদার তীরে শিবির সংস্থাপন করতে। ওদিক দিয়ে আসছেন সেখানকার শাসনকর্তা বিপুলবাহিনী নিয়ে।

সমস্ত দিন ধরে চললো সেই পথ পরিক্রমা। কত মাঠ, পর্বত, নদী, নালা পার হয়ে সেই বিরামহীন বাহিনীর চলা। মাঝে মাঝে অশ্বারোহী সৈনিক দূর পথ থেকে ছুটে এসে জানাতে লাগলো, সম্রাটপক্ষের বাহিনী নর্মদার অপর পারে এসে শিবির সংস্থাপন করেছে।

শাহজাদা খুররম অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হয়ে শোনেন আর তাঁর রক্তে চাঞ্চল্য উদ্দাম হয়ে ওঠে। তিনি সূর্যের দিকে তাকিয়ে কি যেন তাঁর হারানো সম্পদ ফিরে পাবার আশায় বিহ্বল হয়ে তাকান। এ যুদ্ধ তাঁর কাছে বীরত্বের প্রেরণা নিয়ে আসে নি, এ যুদ্ধ তাঁকে বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে। তিনি পিতার বিরুদ্ধে অসি ধরেছেন শুধু বাঁচবার জন্যে। না হলে তাঁর কোনই ইচ্ছা ছিল না। একদিন যখন মেবার জয়ের জন্যে

বাদশাহের প্রতিনিধি হয়ে গেছেন, সেদিন তাঁর মনের শক্তি ও সাহস কিরকম উৎফুল্ল সহকারে বলবীর্য নিয়ে এগিয়ে গিয়ে শত্রুনিধন করেছিল, কাঙড়াদুর্গ জয়েও তাঁর উৎসাহ দমিত হয়নি। তারপর দাক্ষিণাত্য বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে মালিক অম্বর তাঁর ভয়েই বশ্যতা স্বীকার করে সন্ধি করেছেন। আর আজ সেই বিজয়ী যোদ্ধাকে বাদশাহের বিরুদ্ধে শক্তিক্ষয় করতে হচ্ছে! দুনিয়ার ইতিহাসে তাঁর নাম লেখা হল—বিদ্রোহী হিসাবে। এর চেয়ে অসম্মানজনক বীরত্ব আর কিসে আছে? তাই এই যাত্রায় যে শক্তি তাঁর সংযোজিত হয়েছে, সে শুধু যুদ্ধের জন্যে, জয়ের জন্যে নয়। তাই মনের দুর্বলতা নিয়ে তিনি সর্বদা ভাবছেন—কেন আল্লা তাঁর নসিবে এই অন্যায় সমস্যা সৃষ্টি করলেন? এতে যে তাঁর এতটুকু সমর্থন নেই। এযে তাঁর একান্ত স্বভাববিরুদ্ধ। তবু তাকে বিদ্রোহ করতে হবে, লুণ্ঠন চালাতে হবে। বাদশাহের শান্তির সাম্রাজ্যে আনতে হবে অশান্তি। আর হিন্দুস্থানের লোক তাঁর ভয়ে কক্ষের কপাট বন্ধ করে থরথর করে কাঁপবে!

বাদশাহ পিতা তাঁর পুত্রের রণকৌশলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভয়ে রাজ্যের বড় বড় যোদ্ধার সমভিব্যাহারে হাজার হাজার সৈন্য দিয়ে বিদ্রোহী পুত্রকে পরাজিত করতে পাঠিয়েছেন। এমন কি, সঙ্গে দুই পুত্রকে না দিয়েও পারেননি। হয়ত সম্রাট নিজেই আসতেন পুত্রকে শায়েস্তা করতে, কিন্তু তাঁর ইদানীং তবিয়ৎ ভাল নয় বলে তিনি সে ইচ্ছা ত্যাগ করেছেন। যদি রাজ্যের সমস্ত যোদ্ধার দ্বারা না হয় হয়ত একদিন তিনি নিজেই পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন।

শাহজাদা তাই ভাবলেন—পিতা তাঁকে বেশ ভালভাবে জানেন বলেই তাঁর ভয়। তিনি জানেন খুররমের রণনীতি সম্রাট আকবরের রণনীতির মত। সম্রাট আকবর যেমন কোন যুদ্ধে পরাজিত হতেন না, খুররমও তাই। সেজন্যে তাঁর ভয় উপস্থিত হয়েছে—হয়ত খুররম পাঁচহাজার সৈন্য নিয়ে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে পরাজিত করবে। হয়ত একদিন তিনি বেঁচে থাকতেই খুররম সিংহাসন অধিকার করে তাঁকে নির্যাতন করবে।

হঠাৎ শাহজাদা নিজেকে প্রশ্ন করলেন—তিনি কি তাই করতে পারেন? সেদিন যদি কখনও জীবনে আসে, মহাবত খাঁ, আসফ খাঁর মত যোদ্ধাকে পরাজিত করে সিংহাসন অধিকার করেন—তাহলে বাদশাহকে কয়েদ বা হত্যা করে কি তিনি সম্রাট হবেন? অদূর ভবিষ্যতের এই প্রশ্ন কল্পনার মতই মনে হয়। তবু তিনি কল্পনার সেই জগতে একবার উপনীত হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন—না, তিনি কখনই বাদশাহকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁকে অসম্মান করবেন না। শুধু শত্রুদের নিধন করে বাদশাহের সামনে গিয়ে একান্ত অনুগতের মত বলবেন—আপনারই একান্ত অনুগত পুত্র খুররম হাজির পিতা। বাদশাহ পিতা বেঁচে থাকতে পুত্র কখনই সিংহাসন লাভের অভিলাষী নয়, আপনার সাম্রাজ্যে কতকগুলি দুশমন প্রবেশ করেছিল, শুধু তাদের বিতাড়িত করে সাম্রাজ্য সুরক্ষিত করবার জন্যেই আমার এই চেষ্টা। আপনি আমায় ক্ষমা করুন পিতা আমার এই ঔদ্ধত্যের জন্যে।

শাহজাদা শুনতে পেলেন তার পশ্চাতে হাজার হাজার অশ্বখুরের শব্দ! অশ্বের ওপর সওয়ার হয়ে মাথায় সূর্যরশ্মিসন্নিভ শিরস্ত্রাণ পরিহিত সৈনিক। সৈনিকের দেহের রৌপ্যনির্মিত লৌহবর্ম সূর্যের আগুনে জ্বলছে, যেন সহস্র আগুনের শিখা সঙ্গে করে মোগল সাম্রাজ্যের পুত্র শাহজাদা ছুটছে। হ্যাঁ তিনি ছুটছেন। কারণ সূর্য তার হীরকজ্যোতি শোভা নিয়ে আস্তে আস্তে অস্তাচলের দিকে ঢলে পড়ছে। সারি সারি সাইপ্রাসবৃক্ষের মাথার ওপর বাতাসের চুপি চুপি যাওয়া আসাও থেমে আসছে। আশমানের ঐ নীলিমা দিয়ে বিহঙ্গদের ঘরে ফেরার যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। পর্বতের গিরিপথ দিয়ে মৃগশিশুর চঞ্চলপায়ে পলায়ন মুখরিত হয়ে উঠেছে।

শাহজাদা একবার অশ্বের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে থমকে দাঁড়ালেন দলছাড়া হয়ে। তাকিয়ে দেখলেন সমস্ত বাহিনীটি কিন্তু শেষ দেখতে পেলেন না। কোথায় এই দলের শেষ হয়েছে তা দৃষ্টিগোচর হল না। তাঁর দৃষ্টির বাইরে এই বিরাট বাহিনীর শেষরেখা। শুধু অন্তঃপুরের শিবিকাগুলি দৃষ্টিগোচর হল। শিবিকার দরজা বন্ধ। শাহজাদা ভাবলেন—একবার মমতাজকে আশ্বাস জানিয়ে আসবেন! তার গর্ভে শাহজাদার সন্তান। সে হয়ত ভাবছে শাহজাদা এই দুর্বহ গুরুভার দিয়ে নিজে নিশ্চিন্ত আছেন। এরপর যখন ভূমিষ্ঠ হবে, তখন মৃত্যুর সম্মুখীন করে তিনি মজা লুটবেন। হয়ত মমতাজ এইভেবে আল্লার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে, খোদা আমার মৃত্যুই দাও। বিশ্বাস যেখানে নেই, সেখানে মহব্বতেরও কোন মূল্য নেই!

তাই শাহজাদা ভাবলেন—একবার মমতাজকে আশ্বাস জানিয়ে আসা দরকার। তাঁর বলা উচিত—প্রিয়তমা, তোমার ওপর যত নির্যাতনই করি আমি, আমার দিলের রোশনাই এতটুকু যদি অবশিষ্ট থাকে, তা তোমারই জন্যে। তুমি আমাকে সুখ দিয়েছ—আর তার পরিবর্তে তোমায় আমি দুঃখ দিয়ে পরিশোধ করেছি নিজের কৃতজ্ঞতা।

কিন্তু এতটা বলা কি শোভা পায়? হয়ত এই বলার জন্যে তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তখন মমতাজ তাঁর ওপর অন্য ব্যবহারও করতে পারে। এই ভেবে মমতাজকে কিছু বলতে শাহজাদা ক্ষান্ত হলেন। শুধু মনে মনে বললেন—এখন কোন দুর্বলতা না, কোন অনুযোগ না—এখন অস্ত্রের মত কঠিন ও পাষাণের মত দৃঢ় হয়ে এই বিপদের মাঝে স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করতে হবে। ভাল তাকে অনেকেই বাসে, কয়েক ঘন্টা আগে ভগবতী নাম্নী রমণীকে নিয়ে অন্তঃপুরে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, তাতে আজকের এই অভিযান সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হত না।

সেই রমণীর কথা স্মরণ হতে তার আসল পরিচয়টি মূর্ত হয়ে উঠলো।

শাহজাদা সেই কারাকক্ষের কথা ভাবলেন—হ্যাঁ, সেই রমণীর ওপর দারুণ নির্যাতনই তাকে করতে হয়েছিল। বলা হয়েছিল, আসল অর্থ প্রকাশ না করলে সরাবপ্যারী উন্মত্ত সৈনিকপুরুষ তোমার ওপর ব্যাভিচার করবে। এই বলে এক বিশালকায় সৈনিকপুরুষকে শাহজাদা আনিয়ে তাকে সরাব পানে উন্মত্ত হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সেই রমণী তবু দৃঢ়চিত্তে নিজের প্রতিজ্ঞা বজায় রেখেছিল।

শাহজাদা ক্ষিপ্ত হয়ে খোজাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন— এর সমস্ত দেহবস্ত্র উন্মোচন কর।

রমণী জ্বলে উঠে অভিসম্পাত দিয়ে বলেছিল শাহজাদা রমণীর ইজ্জত আপনি হরণ করছেন, আপনার পরিণাম বড় ভয়ংকর।

শাহজাদা আবার জ্বলে উঠে হুকুম দিয়েছিলেন—রক্ষী, দ্বিধা কর না, হুকুম তামিল কর।

রমণীর বস্ত্র বলপূর্বক উন্মোচিত করে তাকে বিবস্ত্র করা হল, সে লজ্জিত হয়ে বক্ষের কুসুমাস্তীর্ণে দু'হাত চাপা দিয়ে নিজেকে গোপন করার চেষ্টা করলো, তবু স্বীকার করলো না কোন কথা।

শাহজাদা গর্জে উঠে বললেন—ঐ শিশুসন্তান কার?

কোন উত্তর না।

শাহজাদা সরাবপ্যায়ী সৈনিককে হুকুম করলেন—ব্যাভিচার কর!

শাহজাদার সামনেই উন্মত্ত সৈনিক ছুটে গেল রমণীর দেহের প্রতি।

রমণী আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলো—বলছি, বলছি, আমি সব বলছি। সম্রাজ্ঞী আমাকে প্রচুর উৎকোচদানে প্রলোভিত করে এই কার্যে পাঠিয়েছেন। শিশুপুত্র আমার না। সম্রাজ্ঞীই কোথা থেকে এনে দিয়েছেন জানি না।

শাহজাদা গম্ভীর হয়ে বললেন—তুমি ভগবতীর নাম যোগাড় করলে কোত্থেকে?

রমণী মাথা নেড়ে বললো— জানি না। সবই সম্রাজ্ঞীর আদেশ! আমার কোন অপরাধ নেবেন না!

তুমি জানো এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড!

রমণী বললো—জানি, সম্রাজ্ঞীর হুকুম পালন না করলেও মৃত্যুদণ্ড হত।

তারপর শাহজাদা কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে ভেবেছেন রমণী নিরপরাধী। তাকে বাদশাহের হেফাজতেই পাঠিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সম্রাজ্ঞী কেমন করে জানলো এই ভগবতীর কথা? তাকে কে জানালো এই কাহিনী? দুনিয়ার কারুর তো জানবার কথা নয়।

এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন নর্মদার অফুরন্ত জলস্রোত। দিগন্তপ্রসারী উন্মুক্ত ক্ষেত্রের কোলে নর্মদা তার বিশাল দীর্ঘ দেহ নিয়ে শুয়ে আছে নির্বিঘ্নে। আশমানে নীলের সমারোহ, ভূমিতেও তাই, মাঝে শুধু দর্শক দুই ক্ষেত্রের মিলন করিয়ে পারাবতের মত এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এরই কোলে শিবির স্থাপন করার বাসনা ছিল কিন্তু বাদশাহী শিবির কালিকার কাছে সংস্থাপিত হয়েছে বলে শাহজাদা তারই কাছাকাছি শিবির সংস্থাপন করবেন বলে মনস্থির করলেন। কারণ অবশ্য দুটি। প্রথমটি হল—এই শিবির থেকে মীর্জা আবদর রহীম খানখানানকে নর্তকীর প্রলোভনে নিজের কাছে নিয়ে আসা। দ্বিতীয়টি হল, গুজরাটের শাসনকর্তা বাহিনী নিয়ে এলে তাকে আসীর দুর্গ লুণ্ঠনে

নিয়োজিত করে এই বাদশাহী ফৌজকে তিনি বাধা দেবেন। আসীর দুর্গ লুণ্ঠনের কথা খুবই গোপন আছে, একথা তিনি তাঁর একান্ত আপন অমাত্যদেরও বলেননি। রণনীতির কৌশল তাঁর বড় জটিল বলেই তিনি কতকাংশ গোপন করে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রধান সেনাপতি খানখানান তাঁর দলভুক্ত হলেই—তার সৈন্যসামন্ত সব করায়ত্ত করা যাবে, এবং এই দেখে বাদশাহী সৈন্য ভীত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হবে। এইরূপ চিন্তা করে শাহজাদা কালিকা দিকে বাহিনী নিয়ে গিয়ে উন্মুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচন করে শিবির তৈরীর হুকুম দিলেন।

সূর্য তখন অস্তাচলে। অন্ধকারে ধূসরবর্ণ আকাশের কোল থেকে নেমে দিগন্ত কবরিত করছে। বিরাট ক্ষেত্র জুড়ে শিবির তৈরী হয়ে গেল। সৈনিকরা বিশ্রামের জন্য স্ব স্ব তাঁবুর মধ্যে আসীন হল। কিন্তু শাহজাদা খুররমের কোন বিশ্রাম নেই। তাঁর মস্তিষ্কে সর্বদা ঘোরাফেরা করতে লাগলো নানারকম কৌশল। দূরে দেখতে পাচ্ছেন বাদশাহের হাজার হাজার শ্বেতবর্ণের তাঁবু। সেই তাঁবুর মাথার ওপর উড়ছে মোগল সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যের নিশান। একদিন এই নিশানের অধিকারী তিনিও ছিলেন। তাঁরও তাঁবুর ওপর উড়তো এমনি বিজয়স্তম্ভের নিশান – আর আজ তাঁর কোন নিশান নেই। নিশান যাঁর নেই, নিশানা তাঁর নেই বলেই মনে হয়। সেজন্যে শাহজাদা এই রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ভাবছেন—সত্যিই কি তাঁর কোন নিশানা নেই!

উত্তেজনা জাগছে। চঞ্চলতা সমস্ত শরীরের শিরায় শিরায়। রক্তস্রোতে সমুদ্রের আলোড়ন। তাই শাহজাদা আর কালবিলম্ব করলেন না। প্রধান সেনাপতি খান-খানানকে আনানোর জন্যে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

শিবির সজ্জিত হয়ে গেছে। শিবিরের মধ্যে স্ফটিকাধারে অত্যুজ্জ্বল আলোর স্বর্ণবর্তিকা শোভা পাচ্ছে। শাহজাদা বসে আছেন একটি রক্তবর্ণের মখমল আচ্ছাদিত কেদারায়। তিনি সরাব পান করছেন। উত্তেজনা তাঁর দরকার বলে তিনি মাদকদ্রব্য সেবন করে নিজেকে তৈরী করছেন। সেরাজী পান সচরাচর তিনি বড় একটা করেন না। তবে প্রয়োজনে এর সাহায্য নিতেও ছাড়েন না। বিশেষ করে রণক্ষেত্রে তাঁর মাদকদ্রব্যের প্রয়োজন হয়।

এই মাদকদ্রব্য সেবনের একটি চমৎকার ইতিহাস আছে। বাদশাহ জাহাঙ্গীর শা নিজে হাতে পুত্রকে মদ্য পরিবেশন করে উৎসাহিত করেছিলেন। বলেছিলেন—নিপুণ যোদ্ধা হতে গেলে এই পদার্থটিকে গলাধঃকরণ করা অবশ্যই পুরুষালী গুণ। প্রথম সেরাজী পান তখনই করেছিলেন শাহজাদা খুররম। আর সেই প্রথম পান করেই

বুঝেছিলেন—এর গুণ বড় চমৎকার। এর কাজ বড় অদ্ভুত। রণক্ষেত্রে বেপরোয়া হতে গেলে এই পদার্থটি সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।

সেই থেকেই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সরাব পান করে অন্য মানুষের বেশ পরিধান করে আসছেন। এবং তিনি রণভূমিতে যে মানুষ, প্রাসাদে সে মানুষ নন। প্রাসাদে হয়ত মনের যন্ত্রণায় ক্রন্দন অনুভব করেন কিন্তু এখানে সেই যন্ত্রণা শাণিত ছুরিকার দ্বারা রক্তাক্ত করে।

শাহজাদা খুররম অনেকক্ষণ ধরে একমনে সরাব পান করে রক্ষীকে হুকুম দিলেন, জেনানা মহল থেকে আনারকে নিয়ে আসবার জন্যে!

তারপর তিনি একমনে শূন্যে শিবিরের মাঝে প্রতীক্ষার প্রহর গুণে আনারের পদধ্বনি শুনতে লাগলেন। ক্লান্তি তার সর্বশরীর ঘিরে কিন্তু ক্লান্ত তিনি বোধ করছেন না। নিজেই স্বর্ণভৃঙ্গার থেকে সরাব স্বর্ণপানপাত্রে ঢেলে চুমুক দিয়ে চলেছেন। তাঁর গোলাপীবর্ণের মুখখানি ঘিরে আরো লালচে আভা। চোখ দুটি নিথর দৃষ্টিতে সমাহিত করে ধরে রেখেছেন অত্যুজ্জ্বল আলোর মাঝে। স্বর্ণপাত্রে আলো জ্বলছে রাতের অন্ধকারকে কম্পিত করে। শাহজাদা একদৃষ্টে তাই দেখছেন। মনে মনে ভাবছেন—একবার মন্ত্রণাসভা বসানো দরকার। তাঁর দোস্তদের ডেকে একবার গভীর আলোচনা করে নিতে হবে। যদি গুজরাটের শাসনকর্তা তাঁর বাহিনী নিয়ে এসে পড়েন ভাল, নতুবা শেষরাত্রের দিকে একটি বাহিনী তাঁরই সৈন্য থেকে বাছাই করে সর্দার ইসমাইলের কর্তৃত্বে পাঠিয়ে দেবেন আসীর দুর্গ আক্রমণ করতে।

আরো ভাবছেন—মমতাজের সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে। তাকে আশ্বাসের জন্যে মনটা কদিন ধরেই বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। বেচারী বড় পেয়ার করে তাঁকে। তিনি নিজের মানসিক অবস্থার ওঠা নামায় অবহেলা করেন এই আওরতকে। অথচ মমতাজের অপরাধ কিছু নেই। সহসা মনে পড়ে মমতাজের সঙ্গে তাঁর প্রথম দাম্পত্যজীবন।

তখন মমতাজমহল তাঁর কাছে আশমানের একটি উজ্জ্বল তারার মত মনে হত। একটি শান্ত, সুখকর অথচ আকর্ষণীয় অগ্নির মত; অথচ সে অগ্নিতে দাহশক্তি প্রচণ্ড কিন্তু জ্বালা ধরায় না। কেমন যেন হৃদয়ের তন্ত্রীতে আবেগের মূর্ছনা। গীত-সুধা নিঃসৃত হয়ে তাঁর আশমান মুখরিত করে তোলে। ঝরণার সুরলহরী কর্ণে ধ্বনিত হয়ে এক কল্পনার স্বর্গে নিয়ে যায়।

সেদিন জীবনে এই আওরতের দানে তাঁর চিত্তের শক্তি সংযোজিত হয়েছিল। বাদশাহের বাদশাহী নিয়মে লাখো লাখো রোশনাই জ্বালা হয়েছিল। শাদীর জাঁক-জমকতায় উৎসবের সেই রাত্রি জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে।

মমতাজ সেদিন তাঁর কাছে আওরত ছিল না। তাঁর অতিপ্রিয় গোলাপের সৌরভের একঝলক নির্যাস। অগুরু চন্দন সুবাসের প্রাণমাতানো সুগন্ধ। এক-খন্ড কস্তুরীর মত সে এসে দিল্লীর প্রাসাদের একটি হীরা-জহরত-পান্না-চুণি-মুক্তার জৌলুসে রাঙানো কক্ষের মধ্যে দুটি সুন্দর আঁখি বন্ধ করে প্রথম দর্শন দিয়েছিল।

শাহজাদার বয়স ছিল তখন উনিশ। হ্যাঁ, উনিশের যৌবনে তখনকার পুরুষের রক্তে সীমাহীন আগুনের দীপ্তি। তখন বক্ষের সীমিতে একটি উষ্ণ দেহের স্পর্শ সৃষ্টি হলে, আর সে স্পর্শে যদি উন্মাদনা জাগে তাহলে হিতাহিত বোধ লুপ্ত হয়ে যায়। শাহজাদা সেদিন অজ্ঞানের রাজত্বে বিচরণ করে ভুল করেননি। যদিও শাদীর ইন্তেজার দিয়ে অর্জমন্দবানুকে লাভ করেছিলেন, দর্শনের পর কিন্তু তার নাম পরিবর্তন করে রাখলেন মমতাজ মহল। মমতাজ তাঁর শাদীকরা বেগম ছিল না, সে তাঁর মহব্বতের রোশনী ছিল। সোহাগের রঙীন পুষ্প ছিল। আওরত সে বয়সে শাহজাদা অনেক দেখেছেন। কিন্তু মমতাজকে দেখার পর ভাবলেন—আসলী হীরার মত সব আওরতই আওরত নয়। মমতাজের রূপই তাঁকে শুধু আকর্ষণ করলো না, গুণও আকর্ষণ করলো। সে বাদশাহের বংশে যুবরাজের রাজ্ঞী হয়ে অহঙ্কারী হল না, বরং স্বভাবের এমনি স্বচ্ছ স্ফটিকের শুভ্রতা প্রদর্শন করালো, যা দেখে শাহজাদা চমকিত হলেন। সেই চমকই জীবনে গচ্ছিত ঐশ্বর্য হয়ে বক্ষের স্বর্ণকোটরে রক্ষিত হল।

মমতাজ তাঁর মনে কোনদিনই অবহেলার পাত্রী হত না, যদি না রাজনীতির পাকচক্রে পড়ে তাকে বিক্ষিপ্ত হতে হত। মমতাজের পিতা আসফ খাঁই তার জন্যে মুখ্যত দায়ী। নূরজাহানের পিতা বলে ইতমাদউদ্দৌলা সম্রাটের প্রধান সচিব ছিলেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর লোভে পড়ে ভ্রাতার এমনি ভাবে এই পদ নেওয়া উচিত হয়নি, যদিও নিয়েছেন তবু কন্যার বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের স্বার্থ বজায় রাখা অনুচিত হয়েছে; মমতাজ অবহেলিতা শুধু তার পিতার জন্যে। আসলে তার নিজের কোন দোষ ছিল না।

তবু কদিন ধরে শাহজাদা খুররমের মনে হচ্ছে মমতাজের প্রতি তিনি একটু বেশী অবিচার করে ফেলেছেন। তবে কি আনার এসেছে বলে এই রকম হচ্ছে। আনার আর তাঁর কে? কেউ না, সামান্য একটি আওরত। না, না এ সময় সেকথা উচ্চারণ করা শোভা পায় না। আনারকে এখন একান্ত প্রয়োজন। আনারকে দিয়ে অনেক উপকার তাঁর সাধিত হবে।

ঠিক এই সময় আনার এসে সেই শিবিরের কক্ষে দাঁড়ালো। পরণে তার গাঢ় নীলরঙের মসলিনের ঘাঘরা, ফিরোজা রঙের ছোট জামা, সোনালী কাজ করা ফিকে গোলাপী ওড়নাখানা অবহেলাভরে বক্ষের কৌতুভরঙ্গে ঢাকা দেওয়া। কণ্ঠে ছিল রত্নবলয়। কপালের ঊর্ধ্বভাগে চুলের প্রান্তদেশে মুক্তার টায়রা। আনার সেজেছে আজ অদ্ভুত। চোখের কোলে এঁকেছে সুরমার অঞ্জন। ঠোঁটে লাগিয়েছে গোলাপী আভা। গালের প্রান্তদেশে মেহেদী রঙের স্পর্শ। আনার সেজেছে কেন এতো? অত্যুজ্জ্বল আলোর মাঝে আনারের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ শাহজাদা মনে মনে হাসলেন। আনার বোধ হয় অভিসারে আসবার জন্যে অভিসারিকা হয়েছে। সেই মুহূর্তে আনারকে মনে হল বড় লোভী। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনের জন্যে তার সব অপরাধ ভুলে শাহজাদা আহ্বান করলেন তাকে।

শাহজাদা সম্ভ্রম জানিয়ে বললেন—আনারবিবি তবিয়ত আচ্ছা আছে ?

আনার প্রাণচঞ্চল কণ্ঠে বললো—জী হুজুর, বহুৎ আচ্ছা। তারপর হেসে বললো—তলব কেন শাহজাদা ?

শাহজাদার মনে হতে বললেন—তুমি এতো সেজেছ কেন ?

আনার কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বরং সপ্রতিভকণ্ঠে বললো—আপনি ডেকেছেন বলে !

আমি কী জন্যে ডেকেছি জানো ?

আনার মৃদু হেসে এবার সলজ্জ ভঙ্গিতে মাথা নামালো !

শাহজাদা তাঁর পূর্ণসরাবপাত্র শেষ করে বললেন—তুমি সরাব পান কর আনার ?

আনার মাথা নেড়ে বললো—না।

কেন ?

আনার চুপ করে থাকলো।

সরাব আমাদের আওরতরা সবাই পান করে, তুমি কর না কেন ?

হঠাৎ আনার তার দুটি সুরমালাঞ্ছিত চক্ষুদ্বয় তুলে জিজ্ঞেস করলো—বেগমসাহেবা করেন ?

শাহজাদা খুবম উত্তর দিলেন সে অনেক কিছুই জেনানামহলের আচরণ অভ্যাস করে না !

কেন করেন না ?

সে কথা বেগমকে জিজ্ঞেস কোরো।

শাহজাদা হঠাৎ দুটি পানপাত্র ভরে একটি আনারের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন—তোমার তো বেগমের মত কোন প্রতিজ্ঞা নেই, তাহলে আমার সঙ্গে একটু সরাব পান করো।

আনার সেদিন রাত্রের শাহজাদাকে দেখে কেন যেন বিস্মিত হচ্ছিল। আজ এই শাহজাদার একি অবস্থা ? প্রথমতঃ তাকে আহ্বান করতেই সে বিস্মিত হয়েছিল। শত্রুর সম্মুখীন হয়ে আগামী যুদ্ধের জন্যে শিবির সংস্থাপিত করে যুদ্ধের কথাই এখন ভাববার সময়। যে শাহজাদা এই বিদ্রোহ করবার আগে বহুদিন হারেম ত্যাগ করে সম্পূর্ণ একাগ্র জীবন গ্রহণ করেছিলেন, সেই শাহজাদা রণক্ষেত্রের শিবিরে বসে একি আশা পোষণ করছেন ! তবে কি তাঁর অধঃপতনের চিত্র তিনি দেখতে পেয়েছেন বলে শেষ আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে নেবার জন্যে আজকের রাত্রে এই বিলাসব্যসন শুরু করেছেন ! আর তা জন্যে তাকে ডেকেছেন শাহজাদা !

আনারের কেমন যেন কান্না পেতে লাগলো। এই রাত্রির পর ভয়ংকর দিনের কথা চিন্তা করে তার সেই মাটিতে বসে পড়তে ইচ্ছা করলো। নিজের জন্যে দুঃখ নয়, যত দুঃখ এই ভাগ্যপীড়িত শাহজাদার জন্যে। যাঁর সঙ্গে তার ভাগ্য জড়িত করতে এতদূর এসেছিল। যাঁর বক্ষে মাথা দিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হবার জন্যে বেইমানী করেছিল সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের সঙ্গে। আজ সেই পুরুষের ভাগ্য পদদলিত হবার

পর্যায়ে এসে থেমেছে। এখন তাকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াই কি উচিত? কিন্তু আনার সে সব কথা ভাবছে না, আনার ভাবছে এই রাত্রি, এইমুহূর্ত ও শাহজাদার অবস্থা। আর ভাবছে, আজকের রাত্রির পর এই শাহজাদার পরিণাম! কিন্তু সেই পরিণাম বড় ভয়ংকর বলেই কি চেষ্টা করা হবে না সেই পরিণাম সাফল্যের আলোকে রাঙা করতে! শাহজাদাকে বীর বলে এতকাল সে জেনে এসেছে, শাহজাদার রণ-নিপুণতা সমস্ত হিন্দুস্থানের গর্ব বলে স্বীকৃত হয়েছে, সেই শাহজাদা এইরাত্রে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, বিলাসী, রমণী সংসর্গে লোলুপ বলে মনে হতে আনারের মনে বেদনার সঞ্চার হল। সে ব্যথিত হয়ে বললো—শাহজাদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

শাহজাদা পানপাত্র এগিয়ে দিয়ে বললেন—বলো।

আপনার আজ এ কি আচরণ?

কি আচরণ দেখছো আনার?

আধমাইল দূরে হাজারো হাজারো বাদশাহী শিবির মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পরদিন সূর্যোদয়ে হাজারো হাজারো সৈনিক ছুটে আসবে আমাদের আক্রমণ করতে। এখানে আপনার আশায় সহস্র সহস্র সৈনিক মৃত্যুপণ করে যুদ্ধের জন্যে তৈরী হয়ে আছে। পরদিন সকালেই তারা আপনার নির্দেশে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর হৃদপিণ্ড উপড়ে নেবার জন্যে। আর আপনি এই সময়ে—?

আনার স্তব্ধ হতে শাহজাদা খুরম মৃদু হেসে বললেন—থামলে কেন আনার? তোমার কথা শেষ কর। আমি এই সময় কি করছি?

আনার তাড়াতাড়ি সংকুচিত হয়ে কুর্নিশ করে বললো—আমাকে মাপ করবেন শাহজাদা, আমি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছি। ভুলে গিয়েছিলাম যে এতটা প্রকাশ করা আমার উচিত হয় নি।

শাহজাদা আনারকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা না করেও বললেন—তুমি কিছু অন্যায় বলনি আনার। আমি ঠিক করেছি আজ এই শেষ রাত্রে প্রচুর সরাব পান করবো, আর তোমাকে কাছে নিয়ে জীবনের শেষ স্পর্শের যবনিকা টানবো। কারণ বুঝতে তো পাচ্ছি, খোদা এ নসিবে জয়লাভ অঙ্কিত করেন নি, তাছাড়া বাদশাহ পাঠিয়েছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ সব সেনাধ্যক্ষদের। শুনেছি, মহাবত খাঁ, আবদুল্লা খাঁ, দুই ভ্রাতা খসরু ও পারভেজ আরো অনেক বিশিষ্ট যোদ্ধারা একা এই শাহজাদা খুরমকে শায়েস্তা করতে এসেছে। সুতরাং পরাজয় যখন হবে, তখন মিছে এই মুহূর্ত অপব্যয় করি কেন? তার চেয়ে বিশ্রামের এই সুন্দর সুযোগে তোমার যৌবনতনুর স্পর্শে ও সরাবের রঙীন মাদকতায় মৃত্যুর যন্ত্রণা ভুলি।

শাহজাদা আবার বললেন—আনার, তোমার জন্যে গুলাবীপানপাত্র পূর্ণ হয়ে অবহেলায় পড়ে আছে, গ্রহণ করে শাহজাদার ওপর গোসা ত্যাগ কর। কি হবে মিছে আর দুশ্চিন্তা করে? পরাজয় তো হবেই, তার চেয়ে এসো দুজনে মিলে এই মধুরাত্রিকে প্রাণভরে উপভোগ করি। এতে দুজনেই লাভবান হবো। তুমি পাবে অতৃপ্তমনের পূর্ণতা, আর আমি পাবো হৃদয়ের সান্ত্বনা। আগামী দিনের ভয়ঙ্কর

দুশ্যগুলি বিস্মৃত হয়ে কিছুক্ষণ অন্ততঃ এক পুষ্পগুচ্ছের সৌরভে বিভোর হয়ে থাকবো।

হঠাৎ আনার শাহজাদার কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে বলে উঠলো—এমন জানলে, এই যৌবন, এই দেহ, এই ঐশ্বর্য দিল্লীর চকবাজারের কোন মুসাফিরের কাছে সঁপে দিয়ে নিজেকে কোরবাণী দিতাম।

শাহজাদা পরক্ষণে সুর পরিবর্তন করে বললেন—হিন্দুস্থানের এক সৌভাগ্যবান বাদশাহের পুত্র আমি আনার। আমাকে চকবাজারের দেওয়ানা মুসাফিরের চেয়েও তুচ্ছ মনে করলে? জানো আমার পূর্ব পরিচয়? তৈমুরের বংশধর আমি। সম্রাট বাবর আমার পূর্ব-পুরুষ। সম্রাট আকবর আমার প্রেরণা। সম্রাট জাহাঙ্গীর আমার শক্তি। তুমি আমাকে এত তুচ্ছজ্ঞান করলে আনার?

আনার যেন ভুলেছিল শাহজাদাকে। সে দেখছিল সেই রাতের আলোয় এক অপরিণামদর্শী যুবককে। যে বিলাসী, পঙ্গু, অক্ষম,—যুদ্ধের নামে ভয় পায়। এমন কি শাহজাদা এক্ষুণি হুকুমজারি করে আনারকে দুনিয়ার অন্যপাড়ে পাঠিয়ে দিতে পারেন, তাও ভুলেছিল। আনার কাতরভাবে উত্তর দিল—তাহলে কেন আপনি এই ব্যবহার করছেন শাহজাদা? আমি নিতান্ত অক্ষম রমণী, বিলাসের উপকরণ ছাড়া শক্তির উপকরণ সংযোজনের ক্ষমতা আমার নেই। তবু আমার মনোভিপ্রায় নয়, এই দুঃসহ রাত্রি রঙীন পানপাত্র ও রমণী স্পর্শসুখে মিথ্যে হয়ে যায়! আপনাকে আমার কোন উপদেশ দেওয়া নিতান্ত অন্যায়, তবু আপনার ব্যবহার আমাকে বিস্মিত করেছে বলে বলতে বাধ্য হলাম। আমার ঔদ্ধত্য মার্জনা করবেন। আপনি একবার আপনার পূর্বপুরুষের সুনাম স্মরণ করে পরাজয় ভুলে জয়ের জন্যে শক্তি সঞ্চয় করুন।

শাহজাদা আনারের কথাগুলি একমনে শুনে হঠাৎ সাধারণ মানুষের মত জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে এই রাত্রিতে কি করবো? নিজের তরবারীতে তো প্রচুর তীক্ষ্ণতা আছে। যদি না থাকতো তো এই রাত্রিতে তীক্ষ্ণভাব সৃষ্টি করবার জন্যে সময় ব্যয় করতাম।

হঠাৎ আনার দুটি হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে নমাজের ভঙ্গিতে বললো—আমি অক্ষম আওরত শাহজাদা। আপনার এখনকার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি আমার সঙ্গে কোন অভিনয় করছেন! যদি তাই হয়, তাহলে বন্ধ করুন জাহাঁপনা— আপনি এরকম ব্যবহার করলে আমি উন্মাদ হয়ে যাবো। আমার পিতার নাম ইব্রাহিম খাঁ, তাঁর ধমনীতে বীরের রক্ত। আমি তাঁরই কন্যা। সে স্রোত আমারও মাঝে প্রবাহিত। তাই যুদ্ধের দামামা শুনলে সেই রক্তে আগুন জ্বলে ওঠে। তাই সেই প্রবৃত্তির কাছে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা লয় হয়ে গিয়ে জয়লাভের জন্যে সমস্ত শরীরের ভঙ্গুর শিরা-উপশিরা উন্মুখ হয়ে ওঠে। আমি পাগল হয়ে যাই শাহজাদা। আর সেই উন্মাদনা পরিলক্ষিত হতে এই রাতকে মিথ্যে হতে দিতে চাই না।

শাহজাদা আবার প্রশ্ন করলেন—তুমি ছুরিকার দ্বারা আততায়ীকে বধ করতে

পারো ?

আনার মাথা নেড়ে বললো—পিতা আমাকে আত্মরক্ষার জন্যে সে আচরণটি শিখিয়েছিলেন।

তুমি নর্তকীর মত নৃত্য করতে পারো ?

আনার বিস্মিত হয়ে বললো—তাই বলে এখন আমাকে নৃত্য করতে বলবেন নাকি ?

শাহজাদা মৃদু হেসে বললেন—যদি আদেশ করি, তুমি নৃত্য করবে না ?

আনার বললো—আমি যে দেহে দোলন সৃষ্টি করে আপনাকে অভিভূত করবো, সেই দেহে এখন অস্বস্তিকর কম্পন।

শাহজাদা বললেন—কিন্তু তোমার নৃত্যই যে এখন উপভোগ করতে ইচ্ছে করছে আনার। অন্ততঃ অল্পক্ষণের জন্যেও নৃত্য করে আমার মনটি খুশি কর, তারপর সেনাধ্যক্ষদের ডেকে মন্ত্রণাসভা বসাবো। আগামী যুদ্ধের নানান নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করে বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে জয়যুক্ত করবো।

আনার অনিচ্ছা জ্ঞাপন করে বললো—কিন্তু আমার যে নাচ আসবে না শাহজাদা।

শাহজাদা গম্ভীর হয়ে বললেন—তুমি যদি নাচ না কর, তাহলে বাধ্য হয়ে আমাকে নর্তকীর জন্যে আদেশ জানাতে হবে। তবে এ সময় আর কোন আওরতকে দেখতে ইচ্ছা করছে না, আনার তুমিই এ সময় থাকলে আমার চিত্ত সবচেয়ে খুশি হবে।

আনার চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছ দন্তপংক্তি দিয়ে রসাপ্লুত ঠোঁট কামড়ে ধরে রাখলো, কোন কথা বললো না।

শাহজাদা আবার বললেন—নাচবে না ? তুমি নিশ্চয় জানো আমার স্বভাব ! আমি যখন সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ি, তখন সবচেয়ে বেশি হাসি। আমি যখন যুদ্ধের জন্যে তৈরী হই, তখন বিলাসের আকাঙ্ক্ষাই আমার বেশি জাগে। তাই বলে মনে কর না, আমি শক্তিহীন বলে এমনি আচরণ করি।

আনার হঠাৎ স্বীকৃতি জানিয়ে বললো—আমি নাচবো শাহজাদা। আপনি যদি খুশি হন, আমি আমার কর্তব্য পালন করবো। তার আগে আমাকে একবার অনুমতি দিন, আমি বেগমসাহেবার কাছে ঘুরে আসি।

শাহজাদা হঠাৎ খুশি হয়ে বললেন, তার প্রয়োজন নেই আনার। আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি আওরতের শরীর ধারণ করলেও তোমার সৌন্দর্য যেমন অন্তঃপুরের শোভা, তেমনি শক্তি ও সাহস বীর সৈনিকের মতই তুলনীয়। এবার কাজের কথা বলি শোনো। এই বলে শাহজাদা সরে এলেন, এসে চাপাস্বরে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টির আলো ফেলে বললেন—তোমাকে এক্ষুণি একটি দুঃসাহসিক কাজ করতে হবে। এই বলে তিনি বাদশাহ শিবিরের প্রবেশ থেকে শুরু করে প্রধান সেনাপতি মীর্জা আবদুর রহীম খানখানানকে প্রলোভিত করে আনা পর্যন্ত একটি বিরাট কৌশল আনারের কাছে পেশ করলেন। এবং শেষে বললেন—তুমিই এ কাজের উপযুক্ত বলে

আমি তোমাকে পাঠাতে চাই। তুমি নিশ্চয় যেতে অমত করবে না। স্মরণ রেখো, এরই ওপর আমার জয়পরাজয় নির্ভর করছে!

আনার শাহজাদা খুররমের সমস্ত কথা শুনে শুধু অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। ভাবতে লাগল,—এতক্ষণ যাঁকে এত ঘৃণা করলাম, তিনি তো তা নন? অভিসারিকার জন্যে তাকে ডাকেন নি, একটি গুরুতর প্রয়োজনের জন্যে তাকে ডেকেছেন। আর সেই কার্যের ওপর নির্ভর করছে পরবর্তী সমস্ত কর্মধারা। নৃত্য এখানে তাকে করতে হবে না, সেই শত্রু শিবিরে করতে হবে। নৃত্য করে অভিভূত করতে হবে সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রধান সেনাপতি খানখানানকে। ভাবতে গিয়ে তার হৃদকম্প উপস্থিত হল। শত্রুশিবিরে গিয়ে একজন ইন্দ্রিয়দুর্বল বিলাসী পুরুষের ইচ্ছার করতে হবে! তাঁর বক্ষে ঢলে পড়তে হবে। আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে হবে। চটুল চাউনির মদিরচ্ছটা সৃষ্টি করে সুরাবপ্যায়ী বেহুঁশী যোদ্ধাকে সন্তুষ্ট করতে হবে। সন্তুষ্ট মানে এমন ভূমিকা করতে হবে যেন তাঁরই জন্যে এই দেহ, এই মন, এই যৌবন। শিবিরের গবাক্ষ দিয়ে তারাভরা আবছা অন্ধকার গম্ভীর রাত্রির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আনার শিউরে উঠলো। ধরা পড়ে যাবার জন্যে আতঙ্ক নয়, তার আতঙ্ক, যদি এই খানখানান তার রমণী-দেহ কলঙ্কিত করে!

আনার চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবছে দেখে শাহজাদা শ্লেষমিশ্রিতস্বরে বললেন—কি আনার, সাহস বুঝি কুলিয়ে উঠলো না? আমি জানি, মুখে অনেকের সাহসের নানান ফিড়িঙ্গি আছে। এতক্ষণ আমাকেই অনেক সাহস জোগাচ্ছিলে, এবার নিজে সেই অবস্থায় পড়ে বুঝি পিছু হটলে?

আনার শাহজাদার মুখের ওপর তীব্রভাবে তাকিয়ে বললো—না, আনার সেজন্যে ভীত নয়। আনার যদি আওরত না হত, তাহলে সে এতোটুকুও ভাবতো না। শুধু ভাবছি, মীর্জা খানখানানকে আমার যৌবন প্রদর্শন করিয়ে প্রলোভিত করে এখানে নিয়ে আসবো, তিনি যদি আমার ইজ্জত কলঙ্কিত করেন!

শাহজাদা পরক্ষণে একখানি ইস্পাহানী ছুরিকা কোমরবন্ধ থেকে বের করে আনারের হাতে দিয়ে বললেন—এই ছুরিকাই সেই ইজ্জত বাঁচানোর জন্যে তোমায় দিলাম। নয় সেনাপতির বক্ষে আমূল বিদ্ধ করবে, নতুবা তোমার নিজের বক্ষে।

আনার বললো,—কিন্তু তাতে তো আপনার উদ্দেশ্য সাধন হবে না?

শাহজাদা বললেন—তোমার যাবার পর দুদণ্ড আমি অপেক্ষা করবো, যদি তুমি ফেরো ভাল, নতুবা অন্যব্যবস্থা সৃষ্টি করে অন্যভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করবো। মীর্জা খানখানানের ইচ্ছানুযায়ী আমি এই ব্যবস্থা করতে স্বীকৃত হয়েছি, সে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার জন্যে তার শাস্তি তোলা থাকবে, প্রয়োজনে আমি তা কাজে লাগাবো। তবে খানখানানকে পেলে তার হেফাজতে বহু শিক্ষিত সৈনিক আছে, সেগুলি হাতে পেলে আমি বাদশাহী তখতও অধিকার করতে পারবো। আর এজন্যেই তোমাকে এই কঠিন কাজটি দিয়ে আমি সাফল্য লাভ করতে চাই।

আনার আবার বললো—কিন্তু আমাকে তো বাদশাহ মহলের অনেকে চেনে।

যদি ধরা পড়ে যাই !

তার জন্যে ছদ্মবেশ ধারণ করবে। সম্পূর্ণভাবে মুখাকৃতি প্রসাধনের দ্বারা পরিবর্তিত করে বাদশাহী শিবিরে যাবে। এমনভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করবে যাতে তোমার পিতা ইব্রাহিম খাঁও না চিনতে পারেন। স্মরণ রেখো, তোমার পিতাও সেখানে আছেন।

আনার আর কোন কথা বললো না। শুধু মনে মনে বললো—আজকের রাত্রিই আমার অগ্নিপরীক্ষার কাল। যদি ধরা পড়ি নির্ঘাৎ মৃত্যু, আর যদি কৃতকার্য হতে পারি, তাহলে শাহজাদার মহত্ত্বতের অনেকখানি অংশ উদ্ধার করবো। কিন্তু এই কঠিন কাজটি কি সহজে করতে পারবো ? তাছাড়া সেই খানখানান কি বিনাস্বার্থে শাহজাদার পক্ষাবলন করতে চেয়েছেন, না এও তার একটি কৌশল ? আনার সেই-মুহূর্তে কিছু বুঝতে পারলো না বলে তাড়াতাড়ি বললো—শাহজাদা তবে বিদায় দিন। যাবার আগে এই বলে যাই, যদি কৃতকার্য হই তাহলে আনারকে স্মরণ করবেন। আর যদি অকৃতকার্য হই, তাহলে আপনারই প্রদত্ত ছুরিকা বক্ষে আমূল বিদ্ধ করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবো, তখন আনারকে ভুলে যাবেন। আনার বলে কোন আওরত আপনাকে পীড়িত করেছিলো স্মরণ করে মনে দুঃখ পোষণ করবেন না।

শাহজাদা শুধু মাথা হেঁট করে বললেন—আমি আল্লার কাছে প্রার্থনা করবো তোমার সফলতার জন্যে। এছাড়া কোন উপায় ছিল না বলে তোমাকে এই সাংঘাতিক কাজে যেতে বাধ্য করলাম। আমার বিশ্বাস, তুমি ছাড়া এ কাজ কেউ পারবে না। আর তুমি পারবে বলেই আমার অন্তঃপুরের সমস্ত আওরতগুলির কথা বিস্মৃত হয়ে তোমাকে স্মরণ করেছি।

হঠাৎ আনার কি বলতে গেল কিন্তু কথা তার মুখ দিয়ে বের হল না। কেমন যেন সব কথা কণ্ঠের কাছে ডেলার মত আটকে গিয়ে তাকে রুদ্ধ করে দিল। শুধু চোখ দিয়ে জল এসে পড়লো। সে তা লুকোবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললো, আমি তবে যাই শাহজাদা।

আনার আর শাহজাদার অনুমতির অপেক্ষা না করে স্কন্ধাবার ত্যাগ করে বাইরে বের হয়ে এল। উন্মুক্ত আশমানের তলায় অন্ধকার অংশে এসে সে হু হু করে কেঁদে উঠলো। সেইমুহূর্তে তার একটি কথাই মনে হল—শাহজাদা কি তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে এই কৌশল অবলম্বন করেছেন, না সত্যিই সেই সেনাপতিকে প্রলোভিত করে আনার জন্যে তার যোগ্যতা স্বীকার করেছেন ? যদি তার যোগ্যতা পরীক্ষা করবার জন্যে দুরূহ কার্যের ভার অর্পণ করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই সে সেই কাজ সুষ্ঠুভাবে পালন করবে।

আনার আর ভাবতে পারলো না, আবছা অন্ধকারের মধ্যে কাকে এইদিকে আসতে দেখে সে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে অন্তঃপুর শিবিরের পথ ধরলো। তাকে এখুনি এমন ছদ্মবেশ ধারণ করতে হবে, যা তার পিতার পর্যন্ত সাধ্য থাকবে না চিনতে

পারেন ! কিন্তু পিতা যদি তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করেন, যদি সেই ছোটবেলার মত শাসনভঙ্গীতে বলেন—আনার, চোখের দিকে তাকিয়ে থাকো, অন্যায় যদি করে থাকো তাহলে দৃষ্টি স্থির রাখতে পারবে না। আজ যদি পিতা সামনে দাঁড়ান, তাহলে সে কি দৃষ্টি স্থির রাখতে পারবে ? তবু সে অদ্ভুতভাবে নিজেকে সাজাবার জন্যে দ্রুত নিজের কক্ষের পথে পা বাড়ালো।

তারপরের ঘটনা সেই চিরন্তন। আনার মনে মনে অনেক ভয়, অনেক শঙ্কা, আবার অনেক সাহস সঞ্চয় করলো ; তারপর একসময় কতকগুলি অনুচর সঙ্গে নিয়ে শত্রু-শিবির অভিমুখে রওনা হল।



সেদিন রাত্রিটি আবছা অন্ধকারের মাঝে সমাহিত ছিল। একটা ভাবী আশঙ্কার মেদুরস্পর্শে আতঙ্কিত ছিল রাত্রির ত্রিযামা। আসমানের ওপর সহস্র নক্ষত্রের শয্যা প্রস্তুত ছিল, কিন্তু বড় একটা প্রকট আলো ছিল না। ধূসরবর্ণের মখমলের ওপর স্বর্ণের কুঁটির মত আসমানের চতুর্দিক। বাতাস ছিল না তাই গুমোট। একটা থমথমে আবহাওয়া চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত ছিল। শব্দ ছিল না, শুধু নর্মদার উচ্ছল-স্রোতের কানাকানি ছাড়া। মাঝে মাঝে অবশ্য কোন সৈনিকের সরাবপানের উম্মত্ত উল্লাসধ্বনি নৈঃশব্দতাকে বিদীর্ণ করছিল। এপাশে শাহজাদার সহস্র শিবির সংস্থাপিত হয়েছে, তারই প্রায় অনেকদূরে অসংখ্য বাদশাহী শিবির। মাঝে শুধু একটি বিস্তৃত খাল। সেই খালটিই বিপক্ষদলকে আলাদা করে রেখেছে।

আবছা অন্ধকার ছিল বলে অনুচরদের সুবিধা হল বাদশাহ শিবিরে প্রবেশ করা। ওরা আনারকে একটি কালো বোরখা পরিয়ে নৌকায় করে খাল পার হল, তারপর প্রহরী-বেষ্টিত বাদশাহী শিবির অভ্যন্তরে ঢুকতে গিয়ে প্রথম বাধা পেল সঙ্গীনধারী প্রহরীর কাছে।

প্রহরী সহুঙ্কারে জিজ্ঞেস করলো, কৌন হ্যায় রে উল্লুকক্যা বাচ্ছি ?

অনুচররা রসিকতা করে বললো। তেরা বাপ হ্যায়রে।

তারপর প্রহরী কাছে এসে বোরখা পরিহিত আনারকে দেখে বললো, এ কৌন হ্যায়রে, তেরা নানী ?

অনুচররা হেসে বললো, না, এ বেহেস্তের হুরী, আঁখির চমক, দিলের রোশনী। তবে এ চিজ আমাদের জন্যে নয়। প্রধান সেনাপতি মীর্জা আবদর রহীম খানখানান সাহেবের দৌলত।

প্রহরী হেসে বললো, বাস্‌রে, তবে তো হাত দেবার উপায় নেই। চিজটি না হয় একবার দেখিয়েই যাও, দেখেই চক্ষু সার্থক করি?

এই বলে প্রহরী আনারের দিকে লোলুপচোখে তাকাতেই বোরখার সামনের অংশ আনার তুলে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে বিজলীর মত একটি চমক সৃষ্টি হয়ে সেই আবছা অন্ধকারে আনারের দেহের জৌলুস ঠিক্‌রে পড়লো। আনারের দেহে ছিল স্বল্প-বসন, উত্তুঙ্গ যৌবনস্তম্ভ লোলুপ হয়ে প্রকট হয়ে পড়লো। তাতেই প্রহরীর চক্ষুদ্বয় দৃষ্টি হারালো। সে বিস্ফারিতস্বরে বললো—বাপরে! এ যে আগুনের তাপ দেখছি! যাও বাবা, নিয়ে যাও সেনাপতির কাছে। সেনাপতির দিলে জোরদার কলিজা আছে, তিনি ঠিক সামলে দিতে পারবেন।

অনুচররা আবার নিঃশব্দে এগিয়ে চললো, ওরা সেজেছিল বাদশাহী সৈন্যের পোষাকে, তাই কেউ আর বড় একটা তাদের উত্ত্যক্ত করছিল না। শুধু বোরখা পরিহিত জেনানা দেখে জিজ্ঞেস করছিল- এ কে আছে রে? যখন শুনছিল সেনাপতি খানখানানের আজ রাত্রের খোরাক, লুটে নিয়ে আসা হয়েছে পাশের গ্রাম থেকে—তখন শুনে মুচকি হেসে চলে যাচ্ছিল।

বিপদসঙ্কুল এই শত্রুপুরীতে থমকে দাঁড়ানো যে কত বড় বিপদের ঝুঁকি, সে তা জেনেও না দাঁড়িয়ে পারলো না। দাড়িয়ে পড়ে সে সেইমুহূর্তে ভাবলো এইমাত্র দুই সৈনিকের যা আলোচনা কানে এল, তাতে সেনাপতি খানখানান যে সহজ লোক নয় তা বেশ ভাল ভাবেই বোঝা যায়। নারীমাংসলোভী এই বিলাসী সেনাপতি যে সরাবের মিঠে খসবু ও রমণী দেহের বৃত্তে সময় অধিক পরিমাণে ব্যয় করেন, তাও বেশ বোঝা গেল! এখন সেই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির পুরুষকে এই উপভোগের আরো সুখ সৃষ্টি করে আরো খুশি করতে হবে। কিন্তু খুশি করতে গিয়ে যে মূল্য তাকে দিতে হবে সেই চিন্তায় আনারকে এমনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে। হঠাৎ ভাবলো সে, ছুটে এখান থেকে পালিয়ে গেলে কেমন হয়? কিন্তু শাহজাদা খুরমের কথা ভেবে সে পলায়ন মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করলো। না, পালানোটা সাহসিকার লক্ষণ নয়, রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে যদি কৌশল প্রয়োগ করে কৃতকার্য হওয়া যায়—তবেই কৃতিত্ব বেশি। আর যদি কৃতিত্ব না স্বীকৃত হয়, যদি সেনাপতির ক্ষুধিত চোখের মাঝে পুড়ে তার আক্রমণের থাবায় দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়, তাহলে শাহজাদার প্রদত্ত ছুরিকার তীক্ষ্নতা পরীক্ষিত হবে নিজের বক্ষে আমুল বিদ্ধ করে।

অনুচররা কানের কাছে চাপাস্বরে বললো—আর বিলম্ব করলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা বেশি। তাছাড়া ঐ সৈনিকদের পিছু না নিলে সেনাপতির শিবির চেনা মুস্কিল।

আনার কোন কথা না বলে আবার অনুচরদের অনুসরণ করলো।

ধুসরবর্ণের অন্ধকার রাত্রি। বোধহয় ঘন কুয়াশা আসমানকে কবরিত করেছিল। দুপাশে শত শত শিবিরের ছাউনি। মাঝে একটি প্রশস্ত গলিপথ। গলিপথে মশালের আলো জ্বলছিল স্থানে স্থানে। ওরা দ্রুত সেই দূরে অপসৃয়মান সৈনিকদের অনুসরণ

করে এক জায়গায় গিয়ে থামলো। শুনতে পেল শিবিরের ভেতর থেকে যন্ত্রসঙ্গীতের ধ্বনি ছুটে আসছে। তার সঙ্গে মিঠে ঘুঙুরের নিক্কণ। সেই নিক্কণের সাথে যে শরীরী দেহটি ঘুরছে তার নৃত্যের ছন্দ বড় দরদভরা। সারেঙ্গী ও তবলার সমন্বয়ে যে প্রাণ মাতানো তালমাহাত্ম্য প্রকাশ হচ্ছে তাতে হৃদয়ের ছন্দই বেতালা হয়ে যায়। ওরা দেখলো, সেই আগের দুটি আলাপী সৈনিক ও আরো দুটি সংযোজিত হয়ে সেনাপতির শিবিরের ছিদ্রপথে চক্ষু প্রবেশ করিয়ে উপভোগ করছে অন্দরের রঙীন চিত্র।

অনুচরদের মধ্যে একজন অগ্রসর হয়ে এসে চাপাস্বরে বললো—আর বিলম্ব নয়, এই সেনাপতির শিবির। আমি ভেতরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করে আসি। এই বলে সে আর অপেক্ষা না করে শিবির অভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসে খুশি হয়ে বললো—সেনাপতি আমার ইসারাতেই বুঝতে পেরেছেন সব। তারপর অনুচর আনারকে বললো—আপনি এবার আপনার কাজ শুরু করুন বিবি, আমরা কাছেই থাকলাম। প্রয়োজন হলেই সাক্ষাৎ পাবেন।

অনুচররা আর অপেক্ষা না করে ত্বরিৎপদে অদৃশ্য হল।

আনার অভিনয়ের জন্যে আসরে নামলো।

বিলম্ব না করে শিবিরের বস্ত্রখন্ডের দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো। ঢুকতেই তার চোখে বিস্ময় সৃষ্টি হল। যুদ্ধক্ষেত্রে এ যে রঙমহল! কক্ষের মধ্যে জ্বলছে উজ্জ্বল বর্তিকা। সেই উজ্জ্বলতায় সমস্ত কক্ষের আসবার প্রতিফলিত। একটি স্বর্ণনির্মিত বিরাট স্বর্ণভৃঙ্গারের ওপর আলোর রোশনাই। কক্ষের মাটিতে জাফ-রাণী রঙের দামী একটি ফরাস পাতা। সেই ফরাসের ওপর দুটি কাবুলী চিড়িয়ার মত খুবসুরত নর্তকী, নর্তকীর অর্ধনগ্ন দেহের শুভ্রবর্ণে আলোর প্রতিফলন। নর্তকী দুটি সেনাপতি খানখানানের সামনে উদ্ভিন্ন যৌবন মেলে ধরে নৃত্য করছে। আনারের মনে পড়লো সেই সৈনিকদের কথোপকথন। 'ঠিক কাশ্মিরী আপেল।' হ্যাঁ রমণী দুটি সত্যিই খুবসুরত। খানখানানের রুচির বাহবা আছে। তিনি রুচিবান পুরুষ। আনার যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে ভেতরের কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছিল না। তাছাড়া স্থানটি একটু অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে সে নিজেকে গোপন করতে সুবিধে পেয়েছিল।

আনার দেখলো খানখানান সেই দুটি নর্তকীর অর্ধনগ্ন উন্মুক্ত যৌবনশোভার দোলন দেখতে দেখতে তারিফ করছেন, আর যে বাঁদী খানখানানের সামনে বসে গুলাব সুবাসিত সেরাজী পরিবেশন করছিল, সে বাঁদীর কাঁচুলি সম্বল বক্ষের কৌমার্য উজ্জ্বল আলোর মাঝে প্রকট হয়েছিল। মাঝে মাঝে খানখানান উল্লাসিত হয়ে সেই বাঁদীকে নিজের প্রশস্ত বক্ষের ওপর সবলে স্থাপন করছেন। ছোট্ট দেহের আওরত বেদনা অনুভব করলেও তার বলার কিছু নেই, সে যন্ত্রণা অনুভব করেও দন্তবিকশিত করে হাস্য প্রকাশ করছে আর সেনাপতির প্রশস্ত বক্ষে নিজের দেহ সঁপে দিচ্ছে।

আনার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলো—এই অবস্থায় সে কি করে খানখানানের

সামনে যাবে ?

এদিকে বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি চৌদুনে উঠেছিল। নর্তকী দুজন নাচতে নাচতে পরিশ্রান্ত হয়ে উঠেছে। ওদিকে রাত্রিও দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আনার কক্ষের চতুর্দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখলো—কক্ষটি রূপালী, সোনালী বর্ণের শোভায় জাঁকজমক পূর্ণ। কক্ষের মধ্যে লোবানের মিষ্টিগন্ধ, সঙ্গে মিশেছে চন্দনের সুবাস। পুষ্পদানীতে সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ, নাগকেশর ও মালতীর অস্তিত্ব। কক্ষের মধ্যে বাতাসে অদ্ভুত গন্ধের মিশ্রণ। তাছাড়া বাদশাহী ঢঙে কক্ষটির মাঝে লাল, নীল, সবুজ ফিরোজা কত রঙের অপর্যাপ্ত বাহার।

আনার শাহজাদার কথা স্মরণ করে হঠাৎ অগ্নিতে জীবন উৎসর্গ করবে বলে অগ্রসর হল। সে খুলে ফেললো বোরখার আবরণ। লোলুপ হল বক্ষের কৌস্তভ-রত্ন। শাহজাদার কথানুযায়ী সে পরেছিল স্বল্প বসন। নর্তকীর মত খাটো ঘাঘরা। হাঁটুর ওপর সেই ঘাঘরার আবরণ শেষ হয়ে তার মাখন সুন্দর পেলব পা দুটি অনাবৃত করেছিল। বুকের কৌস্তভরত্নে বাঁধা একখণ্ড গোলাপী মসলিনের ঘেরাটোপ। তার ওপর ছোট একখন্ড জামা। জামাটি মসলিনের সূক্ষ্মবস্ত্রের। তাই দেহাভ্যন্তরের গোলাপী বর্ণ আবরিত না হয়ে লোলুপ হয়েছিল। তাছাড়া কণ্ঠ-হারের শেষ বিন্দুর মাঝের অংশ—দুই যৌবনস্তম্ভের মিলন স্থান অনাবৃত করে রাজ্যের রহস্যময়তার হীরক দ্যুতি সৃষ্টি করেছিল। আনার নিজের বক্ষের দিকে তাকিয়ে নিজেই শিহরিত হল। তারপর মনে মনে বললো—এই ঐশ্বর্য এতদিন ধরে একান্ত যত্নে পোষণ করে শেষ পর্যন্ত অপাত্রে উৎসর্গ করার জন্যে নির্দেশ প্রেরিত হল!

শাহজাদার কথা আবার স্মরণ করলো আনার—তিনি বার বার সাবধান করে বলে দিয়েছেন—তোমার যৌবন, তোমার রূপ ও সৌন্দর্যের ওপর নির্ভর করে খান-খানানকে এখানে আনা সম্ভব হবে। যদিও সে বলেছে শাহজাদার পক্ষাবলম্বন করবে কিন্তু মত পরিবর্তিত হতেও বিলম্ব হবে না। তাই তার মত যাতে না পালটায় তোমার যৌবনের আকর্ষণ তেমনি ভাবে সেনাপতির মাঝে সৃষ্টি করবে। তারপর যখন তোমাকে ছাড়া তার হৃদয় ভেঙে পড়বার উপক্রম হবে, তখন বলবে—আপনি শাহজাদার শিবিরে চলুন, সেখানেই আপনার অবশিষ্ট আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবো। এই অভিনয় যদি সার্থক হয়, তাহলে কৃতকার্য অবশ্যই হবে। কিন্তু যদি এই চরিত্রের অভিনয়ে সে কিছুমাত্র কৃতকার্য না হতে পারে ?

আনার আর ভাবলো না, সে সমস্ত ভাবনার ঊর্ধ্বে উঠে হঠাৎ আসরের আলোর রাজ্যে গিয়ে দাঁড়ালো। সেনাপতির আমেজে ভরপুর চোখের দৃষ্টিতে হঠাৎ আনারের সৌন্দর্য রোশনাই জ্বালালো! সেনাপতি উল্লসিতস্বরে 'হুররে' দিয়ে উঠলেন।

আনার বার বার কুর্নিশ জানিয়ে হঠাৎ নৃত্য শুরু করলো। আগের দুজন নর্তকী আনারের আকস্মিক আবির্ভাবে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে থমকে গেল। খানখানান আনারের সচল দেহের দিকে তাকিয়ে তাদের হাত নেড়ে চলে যেতে বললেন। তারা

আহত বন্য পশুর মত আক্রোশে ফুলতে ফুলতে অন্তর্হিত হল। তারপর সেনাপতি সরাব পরিবেশনকারী বাঁদীকে চলে যেতে ইসারা করলেন। সেও আনারের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে অদৃশ্য হল।

এবার সমস্ত কক্ষটির মধ্যে সেনাপতি আবদর রহীম খানখানান ও আনার। আনার নাচছিল তার দেহের বিচিত্র রহস্যের বাঁকে বিজলীর চমক সৃষ্টি করে। কক্ষের মধ্যে জোরালো আলোর স্বপ্নাভা। সেই আলোতে সেনাপতি খানখানান আনারের সৌন্দর্যের চমক দেখে হতচকিত হয়ে যাচ্ছিলেন। এতকাল ধরে কম তিনি রমণীদর্শন করেন নি। বাদশাহের চাকরীর কৃপায় অনেক আওরতের যৌবন তিনি ভোগ করেছেন, রূপও কম দেখেননি, তবে এমন চমক তাঁর মধ্যে কখনও সৃষ্টি হয়নি।

ওদিকে অদৃশ্য থেকে বাদ্য-যন্ত্রের মিঠে সুরের মাদকতা বাতাসে আরো চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। আনার সেই চঞ্চলতায় তাল ঠিক রেখে পায়ের ছন্দ প্রকাশ করছিল এক, দুই, তিন। তার ঘাঘরা ঘুরছে বিচিত্র লয়ে বৃত্তাকারে। তার হাঁটু থেকে উরু, উরু থেকে পায়ের অনেকখানি উঁচু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। আনার তাকিয়ে রয়েছে খানখানানের চোখের দিকে। খানখানান সরাব পান করতে ভুলেছেন। আগে যে সরাব পান করেছিলেন তারই আমেজে তিনি ঢুলঢুলু। সেই আমেজের মৌতাতেই তিনি রঙিন চোখে আনারের দিকে বিস্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর শরীরের রক্তের স্রোতে উন্মাদনার তাণ্ডব শুরু হয়েছিল। তিনি আনারকে কাছে চাইছিলেন। বলতে তাঁর ইচ্ছা করছিল, দূরে না থেকে, নৃত্য না করে কাছে এসো। এই রাত্রি, এই পরিবেশ, আমার রঙীন শিবির কক্ষ, সব মধুর করে তুমি আমার বক্ষপাশে এসো। কিন্তু কে শুনবে সে কথা?

আনার বোধহয় বুঝেই সেনাপতিকে বেকুব বানানোর জন্যেই আপন দেহের বসন আরো উন্মুক্ত করলো, আরো প্রকট করলো, করে সেনাপতিকে পাগল করে তুললো।

সেনাপতি বারবার উল্লসিত হয়ে, বারবার উন্মত্ত হয়ে, তীব্র আকাঙ্ক্ষায় অস্থির হয়ে নিজের বিরাটদেহ তুলে দাঁড় করাবার চেষ্টা করতে গেলেন। কিন্তু ভারী দেহ, তার উপর প্রবৃত্তির তাড়নায় অস্থির, উঠে দাঁড়ানো সম্ভব না হতে তিনি সেই এক জায়গায় বসে বসে আনারকে হাত নেড়ে ডাকতে লাগলেন। কেমন যেন তাঁকে এক লোলুপ ক্ষুধিত পশুর মত মনে হতে লাগলো।

আনার হঠাৎ নৃত্য থামিয়ে খানখানানের সামনে গিয়ে স্বর্ণভৃঙ্গার থেকে সরাব ঢেলে পানপাত্র এগিয়ে দিল সেনাপতিকে।

সেনাপতি একান্ত অনুগতের মত গদগদকণ্ঠে বললেন—তোমার কি চাই পেয়ারী, আমার বহুত দৌলতের বিনিময়ে এই দিল তুমি নাও।

আনার শুধু গোলাপী ঠোঁটে বিজলীর চমক সৃষ্টি করে শুভ্র দন্তপংক্তি মেলে হাসতে লাগলো। সে পানপাত্র এগিয়ে দিল খানখানানের দিকে।

খানখানান বললেন—এ কি হবে পান করে বিবি? তোমার এই রঙীন দেহের খসবু সরাবীতে যে মাদকতা আছে, তাই আমাকে পান করতে দাও।

আনার কোন কথা বলছে না। সে শুধু হাসছে, আর চোখের নানান ভঙ্গি প্রদর্শন করছে। সে হঠাৎ সরাবপূর্ণ পাত্র খানখানানের মুখের সামনে ধরে তাঁকে পান করতে বললো।

সেনাপতি এরকম ব্যবহার কখনও পান নি। এরকম সোহাগ কখনও তিনি অনুভব করেন নি। এর মধ্যে যা উপভোগ আছে তার সন্ধান পেয়ে পুলকিত হয়ে আনারের হাতে ধরা পানপাত্র নিঃশেষ করলেন।

আনার আবার পানপাত্র ভরে দিল।

এদিকে তখন যন্ত্রসঙ্গীত বেজেই চলেছে। কক্ষের মধ্যে একটি ছন্দময় অস্থিরতা, একটি সুরমাধুর্যের অপরূপ মুহূর্ত। একটি চমকপ্রদ গীতের অপূর্ব দোলন। সব মিলিয়ে আনারের সৌন্দর্য, তার নগ্নদেহশোভার রোশনাই। কক্ষের মধ্যে সেই মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সেনাপতি সেদিকে তাকিয়ে কেমন যেন বিবশ হয়ে পড়ছিলেন। কেমন যেন অধিক মাদকদ্রব্য সেবনের আলস্যে দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। কেমন যেন অতিরিক্ত সুগন্ধ আঘ্রাণের জন্যে মৌতাতের আমেজে শূন্য হয়ে যাচ্ছিলেন।

আনার আবার সরাব এগিয়ে দিল।

খানখানান অভিভূতের মত যন্ত্রচালিত হয়ে তা গ্রহণ করে পান করলেন।

আনার আবার দিল।

আবার তিনি পান করলেন।

এইরকম বার বার আনার দিল আর সেনাপতি সুবোধ বালকের মত তা গ্রহণ করে গলায় ঢেলে দিতে লাগলেন। এই অবসরে খানখানান আনারের হাত ধরলেন, তাকে কাছে টেনে আনতে গেলেন। চাপাস্বরে বললেন—শাহজাদা খুররমের প্রেরিত একটি আওরত যদি এমন হয়, না জানি আরো কত এমনি আওরত তাঁর হারেম শোভা করে আছে? আমি যাবো শাহজাদার কাছে। তাঁকে সাহায্য করে বিপদমুক্ত করবো কিন্তু পরিবর্তে যদি এমনি আওরতের সঙ্গ আমায় দান করেন তাহলে আমি তাঁর গোলাম হয়ে থাকবো।

এবার আনার কথা বললো, বললো—আমার চেয়ে আরো অনেক খুবসুরত আওরত শাহজাদার হারেমে আছে, তিনি বলেছেন, আপনি চলুন, আপনাকে প্রত্যহ একটি করে নতুন আওরত তিনি নজরানা দেবেন।

খানখানান বললেন—আমি বহুত খুশি হয়েছি বিবি। কিন্তু আমার অন্য আওরতের চেয়ে তোমারই সঙ্গ ভাল লাগবে, তুমি আমাকে আনন্দ দেবে বলো! তুমি কাছে থাকলে আর আমার কিছু দরকার হবে না।

আনার হেসে বললো—কিন্তু আমার চেয়ে আরো খুবসুরত আওরত আছে জনাব।

খানখানান বললেন—আমি তাদের জন্যে লালায়িত নই। তুমি থাকবে কিনা বলো?

আনার শুধু হাসলো, কথা বললো না। সে আবার সরাব পরিবেশন করলো।

খানখানান নেশার আমেজে বুঁদ হয়ে গেলেন। হঠাৎ তিনি ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলে বললেন—এই বক্ষের মধ্যে বড় যন্ত্রণা বিবি, তুমি একবার এই বুকে তোমার ঐ সুন্দর হাতটি স্থাপন কর। অনেক আওরত আমার জীবনে এসেছে, তাদের ভোগ করেছি কিন্তু তৃপ্ত হতে পারিনি। আজ তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে, বহুকাল ধরে এই যেন আমি খুঁজছিলাম। তুমি যখন এসেছ তখন দূরে না থেকে কাছে এসে আমাব বুকে তোমার হাতটি স্থাপন কর। দেখবে, এই বিশাল বুকের সমস্ত অংশ হাহাকারে ভবে আছে।

আনাব কী ভেবে একটু ব্যবধান রেখে খানখানানের কামিজের ওপর দিয়ে তাঁর বুকে নিজের হাতটি স্থাপন করলো।

সেনাপতি আরামে চক্ষু বুজে আনারের হাতটির ওপর নিজের হাতেব আঙুলের ক্রীড়া সৃষ্টি করতে লাগলেন। তাকে কাছে টানতে লাগলেন কিন্তু আনার নিজেকে দূরে ধরে রাখলো। সেনাপতি বার বাব আনারকে একান্তে গ্রহণ করবার চেষ্টা করলেন কিন্তু আনার অটল। আনার নিজেকে সেনাপতির বক্ষে সঁপে দিল না।

সেই মুহূর্তে খানখানানের যদি শক্তি থাকতো তাহলে তিনি সেই শক্তি প্রয়োগে আনারকে সবলে আলিঙ্গনাবদ্ধ কবতেন কিন্তু আনার সেই জায়গায় কৌশল করে খানখানানকে সরাব পান করিয়ে নেশার মাঝে পঙ্গু করেছিল। সেজন্য খানখানানের তীব্র প্রবৃত্তি জেগে উঠলেও শক্তিহীনতার জন্যে তাঁর উপভোগ নেশার মাঝেই লীন হয়ে যাচ্ছিল। তিনি শুধু জড়িতকণ্ঠে বার বার বললেন—সুন্দরী কেন তুমি আমাকে বিমুখ করছো? তুমি যে আমার বেগম হবে বলে জন্মেছ। এসো কাছে এসো, কাল তেমোকে ঠিক শাদী করে বেগম করবো। এমনি কথা দুচারবার বলতে বলতে সেনাপতি খানখানান তারপর আস্তে আস্তে একেবারে অবশ হয়ে গেলেন। আর তাঁর কোন শক্তি থাকলো না। আনার ভাল করে খানখানানকে পরীক্ষা করে ত্বরিৎপদে কক্ষের ক'টি প্রজ্বলিত বর্তিকা নির্বাপিত করলো। কক্ষের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার ছেয়ে গেল।

আনার তারপর তাঁবুর পর্দা সরিয়ে বাইরে এলো। বাইরে আসতেই কোত্থেকে সেই অনুচররা উদয় হল। তারা আর কোন কথা জিজ্ঞেস করলো না, অন্ধকারে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে সেনাপতি খানখানানকে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করে স্কন্ধে আরোহণ করে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। আনার আবার বোরখার আবরণে নিজেকে আবরিত করে তাদেব পিছু পিছু চলতে লাগলো। তার শরীর বড় ক্লান্ত লাগছিল। কিন্তু কৃতকার্যের আনন্দে তার পদক্ষেপ হয়েছিল খুবই দ্রুত।

তখন নিশুতি রাত্রি। বাদশাহী শিবিরের দুপাশে তাঁবুগুলি থেকে কোন সাড়া-শব্দ আসছিল না। শুধু মাঝে মাঝে দু একটি প্রহরীর দেখা মিলছিল, কিন্তু তারা ঘুমে এত কাবু যে সামনে দিয়ে তাদের সেনাপতিকে নিয়ে শত্রুপক্ষ চলে গেল, তাও দেখার অবসর হল না।

এমনিভাবে নিরুদ্বেগে একসময় দলটি গিয়ে শাহজাদার শিবিরের সামনে থামলো। আনারের একবার ইচ্ছা করলো, শাহজাদার সামনে গিয়ে একটি সেলাম ঠুকে আসে কিন্তু পরক্ষণে বড় ক্লান্তি অনুভূত হতে সে টলতে টলতে নিজের কক্ষের দিকে চলে গেল।

শাহজাদা খুররম যে একজন সুকৌশলী রণনিপুণ সাহসী বীরপুরুষ—তার প্রমাণ পরদিন প্রভাতের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার চতুর্দিকে আবার ছড়িয়ে গেল। বর্তমানের মোঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীর শা যে-ভয়ের জন্যে পুত্রের বিরুদ্ধে রাজ্যের সেরা সেরা যোদ্ধাদের নিযুক্ত করেছিলেন, বাদশাহকে সেই ভয়ে আবার চিন্তিত হতে হল। একজন সেনাপতি বেইমানী করেছে, বেইমানী ছাড়া কি—তার সমর্থন না থাকলে কি শত্রুপক্ষ তাকে বেঁহুশীর মাঝে বন্দী করে নিয়ে যেতে পারে? খানখানানের গোপন চক্রান্ত গোপনে থাকে নি, আলোর মাঝে উন্মুক্ত হয়ে গেছে।

তারপর খানখানানের বিশ্বাসঘাতকতায় উন্মুক্ত রণক্ষেত্রে সেনাপতির নিজস্ব সৈনিকরা বাদশাহী ফৌজ থেকে পালিযে এসে শাহজাদার দলে যোগদান করেছে। বাদশাহের অন্য সব সেনাধ্যক্ষরা এই দুঃসংবাদে মর্মাহত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করেছে। অবশ্য সে দলে তুর্কি সেনাপতি মহাবত খাঁ ও যুবরাজ পারভেজ ছিলেন না। তাঁরা অন্য বাহিনী পরিচালনা করে তখন শাহজাদাকে বাধা দেবার জন্যে অন্য-স্থানে অপেক্ষা করছেন।

এদিকে গুজরাটের শাসনকর্তা শাহজাদার দলে যোগদান করলে আসীর দুর্গ একরকম বিনা রক্তপাতেই শাহজাদার দখলীভূক্ত হয়।

শাহজাদা আসীর দুর্গ দখল করে প্রচুর ধনসম্পত্তি ও খাদ্য সামগ্রী হস্তগত করলেন তারপর বুর্হানপুরের দিকে গমন করলেন। কিন্তু বুর্হানপুরের পৌঁছেই তিনি চমকিত হলেন সংবাদ শুনে—যে সেখানে মুতামদ্-উদ্দৌলা অলকাহির মহাবত খাঁ ও শাহজাদা পারভেজ প্রায় চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

শাহজাদা মনে মনে খানিকটা ভীত হলেন কারণ মহাবত খাঁর রণনীতি তাঁর অজানা নয়। এই তুর্কি সেনাপতি যে একজন সুচতুর কৌশলী ও বড় যোদ্ধা, তার প্রমাণ তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয়ের সময়ে বেশ ভালভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন।

তাই আক্রমণের আগের দিন রাত্রে সেনাপতি খানখানানের সঙ্গে তিনি আলোচনায় বসলেন। এদিকে খানখানান কদিন ধরে মানসিক অবস্থার বিপর্যয়ে শাহজাদার পক্ষ ত্যাগ করবেন বলে ঠিক করছিলেন। সে কথা শাহজাদা খুরমের অজ্ঞাত নয়। এমন কি এও তাঁর অজ্ঞাত নয়, গুজরাটের শাসনকর্তাও খানখানানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে অন্যায় কতকগুলি আবদার প্রকাশ করে এবং তা না পেয়ে রুষ্ট হয়ে শাহজাদার পক্ষত্যাগ করে চলে যাবেন বলে ঠিক করছিলেন। এসব কোন কথাই শাহজাদার অজ্ঞাত নয়। তিনি ভাবছিলেন—এই দুজন বিরুদ্ধবাদী পদস্থ ব্যক্তিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবেন কিনা? উপস্থিত তাঁর বিপদে এরা যেরকম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছেন তা সহ্যের

অতীত। তাঁরা কতকগুলি অসম্ভব দাবী উপস্থিত করেছেন, সেগুলি শুনে শাহজাদা মনে মনে দারুণ ক্ষুব্ধ। প্রকাশ্যে তিনি তা প্রকাশ করবেন কিনা ভেবে চলেছেন।

সেনাপতি খানখানান চান আসীর দুর্গের অধিকার ও আনারউন্নিসাকে। আর গুজরাটের শাসনকর্তা চান হাবেমের সেরা একটি বাঁদী, যে বাঁদীটি মমতাজবিবির প্রিয় —আর লুণ্ঠনের অর্ধেক ধনদৌলত। এতখানি স্পর্ধা ও'দের দেখে শাহজাদা খুরম যার পর নাই স্তম্ভিত হয়েছেন। সামান্য এক একজন কর্মচারী হয়ে তাঁরা যে দম্ভ প্রকাশ করেছেন, তা সহ্যাতীত। তিনি কি নিজের বংশগৌরবও ভুলে গেলেন? এখনও তাঁর পিতা হিন্দুস্থানে ঐশ্বর্যমণ্ডিত মোঘল সিংহাসনে আসীন। তিনি সেই সম্রাটের পুত্র। সৌভাগ্যবান বংশের সেরা সম্মানীয় বংশধর। না হয় আজ সাময়িক ষড়যন্ত্রের জন্যে পিতার বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য হয়েছেন, তাই বলে কি তাঁর বংশগৌরব বিলুপ্ত হয়েছে?

এ'রা ভেবেছে কি? শাহজাদা খুরমকে কি তাঁরা এক ভাগ্যপীড়িত মুসাফির ভেবেছে? কিন্তু ক্ষুব্ধ হয়েও তাঁকে সান্ত্বনা সংগ্রহ করে নিতে হল কারণ সত্যিই এখন তাঁর দুঃসময়, শত্রু বর্ধিত না করে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করাই ভাল। তাছাড়া আরো তাঁকে দুটি সংবাদ বিস্মিত করেছে—এক মহাবত খাঁ, দুই শ্বশুর আসফ খাঁ। আসফ খাঁও পঁচিশ হাজার অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে বিলুচপুরের কাছে অপেক্ষা করছেন। এইসময় যদি খানখানান ও গুজরাটের শাসনকর্তাকে ক্ষুব্ধ করেন তাহলে তাঁরা তাঁদের বাহিনী নিয়ে চলে যাবেন। তখন অল্প সৈন্য নিয়ে মহাবত খাঁ ও আসফ খাঁকে পরাজিত করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এদেরকে হত্যা করলেও সেই একই অবস্থা দাঁড়াবে, সৈনিকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করবে।

কিন্তু এদের দাবী না স্বীকার করলেও তো তাঁরা বশে থাকবেন না! অথচ কি করে তিনি এই দাবী মঞ্জুর করেন? প্রথমতঃ খানখানানকে আসীরদুর্গের অধিকার দেওয়া অসম্ভব—কারণ ঐ দুর্গটি সুরক্ষিত এবং প্রয়োজনে তার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকা তাঁর পক্ষে সুবিধা হবে। দ্বিতীয়ত, আনারকে নজরানা দেওয়া অসম্ভব কারণ সেদিন এসে সে শাহজাদার সম্মানের প্রতি শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করে গেছে। শাহজাদাকে সে সচকিত করেছে। সে বলেছে—আমার গোস্তাখি মাপ করবেন জনাব, খানখানান যদি মমতাজবিবিকে নজরানা চাইতেন, তাহলে কি আপনি তা বিনা দ্বিধায় দিতেন? তবে আমাকে কেন নজরানা দিতে চাইচেন? আপনি তো জানেন আমার অভিলাষ কি?

শাহজাদা ভেবে দেখেছেন--তিনি আনারের কাছে কৃতজ্ঞ। আনার খানখানানকে শত্রুশিবির থেকে প্রলোভিত করে না আনলে এই জয় সংঘটিত হত না। তিনি কৃতজ্ঞ আনারের কাছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাঁর ধর্ম। তবু তিনি বোধ হয় নিজের স্বার্থের জন্য আনারকে নিবেদন করতেন কিন্তু তাঁর সম্মান ক্ষুন্ন হলে বলে তিনি খানখানানও গুজরাটের শাসনকর্তার কোন দাবীই মঞ্জুর করতে চান না। তাঁর চিন্তা, মঞ্জুর করলেই তো আবার অন্য দাবী তাঁরা মেলে ধরবে, তখন আবার তা পূরণ না করলে তাঁরা আজকের এই একই ভূমিকা গ্রহণ করবেন!

কিন্তু আগামী দিনের সমস্যায় আবার তিনি ভাবতে শুরু করেছেন, কালই মহাবত খাঁ ও ভাইজান পারভেজের সঙ্গে অসি বিনিময় করতে হবে, অন্ততঃ আগামী-কল্যের সময়টি যাতে এঁরা তাঁর সঙ্গে থাকে, তারই ব্যবস্থা করা ভাল। এই দিনটির সমস্যা শেষ হলে জয় পরাজয় যাই হোক্—তারপর এঁদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করলেই হবে। অন্ততঃ তাঁদের ডেকে বলা হোক্—আপনাদের দাবী মঞ্জুর হবে, শুধু কালকের যুদ্ধটি শেষ হবার পর।

যখন তিনি সেনাপতি খানখানানকে প্রহরীর দ্বারা সেলাম পেশ করে পাঠালেন, ঐসময় ঝড়ের বেগে আনার কক্ষে প্রবেশ করলো।

আচমকা আনারকে বিপর্যস্ত বেশবাসে উন্মত্তের মত ছুটে আসতে দেখে শাহজাদা দারুণভাবে বিস্মিত হলেন। কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই আনার শাহজাদার পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে ক্রন্দনমুখরিত কণ্ঠে বললো—শাহজাদা বাঁচান আমাকে! আমার ইজ্জত এক লম্পট সৈনিক কর্তৃক লুণ্ঠিত হচ্ছে!

শাহজাদা দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হলেন কিন্তু সে ভাব না প্রকাশ করে সংযতকণ্ঠে বললেন—উত্তেজনা প্রশমিত কর আনার। কি হয়েছে সবিস্তারে ব্যক্ত কর? যদি অসম্ভব না হয়, তাহলে তোমাকে যে আক্রমণ করেছিল, তার প্রতি সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবো।

কিন্তু আনারের বক্তব্য আর পেশ করা হল না।

বেগে সেনাপতি মীর্জা আবদর রহীম খানখানান প্রবেশ করলেন, করে কোন কথা না বলে শাহজাদার সামনেই আনারকে আকর্ষণ করতে গেলেন।

শাহজাদা খুররম তাই দেখে হকচকিত হয়ে দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন সেনাপতির ঔদ্ধত্যে। তিনি ক্ষিপ্ত হয়েও 'খামোশ' শব্দ হুঙ্কারিতস্বরে প্রয়োগ করতে গেলেন কিন্তু পরক্ষণে আগামীকল্যের কথা ভেবে নিজেকে সংযত করলেন, করে শান্তকণ্ঠে বললেন—খাঁ সাহেব, কি হয়েছে! আপনি এত উত্তেজিত কেন?

খানখানান শাহজাদার দিকে ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করে বললেন—বাদশাহার হেফাজতে চাকরী করেও আমাকে অনিচ্ছার জীবন যাপন করতে হয়নি, আর শাহজাদার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্বীকার করে আমাকে কৃচ্ছসাধনের মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করতে হচ্ছে। আমি আজ পাঁচদিন উপবাস করে আছি জানেন? না সরাব, না রমণী সংসর্গ। যাক্‌গে সে সব বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই, আমি এই আওরতকে বলপূর্বক গ্রহণ করবো। এই আমাকে সেদিন রাত্রে প্রলোভিত করে এখানে নিয়ে এসেছিল, তারপর তার ধরা পাচ্ছিলাম না, আজ কায়দায় পেয়েছি, তাই কিছুতে একে ছাড়বো না। খানখানান আবার বললেন—চলে এসো সুন্দরী, শাহজাদা কোন আপত্তি করবেন না। তুমি আমাকে সঙ্গ দিলে আমার সমস্ত উত্তেজনা প্রশমিত হবে।

আনার কাতরভাবে বললো—শাহজাদা, তাহলে কি বুঝবো আমি বাদশাহের তৃতীয়পুত্র যুবরাজ খুররমের হেফাজতে নেই, এক দুর্বল, অক্ষম পুরুষের হেফাজতে

আছি, যিনি নিজের হারেমের রমণীর ইজ্জত বাঁচানোয় অক্ষম।

শাহজাদা তবু শান্তকণ্ঠে খানখানানকে বললেন—খাঁ সাহেব, আপনি শান্ত হোন্। এই আওরতকে ছেড়ে দিন। আমি আপনার আনন্দের জন্যে রঙমহলের আসর বসাচ্ছি!

খানখানান শাহজাদার কোন সম্মান রক্ষা না করে বললেন—আপনি যদি সে সম্বন্ধে এতটুকু সচেতন থাকতেন, তাহলে অনেক আগেই ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। এখন এই আওরতকে আমার তাঁবুতে প্রেরণের নির্দেশ দিন, তাহলেই আমি বিশেষ উপকৃত হব।

শাহজাদা বললেন—কিন্তু এই আওরতটিকে ত্যাগ করুন, এর ইজ্জত অন্য ব্যক্তির।

তার মানে?

অর্থ জিজ্ঞেস করবেন না খাঁ সাহেব, আপনি অন্য আওরত আকাঙ্ক্ষা করুন, অবশ্যই পূরণ হবে। কিন্তু এর আশা ত্যাগ করুন।

খানখানান বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে একে আমার শিবিরে পাঠিয়ে আমাকে প্রলোভিত করেছিলেন কেন?

সেটা প্রয়োজনের জন্যে।

খানখানান হঠাৎ শাহজাদার মুখের উপর দম্ভ প্রকাশ করে বললেন—তাহলে আমারও শেষ জবাব শুনে রাখুন শাহজাদা, যদি এই আওরতটিকে আজকের রাত্রের জন্যে আমাকে না দেন তা'হলে আমি আগামী কল্য আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করে যুদ্ধ করবো না। জেনে রাখুন, আপনি আমার বন্ধুত্ব হারালেন।

এই কথা শুনে আনার শব্দ করে কেঁদে উঠে বললো—শাহজাদা স্তব্ধ হোন্। তারপর সে ক্রুদ্ধভঙ্গিতে সেনাপতি খানখানানের দিকে তাকিয়ে বললো—বেশ চলুন। আমার ইজ্জত কোরবানী দিলে যদি শাহজাদা বিপদমুক্ত হন, আমি সে ইজ্জত বাঁচিয়ে রাখতে চাই না। চলুন খাঁ সাহেব আপনার তাঁবুতে। আমার এই দুর্লভ দেহটি গ্রহণ করলে যদি আপনার প্রবৃত্তি দমন হয় তাই করুন—তবে এই বিপদে শাহজাদার বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁকে বিপদগ্রস্ত করবেন না।

খানখানান আর কোন কথা বললেন না, শাহজাদার দিকে খুশিতে তাকিয়ে আনারের অনুসরণ করলেন।

শাহজাদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হতবুদ্ধির মত এই নাটকীয় ঘটনা দেখতে লাগলেন। তিনি যেন কেমন দুর্বল হয়ে গেলেন। তাঁর সমস্ত শরীরের শক্তি যেন অপসারিত হয়ে গেল। তিনি চোখের সামনে দেখতে লাগলেন তাঁর অসম্মান। তার রক্তকে যেন একচুমুকে নিঃশেষিত করে দিল। তাঁর রক্তে যে বংশের গৌরব, সেই গৌরব যেন আজ ধূলায় ধূসরিত। আনারকে নিয়ে যখন খানখানান একেবারে তাঁবুর শেষপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন তখন তাঁর রক্তে হঠাৎ বংশের প্রবহমান ধারা সচেতন হয়ে উঠলো। শিরায় শিরায় জাগলো উত্তেজনা। রোম-কূপ তীক্ষ্ণ হয়ে সমস্ত শরীরে

কি এক অসীম শক্তি সংযোজিত হল। তিনি চীৎকার করে বললেন—খামোশ।

বিরাট দৈর্ঘ্যের তাঁবু। তাঁবুর শেষপ্রান্তে আনার ও খানখানান উপনীত হয়েছিল, শাহজাদার গর্জনে তারা উভয়ে সচকিত হয়ে এদিকে ফিরলো, তারপর তারা শাহজাদার কাছে আবার ভীত হয়ে সরে এলো।

শাহজাদার শিরায় তখন সিংহের রক্ত প্রবাহিত। তৈমুর লং যেন আবার জেগে উঠেছেন তাঁর উত্তমপুরুষের ধমনীতে। সম্রাট বাবর যেন আবার হিন্দুস্থান বিজয়ের জন্যে প্রস্তুত। সম্রাট আকবর শাহজাদার শক্তির সঙ্গে সংযোজিত হলেন। শাহজাদা খুররম সমস্ত দুনিয়ার ভাগ্যবিধাতা হয়ে প্রভুর ভূমিকায় অধিষ্ঠান হয়ে সরোষে খানখানানকে বললেন—এতদূর স্পর্দ্ধা আপনার কোত্থেকে হল? আপনি আমাকে অপমান করে আমারই সামনে থেকে আমার হারেমের আওরত নিয়ে যান? আপনি কি ভুলে গেছেন, আপনি আমার পিতার নফর, আমার পিতার যে নফর সে আমারও তাই। নফরের এই ঔদ্ধত্য ক্ষমাহীন। এর উপযুক্ত শাস্তি মৃত্যুদন্ড। আমি আপনাকে সে শাস্তি দিতাম কিন্তু আপনি আমার একটু উপকার করেছেন বলে আমি আপনার মৃত্যুদন্ড রহিত করলাম।

তারপর আরো প্রচন্ডভাবে চীৎকার করে বললেন—এই মুহূর্তে আপনি আপনার বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে যান। আমি আপনাকে আর দেখতেও ঘৃণা বোধ করি।

খানখানান শাহজাদার ক্ষুব্ধতায় সহসা বিস্মিত হয়েছিলেন, তারপর সেভাব কমলে শ্লেষভরে বললেন—আমি চলে গেলে আপনাকে পরাজয়ের কালিমা গ্রহণ করতে হবে, তা কি ভেবে দেখেছেন?

শাহজাদা পূর্বের মেজাজে বললেন—তবু সে পরাজয় গৌরবের হবে। নিজের পৌরুষ বাঁচিয়ে সম্মান রক্ষা করাই বীরের ধর্ম। আপনার আর কোন কথা শুনতে চাই না, আপনি বেরিয়ে যান।

আনার পূর্বেও ক্রন্দন করছিল, এখনও আবার ক্রন্দন করে বললো—শাহজাদা আপনি আমার জন্যে এ পরাজয় ডেকে আনবেন না। আমার তুচ্ছ জীবনের জন্যে এত বড় ত্যাগ স্বীকার করবেন না।

শাহজাদা অগ্নিদৃষ্টিতে আনারের দিকে তাকিয়ে বললেন—সম্মানই সবচেয়ে বড়। আমি সম্মান রক্ষা করেছি মাত্র। আমার হারেম মানে আমারই সম্মান। অন্তঃপুরে যাও। যদি কখনও আমি অসম্মানিত হই, তখন তোমাদের ইজ্জত সব শয়তানদের দ্বারা লুণ্ঠিত হবে— তার আগে নয়।

খানখানান শাহজাদার ক্ষুব্ধতায় ভীত হয়ে বেশী প্রতিবাদ না করে সরে পড়লেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, শাহজাদা ভাগ্যপীড়িত হলেও তিনি বাদশাহের পুত্র। ঐ উপাধি তাঁর খোদার দান। খন্ডাবে কে? সে কথা স্মরণ করে খানখানান রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলেন। আর আনার শাহজাদার ব্যবহারে অভিভূত হয়ে আনন্দ সাগরে ভাসতে ভাসতে নিজের স্থানে চলে গেল।

পরাজয়ের কালিমা আগেই লেখা হয়েছিল, তাই পরাজিত হতে শাহজাদা খুরম চমকালেন না, অল্প সংখ্যক বাহিনী যা অবশিষ্ট ছিল তা সঙ্গে নিয়ে গোলকুণ্ডা অভিমুখে পলায়ন করলেন। এ আক্রমণে তিনি পরাজিত হয়েছেন বটে কিন্তু উদ্যম হারান নি। তিনি সম্মান রক্ষা করেছেন বলে সাহস তাঁর আরো সঞ্চিত হয়েছে। রণক্ষেত্রে তাঁর বাহিনী যখন বীরবিক্রমে যুদ্ধ করছিল, সেই সময় তাদের মধ্যে কতকাংশ শাহজাদা পারভেজের দলে গিয়ে মিশে শাহজাদা খুরমকে দুর্বল করেছিল। এছাড়া এর আগে সেনাপতি খানখানান ও গুজরাটের শাসনকর্তা তাঁদের বাহিনী নিয়ে পলায়ন করেছেন। তাঁরা এ যুদ্ধক্ষেত্রে কোন পক্ষই অবলম্বন করেন নি।

শাহজাদা যখন গোলকুণ্ডায় পলায়ন করছিলেন সেইসময় মমতাজবিবির পিতা কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন; সেখানেও কিছুসংখ্যক সৈন্য হারিয়ে শাহজাদা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলেন। এখানে একটি ঘটনা ঘটলো। এক সৈনিক শত্রুপক্ষের একজন উচ্চপদস্থ সেনাধ্যক্ষের মুণ্ড কর্তন করে এনে শাহজাদাকে উপহার দিল। সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিল আনারউন্নিসা। কাটামুণ্ডটি দর্শন করে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠে বললো—এ যে আমার পিতা ইব্রাহিম খাঁ! তারপর সে দুই জানু পেতে চোখে অশ্রু নিয়ে আল্লার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়ে বললো—খোদা, মেহেরবান, তুমি তো সবই জানো! আমার পিতার আত্মার জন্যে তোমার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি তুমি তাঁকে শান্তি দিও। তিনি নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে সম্রাজ্ঞীর কৃপাপ্রার্থী হয়েছিলেন, তারপর যা করেছেন প্রভুর উন্নতির জন্যে। তার জন্যে যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে, তাঁর অবস্থা কল্পনা করে তাকে ক্ষমা কোরো।

শাহজাদা খুরম আনারের মানসিক চাঞ্চল্য অনুভব করলেন। তিনি তাঁর দারুন অবস্থার মধ্যেও আনারের জন্যে ব্যথিত হয়ে বললেন—আমি দুঃখিত আনার তোমার পিতৃহত্যার জন্যে। আমি যদি জানতুম তাহলে একাজ কখনও করতে দিতুম না। তোমার পিতা অবশ্য আমার বিরুদ্ধে যথেষ্ট শত্রুতা করেছেন, তাঁর ওপর আমার ক্রোধ ছিল কিন্তু আমার সামনে যদি তিনি পড়তেন তাহলে আমি তাঁকে হত্যা করতাম না।

আনার শোকার্তস্বরে বললো—আমি তো পিতার মৃত্যুর জন্যে কোন দুঃখ করিনি শাহজাদা! তবে আপনি এসব কথা বলছেন কেন?

শাহজাদা বললেন—তুমি না বললেও এই স্বাভাবিক আনার, আমার পিতার মৃত্যু হলেও আমি শোকার্ত হতাম। তুমি যদি শোকার্ত না হতে তা হলে আমি খুব বিস্মিত হতাম।

গোলকুন্ডার পথেই মমতাজের কনিষ্ঠপুত্রের জন্ম হল। সে দিনটি বড় ভয়ংকর দিন ছিল। সেদিন দুনিয়ার মাঝে ঈশ্বরের ক্রুদ্ধভাব বর্ধিত হয়েছিল। চতুর্দিকে প্রলয়ের বহ্নি। ঝটিকার প্রবলবেগে আকাশ-বাতাস মাতামাতি হয়ে এক মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রবল বারিধারার বর্ষণে মাঠ-ঘাট জলমগ্ন হয়ে জলপ্লাবিত ক্ষেত্র পরিলক্ষিত

হল। এ দুর্যোগের অনুভূতি প্রাসাদের মাঝে অবস্থান করে জাফরীর ভেতর দিয়ে উপভোগ করা এক—আর বিরাট উন্মুক্তক্ষেত্রের মাঝে বিস্তৃত আসমানের নিচে তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করা আর এক। তাই শাহজাদার পরিবারবর্গ ও শাহজাদা নিজে উপভোগ করলেন দারুণভাবে সেই দুর্যোগের অবস্থা।

সেই দুর্যোগের মাঝেই পথিমধ্যে অর্থাৎ তাঁবুতেই মমতাজের কনিষ্ঠপুত্র জন্মগ্রহণ করলো। গোলকুণ্ডার পথে যেতে দুর্যোগের ঘনঘটা আসমানে দেখে উন্মুক্তক্ষেত্রে তাঁবু খাটাতে বলেছিলেন শাহজাদা। তখন তিনি জানতেন না, আর এক বিপদ তার জন্যে অন্তরালে অপেক্ষায় আছে।

সেই দুর্যোগের মাঝেই ছুটে এসে সংবাদ দিল বাঁদী—হুজুর একবার অন্তঃপুরে চলুন! বেগম সাহেবা আপনাকে একবার দেখতে চেয়েছেন!

বেগমসাহেবা দেখতে চেয়েছেন শুনে শাহজাদা নিজের গভীর চিন্তার মাঝে চমকিত হয়ে বাঁদীর দিকে চাইলেন। তিনি তখন একদম বুঝতে পারেন নি আসল ব্যাপারটা। বেগমসাহেবা দেখতে চেয়েছেন অর্থ বোধ হয় তার মনে কোন বিপদের আশংকা জেগেছে। বিস্মিত হয়েছেন এই ভেবে, যে বেগমসাহেবা কখনও ডাকেন না, হঠাৎ আজকে কি এমন দুর্ঘটনা তাঁকে বিরুদ্ধ স্বভাবের কাজ করতে বাধ্য করলো?

তারপর বাইরের দুর্যোগের ঘনঘটার দিকে বার বার আতঙ্কে তাকিয়ে বেগমসাহেবার কাছে যাবার জন্যে বাঁদীকে অনুসরণ করলেন। একবারও তাঁর মাথায় এলো না যে, বেগমসাহেবা পূর্ণ অন্তঃসত্ত্বা। যে কোন সময়ে বিপদ আসন্ন হতে পারে। আনার অবশ্য অনেকবারই শাহজাদাকে এই সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল কিন্তু শাহজাদা খুরম তখন অন্তঃপুরের চিন্তার চেয়ে রণক্ষেত্রের চিন্তাতে সময় ব্যয়িত করেছেন। আজও অবশ্য সেই চিন্তাই তাঁর মনে—ভাবছেন সৈন্য দরকার, অর্থ দরকার, নিরাপদ আশ্রয় দরকার—না হলে বাঁচবার উপায় নেই। আর সেই জন্যেই তিনি ত্বরিৎ গোলকুণ্ডার পথে চলেছেন। দুর্যোগের সৃষ্টি না হলে হয়ত এতক্ষণ অনেক পথ চলে যেতেন। কিন্তু দুর্যোগ দেখেই তাঁকে তাঁবু খাটাতে হয়েছে এই অপরিচিত স্থানে। এই দুর্যোগের মাঝে পথ অতিক্রম করতে গেলে পাছে দীর্ঘ বৃক্ষাদির পতনের ফলে লোকক্ষয় হয়, এই ভয়ে তাঁর এখানে অবস্থিতি।

বেগম ছাউনির সামনে যখন সিক্তবসনে গিয়ে পেঁছিলেন, তখন ছাউনির অভ্যন্তরে থেকে সদ্যজাত শিশুর ক্রন্দন ভেসে আসছে। এই সময় আসমানের মাঝে প্রচণ্ড শব্দে বিদ্যুৎ চমকালো, আর সঙ্গে সঙ্গে বাজপড়ার শব্দ হল। আনার এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল—আনার যেন মৃদু হেসে কি বললো—কিন্তু তার একটি কথাও শাহজাদা শুনতে পেলেন না, প্রচণ্ড শব্দের মাঝে আনারের কথাগুলি চাপা পড়ে কবরশায়িত হয়ে গেল।

তবু অনুমানে বুঝলেন শাহজাদা—তিনি একটি সন্তানের পিতা হয়েছেন।

সংবাদটি খুবই শুভ হত যদি তাঁর এই সময়টিও শুভ হত। কিন্তু এই দুঃসময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে শাহজাদা মনে মনে বিরক্ত হয়ে বললেন—কি প্রয়োজন ছিল—এই সন্তানের? যারা আছে, দারা, সুজা, ঔরঙ্গজেব, জাহানারা—এদের শেষপর্যন্ত কি পরিণতি হবে তার কোন ঠিক নেই? আবার নতুন একজন এসে সে দুর্ভাগ্য নিয়ে শুধু আরো দুঃখ সৃষ্টি করতে এলো।

এবার আনারের কথা শোনা গেল। সে উৎফুল্ল হয়ে বললো—শাহজাদা, পুত্রসন্তান এসেছে, দেখবেন, এই পুত্র আপনার জীবনে নতুন আলো দান করবে।

শাহজাদা মনে মনে বললেন—আমার কোন পুত্রই আমাকে দুঃখ দেয় নি, তারা প্রত্যেকেই যখন দুনিয়াতে এসেছে, তখন তারা পিতাকে লাভবান করেছে কিন্তু এ পুত্র সর্বনাশের প্রতীক হয়েই আবির্ভূত হয়েছে। তার সাক্ষী আজকের প্রকৃতির ভীষণ অবস্থা। কিন্তু তিনি মুখে কিছু বললেন না। পরে শুধু ম্লান হেসে বললেন—দুর্যোগ থেমে গেলেও এখন কদিন ছাউনি তুলতে পারবো না!

তারপর চিন্তিত হয়ে বললেন—এই অপরিচিত স্থানে বেশীদিন অপেক্ষা করাও কি উচিত হবে? শত্রু কখন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে কে জানে? তার ওপর আমার সৈন্য প্রায় নিঃশেষ, অশ্বও বেশী নেই। অস্ত্রশস্ত্রও স্বল্প। খাদ্যদ্রব্য শেষ হয়ে এসেছে। এ সময় গোলকুণ্ডায় ফিরে না গেলে জীবন সংশয় হবে। তারপর তিনি বললেন—আমার অন্যান্য সন্তানরা কোথায়?

আনার বললো—তারা পাশের ছাউনিতে ধাত্রী আম্মার কাছে।

শাহজাদা ফিরছেন দেখে আনার কুন্ঠিত হয়ে বললো—একবার বেগমসাহেবার সঙ্গে দেখা করবেন না?

শাহজাদা তির্যক দৃষ্টিতে আনারের দিকে তাকিয়ে বললেন—কেন সে কি আমাকে ডেকেছে?

না তা ডাকেন নি বটে। তবে তাঁর ইচ্ছা আপনার দর্শন একবার পান!

শাহজাদার হঠাৎ একটি কঠিন উত্তর মনে এল কিন্তু তিনি তা সংবরণ করে নিযে কি ভেবে বললেন—বেশ চলো, সবার ইচ্ছাই আমি পূরণ করি।

আনার আর অভ্যন্তরে গেল না, শাহজাদাকে পাঠিয়ে দিয়ে সে বাইরে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখতে লাগলো। সমস্ত দুনিয়া কি এক আক্রোশে প্রতিশোধ নেবার জন্যে ওলোটপালট করে দিচ্ছে। বাতাসের অসম্ভব গর্জন, বৃষ্টির দারুণ বেগ, ক্ষেত্রের চতুর্দিকের মনোরম বৃক্ষশ্রেণী কেমন যেন প্রবল আঘাতের যন্ত্রণায় আছাড়ি পাছাড়ি করে মুক্তি চাইছে। বাতাসের শুধু সেই আর্তনাদ—মুক্তি দাও, যদি কোন অন্যায় করে থাকি, তার কি ক্ষমা নেই? কিন্তু কে মুক্তি দেবে? ক্ষমা যে এই দুনিয়ার বক্ষ থেকে অপসারিত হয়েছে। শুধু ক্রোধের তান্ডব, আর সেই তান্ডবে সমস্ত বিশ্বচরাচর আহত হয়ে ক্ষতবিক্ষত। শুধু যন্ত্রণার আর্তি। আর সেই যন্ত্রনার আর্তনাদ ঐ আসমানের বক্ষ বিদীর্ণ করে বিদ্যুতের চমকের সাথে বাজের শব্দ।

আনার কিন্তু তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব কথা ভাবছিল না, সে তার অন্তঃপ্রদেশে প্রবেশ করে ভাবছিল মমতাজের অবস্থা। বাইরে থেকে এদের দেখলে মনে ঈর্ষার ছোঁয়াচ লাগে কিন্তু ভেতরে ঢুকলে এদের অবস্থা দর্শনে মনে যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। মমতাজবিবি কত বড় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এই শাহজাদার বেগম হয়েছিলেন। অথচ তাঁর কোন অপরাধ নেই। এমন কি তাঁর মত শান্তশিষ্ট সহানুভূতিশীলা রমণী দুনিয়ার দুর্লভ। কিন্তু নিজের পিতার জন্যে তিনি আজ শাহজাদার অবহেলার পাত্রী। কেন এই অবহেলা, কেন এই অশ্রদ্ধা—একবার এই রমণী জিজ্ঞেস করেন না। এমন কি নিজের মানসিক বেদনাও মুখের ওপর রেখাঙ্কিত নেই, যার জন্যে বোঝা যাবে—তাঁর অবস্থা। জিজ্ঞেস করলে শুধু হাসেন, বলেন—বহিন ওসব কথা থাক্। তিনি স্বামী, তাঁর কোন সমালোচনা করতে নেই।

আজ যখন খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন, আনার জিজ্ঞাসা করলো—শাহজাদাকে একবার সংবাদ দেব! তিনি হাত নেড়ে বললেন—না থাক্। কিন্তু এই 'না থাক' এর মধ্যেই প্রকাশ হল তাঁর মনের প্রবল ইচ্ছাটি।

আনার তাই ভাবতে লাগলো—জীবনে নিজের সুখের জন্যে শুধু পাগল হয়ে ঘুরেছি, কিন্তু এই রমণীর প্রেরণায় আজ বুঝতে পেরেছি—যা পাবার তা বিনা আয়াসেই পাওয়া যাবে, যা পাওয়া যাবে না, তার জন্যে প্রাণের চাহিদা থাকলেও শুধু উদ্যমই বাড়ে—মেলে না কিছু।

এইসময় শাহজাদা তখন মমতাজের শয্যাপার্শ্বে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে আছেন। মমতাজ শয্যার মাঝে নিস্তেজ হয়ে শুয়ে, পাশে সদ্যজাত শিশু। সদ জাত শিশু নয় একটি সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপ।

মমতাজ শাহজাদাকে দেখে ম্লানহাসি প্রকাশ করলেন।

শাহজাদা অনেকদিন পর মমতাজকে দেখলেন। হ্যাঁ অনেকদিন পরই। এতদিন শুধু এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছেন, কেন চলেছেন তিনি তা জানেন না। বিদ্রোহ শুরু হবার পূর্বে সেই মান্ডু দুর্গের একটি রাত্রেই মমতাজের সঙ্গ ত্যাগ করেছেন। তারপর নানা যুদ্ধবিগ্রহে, হট্টগোলে ভুলেছেন অন্তঃপুরের সঙ্গ। আনার ছাড়া এই অন্তঃপুরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই শাহজাদার ছিল না।

আজ মমতাজকে অনেকদিন পর দেখে হঠাৎ তাঁর আকস্মিকভাবে মনে এল—তিনি আশ্রয়ের সন্ধানে সমস্ত হিন্দুস্থান পর্যটন করে বেড়াচ্ছেন—কিন্তু এই অন্তঃপুরের মাঝে মমতাজের ঐ শয্যাই তাঁর একমাত্র সান্ত্বনার আশ্রয়। ঐ শয্যার মাঝে মমতাজের বক্ষের সান্নিধ্যে নিজেকে সঁপে দিতে পারলেই যেন আর কোন চিন্তা থাকে না। তবে তিনি এতদিন ধরে কেমন করে এই সান্ত্বনার আশ্রয় ভুলে থাকলেন? কেমন করে ভুলে অবহেলা করলেন এই নীরব মানুষটিকে? সে তো কোনদিনও নিজের অধিকার প্রদর্শন করিয়ে দাবী আদায়ের চেষ্টা করে নি! করে নি বলেই কি তিনি তাকে বার বার আঘাত হেনেছেন!

মমতাজকে সেইমুহূর্তে তাঁর অনেক কথা বলতে ইচ্ছা করলো, —আমি

আহাম্মক। আসল কোহিনুরের সম্মান তুচ্ছ করে নকলে মেতে আছি। আরো বলতে ইচ্ছা করলো— মমতাজ, তুমি আঘাত কর, তুমি রক্তাক্ত কর—কিছু শোণিত আমার দেহাভ্যন্তর থেকে বের হয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হব। অন্ততঃ বুঝবো, আমার অপরাধের শাস্তি আমি পেয়েছি।

শাহজাদার চোখ দিয়ে জল ঝরলো।

মমতাজ তাই দেখে নিস্তেজকণ্ঠে বললো—শাহজাদা, বাইরের দুর্যোগ কি থামবে না? তুমি গোলকুণ্ডায় গিয়ে না পেঁছিলে তো অসুবিধায় পড়বে!

হঠাৎ শাহজাদা আর নিজেকে রোধ করতে পারলেন না, যে চোখের জল স্রোতের আকার নিয়েছিল, তা প্রবলবেগে বের হয়ে এলো চোখের দুই ধার দিয়ে। চীৎকার করে বললেন—না না মমতাজ, আমার প্রয়োজন নেই গোলকুণ্ডায় গিয়ে। আমি বাদশাহের কাছে বশ্যতা স্বীকার করবো। বলবো, আমার ধনদৌলত, জাগীর কিছু চাই না। আমি সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চাই না। শুধু আমাকে একটি থাকবার জন্যে প্রাসাদ দিন, আমি সেই প্রাসাদে আমার মমতাজ ও সন্তানদের নিয়ে সাধারণ জীবনযাপন করবো। যে দৌলতের লোভে, প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্যে আমি আমার প্রিয়তমা বেগমকে ভুলি, সে প্রতিপত্তিতে আমার দরকার নেই।

মমতাজ শাহজাদার হাতটি হাত বাড়িয়ে ধরলেন, তারপর শান্ত কণ্ঠে সান্ত্বনার বাক্যে বললেন—ছি এরকম ভেঙে পড়ছো কেন? আমি তো তোমাকে কিছু বলি নি!

শাহজাদা চুপ করে মমতাজের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন!

আর মমতাজ শাহজাদার হাতের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগলেন—তুমি বাদশাহের পুত্র, তোমার কি দুর্বলতা সাজে? গোলকুণ্ডায় যত তাড়াতাড়ি পেঁছিতে পারো তার ব্যবস্থা কর। সেখানে গিয়ে সৈন্য যোগাড় করতে হবে, অস্ত্র যোগাড় করতে হবে। খাদ্য, অশ্ব—অনেক কাজ তোমার।

শাহজাদার মনে সান্ত্বনা সৃষ্টি হচ্ছিল না, তিনি যেন মমতাজের সান্ত্বনায় বার বার লজ্জিত হয়ে তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছিলেন। মমতাজ যত তাঁকে স্তোকবাক্য শোনাতে লাগলেন, শাহজাদা তত শিশুর মত হয়ে যেতে লাগলেন। এতদিন মমতাজের ওপর অবিচার করে যে অন্যায় করেছেন, তারই শাস্তি যেন তিনি পেলে খুশি হতেন। কিন্তু শাস্তি না পেয়ে মমতাজ পরিবর্তে তাঁকে সান্ত্বনা জ্ঞাপন করতে তাঁর অপরাধগুলি যেন আরো জ্বলন্ত হয়ে উঠলো। তিনি হঠাৎ বললেন—জানো, আমি তোমায় অবিশ্বাস করেছি!

মমতাজ হাসলেন, বললেন—অন্যায় কি? পিতা অপরাধী জেনে তাঁর কন্যাকে কেই বা বিশ্বাস করতো?

কিন্তু তুমি তো কোন অবিশ্বাসের কাজ কর নি?

হয়ত করতাম, তোমার ক্ষুব্ধতায় ভীত হয়ে হয়ত সাহস করিনি!

শাহজাদা বিস্ময়ে বললেন—এ তুমি কি বলছো মমতাজ?

মমতাজ হাসলেন, বললেন—খারাপ লাগলেও এই সত্য।

তাহলে আমি কি কোনো অপরাধ করিনি ?

মমতাজ বললো—আমারতো মনে হয় কোন অপরাধই হয়নি। তুমি মিছে দুঃখ পেয়ে কষ্ট পাচ্ছো। বরং আমার কথা ভুলে গিয়ে তুমি সত্বর গোলকুণ্ডা অভিমুখে যাত্রা করার ব্যবস্থা কর।

শাহজাদা হঠাৎ সদ্যজাত শিশুর দিকে তাকিয়ে বললেন—দুচারদিন এখানে অবস্থান না করলে কি পথশ্রম সহ্য করতে পারবে ?

মমতাজ ভীত হয়ে বললো—না না, সে চেষ্টা কর না শাহজাদা, তুমি শক্তিহীন জানলেই বাদশাহী ফৌজ এসে তোমাকে আক্রমণ করবে। পথশ্রম অসহ্য হলেও সহ্য করে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে। এবং সেখানে গিয়ে আবার সৈনা সংগ্রহ করে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে।

শাহজাদা তবু বললেন—কিন্তু তোমার শরীর অসুস্থ জেনেও যদি ছাউনি তুলি, সেটা কি ভাল হবে ?

মমতাজ হঠাৎ কাতর হয়ে বললো—এতদিন আমাব কথা ভুলে থেকে যদি এতদূর এগিয়ে এলে, তবে আজ কেন আমার কথা ভেবে তুমি পিছিয়ে যাচ্ছো ? তুমি কি আমাকে সেইরকম তোমার বেগম ভাবো ? তুমি কি জানো না, যোগ্য বেগমের কর্তব্য স্বামীকে দুর্বল না করে শক্তি সঞ্চয়ে স্যাহায্য করা ?

শাহজাদা খুরম বেরিযে এলেন মমতাজের তাঁবু থেকে। সেদিন তিনি বেরিয়ে এসে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন—মমতাজের মনে কষ্ট দেবার মত কোন কাজ তিনি জীবনে করবেন না। সে তাঁর শুধু বেগম না, বিপদের বন্ধুও বটে !

আজ যখন এক এক করে সকলে তাঁর কাছ ছেড়ে চলে গেল, মমতাজ সেখানে তাঁকে অনেক বড় সান্ত্বনা প্রদান করলো।

তবু গোলকুণ্ডা পথে আবার তাঁকে পাড়ি দিতে আবো চারদিন সময় লাগলো। এই চারদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগ একই অবস্থায় থাকলো বলে শাহজাদাকে সেখানেই অপেক্ষা করতে হল। সেখানে অপেক্ষা করেও বহু বিপদের তাঁকে সম্মুখীন হতে হল। প্রচন্ড জলস্রোতে বেগে ছাউনির মধ্যে জল ঢুকলো। ঝড়ের প্রবল দাপটে কটি তাঁবু ছিটকে অন্যদিকে চলে গেল। কটি অশ্ব একনাগাড়ি জলে ভিজে অর্ধমৃত হয়ে গেল। শাহজাদার জ্যেষ্ঠপুত্র দারার প্রচন্ড জ্বর হল। সে সেই জ্বরে কদিন অজ্ঞান, অচৈতন্য থাকলো। বিনা চিকিৎসায় তাকে ফেলে রাখতে হল চারদিন। উনুন জ্বালার অভাবে ফলাহার ছাড়া সকলকেই একরকম অনাহারে

থাকতে হল। মমতাজের সদ্যজাত পুত্র ও সে নিজে দুর্বল দেহ নিয়ে তাঁবুর মধ্যে বহুকষ্টে দিন কাটাতে লাগলো।

আর শাহজাদার কথা না বলাই ভাল। বাদশাহের পুত্র, বহু বিলাসের মধ্যে মানুষ। তাঁকে এই পথিমধ্যে দুর্যোগের মাঝে যে উদ্বেগ নিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হল, তা বলবার নয়। তিনি নিজের জন্যে ভাবছিলেন না, ভাবছিলেন তাঁর সঙ্গে যারা আছে।

এখনও কিছু লোক তার কর্তৃত্ব মেনে এখানেই অবস্থান করছে। তবে বড় বড় আমীর যারা তাদের কেউ কেউ যুদ্ধে মরেছে, কেউ পলায়ন করে বাহাদুরী দেখিয়েছে। দেওয়ান আফজল খাঁর মৃত্যুটি বড় অদ্ভুত। তাঁকে কে একদিন গুপ্তহত্যা করে গেলো। তখন শাহজাদা বুর্হানপুরে মহাবত খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। সেই সময় একদিন সন্ধ্যার পর এই দুর্ঘটনা ঘটলো। আফজল খাঁর হত্যাকারীকে শাহজাদা অনেক খুঁজেছিলেন কিন্তু তার সন্ধান করতে পারেন নি। ঐ প্রবীন ব্যক্তিটি মরে যেতে শাহজাদা বড় কষ্ট পেয়েছিলেন। পিতৃহীন পুত্রের পিতার মত একজন অভিভাবক সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তাঁর লোকান্তরিতে শাহজাদা হতবুদ্ধি হলেন।

মান্ডুদুর্গ থেকে যখন অভিযান শুরু করেছিলেন তখন লোক ছিল তাঁর সঙ্গে অনেক, আজ গোলকুণ্ডায় যখন পরাজিত হয়ে পলায়ন করছেন তখন তাঁর শিবির শূন্য। যে কজন লোক তাঁর সঙ্গে আছে, একজন বিদ্রোহী শাহজাদার কাছে সে কটি লোক কেউ দেখলে হাসবে। অন্তঃপুরে ছিল অসংখ্য বাঁদী, নর্তকী, খুবসুরত অনেক আওরত। এগুলি অন্তঃপুরের শোভার জন্যে রাখা ছিল, তারা বেগতিক দেখে সুবিধামত সুযোগ পেয়ে পলায়ন করেছে। গুজরাটের শাসনকর্তা যেমন সাহায্য করতে এসেছিলেন, যাবার সময় হারেম থেকে কটি আওরতকে চুরি করে নিয়ে চলে গেছেন। শাহজাদা জেনেও তাদের বাধা দেন নি। এই জন্যে যে, যারা যেতে চায়, তাদের ধরে রাখা যাবে না বলেই বাধা দেন নি।

এই চারদিন ধরে তাঁবুর মধ্যে কর্মহীন জীবনে শুধু এই সব কথা ভেবে যাতনাই ভোগ করেছেন। আস্তে আস্তে দীপ নিভে আসছে। এ দীপ আর জ্বলবে না। বাদশাহের প্রাসাদ কক্ষেই সেই অত্যুজ্জ্বল ঝাড়ের হাজারো বাতি নিভে গিয়ে একটি তৈলহীন প্রদীপও জ্বলবে না। ভাগ্যহীন শাহজাদার জন্যে কে দীপ জ্বালবে? দুনিয়া যে বড় আহাম্মকের জায়গা। এখানে মমতার স্থান কোথায়? এখানে দুঃখীর স্থান কোথায়? এ যে দৌলতের জায়গা। এখানে যার দৌলত আছে তারই সামনে রোশনাই আছে। যার দৌলত নেই সে রোশনাই হারিয়ে অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। তার দিকে কেউ ফিরে দেখবে না।

আর শাহজাদার একদিন সব ছিল, আজ তিনি নিঃস্ব। সেই নিঃস্বর ওপর নির্যাতন যে বেশি। দুনিয়া বলবে এই সর্বহারা ভাগ্যহীন মানুষটির ওপর এই-বার অত্যাচার চালাও। কারণ এর চারিদিকে আগে যে পরিখা ছিল, সে পরিখা এখন লোপ পেয়েছে। এখন একজন ফকিরের চেয়েও এর মূল্য কম। ফকিরের

কিছু ছিল না, তাই তার ওপর অনুগ্রহ জাগা স্বাভাবিক কিন্তু অহঙ্কারী মানুষটির সব ছিল; তার যখন দুনিয়ার পরম সৌভাগ্য ছিল, সে তখন অত্যাচার চালিয়েছে। এবার তার ওপর অত্যাচার চালাবার আমাদের সময় এসেছে। আক্রমণ কর, ধ্বংস কর, রক্তাক্ত কর। বক্ষবিদির্ণ করে কলিজা ছিঁড়ে নাও। তাঁকে বাঁচতে দিও না। ঈশ্বরকে ডাকতে দিও না। তার কোন প্রার্থনা শুনো না।

দুর্যোগের তৃতীয়দিন রাত্রে শাহজাদা হঠাৎ দুঃস্বপ্ন দেখে দারুণ চিৎকার করে পালঙ্ক থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

সেই চীৎকার শুনে অন্তঃপুর থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় বাঁদীরা ছুটে এল, অবশিষ্ট যে খোজা প্রহরীরা ছিল তারা ছুটে গেল, সৈনিকরা জেগে উঠলো, আনার সংবাদ পেয়ে ছুটলো পিছু পিছু।

শাহজাদাকে মাটি থেকে তুলে জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হল। তিনি জ্ঞান ফিরে পেয়ে চারিদিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন দেখতে লাগলেন!

আনার জিজ্ঞেস করলো—আপনার কি হয়েছিল শাহজাদা?

শাহজাদা কোন কথার উত্তর দিলেন না, শুধু হাত নেড়ে সকলকে যেতে বলে তিনি চোখ বুঝলেন।

সে রাত্রের পর পঞ্চম দিন সকালে দুর্যোগ অপসারিত হল। ঝলমলে দিনের আলো প্রতিভাত হল। সূর্য উঠলো পূর্ণ গগনে। চারদিন অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকবার পর সূর্য উদিত হতে যেন নবপ্রভাত ঘোষিত হল। পাখী ডাকলো আনন্দস্বরে। ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রকৃতির মাঝে আলোর বর্ণাঢ্য ছড়ালে দেখা গেল তার বীভৎসতা। শিহরিত হল সকলে সেই দৃশ্য দেখে। যে সমস্ত বৃক্ষাদি তখনও প্রাণধরে রাখবার ক্ষমতা আহরণ করেছিল, তারা এই পরিবর্তনে আনন্দিত হয়ে পত্রমূলে দোলন জাগিয়ে নতুন দিনকে স্বাগত জানালো।

প্রকৃতি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। বিশেষ করে পক্ষীদল। এই কদিন তারা যে কোথায় ছিল, বোঝা মুস্কিল। হঠাৎ তারা আবির্ভূত হয়ে বৃক্ষের ডালে ডালে লাফালাফি করে গান শুরু করে দিল।

দুর্যোগ অপসারিত হতে শাহজাদা আর বিলম্ব করলেন না, তাঁবু তোলার ব্যবস্থা করলেন। যদিও তাঁর শরীর খুব ভাল ছিল না, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দারার তখনও জ্বর কমেনি, তবু তিনি আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। দ্রুতগামী এক অশ্বারোহীকে আসীর দুর্গ থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য আনার জন্যে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি আবার বাহিনী নিয়ে গোলকুণ্ডার পথ ধরলেন।

আরো কয়েকদিন পর যখন গোলকুণ্ডায় পেঁছিলেন তখন তার নিজের অবস্থা সঙ্গীন। কিন্তু কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করে শাহজাদা খুরম খাদ্য ও সৈন্য সংগ্রহে মন দিলেন, যখন তিনি এই কাজে ভীষণ ভাবে লিপ্ত—সেইসময় তাঁর কানে সংবাদ এল, বিরাট বাদশাহী ফৌজ চতুর্দিক থেকে ছুটে আসছে তাঁকে আক্রমণ করার জন্যে।

শাহজাদা বিপদ বুঝলেন। আর অপেক্ষা করা সমীচীন না মনে করে দ্রুত আস্তানায় ফিরে গেলেন এবং মাত্র কম সংখ্যক অনুচর সঙ্গে নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে ছুটিয়ে দিলেন অশ্ব উর্ধ্বশ্বাসে উড়িষ্যার দিকে! এইসময় মমতাজকেও অশ্বপৃষ্ঠে উঠতে হল। এবং মমতাজের সঙ্গে অন্যান্য জেনানাদেরও। সে এক বিশ্রী শোচনীয় পরিণাম। শাহজাদার পুত্রকন্যাগুলিকে নিয়ে গোল বাধলো। তারা কিছুতেই অনুচরদের হেফাজতে অশ্বের পিঠে উঠবে না। তাদের ইচ্ছা নিজেরা এক একটি অশ্ব পিঠে উঠে সুদূর পথ অতিক্রম করবে।

শাহজাদা ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি তখন বাতাসে শুনতে পাচ্ছেন অশ্বক্ষুরের বিচিত্রধ্বনি। বাদশাহ সৈন্য যে খুব দূরে নয় বুঝে হুকুম দিলেন অবাধ্যপুত্রদের ত্যাগ করতে।

কিন্তু আনাব ছুটে এসে তাদের কাছে নিয়ে শান্ত করে সে যাত্রা রক্ষা করলো।

গোলকুন্ডায় সৈন্যও সংগ্রহ হল না। গ্রহণ করা হল না এতটুকু বিশ্রাম। প্রায় ত্রিশটি অশ্ব আবার ছুটে চললো পর্বত, উঁচু টিলা, নদী, নালা, উন্মুক্তক্ষেত্র পার হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে। শাহজাদা যদি একবার শান্ত মস্তিষ্কে চিন্তা করতেন, তাহলে এই বিপদজনক সুদূর পাড়ি কিছুতে তিনি দিতেন না। কিন্তু তাঁর তখন সমস্ত চেতনা লোপ পেয়েছে। অর্ধচেতনার মধ্যে শুধু মনে আছে সৈন্যসংগ্রহ করতে হবে, শক্তি বর্দ্ধিত করতে হবে, বাদশাহের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। পরাজয় নয়। কলঙ্ক নয়! যদি এর জন্যে মৃত্যুও আসে তবু থামলে চলবে না।

বিশ্রাম নেই। ক্লান্তি প্রকাশের কোন অবসর নেই। ত্রিশটি কাবুলী অশ্ব ছুটে চলেছে বাংলা মুলুকে। শাহজাদা বাংলা মুলুকে চলেছেন কেন জিজ্ঞেস করলে কোন উত্তরই মিলবে না। তিনি আশাবাদী। চিরকাল আশার ওপর নির্ভর করে জীবনধারণ করেছেন, সেই আশাই মনে পোষণ করে পলায়ন করছেন বাংলায়। কারণ বাদশাহ এখন লাহোরে। লাহোর থেকে হুকুম গিয়ে বাংলায় পড়তে পড়তে তাঁর কার্য উদ্ধার হয়ে যাবে। উড়িষ্যায় আছে তাঁর পরিচিত লোক। সেখানে গেলে অন্ততঃ কিছু সৈন্যসংগ্রহ করা যাবে। অস্ত্রশস্ত্রও মিলবে কম নয়। তাছাড়া সামনে আছে পাটনায় রোটাস দুর্গ। রোটাস দুর্গ অধিকার করে লুঠ করবার লোভ দেখালে অনেক লোক সংগ্রহ হবে। সেই সুযোগে শাহজাদা শক্তিবৃদ্ধি করে নেবেন।

এই মানসে জীবনপণ করে শাহজাদা ছুটে চললেন উড়িষ্যার পথে।

উড়িষ্যাতে একদিন পৌছিলেন। সেখানে একজন বন্ধু পেলেন, পূর্বে বাদশাহী সেনাধ্যক্ষ ছিল, এখন বিতাড়িত—নাম বুলন্দ শেখ বাহাদুর। বুলন্দের সাহায্যে অনেকগুলি সৈন্য সংগ্রহ হল। রোটাস দুর্গ লুঠ হবে ঐ লোভে।

সেদিনের বৃহৎ সেই রোটাস দুর্গ ইতিহাস বিখ্যাত। সকলেই জানতো ঐ দুর্গে আছে হাজার হাজার ধনদৌলত। ঐশ্বর্যমন্ডিত রোটাস দুর্গ শাহজাদা লুঠ করবেন শুনে বহু শক্তিশালী লোক তার দলভুক্ত হল। তাছাড়া বুলন্দের অদ্ভুত চেষ্টায় ও শাহজাদার সুনামে অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ হল।

আবার শাহজাদার বাহিনী পুষ্ট হল। তিনি আবার শক্তি পুনরুদ্ধার করে উচ্চ বেদীমূলে আসীন হলেন। বিরাট এক বাহিনীর পরিচালক হয়ে ছুটে চললেন পাটনা অভিমুখে সেই বহু প্রাচীন রোটাস দুর্গ আক্রমণ করতে।

একদিন দুনিয়ার চিহ্নিত শুভলগ্নে রোটাস দুর্গ আক্রমণ করলেন। তাঁর বিরাট বাহিনী দেখে দুর্গের অধিপতি সসম্মানে দুর্গ ত্যাগ করে দাঁড়ালেন। একরকম বিনা রক্তপাতেই রোটাস দুর্গ শাহজাদার অধিকারভুক্ত হল। দুর্গ লুঠ হল সৈনিকদের দ্বারা। এত প্রচুর ধনরত্ন দুর্গে ছিল যে লুঠ করেও শাহজাদার ভাগে যা পড়লো তা অপর্যাপ্ত।

শাহজাদা নিজের পরিবারবর্গকে সেই দুর্গে স্থান দিয়ে ভাবতে লাগলেন—এবার এখানে বিশ্রাম নেবেন কিনা? কিন্তু খোদা তাঁর নসীবে বোধ হয় বিশ্রাম লেখেন নি।

সংবাদ ছুটে এলো বাদশাহী ফৌজ এলাহাবাদের কাছে এসে শিবির সংস্থাপিত করেছে। শাহজাদা খুরম আর কালবিলম্ব না করে পরিবারবর্গকে দুর্গে রেখে, দুর্গ রক্ষীর দ্বারা সুরক্ষিত করে বাহিনী নিয়ে ছুটলেন এলাহাবাদ অভিমুখে।

শাহজাদার নিজস্ব যে সৈন্যদল ছিল, তারা পলায়িত। এখন যে সৈন্যদল তিনি গঠন করেছিলেন, সেগুলি সুশিক্ষিত নয়। লোভে পড়ে শাহজাদার দলে এসে যোগ দিয়েছে। তরবারী ধরতে পারে না, এমন লোকও শাহজাদার সৈন্যদলে ছিল। শাহজাদা সেই অশিক্ষিত বাহিনী নিয়ে সুশিক্ষিত বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে পারবেন কেন? তাই অতি সহজে পরাজিত হলেন এবং পরাজয়ের কালিমা মেখে হতোদ্যম হয়ে রোটাস দুর্গে ফিরে এলেন। যে বাহিনী নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন, প্রায় তার চারভাগের তিনভাগ বাদশাহী সৈন্যের হাতে মার খেয়ে ভূতলশায়ী হল। তিনি যখন রোটাসে প্রত্যাবর্তন করলেন, তাঁর সঙ্গে যারা ছিল তাদের তিনি বিরক্ত হয়ে বিদায় দিলেন।

আবার শাহজাদা অকূলে ভাসলেন। আর কোন উপায় নেই। বশ্যতা স্বীকার করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। পিতার কাছে হাতজোড় করে মিনতি জানিয়ে বলতে হবে—পিতা, ক্ষমা করুন! ক্ষমা যদি না করেন, অপরাধীর শাস্তিবিধান করে দুনিয়াতে উজ্জ্বল নামের মহিমা রক্ষা করুন। এ ছাড়া পথ নেই।

এ ছাড়া পথ নেই। সমস্ত উদ্যম, সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ। রোটাস দুর্গের সবচেয়ে অন্ধকার কক্ষে শাহজাদা নিজেকে এবারে অন্তরীণ করলেন। দুনিয়ার অপূর্ব আলোর কাছ থেকে চিরতরে মুক্তি নেবার জন্যে কক্ষের দরজা রুদ্ধ করে অধোবদনে মুখ ঢাকলেন। সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা তাঁর চিরতরে লুপ্ত। এখন নতুন করে বাহিনী তৈরী করবার কোন উদ্যম নেই। বিদ্রোহ তার জীবনে শেষ হয়ে গিয়েছে। তিনি বুঝেছেন বাদশাহের সঙ্গে পারা তাঁর কর্ম নয়! বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে লড়তে গেলে বিরাট সাম্রাজ্যের সাহায্য না পেলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তার সাক্ষী তো দেখলেন এতদিন। শুধু বেদনা ছাড়া মিললো না কোন সুখ।

সমস্ত হিন্দুস্থানের লোক তাঁকে নিয়ে আলোচনা করছে। তাঁর সম্বন্ধে নানান সমালোচনা করে তাঁর বীরত্বের ওপর অভিসম্পাত জ্ঞাপন করছে। বলছে—বাদশাহ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে গিয়ে শুধু নাজেহাল হয়নি, পেয়েছে উচিত শাস্তিই। অথচ তারা তো জানে না, শাহজাদা খুরম কেন এই বিদ্রোহ ঘোষণা করতে গিয়েছিলেন। তিনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে কম দুঃখ ভোগ করেন নি। কতদিন তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে তারপর অপারগ হয়ে এই বিদ্রোহ করেছেন। তিনি যদি বিদ্রোহ না করে বশ্যতা স্বীকার করতেন, তা হলে কি তাঁর পৌরুষ রক্ষা হত? লোকে যখন আসল কাহিনী শুনতো, বলতো—কাপুরুষের পুত্রের ঠিকই অবস্থা হয়েছে। আর তাছাড়া ওদিকে নুরজাহানের দলেরা তাঁর জীবন-হানি করবার চেষ্টা করতো। এখন মনে হচ্ছে, সেদিন এই জীবন গেলেই বোধ হয় ভাল হত, তাহলে এই নিদারুণ লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলতো।

আজ যে দারুণ লজ্জা। বার বার পরাজয়। তিনি যেদিকে যাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহী ফৌজ তাড়া করে তাঁকে নাস্তানাবুদ করে তুলছে। তাঁর পরিকল্পনা তৈরী করতে সময় লাগছে কিন্তু পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। শক্তি যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ সে শক্তি অপব্যয় করে বার বার মাথা তোলবার চেষ্টা করেছেন। আজ সে শক্তিও শেষ, সঙ্গে সঙ্গে উদ্যমও শেষ।

এখন হয় মৃত্যু, নয় পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে পত্র লেখা। 'পিতা বাঁচবার ক্ষমতা দিন। থাকবার আশ্রয় দিন। আহারের জন্য খাদ্যবস্তু দিন। আমার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। আমি নিঃস্ব হয়েছি। ঐশ্বর্যমণ্ডিত দুনিয়ায় স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে আজ আমি মুসাফির। পথে পথে ঘুরছি। আপনার পুত্র বলে আর নিজেকে গর্বিত করবো না। আমি এখন সে সৌভাগ্য হারিয়ে আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।'

আর সঙ্গে সঙ্গে সম্রাজ্ঞী বাদশাহকে বলে তাঁর অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন। আর সেই অনুগ্রহ নিয়ে শাহজাদাকে বেঁচে থাকতে হবে।

না, না, না, সে অসম্ভব। তার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়। শাহজাদা খুরম মৃত্যুর জন্যে তৈরী হলেন। সহজ অবস্থায় মৃত্যু আসবে না বলে তিনি বদ্ধকক্ষে বসে প্রচুর সরাব পান করতে লাগলেন।

বাইরের কেউ তখনও জানলো না। শাহজাদা খুরম মৃত্যুর জন্যে তৈরী হচ্ছেন। এমন কি তাঁর বেগম মমতাজ পর্যন্ত জানলেন না। মমতাজ অবশ্য শাহজাদার কথা ভাবছিলেন কিন্তু তিনি কিছুতে ভাবতে পারেন নি শাহজাদার অবস্থা এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে। তিনি ভেবেছিলেন, হয়ত আবার সৈন্য সংগ্রহের জন্যে দুর্গের কোথাও না কোথাও বসে শাহজাদা মন্ত্রণার আসর বসিয়েছেন।

সংবাদটা শুনলেন অনেক পরে। বাঁদী এসে খবর দিল, রক্ষী এসে খবর দিল। আনার উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে খবর দিল। চারিদিকে কেমন যেন একটা হুলুস্থুল পড়ে গেল।

দুর্গ অধিকারের পর দুর্গের কক্ষগুলি পূর্ণ করে আবার শাহজাদার সংসার সাজানো হচ্ছিল। বেগমমহল, নর্তকীমহল, বাঁদীমহল, খাসমহল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্নভাবে বিভক্ত হয়ে নতুনরূপ সৃষ্টি হচ্ছিল।

সেইসময় এই সংবাদ।

বিস্তারিত ঘটনাটি পেশ করলো সেই আনার। আনারউন্নিসা বিবি। যে এই পরিবারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল।

সে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো—কি হবে বেগমসাহেবা?

মমতাজের স্বভাবের মধ্যে কোন উচ্ছ্বাস ছিলনা। শত বিপদেও তিনি কখনও উত্তেজনা পোষণ করতেন না। তবে বিপদের তারতম্যের ওপর পরবর্তী কর্মধারা তাঁর নির্বাচিত হতো, তবে সে শান্তগতিতে। এখানেও তেমনি শান্তস্বরে বললেন—কি হয়েছে বহিন, আগে পেশ কর—তারপর প্রতিকারের চিন্তা করবো।

তখন আনার বললো—শাহজাদা শেষপ্রান্তের একটি অন্ধকারকক্ষে প্রবেশ করেছেন। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ। অনেকক্ষণ তার মধ্যে ঢুকেছেন। বের হচ্ছেন না বলে রক্ষী খবর দেয়। আমি অনেকক্ষণ ডেকেছি, প্রহরীরা অনেকেই ডেকেছে, বাঁদীরাও ডেকেছে—তবু কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

মমতাজ উদ্বিগ্নতা প্রকাশ না করে বরং পুনরায় শান্তকণ্ঠে বললেন—হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন! ঘুম ভাঙলে দরজা খুলবেন।

আনার অস্থির হয়ে বললো—না বেগমসাহেবা, আমার যেন কেমন ভয় করছে! শাহজাদার মানসিক অবস্থা ভাল নয়, হয়ত তিনি—? আনার কথা শেষ না করে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়লো। তারপর অধীর হয়ে বললো—বেগমসাহেবা, আমার কেমন যেন ভয় করছে! শাহজাদা বুঝি পরাজয়ের কলঙ্ক সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন?

আত্মহত্যা! মমতাজের সংযমী দেহটা হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠলো। তাঁর অন্তরাত্মা চীৎকার করে মাথা নেড়ে বললো—না না এ অসম্ভব। শাহজাদা এত নীচে! শৌর্যের বীর্যের যিনি অধীশ্বর! বাদশাহ জাহাঙ্গীর থাঁর যিনি গর্ব! যিনি মেবার, দাক্ষিণাত্য বিজয়ী বীর—তিনি আজ আত্মহত্যা করে দুনিয়া থেকে চলে যেতে চান! আর ইতিহাসকার তাঁর জীবনীতে লিখবেন—নিজের শক্তি ও সাহস পর্যাপ্ত ছিল না বলে শাহজাদা খুরম একান্ত বাধ্য হয়ে আত্মহত্যা করে পালিয়েছেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহের পুত্র শাহজাদা খুরম রোটাস দুর্গে তাঁর স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের ফেলে রেখে একান্ত অসহায়ের মত মৃত্যুকে বরণ করেছেন! মমতাজ একই কথা কতবার মনে মনে রোমন্থন করলেন, ততবারই তাঁর মধ্যে অবিশ্বাস এসে তাকে শুধু 'না না' বলাতে লাগলো। তিনি নিমেষে কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠলেন। সমস্ত পরিস্থিতিটা চিন্তা করারও অবস্থা থাকলো না, পাশে দাঁড়িয়েছিল জাহানারা। জাহানারার কোমল কাঁধটি ভর করে শুধু শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর এক সময় ভীষণ ব্যস্ত হয়ে আনারকে বললেন—আমাকে সেই কক্ষের দরজার কাছে নিয়ে চলো বহিন, যদি সেরকম

কোন দুঃসংবাদ শুনি তাহলে আর এই কক্ষে ফিরবো না, আমি স্বামীর সঙ্গে দেহত্যাগ করবো। শুধু তোমাকে আমার মিনতি—তুমি আমার পুত্রকন্যাদের লাহোরে বাদশাহের কাছে পাঠিয়ে দিও।

আনার অবাক হয়ে মমতাজের অস্থিরতা লক্ষ্য করছিল। সে ভাবছিল—এই মানুষটি কত শান্ত ও সংযত স্বভাব ধারণ করেন, আবার সেই স্বভাব পরিবর্তিত হলে কিরকম অন্য মানুষ হয়ে যান। সে বেগমসাহেবার কথায় সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললো—হয়ত আমার আশংকা অমূলক বেগমসাহেবা। শাহজাদা হয়ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমোতেও পারেন!

মমতাজ আনারের দিকে শুধু একবার তাকালেন, কোন কথা বললেন না।

ওরা এসে পৌঁছলো সেই বন্ধ কক্ষের দরজার সামনে।

মমতাজ প্রহরীকে হুকুম দিল—শাহজাদাকে ডাকবার জন্যে।

প্রহরী বাজখাই কণ্ঠে চীৎকার করে ডাকলো।

কোন সাড়া নেই।

আনার ডাকলো, তাও কোন সাড়া মিললো না।

শেষকালে মমতাজ মিনতি করে ডাকলো—শাহজাদা, দরজা খোলো! আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না, তুমি এ কাজ করতে পারো! এ যে পরাজয়ের চেয়ে ভীষণ কলঙ্ক—এ কথা তুমি বাদশাহের পুত্র হয়ে একবারও ভাবলে না?

যখন কোনই সাড়া মিললো না তখন মর্মরময় দেওয়ালের মাঝে মেহগনি কাঠের মজবুত গাঁথুনি ভেঙে কক্ষ উন্মুক্ত করা হল।

অন্ধকার কক্ষ। দুনিয়ার সমস্ত অন্ধকার যেন সেই কক্ষের মধ্যে জমা হয়েছে, এমনি মনে হল। কক্ষে দিনের বেলা আলো জ্বালা হল। দেখা গেল, শাহজাদা মাটিতে পড়ে আছেন মৃত মানুষের মত। তবে তাঁর সামনে স্বর্ণভৃঙ্গার পড়ে আছে, পানপাত্র পড়ে আছে কিন্তু ভৃঙ্গারে সরাব নিঃশেষিত। শাহজাদার বুকের ওপর হাত দিয়ে দেখা গেল, তিনি মৃত নয়, অর্ধমৃত। বৈদ্য এলো, শাহজাদার শরীর পরীক্ষা করে বললো—অত্যধিক সরাব পান ও পরিশ্রমের দুর্বলতায় চেতনা হারিয়েছেন, ভয়ের কিছুই নেই, তবে বিশ্রাম ও শুশ্রূষার দরকার।

মমতাজ শাহজাদাকে নিজের কক্ষে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষায় মন দিলেন। শাহজাদা মৃত নয় জেনে কতকটা আশ্বস্ত হয়ে মমতাজ শাহজাদার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করে আহার নিদ্রা ভুলে গেলেন।



এরপর আরো দুদিন উদ্বেগের মধ্যে কাটলো।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যাবেলা শাহজাদা অনেকটা সুস্থ হয়ে পালঙ্কের ওপর উঠে বসলেন। এই কদিন শাহজাদার জ্ঞান ছিল বটে কিন্তু মমতাজ কোন কথা বলে শাহজাদার স্মৃতি ভারাক্রান্ত করতে চান নি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা শয্যার ওপর উঠে বসতে মমতাজ বললেন—তোমার মনে আছে বোধহয় সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের বহিন মনিজা বেগমকে! যিনি আমাকে খুব পেয়ার করতেন। তাঁর স্বামী কাসেম খাঁ জোয়ানীকেও তোমার নিশ্চয় মনে আছে? যাঁর বিশাল বক্ষ দেখলে বুকের মধ্যে ধুক্‌পুক্‌ করতো। তিনি এখন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা, তাঁর অধিকারে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈনিক আছে! আমরা যদি এখন পাঞ্জাবে গিয়ে তাঁর সাহায্য চাই, তাহলে কি তিনি বিমুখ করবেন?

শাহজাদা শুধু বেগমের কথায় ম্লান হাসি প্রকাশ করলেন, কোন কথা বললেন না।

মমতাজ আবার বললেন—আমি কি অন্যায় বললাম শাহজাদা?

শাহজাদা খুরম মাথা নেড়ে বললেন—না, কিন্তু আবার কেন এসব চিন্তা মমতাজ? অভিশপ্ত জীবনে আর সুদিন আসবে না।

মমতাজ অধৈর্য হয়ে বললেন—কে বললো আসবে না? নিশ্চয় আসবে। অন্ধকারের পর যেমন আলোর রূপ দুনিয়া ঝলসে দেয়, তেমনি দুর্দিনের পর সুদিন নিশ্চয় আসবে।

শাহজাদা কোন কথার উত্তর না দিয়ে নিস্তেজকণ্ঠে গবাক্ষ দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখতে লাগলেন! দেখাত দেখতে কোথায় যেন তিনি চলে গেলেন, কাবুল, কান্দাহার, দাক্ষিণাত্য, মালব, গুজরাট, উড়িষ্যা আরো অনেক অনেকদূর। সমস্ত হিন্দুস্থানের মাঝে তিনি যেন একটি অশ্বের পিঠে সওয়ার হয়ে ঘুরতে লাগলেন। এমন কি ঠট্টপ্রদেশ হয়ে পারস্যাধিপতি শাহ আব্বাসের কথাও মনে পড়লো। মনে পড়লো মালিক অম্বরকে। তিনি শাহজাদার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন—কখনও যদি কোন সাহায্য দরকার হয়, নিঃসঙ্কোচে চাইবেন, এ বান্দা আপনার কোন উপকারে লাগতে পারলে ধন্য হবে। না, না এসব চিন্তা মনে আসে কেন? কোন প্রয়োজন নেই, কোন উদ্যম! শুধু পন্ডশ্রম ছাড়া কিছুই হবে না। বিরাট মর্মরময় বাদশাহী প্রাসাদের বুকে তাঁর ঐ গুটিকয়েক দুর্বল সৈন্য নিয়ে কোন আঘাতই হানতে পারবে না। শুধু শুধু পরাজয়ের কলঙ্ক বয়ে বয়ে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করা হবে।

মমতাজ আবার চমকে দিয়ে বললেন—কি ভাবছো প্রিয়তম? ভুলে যেও না তুমি বাদশাহের পুত্র! মনের মধ্যে দুর্বলতার বাসা সৃষ্টি করা তোমার অন্যায়! সমস্ত হিন্দুস্থান তোমার কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে, এই বুঝে কাজ করবে! পরাজিত হয়েছ বলে যে ক্লান্তি তোমাকে শয়তানের মত আক্রমণ করেছে, তাকে এই বলে প্রবোধ দাও—একটা বিরাট সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বড়ই কঠিন। অন্য কেউ হলে হয়ত সাহসই করতো না, তোমার অসীম শক্তি আছে বলেই তুমি চেষ্টা

করেছ। অন্ততঃ সাম্রাজ্যের পাষাণ ভিতে একটু আঁচড় কাটতে পেরেছ জেনে সকলেই মনে মনে চমকিত। তুমি যদি সংবাদ নাও, বাদশাহও তাঁর অবাধ্য পুত্রের সাহসে চমকিত। যদিও মনে মনে তিনি যথেষ্ট দুঃখিত কিন্তু গর্বিত না হয়ে পারেন নি যে তাঁর তৃতীয়পুত্র খুরমই বাদশাহের সম্মান রক্ষা করেছে। তুমি কি জানো না, বীরের সম্মান চিরকালই শ্রদ্ধার উচ্চবেদীমূলে? বাদশাহ কি বীরপুত্রকে কখনও ধ্বংস করতে পারেন? তোমার বিরুদ্ধে তাঁর রণনীতি দেখে বুঝতে পাচ্ছো না, তিনি শুধু তোমাকে শক্তিহীন করবার হুকুম দিয়েছেন, বিনাশের কোন পরোয়ানা দেন নি? বড় বড় যোদ্ধাকে তোমার বিরুদ্ধে পাঠিয়ে শুধু তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন?

শাহজাদা বোধ হয় মমতাজের কথায় কিছুটা সান্ত্বনা বোধ করলেন। মমতাজের দিকে তাকিয়ে বললেন—কিন্তু বাদশাহী সৈন্যের সঙ্গে যে লড়বো সৈনিক কই? কে দেবে আমাকে সৈনিক? সকলেই বাদশাহের ভয়ে সংকুচিত—কেউই বাদশাহের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের জীবন সংশয় করতে চায় না!

মমতাজ বললেন—আমি বলি পাঞ্জাবে কাসেম খাঁ জোয়ানীর কাছে চলো, তিনি আমাদের উভয়কে স্নেহ করেন, তিনি হয়ত আমাদের সাহায্য করতে পারেন।

শাহজাদা মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন—তুমি যত সহজ করে কথা বলছো তত যদি সহজ হত? তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—কাসেম আলী খাঁ সত্যিই আমাদের পেয়ার করেন, নূরজাহানের জ্যেষ্ঠা ভগিনী হলেও মনিজা বেগম সত্যিই স্নেহময়ী রমণী। কিন্তু তাঁরা আমাদের এখন দেখলে আতঙ্কে শিহরিত হবেন। কারণ সমস্ত হিন্দুস্থান আজ জানে আমি বাদশাহের বেদৌলৎ পুত্র। সেই ভয়েই তাঁরা হয়ত সমস্ত স্নেহ লুকিয়ে স্বার্থের জন্যে অকপটে বলবেন—আমাদের সর্বনাশের জন্যে তোমরা এখানে কেন এলে?

তারপর শাহজাদা কাতরভাবে মমতাজকে বললেন—বেগম, অপমান তো জীবনে অনেক পেলাম, আর অপমান গ্রহণ করে ক্ষতবিক্ষত হতে বলো কেন?

মমতাজ স্বামীকে উত্তেজিত করার জন্যে বললেন—তাহলে কি তুমি স্থির করেছ মৃত্যু ছাড়া আর কোন পথ নেই?

শাহজাদা কাতর হয়ে বললেন—পথ আছে, বাদশাহ পিতার কাছে অপরাধের ক্ষমা চেয়ে অনুগ্রহ প্রার্থনা করা!

মমতাজ বললেন—দুটোই তো অসম্মানের পথ—এই করলে কি তুমি সুখী হবে?

শাহজাদা হঠাৎ অসহ্যতার বাষ্প প্রকাশ করে বললেন—আমি আর জীবনে সুখ পাবো না মমতাজ! খোদা আমার সব সুখ কেড়ে নিয়েছেন!

মমতাজ আরো উত্তেজনা জাগানোর জন্যে বললেন—ভুল কথা। সুখ তোমার জীবনে ঠিকই আসবে। তুমি শুধু সাময়িক ক্লান্তিতে দুর্বল হয়ে পড়েছ বলে পথ হারিয়ে ফেলেছো। আমার কথা একটু ভেবে দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে আমি

কোন অন্যায় কথা বলছি না। পরাজিত হয়েছ বলে শক্তি লোপ পাবার উপক্রম হয়েছে। কিন্তু একটা কথা কি একবারও ভাবোনি—যে দুর্গের মাঝে আমরা অবস্থান করছি, সেটি আমাদেরই শক্তি প্রয়োগের দ্বারা অধীকৃত হয়েছে। এখানকার সমস্ত ঐশ্বর্য আমাদের। এখানকার বাতাস আমাদের। আশমানের চন্দ্রাতপ আমাদের। এখানকার প্রতিটি পাথর আমাদের। এছাড়া এমনি আর একটি আছে আসীর দুর্গ। দুটি দুর্গের অধীশ্বর হয়েও তুমি মৃত্যুর কথা ভাবছো শাহজাদা?

মমতাজের কথায় শাহজাদা ম্লান হেসে বললেন—একজন শাহজাদার পক্ষে কি এই যথেষ্ট মনে করো বেগম? মনে রেখো আমি সমস্ত জাগীর হারিয়ে কপর্দকহীন হয়েছি।

ভুলি নি—কোন কিছুই ভুলি নি আমি প্রিয়তম। মমতাজ যেন কেমন আবেগের স্রোতে আছড়ে পড়লেন—একজন ফকিরের চেয়েও তো আমাদের অনেক বেশী আছে শাহজাদা! হয়ত আমীরের দৌলত নেই আমাদের—তাতে কি হয়েছে? যদি জীবন থেকে যায় তাহলে নিশ্চয় একদিন সব হবে। আফশোষ কি—একদিন নয় সুগন্ধী মিঠে কাবাব খেয়ে রসনা তীব্র করেছি, আজ জুটবে এক টুকরো রুটি—তাও হয়তো জুটবে না—তাই বলে কি কাঁদবো?

শাহজাদা বললেন—তুমি হয়তো উপবাসে দিন কাটাবে, কিন্তু তোমার পুত্র-কন্যারা?

মমতাজ কন্ঠের উপর রক্ষিত একটি বহুমূল্য কণ্ঠহার দেখিয়ে বললেন—এর মূল্য কি তুমি বিস্মৃত হয়েছ? এটি জহুরীর কাছে বিক্রী করে আমার পুত্রকন্যাদের আহার চলবে না?

তারপর!

যতদিন আমার ক্ষমতা থাকবে, চালাবো। পরে না পারলে ভিক্ষা করবো। তবু এই বলে মনকে প্রবোধ দেব—আমি সম্পূর্ণ। আমার মনে কোন খেদ নেই। তুমি তোমার পিতার রাজ্যের কোন একটি সাধারণ গৃহস্থের খোঁজ নাও, দেখবে তারা কত সুখী। অথচ তাদের কিছু নেই, নেই বলে দুঃখও নেই।

শাহজাদা মৃদু হেসে বললেন—এমনি কোন গৃহস্থের সংসার পেলে কি তুমি সুখী হবে?

সুখী অবশ্য হব না, তবে বাদশাহ প্রাসাদের দৌলতের মাঝে জীবন উৎসর্গীকৃত হল না বলেও দুঃখ করবো না।

শাহজাদা তারপর বললেন—আমাকে কি করতে উপদেশ দিচ্ছ তাই স্পষ্ট করে বলো! আমি তোমার মত এমনি নিঃস্বর জীবন যাপন করতে পারবো না। চিরকাল ঐশ্বর্যের মাঝে কাটিয়ে এসেছি, দৌলতের রোশনাইতে চোখ ধাঁধিয়েছি। শয্যার কোমল গহ্বরে দেহ এলিয়ে আশমানকে কাব্যের চোখে দেখেছি! সর্বদা শুনেছি রঙমহলের মাঝে পানপাত্রের বিচিত্র ধ্বনি আর নর্তকীর সুন্দর পায়ের ঘুঙুরের নিক্কণ। তাই তোমার মত করে ভাবতে পারলুম না বলে দুঃখ কর না।

এখন স্পষ্ট করে বলো—কি করলে আমি সবার কাছে মাথা তুলে থাকতে পারবো ?

মমতাজ লজ্জিত হয়ে বললেন, আমার গোস্তাখি মাপ করো শাহজাদা। আমি তোমায় কি উপদেশ দেব—শুধু বলছিলাম আর একবার চেষ্টা কর, তোমার যে শক্তি ও সাহস নিঃশেষিত হয়নি, তার নিদর্শন সারা হিন্দুস্থান দেখুক।

শাহজাদা মাথা নেড়ে বললেন—বেশ, তাই করবো। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু কি উপায়ে ?

মমতাজ হেসে বললেন—তার আমি কি বলবো ?

শাহজাদা বললেন—তাহলে বাকীটা আমি বলি শোনো। এই রোটাস দুর্গ উপযুক্ত রক্ষীব দ্বারা সুরক্ষিত করে তোমাদের সকলকে এখানে রেখে যাই। আর আমি গোপনে অশ্বারূঢ় হয়ে দাক্ষিণাত্যে মালিক অম্বরের সাহায্যের জন্যে গমন করি যদি তাঁর সাহায্য সম্পূর্ণরূপে পাই, তাহলে তোমাদের এখান থেকে নিয়ে যাবো।

শাহজাদার কথা সম্পূর্ণ হবার আগেই মমতাজ মাথা নেড়ে বললেন—আমি কখনও তোমাকে একা ছেড়ে দেব না। শত্রু গুপ্তচর চতুর্দিকে ঘুরছে। তোমার পিতা না হয় পুত্রের জীবন নাশ করতে চান না, কিন্তু অন্যান্যরা ? না, না, এ অবস্থায় আমি কাছে না থাকলে তুমি হয়তো বিপদে পড়বে !

শাহজাদা বললেন—তাহলে তোমাদের নিয়ে যেতে গেলে তো সে এক বিরাট লটবহর সঙ্গে নিতে হবে। আমি শুধু গোপনে আরো তুরন্ত চেষ্টা করবো বলে এই ইচ্ছা প্রকাশ করছি।

মমতাজ বললেন—বেশ আর সব এখানেই থাক্। তুমি যখন এখানে থাকবে না, মনে হয় শত্রুপক্ষ এ দুর্গ অধিকারের কোন চেষ্টা করবে না। সকলকে এখানে রেখে আমি আমার শিশুপুত্রকে নিয়ে তোমার সঙ্গী হই, আর সঙ্গে কটি বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে দাক্ষিণাত্য পাড়ি দেওয়া হোক্।

শাহজাদা চিন্তিত হয়ে বললেন—জাহানারা, দারা, সুজা, ঔরঙ্গজেব এরা এখানে কার হেফাজতে থাকবে ?

মমতাজ চিন্তা না করেই বললেন—কেন, বহিন আনার আছে !

আনারের কথা শুনে শাহজাদা সত্যিই নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন —হ্যাঁ, আনারের কথা আমার মনে ছিল না। ঐ একটি আওরত এই পরিবারের সমস্ত ভাল-মন্দের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। একবার আনারকে ডাকতে পাঠাও তো ! তাকেই জিজ্ঞেস করে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করি—যদি হয়ে যায়, তাহলে আমরা আর বিলম্ব না করে যাত্রা শুরু করবো।

মমতাজ একটি বাঁদীকে আহ্বান করে আনারকে ডাকতে পাঠালেন।

আনার এলে মমতাজ সুমিষ্টস্বরে জিজ্ঞেস করলেন—বহিন, তুমি কি খুব ব্যস্ত ছিলে ?

আনার হতবুদ্ধি হয়ে বললো—না বেগমসাহেবা !

তাহলে নিজের সৌন্দর্যের প্রসাধন করনি কেন ?

আনারের কপালের ওপর কটি চূর্ণকুন্তল এসে খেলা করছিল, সেগুলি হাত দিয়ে সরাতে সরাতে লজ্জিত হয়ে হেসে বললো—ওদের সঙ্গে খেলছিলাম কিনা, তাই চুল উড়ে এসেছে।

ওরা যে কারা, মমতাজ বুঝলেন, তাই বললেন—ওরা তোমায় জ্বালাতন করে, না?

আনার মস্তক অবনত করে শান্তকণ্ঠে বললো—না মালেকা। ওরা আমাকে খুব পেয়ার করে।

তারপর মমতাজ শাহজাদার দিকে তাকিয়ে বললেন—শাহজাদা, তোমার যেদিন সুদিন আসবে, আমার এই বহিনকে কিন্তু ভুলবে না।

শাহজাদা শুধু হাসলেন, কোন কথা বললেন না।

মমতাজ বললেন—আর সেদিন আনার বহিনের সঙ্গে একজন মেহমান আমীর আদমির শাদী দেবে, যাতে আমার বহিন সুখে থাকে!

এবার শাহজাদা আনারের মুখের ওপর স্পষ্ট করে তাকাবার চেষ্টা করলেন।

আনার মস্তক অবনত করে রেখেছিল। আরো ঝুলিয়ে দিল নীচের দিকে। তখন বক্ষের মধ্যে তার আলোড়ন জাগছিল। রক্তস্রোতে আন্দোলন। সমস্ত শরীর কি এক অজানিত উত্তেজনায় এমনভাবে কাঁপতে লাগলো যে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা আনারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়লো। আর দাঁড়িয়ে থাকলেও, পাছে যদি মমতাজের সামনে কিছু প্রকাশ হয়ে যায়, এই ভয়ে সে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালো।

শাহজাদা বোধ হয় তার অবস্থাটা বুঝলেন। তিনি তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে বললেন—আনারবিবি তুমি যেও না, একটু অপেক্ষা কর। তোমার সঙ্গে অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্যে ডেকে এনেছি। তুমি একবার শত্রুশিবির থেকে সেনাপতি খানখানানকে প্রলোভিত করে এনেছিলে বলে শাহজাদার সমস্ত পরিবার তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। সেদিন খানখানান না এলে প্রথম রণক্ষেত্রেই হার স্বীকার করতে হত। তারপর এতদিন ধরে এই পরিবারের সুখদুঃখে তুমি নিজেকে নিয়োজিত করে রেখেছ, আজ আবার তোমাকে একটি গুরুভার অর্পণ করছি—এই দুর্গের অন্তঃপুরের সমস্ত ভার তুমি নেবে, আর আমার তিনপুত্র ও এক কন্যার ভার।

আনার বিস্ময়ে শাহজাদার দিকে তাকিয়ে থাকলো দেখে শাহজাদা বললেন—আমি মমতাজ ও তার শিশুপুত্রকে নিয়ে এখুনি দাক্ষিণাত্য রওনা হচ্ছি। সেখানে গিয়ে সৈন্য সংগ্রহ করে আবার ফিরে আসবো। তুমি সেই কদিন এই দুর্গের মাঝে থেকে সবকিছু পাহারা দেবে, আর আমার পুত্রকন্যাদের দেখবে।

আনারের বলতে ইচ্ছা করলো—এতখানি বিশ্বাস আমাকে করছেন শাহজাদা? আমি যদি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করি? মানুষের মন কত রহস্যময়, সে তো জানেন? যদি কারো দ্বারা প্রলোভিত হয়ে অথবা নিজের মনের মধ্যে দুশমন ঢুকে এই দুর্গও শাহজাদার পুত্রকন্যাদের ধ্বংস করতে অগ্রসর হই?

আনার কোন সমর্থন জানালো না দেখে শাহজাদা আবার বললেন—এ ছাড়া

কোন উপায় নেই আনার। আমি জানি, তুমি ভীত হবে। কিন্তু তুমি ছাড়া এ ভার যে কাউকে বিশ্বাস করে দিয়ে যেতে পারি না !

মমতাজ আরো এগিয়ে গিয়ে আনারের দুটি হাত ধরে বললেন—তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমতী। তোমার সাহসের কোন তুলনা নেই। আমি যাচ্ছি শুধু শাহজাদার নিরাপত্তার জন্যে। তুমি তো জানো, শাহজাদার মানসিক অবস্থা এখন কি? ক্ষণে ক্ষণে তাঁর মত পরিবর্তিত হয়ে কেমন যেন তিনি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছেন।

আনার শুধু এই কথার শেষে নিম্নস্বরে বললো—আমাকে অতো বলার দরকার কি বেগমসাহেবা? আমি এ ভার নিলাম।



মাত্র দু'ঘন্টা পরেই শাহজাদা খুরম আপন অশ্বের পিঠে মমতাজকে সওয়ার করে, মাত্র আটটি অশ্বারোহী অনুচর সঙ্গে নিয়ে ছুটে চললেন। শিশু পুত্র মুরাদকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা ছিল কিন্তু দুর্গম পথ দ্রুত অতিক্রম করতে গিয়ে শিশুপুত্রের প্রাণহানির আশংকা বোধ করায় মমতাজ নিজেই শিশুপুত্রকে আনারের হেফাজতে রেখে গেলেন। জননী হয়ে একাজ করতে হল বলে মমতাজ বেদনা পেলেন। কিন্তু স্বামীর জন্যে তিনি সব সহ্য করলেন।

একটি অশ্বের উপর একজন রমণী ও অন্যজন পুরুষ।

তাঁদের দেখে মনে হল যেন তাঁরা যুগ যুগ ধরে এমনি দুটি অভিন্ন হৃদয়ে অশ্ব-পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে পরস্পর হৃদয় বিনিময় করে পথ পরিক্রমা করে চলেছেন। তাঁদের দেখে অন্যান্য দম্পতীরা ঈর্ষার চোখে তাকিয়ে আছে। বলছে—এরা এত সোহাগ পেল কোথায়? কিম্বা কেউ বলছে ঐ বীরপুরুষ কি ঐ রাজকন্যাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে? এদের দেখে যে মনে পড়ে পৃথীরাজ ও সংযুক্তাকে। পৃথীরাজ ও সংযুক্তার মিলন কাহিনী জগতের দাম্পত্য জীবনের নিদর্শন সৃষ্টি করেছে, এরাও কি তেমনি কিছু সৃষ্টি করতে চলেছে?

আশমানের নীল মেঘের কোলে চন্দ্রাতপের শোভা। পুষ্পবৃক্ষের শাখে কোরক জাগার সঙ্গে সঙ্গে তার সুগন্ধ বাতাসে আমন্ত্রণ। সেই সুগন্ধে মধুকর আসে গুণগুণিয়ে। তেমনি একটি হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষায় আর একটি হৃদয়ের আকর্ষণ যদি না জাগে, তাহলে সে জীবন হয় ব্যর্থ। কিন্তু যদি জাগে তবে দুটি হৃদয়ের সোহাগ-কুসুম রঞ্জিত হয়ে বর্ণশোভা বিকশিত করে, আর সেই বর্ণচ্ছটা প্রকাশিত হয় বিচিত্র রঙ-এ।

কতদূরে ছিল দুটি হৃদয়। মাঝখানে ছিল একটি বিরাট মর্মরময় প্রাচীর।

আর ছিল দস্তুর ব্যবধান। নিয়মের বন্ধন ছাড়া তাঁরা কখনও কাছাকাছি হতে পারতেন না। বাঁদী এসে খোজাকে জানাতো এত্তেলা, খোজা গিয়ে শাহজাদাকে বললে তবে দেখা মিলতো। আব শাহজাদারও ইচ্ছানুযায়ী বেগমমহলে আসা হত না, তারও নিয়ম ছিল। এই নিয়ম রক্ষা করতে গিয়ে দুজনে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। ঘনিষ্ঠ হযে নিবিড়তার স্পর্শানুভব মনের মধ্যে যে পুলক জাগায়, সে পুলকেরই অভাব দেখা গিয়েছিল এদেব মধ্যে।

তারপর ব্যবধান চলে যেতে নিয়ম ভেঙে পড়তে সব এক হয়ে গেল। দুটি নদী আর ভিন্নভাবে অবস্থান করলো না, তারা অভিন্ন হৃদয়ের সুখে বিলীন হয়ে গিয়ে একাত্মার মাঝে নতুন দুনিয়ার সৃষ্টি করলো।

বোধ হয় এই মিলনের গীতসুধায় রচিত হয়েছিল প্রেমের সমাধিতে শুভ্র মর্মরের অমর স্মৃতিসৌধ জগদ্বিখ্যাত 'তাজমহল'।

তবে সে কাহিনী আরো অনেক পরের।

সেদিন শুধু মখমল আচ্ছাদিত সবুজ তৃণশয্যার ওপর দিয়ে ধ্বনিত হয়েছিল অশ্বক্ষুরের বিচিত্র শব্দ। আর মমতাজ তাঁর প্রিয়তমের একান্ত সান্নিধ্যে বসে উন্মুক্ত আশমানের নীচে নিজের রমণীয় লজ্জা ঢাকতে সূর্যরশ্মির মাঝে আরো আরক্তিম হয়ে উঠেছিল কিনা জানা নেই। তবে উভযেই তাঁরা যে সেদিন সান্নিধ্যলাভের সুখে আনন্দিত হয়েছিলেন, পরবর্তী জীবন লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে।



দেখতে দেখতে তারপর চলে গেল একমাস।

এখানে রোটাস দুর্গে বসে আনার একা শাহজাদার পরিবারবর্গের দেখাশুনো করতে লাগলো। শাহজাদা তাকে নিজের হাতে ভার দিয়ে গেছেন, তিনি অনেকখানি বিশ্বাস করতে পেরেছেন বলে এতখানি দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। সেজন্যে আনার খুব আনন্দিত।

সে আনন্দিত হয়েই এই শাহজাদার পুত্রকন্যাদের সমস্ত আবদার মেনে নিয়েছিল। সে খুসী এইজন্যে যে, শাহজাদার অবস্থা যদি রাজসিক ঐশ্বর্যের মধ্যে আড়ম্বরে দিন কাটতো, তাহলে তার এই আধিপত্য স্বীকৃত হত না। সে পেত না এমনি একটি একাত্মবোধ স্বীকৃতি। সে এই পরিবারের এত কাছাকাছি হতে পারতো না।

সে এই পরিবারের অনেক কাছাকাছি আসতে পেরেছে বলে একদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত, কারণ তার মনের সঙ্গে সে নাগাল পেয়েছে। শাহজাদা ও মমতাজের মধ্যে তার আধিপত্য স্বীকৃত হয়েছে। তাঁরা তাকে এতখানি বিশ্বাস করেন যেন সে বিশ্বাস পরম আত্মীয়কেও তাঁরা করতে পারেন না।

আর শাহজাদার এই দুর্দিনে বোধহয় তারই পরম লাভ হয়েছে। যদিও তার কোন আকাঙ্ক্ষাই মেটে নি, যে জন্যে সে বাদশাহী প্রাসাদ ছেড়ে চলে এসেছিল, সে ইচ্ছা তার মনের মধ্যেই ঘুমিয়ে আছে। বরং এখানে এসে সে অভিভূত হয়ে গেছে। অবাক হয়ে শাহজাদার পরিবারের মধ্যে মিশে গেছে। আর নিজের যৌবনের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা বিনা আয়াসেই প্রশমিত হয়েছে।

শাহজাদার কাছ থেকে সে চেয়েছিল রমণীর সৌভাগ্য। ভেবেছিল শাহজাদা হয়ত তাকে মমতাজের মত বেগমের আসনে বসাবেন। তিনি অবশ্য অস্বীকার করেন নি, বলেছেন—আমার এই অন্ধকার দিন অপসারিত হলেই তোমার স্বীকৃতি তুমি পাবে!

কিন্তু তখন কি আমার যৌবন থাকবে?

শাহজাদা উত্তর দিয়েছেন—নাইবা থাকলো। যৌবনই কি মানুষের সব?

আনার বলেছে—মানুষের সব নয়, রমণীর সব।

এসব কথা বলবারও সময় আনার কখনও পেত না। কারণ শাহজাদা সর্বদা বিদ্রোহের জন্যে মানসিক দুশ্চিন্তার মাঝে বিচরণ করছিলেন, এসব কথা বলবারও অবসর আনার কখনও পায় নি। সে শুধু উল্কার মত শাহজাদার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছোটাছুটিই দেখেছে, তার মধ্যে কি এসব আলোচনা শোভা পায়! তার ওপর ভয়ও ছিল, শাহজাদা ভাগ্যপীড়িত হয়েছেন বলে তো বাদশাহী মেজাজ পরিত্যাগ করেন নি! হয়ত ক্ষুব্ধ হয়ে ঘাতককে নির্দেশ দেবেন—এই আওরতকে এখুনি হত্যা করবার ব্যবস্থা কর।

বাদশাহী শাসনে ঘাতকের ব্যস্ততাই সর্বদা বেশী। তাই সামান্য একটি রমণীকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে কোন অনুকম্পা সৃষ্টি হবে না। সেই ভয়েও আনার দমিত হত না, তার অসামান্য রূপ প্রসাধনের মাঝে প্রকটিত করে শাহজাদাকে অবশ করবার চেষ্টা করতো, অবশ করে চেয়ে নিত নিজের স্বীকৃতি। কিন্তু তা যদি হঠাৎ শাহজাদার ঐরকম দুর্দৈব অবস্থা সৃষ্টি না হত, তাহলে হয়ত সম্ভব হত।

শাহজাদার সঙ্গে পরিচিত হবার আগে আনার ভেবেছিল—হয়ত শাহজাদা তাঁর সৌন্দর্যবিলাসী মনে আনারের অসামান্য রূপ ও প্রকটিত যৌবন দেখে অভিভূত হবেন। এবং সেই কল্পনায় সে সুদূর পথ অতিক্রম করে শাহজাদার সামনে এসে যৌবন প্রদর্শন করেছিল কিন্তু শাহজাদা আনারের কৌশলে ধরা না পড়ে বরং হারেমের সামান্য একটি বাঁদীর মত তাকে তুচ্ছ করেছিলেন। আনার সেদিন তখন কারাগারে বসে। সেদিন দিশেহারা হয়ে সে ভেবেছিল—এর প্রতিকার কি? সম্রাজ্ঞী যে বলতেন—তার রূপ নাকি বাদশাহঘরের দৌলত, হীরার রোশনাই। তাই যদি হবে, তাহলে একটি পুরুষ কি করে ভোগ না করে তার রূপকে তুচ্ছ করলো? রমণীর বাড়ন্ত বয়সের যৌবনের দেহও কি পুরুষের বুকে আগুন জ্বালায় না?

আনার তাও ভেবেছে—শাহজাদার হারেমে আছে তার মত অনেক জোয়ানী আওরত। শাহজাদার প্রবৃত্তি যদি কখনও উদ্দাম হয়, তাহলে তিনি তাদের গ্রহণ

করতে পারেন। সেজন্যে আনারের রূপৈশ্বর্য তাঁকে আকর্ষণ করেনি। তাই আনার ভাবলো—কি করে সে শাহজাদাকে আপন করবে?

ভাবতে ভাবতেই তার আকস্মিক মিললো শাহজাদার সৌভাগ্য! শাহজাদা হঠাৎ তাকে একদিন কারামুক্ত করে গ্রহণ করলেন। আনার অভিভূত হল। আনন্দিত হল। সুখী হল। পুলকে অন্তরের মধ্যে গান গেয়ে উঠলো কিন্তু শঙ্কিত হল। শঙ্কিত হল এই ভেবে যে তার সব গর্ব এবার চূর্ণ হয়ে গেল। সে অপবিত্র হল।

রমণীর যে ঐশ্বর্য, রমণীব যে গর্ব সেই গর্ব পুরুষের একটিবারের স্পর্শেই কলুষিত হয়ে যায়। তখন রমণী আর তার গর্বিতভঙ্গি নিয়ে চলাফেরা করতে পারে না।

শাহজাদার বাহুবন্ধনে আটক পড়বার আগে আনার শাহজাদাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল কিন্তু শাহজাদার দ্বারা বঞ্চিত হবার পর সে প্রতিজ্ঞা কেমন যেন আনারের কাছে লঘু হয়ে গেল। আনার তখনই তরুলতার মত শঙ্কিত হয়ে কম্পিতবোধ করলো।

তারপর থেকেই তার চললো পাবিকল্পনা। অহরহ চিন্তার আবর্ত।

রূপ ও যৌবন দিয়ে আর শাহজাদাকে বশ করা যাবে না। বরং শাহজাদার গ্রহণের পর সেই শাহজাদার বশ হয়ে গেছে। কিন্তু শাহজাদা যদি এখন বাঁদীর মত পরিত্যাগ করেন, তাহলে কিছুই করবার নেই। তার মত কত রমণী শাহজাদার হারেমে আছে। তারা নিজেদেব যৌবন উৎসর্গ করবার জন্যেই এই হারেম শোভা করে আছে। শাহজাদা তাদের খেয়ালের বশেও গ্রহণ করেন না, যদি করেন তাহলে তারা ধন্য হয়ে যাবে। সুতরাং আনাব যদি কখনও ক্ষোভ প্রকাশ করে, তাহলে সকলে বলবে—যা পেয়েছ যথেষ্ট হয়েছে, এর বেশী আশা কর না।

কিন্তু আনার তো তা চায় নি! চায় নি বলেই তার যাতনা অনেক। তারপরই সে সাবধানে অন্য ভূমিকা গ্রহণ করলো।

পরবর্তী কার্যধারা দেখে আনারের ঐ গতিবিধি বোঝা গিয়েছিল। না হলে শত্রুশিবির থেকে সেনাপতি খানখানানকে অর্ধনগ্ন দেহ দেখিয়ে সে প্রলোভিত করে আনতো না। সেদিন এনেছিল বলেই শাহজাদা কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন। তবে সেদিন শাহজাদা তার ইজ্জতের জামীন হয়েছিলেন বলেই সে সাহস করেছিল। শাহজাদা সেদিন একান্ত চাপাস্বরে বলেছিলেন—তুমি তো আমার আওরত, তাই যদি হও তাহলে নির্দ্বিধায় আমার ইচ্ছাকে জয়ী কর; যদি কোন অঘটন ঘটে আর সেজন্য যা মলিনতা জমবে, আমি তা মোচন করে দেব।

আনার সেদিন দারুণ সুযোগ পেয়ে শাহজাদাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছিল, কিন্তু সে পুলকিত হয়েছিল এই ভেবে যে তার আর শাহজাদার দূরত্ব এই সুযোগে একেবারে কাছাকাছি এসে গেল।

সেদিন রাত্রের কথা আজও মনে আছে আনারের। হ্যাঁ, তার জীবনে

সেদিনের রাত্রিটি তার অভিসারের দ্বিতীয় রাত্রি। জীবনে যদি আর কোনদিন কোন কিছু না মেলে তাহলে সম্পদ হিসাবে তার থাকবে প্রথম ও দ্বিতীয় স্মরণীয় রাত্রির শুভমুহূর্ত দুটি।

মীর্জা আবদর রহীম খানখানানকে শত্রুশিবির থেকে আনবার পর সে যখন বিশ্রামের জন্যে ক্লান্তদেহে নিজের শিবির অভিমুখে গমন করছে, সে-সময় হঠাৎ বাঁদী আবির্ভূত হয়ে জানালো—বিবি, শাহজাদা আপনাকে সেলাম দিয়েছেন।

এতরাত্রে! পরমবিস্ময়ে এ কথাটি বলতে গিয়ে হঠাৎ সচকিত হয়ে আনার নিজেকে সংযত করলো। পরক্ষণেই তার মনটি আনন্দে নৃত্য করে উঠলো। এ নৃত্য সে খানখানানের লুব্ধদৃষ্টির সামনেও পেশ করতে পারেনি।

মনে মনে অদ্ভুত নৃত্য করতে করতে সে অসামান্য ত্রিযামা রাত্রির স্তব্ধ সেই আশমানের দিকে তাকিয়ে অভিভূত হয়েছিল। যেন সে উন্মুক্তক্ষেত্রের সামনে ঐ আশমানের উজ্জ্বল রজতশুভ্র রঙমহলের কারুকার্যময় হীরা-চুনি-পান্নার জৌলুস প্রত্যক্ষ করলো। সে শুনতে পেলো সেই রঙমহলে সে অর্ধনগ্ন দেহে নৃত্য করছে। এই কিছুক্ষণ আগে খানখানানের বেহুঁশ চোখের সামনে যে অর্ধনগ্ন দেহে নৃত্য করে এলো, সে নৃত্যের মাঝে কর্তব্য ছিল, আর এ নৃত্য নিজের স্বার্থের জন্যে। সুতরাং তার প্রাণের প্রেরণাকে সেখানে মমতার পলিমাটি আবরিত করলো। আনার মনে মনে ভাবলো সে বুঝি পূর্ণ। সেইমুহূর্তে তার মনে হল, একদিন সে ঠিক ঐ মোগলসিংহাসনে সম্রাটের পাশে সম্রাজ্ঞীর পদ অলংকৃত করবে। প্রজারা এসে তাকে সহস্র সম্মান দান করে তার দীর্ঘজীবন কামনা করবে আর সে সম্রাট শাহজাহানের পাশে গর্বিতা ভঙ্গিতে বসে হাজারো মেহমান আদমীর কুর্নিশ কুড়োবে।

কিন্তু এও বোধহয় তার প্রয়োজন ছিল না। সে সম্রাজ্ঞী হওয়ার কামনার চেয়ে বেগম হয়ে হারেম অলংকৃত করতে চেয়েছে। অন্য কারো নয়, শাহজাদা খুররমের বেগম। পুরুষের মত বলিষ্ঠ আকৃতি নিয়ে যে শাহজাদা গোলাপের মত বর্ণসুষমা দেহ ঘিরে অর্জন করেছেন, যার দেহসৌন্দর্য পরম ঈর্ষার বস্তু—সেই শাহজাদার আলিঙ্গন ও তাঁর সোহাগ ছাড়া আনার জীবনে আর কোন মহামূল্যবান বস্তু চায় না। এমন কি বাদশাহী রত্নাগারের সমস্ত রত্ন যদি আনারকে দিয়ে বলা হয়, তুমি এর বিনিময়ে এই অপর্যাপ্ত রত্ন গ্রহণ কর—তবু না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ আনার মরেছে। আনার মরেছে সেই প্রথম কলিটি ফোটবার মুহূর্তে। যখন তার দেহে যৌবনের নানা উপকরণ লোভাতুর হয়ে মেলে দিচ্ছিল বর্ণসুষমা সেই সময় সে শাহজাদাকে দেখেই মরেছিল। আর তারপরই তার প্রতিজ্ঞা মনের প্রাসাদে আস্তে আস্তে দৃঢ় ভিত গঠন করে তাকে অটল করেছে।

সেই শুরু থেকেই আজ এইপর্যন্ত তার মনের প্রতিজ্ঞা একই পর্যায়ে স্থির হয়ে আছে।

এরই মধ্যে সে কতদিন বিস্ময়ে ভেবেছে,—কতলোকের কতকিছু প্রার্থনা থাকে,

তার এই সামান্য প্রার্থনা মঞ্জুরিত হবে না কেন? সে তো সম্রাজ্ঞী হতে চায় নি, সে চেয়েছে একজন সৌভাগ্যবান পুরুষের অংকশায়িনী হতে। এটা কি দুনিয়াতে খুব বড় প্রত্যাশা? আর চেয়েছে তাঁর মধ্যে সম্মান। একজন শাহজাদার তো অনেক বেগম থাকে, সে তাদের মধ্যে একজন হল, এ আর এমন কি প্রত্যাশা? তার রূপ কি বাদশাহী অন্তঃপুর আলো করবার মত নয়? তবে কেন এই জিজ্ঞাসা?

আনার কিন্তু সেই মুহূর্তে এসব কথা ভাবছিল না, ভাবছিল শাহজাদা এই রাত্রিকালে তাকে আহবান করলেন কেন? তিনি তো শুনেছেন সেনাপতি খান-খানানকে বেঁহুশ অবস্থায় এখানে আনা হয়েছে, এখন তিনি পরম আরামে শয্যার গহবরে শুয়ে হয়ত আনারের নগ্নদেহের সৌন্দর্যই স্বপ্নের মধ্যে দেখে শিহরিত হচ্ছেন। আনার সে কথা ভেবে মনে মনে পুলকিত হল।

তাহলে শাহজাদা ডেকেছেন কেন—তবে কি কোন পুরস্কার দেবেন বলে অপেক্ষা করছেন? কিন্তু তিনি কি পুরস্কার দেবেন?

কয়েকটি ছাউনি অতিক্রম করে আনার চলে এসেছিল, আর কটি ছাউনি এগিয়ে গেলেই বেগম ছাউনি—তারপরেই তার আলাদা কক্ষ, সে নিজের কক্ষের দিকে পা চালাতে গিয়েও কি ভেবে আবার পশ্চাদ্‌মুখী হল। মনে মনে বললো—এ লোভ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। যদি আজ রাত্রে তার জীবনে দ্বিতীয় মিলনের সম্ভাবনা স্বীকৃত হয়, তাকে উপেক্ষা করা উচিত হবে না। এই ভেবে আনার ফিরলো। অবশ্য শাহজাদা কেন ডেকেছেন আনার জানে না, শুধু তার অনুমান।

তবু আনার কৌশলের আশ্রয় নিল। অদম্য তৃষ্ণা হৃদয়ে নিয়ে সে শাহজাদার শিবিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

আশমানের চন্দ্রাতপে তখন চন্দ্রিমার শুভ্র আলো বিরাজমান। অসংখ্য নক্ষত্র প্রাসাদের অলিন্দের অজস্র স্ফটিকাধারে প্রজ্বলিত বর্তিকার মত জ্বলে আছে। যেন মনে হচ্ছে এক একটি হীরকখণ্ড জ্বলছে প্রাসাদের মর্মরময় দেয়ালের খোদিত অংশে। বাতাসে ভেসে আসছে ভিজে মাটির গন্ধ। জোনাকিরা দূরে বনান্তরালে আলো বিকীরণ করছে, তাও মাঝে মাঝে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। বনফুলের গন্ধ ভেসে আসছে আর আসছে নিজের দেহের গন্ধ। তার পোষাকে আছে গন্ধের সংমিশ্রণ। ইস্তাম্বুলের আতরদানী থেকে জোরালো গন্ধ গায়ে ছড়িয়েছিল। দেহে সুরভিত করেছিল চন্দনের সুবাস। লোবানের জোরালো গন্ধ ও তার মস্তকের প্রতি কেশপাশে আমোদিত করেছিল। সে যেন নিজেই একটি গন্ধের সংমিশ্রণে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। তাই বাইরের কোন গন্ধই তাকে মুগ্ধ করছিল না।

হঠাৎ কেন জানি আনার সেই নিষুতি রাত্রির কোলে রহস্যময়ীর মত মৃদু হাসলো। তারপর মনে মনে বললো—সব সৌরভকে কবরিত করে আওরতের দেহের সহজাত সুগন্ধই পুরুষকে পাগল করে, তার দেহে সেই গন্ধই আছে। একথা প্রথম মিলনের রাত্রেই শাহজাদা বলেছিলেন।

সমস্ত প্রান্তর নিঝুম ও নিস্তব্ধ। রাত্রি প্রহরের শেষযামে ঢলে পড়েছে। আনার

সেই সময় শাহজাদার শিবিরের সামনে তার কালো বোরখাটি খুলে ফেললো। ঝলমলিয়ে উঠলো তার দেহের বর্ণসুষমা, যৌবনের রোশনাই, বক্ষের অমূল্য রত্ন। আনারের দেহে ছিল স্বল্প বেশবাস। সে যে পোষাকে খানখানানের শিবিরে গিয়েছিল, সেই পোষাকই তার দেহ ঘিরেছিল। আনার হঠাৎ তার অর্ধনগ্ন দেহ থেকে সমস্ত বসন ত্যাগ করতে চাইলো।

সে তখন কেমন যেন রাতের মোহিনীমায়ায় শয়তানের রূপ পেয়েছে। দেহের মধ্যে তার কামনার ইন্ধন। সে কামের অনুভবে শাহজাদার বক্ষ আলিঙ্গনে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষার মাঝে সমাহিত। তাছাড়া খান-খানানকে প্রলোভিত করে তার মনের মধ্যে উত্তাপের বাষ্প জমেছিল। সেই উত্তাপ শাহজাদার আমন্ত্রণে এখন কানায় কানায় পূর্ণ। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো— আজ শাহজাদাকে যেমন করেই হোক তার সোহাগের ইন্দ্রজালে অভিভূত করবে। এরাত্রি কিছুতে মিথ্যে হতে দেবে না।

আজকে সেই অদ্ভুত রাত্রির বিস্ময়কর মুহূর্তটির কথা ভেবে সে বিস্মিত হল। কেমন করে সেদিন মনের মাঝে লোভের বশে মিথ্যে হয়ে গিয়েছিল! রমণীর জীবনে এমনি কোন মুহূর্ত কি আবিভূর্ত হয়? না, সেদিন শুধু তারই জীবনে এসেছিল ঐ অদ্ভুত কামনা?

যাই হোক সেই মুহূর্তে আনার বক্ষের উদ্ভিন্ন যৌবনশোভার স্বল্প বসনের আচ্ছাদন যা ছিল উন্মুক্ত করে দিল। সমুদ্রের শুভ্র একঝলক ফেনরাশি যেন ঝলকে উঠলো চন্দ্রালোকের জোৎস্নাধারায়। গোলাপীবর্ণের দুই রক্তময় পর্বতস্তম্ভের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আনার লজ্জিত হয়ে নিজের বক্ষে দুই হাত আড়াআড়িভাবে চাপা দিল। সে সেই নিরালা জায়গায় চতুর্দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে যেন শিহরিত হয়ে উঠলো।

আনার তাড়াতাড়ি বক্ষের ওপর কাঁচুলির আবরণ টেনে শাহজাদার শিবিরের মধ্যে ছুটে গিয়ে প্রবেশ করলো। করে শাহজাদার ক্রোড়ের ওপর নিজেকে সঁপে দিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো —কে—কে –কে যেন আমাকে আক্রমণ করতে আসছে?

শাহজাদা আনারের অবস্থা দেখে বিস্মিত না হয়ে বা কে আক্রমণ করতে এসেছিল, তার অনুসন্ধান না করে আনারের রূপসী দেহ আরো ভাল করে ক্রোড়ের মধ্যে গ্রহণ করলেন, তারপর নেশাজড়িতকণ্ঠে বললেন—আমি তোমাকে ডেকেছিলাম আনার।

আনার তেমনি শাহজাদার সবল ক্রোড়ের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়ে অস্ফুটস্বরে বললো—কেন?

শাহজাদা তখন আনারের কোমল দেহের বৃন্তে উপভোগ রচনা করবার জন্যে তার দেহের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করছেন, সেজন্যে কোন উত্তর দিলেন না। শুধু এক সময় আনারের দেহটি আপন বক্ষের মাঝে সীমাবদ্ধ করে সোহাগরঞ্জিত স্বরে বললেন— তোমাকে পুরস্কৃত করবার জন্যে ডেকেছিলাম আনার।

তারপর আর সে রাতের শেষ প্রহরের কোন বর্ণনা নেই। দুটি আকাঙ্ক্ষিত দেহের মিলন রচিত হল। চাঁদমা আশমান থেকে রশ্মি বিকীরণ করতে করতে এক

সময় নিঃশেষ হয়ে গেল।

আনারের জীবন সার্থক হল। সে রাত্রে আনারের শুধু কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হল না, পূর্ণ হল তার দ্বিতীয় রাত্রির তপস্যা। শাহজাদা তাকে পুনরায় সোহাগরঞ্জিত করে তার অপূর্ণজীবনে পূর্ণতা সৃষ্টি করলেন। সমুদ্রের বুকে বুঝি আলোড়নের শেষ হল। বাতাসের উন্মাদ, উদ্দাম চঞ্চলতা বুঝি প্রশমিত হল।

এর নাম ব্যভিচার নয়। এর মাঝে যে মিলন সৃষ্টি হল, তা দাম্পত্য মিলনের সৌরভেই প্রতিষ্ঠিত। তাই আনার পরবর্তী জীবনে নিজের মনের মণিকোঠায় এই স্মৃতি সঞ্চয় করে রেখে দিল। সে স্মৃতির রঙ গোলাপী। সে স্মৃতিতে পুষ্পময় গন্ধেই সৌরভ বিকশিত হল।

এ সব কথা আনার রোটাস দুর্গের একটি কারুকার্যমণ্ডিত অলিন্দে বসে ভাবছিল। আজ একমাস শাহজাদা ও মমতাজ দাক্ষিণাত্যে চলে গেছেন, তারপর আর কোন সংবাদ নেই।

আরো ভাবছিল এইজন্যে যে গতরাত্রে একটি কাণ্ড ঘটে গেছে। সে ওসমানকে হত্যা করেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই পূর্বপরিচিত ওসমান। শাহজাদার বিরাট সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যারা তখনও বেঁচে ছিল সেই ওসমানই তাদের অন্যতম। শাহজাদা তাকে এই দুর্গের রক্ষীবাহিনীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন।

ওসমানের মনে যে এতদিন ধরে সেই আদিম প্রবৃত্তি বাসা বেঁধেছিল আনার একবারও ভাবে নি। এমন কি সে ভুলেছিল ওসমানের কথা। ওসমান বলে যে কোন সৈনিককে সে চেনে, এ কথাও একেবারে বিস্মৃত হয়েছিল। গত রাত্রে নয়, গত রাত্রি থেকে পরিমাপ করে আরো পিছনের কটি দিন। হ্যাঁ, সেই কটি দিন ধরে ওসমান নিজের অধিকার বিস্তার করবার চেষ্টা করেছে।

আনার মনে মনে প্রমাদ গণলো। শাহজাদা নেই। কোন রক্তচক্ষুর শাসন নেই। শুধু বৃদ্ধ উজীর সওকত খাঁ দুর্গের অধ্যক্ষ হয়ে আছেন, আর অন্তঃপুরের কর্ত্রী সে নিজে। দুজনেই শক্তিহীন, একজন রমণী ও অন্যজন পূর্বে শক্তিশালী ছিলেন এখন শক্তিহীন বৃদ্ধ। শুধু অভিভাবক হিসাবে শাহজাদা তাঁকে রেখে গেছেন।

আনার সেজন্যে বড় চিন্তিত হল। এই নতুন বিপদে সে কি করবে ভেবে পেল না।

ওসমান ছিল দুর্গের রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক। কার্যের সুবিধার জন্য তার বিচরণ ছিল সর্বত্র। নতুন উপাধি পেয়ে সে বুক ফুলিয়ে অসি কোষবদ্ধ করে অন্তঃপুর থেকে বারমহল সর্বত্র ঘুরতো। সে কারো নিষেধবাণী মানতো না, তার কারণ যদি শত্রু আসে, তখন তাকে এই দুর্গ রক্ষা করতে হবে।

কিন্তু মোগল-অন্তঃপুরের অবরোধ-প্রথা ছিল একটু কঠিন। যদিও শাহজাদা ও মমতাজ বেগম ছিলেন না তবু অন্তঃপুর অন্তঃপুরই। সেখানে বিশেষ কজন এবং পুরুষের মধ্যে এক শাহজাদা ছাড়া কারো প্রবেশের অধিকার ছিল না। এই কঠিন অবরোধের কথা সবাই জানতো, তাই সে-নিয়ম খণ্ডন করবার সাধ্য কারো ছিল না।

প্রথম প্রথম বাঁদীরা এসে কত্রী আনারকে জানাতো ওসমানের যথেচ্ছাচার! এমন কি ওসমান যে বাঁদীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের বলপূর্বক গ্রহণ করবার চেষ্টা করছে, তাও শুনলো আনার। কিন্তু সে কিছু বলতে সাহস করলো না এই জন্যে যে, যদি বললে কিছু অন্য বিপদ এসে যায়। আগুন জ্বলে ওঠে! সেজন্যে আনার শাহজাদার সংবাদ শোনার ইচ্ছায় মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হলেও চুপ করে থাকলো; কিন্তু আর চুপ করে থাকা সম্ভব হল না যখন একটি ঘটনা ঘটলো এবং সেই ঘটনাটি নিয়ে সমস্ত দুর্গের আকাশে বাতাসে ত্রাসের সঞ্চার হল।

একদিন রাত্রে হঠাৎ একটি রমণী-কন্ঠের চিল-চীৎকারে সমস্ত দুর্গের চারিদিক প্রতিধ্বনিত হল।

সমস্ত দুর্গপুরী তখন অন্ধকার হয়ে নিস্তব্ধতার মাঝে বিরাজ করছিল। সকলে তখন নিদ্রার কোলে। শুধু পাহারাদার জেগে আছে দুর্গের তোরণ দ্বারের মাথায় অলিন্দে শত্রুর আশায়। তাদেরই চোখে শুধু ঘুম ছিল না। তবু শেষ রাত্রে তাদেরও ঘুম আসছিল।

অন্ধকার সেদিন খুব একটা ছিল না। আশমানের চন্দ্রের রশ্মি মালা দুর্গের সর্বত্র প্রতিফলিত হয়েছিল।

সেই সময় এই চীৎকারটি সমস্ত দুর্গ মুখর করে প্রচারিত হল। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কক্ষের আলো জ্বলে উঠলো। অলিন্দে স্বল্প আলোর বিচ্ছুরণ ছিল, আরো আলোর প্রকাশ হল।

আনার গভীর ঘুমের মাঝে আচ্ছাদিত ছিল, আচমকা এই চীৎকারে সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বাইরে বেরিয়ে এলো। সে উঠে আসতে বাধ্য হল এজন্যে যে, তার কর্তৃত্বাধীনে সমস্ত অন্তঃপুর, তার কর্তব্য আছে, শাসন আছে এবং সমস্ত ব্যবস্থা সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব আছে। দায়িত্ব তার এত বেশী যে সর্বদাই সেজন্যে সচেতন।

সেজন্যে সে নিদ্রাজড়িত চোখেই বাইরের অলিন্দে এসে সংবাদ সংগ্রহের জন্যে ইতস্ততঃ তাকালো কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, একটি খোজা প্রহরী এসে রুদ্ধ নিশ্বাসে যা ব্যক্ত করলো তাতেই সে দারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো।

বাঁদীমহলের একটি বাঁদীকে রক্ষীবাহিনীর কে যেন বলপূর্বক গ্রহণ করবার জন্যে এই রাত্রে অনুচর দ্বারা তুলে নিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু বেশী দূর যেতে পারে নি। বাঁদী-মহলের পিছন পথেই বাঁদীটি জাগরিত হয়ে চীৎকার করে ওঠে, আর সেই চীৎকারে অনুচররা পালিয়ে যায়।

আনার সব ঘটনা শুনে গম্ভীর হয়ে বললো, সে বাঁদী কোথায়? সে তার কক্ষে।

আনার আর অপেক্ষা না করে প্রহরীকে নিয়ে সেই বাঁদীর কক্ষে গেল।

বাঁদীটি তখন হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে রোদন করছিল। আনার দেখল বাঁদীটি খুবসুরত জোয়ানী। অপহরণ করার মত কিছু আছে।

আনার গম্ভীর হয়ে ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলো—কান্না থামাও, এখন বলো এ সম্বন্ধে কি জানো?

বাঁদীর নাম গুলাবী।

গুলাবী আনারকে দেখে সপ্রতিভ হয়ে কান্না সংবরণ করলো। তারপর বললো—কদিন ধরে রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক তাকে জ্বালাতন করছিলেন। আমি তাঁকে বারবারই আপনাকে বলে দেব বলে ভয় দেখাতাম। একদিন তিনি এই বাঁদী-মহলে এসে আমাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করেন, আমি তার হাতে কামড় দিয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম। তিনি সেই আক্রোশে শাসিয়ে যান--কে তোমাকে রক্ষা করে দেখবো? আমি যখন তোমার প্রতি লুব্ধ হয়েছি তখন অন্তঃপুরের কর্ত্রীর সাধ্য নেই তোমাকে রক্ষা করে।

আনার হঠাৎ চীৎকার করে গুলাবীকে বললো—থাক্ থাক্ আর বলতে হবে না। একথা আগে বলো নি কেন?

গুলাবী ভয়ে ভয়ে বললো—আমি ভেবেছিলাম, এ হয়ত শুধু শাসানো ছাড়া কিছু নয়।

আনারের ক্রোধ তখন সপ্তমে উঠেছে। সে রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে বাঁদী মহল থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো। এসে সে নিজের কক্ষে ঢুকে ওসমানকে ডাকতে পাঠালো।

যতক্ষণ পর্যন্ত ওসমান না এলো সে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সমস্ত কক্ষময় পায়চারী করলো, দাঁতে দাঁত চেপে বললো—ওসমান, তুমি আনারের রমণী রূপ দেখেছ, আনারের সিংহীরূপ দেখো নি। একবার শুধু সেই ক্রোধের মধ্যে জেগে উঠলো একটি প্রশ্ন—ওসমান কি তার দুর্বলতা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে সুযোগ পেয়ে তাকে অবমাননা করছে! আবার পরক্ষণে সে দাঁতে দাঁত চেপে বললো—তাই যদি হয়, তবে এর পরিণতিও হবে মারাত্মক।

ওসমান কক্ষে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে রুদ্ধস্বরে চীৎকার করে বললো—ওসমান খাঁ, তোমার কি শাস্তি দিলে এর প্রতিকার হবে?

ওসমান খাঁও বোধহয় মনে মনে পরিকল্পনা তৈরী করেই এসেছিল। কিছুমাত্র দমিত না হয়ে সেও বললো—আমারও সেই একই কথা জিজ্ঞাসার আছে আনারবিবি!

খামোশ! আনার আরো জোরে চীৎকার করে উঠলো।

ওসমানও কণ্ঠে ঝাঁজ সৃষ্টি করে বললো—আওরতের শাসন মানবার মত সৈনিকপুরুষ আমি নই আনারবিবি। তাছাড়া এত যে আস্ফালন করছ, ভেবে দেখ আমার কাছে কী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলে?

আনার কিছুমাত্র শঙ্কিত না হয়ে বললো—তুমি তাই বলে গুলাবীর ওপর আক্রমণ করেছিলে কেন?

অন্তঃপুরের কঠিন অবরোধ ভেঙে চুরমার করে দেব বলে। তোমার কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ করবো বলে।

বেসরম, স্তব্ধ হও! শাহজাদা ফিরলে এর শাস্তি কি হবে জানো?

ওসমান হেসে বললো, শাহজাদা আর ফিরবেন না আনারবিবি!

কে বললো তিনি ফিরবেন না?

ওসমান হেসে বললো, আনারবিবি দেখছি কোন সংবাদই রাখেন না! তিনি বাদশাহী ফৌজের কাছে হেরে ফেরার হয়েছেন।

এ সংবাদ আনার জানতো না, তাই সে একটু অন্যমনস্ক হল।

এই সুযোগে ওসমান আরও একটু কাছে সরে গিয়ে বললো—আর কি করবে আনারবিবি? আমি জানি তোমার রূপ আছে, সে রূপ দিয়ে শাহজাদাকে রক্ষা করতে পারতে! কিন্তু এমন দুঃসময় এসে পড়লো যে তোমার সেই প্রার্থনা শোনবার তাঁর সময় হল না। তারপর আবার হেসে বললো—তাছাড়া শাহজাদা এখন রমণীর রূপ দেখবেন কি—পথের ফকির হয়ে বেগমের হাত ধরে পথে পথে ঘুরছেন! তুমি কেন মিছে তাঁর আশায় থেকে নিজের যৌবনটা কোরবানী দিচ্ছ। চেষ্টা তো অনেক করলে, এবার আমার ওপর প্রসন্ন হও। তোমার প্রতিজ্ঞাও পূরণ হোক্ আর আমি খুশি হই। বরং এসো, উভয়ে মিলে এই দুর্গটি অধিকার করে এর একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসি। তুমি আমার পাশে থাকলে আমি বিদ্রোহ করে সাম্রাজ্যের ভিত টলাতে পারি।

আনার ওসমানের কথায় তার মনের অভিপ্রায় বুঝে নিল। সে সেদিন ওসমানকে আরো কিছু বলে বিদায় করে দিল কিন্তু মনে মনে তার ক্রোধ প্রশমিত হল না! ওসমানের স্পর্দ্ধা যে গগনচুম্বী হয়েছে, এই ভেবে সে শঙ্কিত হয়ে অনেক কিছু ভাবতে লাগলো। আর ভাবতে লাগলো—শাহজাদার কথা। সে অন্যান্য লোকের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে জানলো যে ওসমানের কথা মিথ্যে নয়, শাহজাদা সত্যিই জগৎসিংহের সাহায্য পেয়ে বাদশাহী সৈন্যের সঙ্গে অসি বিনিময় করেছিলেন কিন্তু পরাজিত হয়ে আবার পালিয়েছেন। কোথায় গেছেন কেউ জানে না।

আনার এই দুঃসংবাদে মর্মাহত হয়ে নিজের নিরাপত্তা চিন্তা করলো—শাহজাদার পুত্রকন্যার কথা চিন্তা করলো। তাদের প্রত্যহ সান্ত্বনা দিয়ে রেখেছে, পিতার সংবাদ এলেই তারা সেখানে চলে যাবে। এখন যদি পিতার এই দুঃসংবাদ শোনে, তাহলে তাদের ধরে রাখাই শক্ত হবে। তাছাড়া তাদের প্রাণের আশঙ্কাও আছে। এই সুযোগে কে যে কোথা থেকে এদের প্রাণ সংশয় করবে কে জানে? কারণ এদের কারো প্রাণ বধ করতে পারলেই শাহজাদার ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হবে। একজন তো ওসমান রয়েছে, সে দেখতেই পাচ্ছে। ওসমান যে এই সুযোগে কি করবে আনার জানে না, তবে অনেক কিছুই করতে পারে ভেবে আনার গভীরভাবে চিন্তিত হল।

এরই মধ্যে সে আরো কবার সরাসরি আনারের কাছে এসে এক রকম তাকে শাসিয়ে গেল! সে বললো—আনারবিবি, তুমি যদি তোমার প্রতিজ্ঞা পূরণ না কর, তাহলে আমি যা খুশি তাই শুরু করবো। আমি তোমার সেই প্রতিজ্ঞার কথা সকলকে বলে দিয়ে তোমার সম্মান ধূলায় লুটিয়ে দেব। তারপর বললো—

কেন আর মিছে আশা করছো আনারবিবি? শাহজাদা আর ফিরবেন না, হয়ত কোন দিন সংবাদ শুনবে—তিনি আত্মহত্যা করেছেন! কেন তোমার কি স্মরণ নেই, এই দুর্গেই তিনি একদিন আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন!

আনারের সবই মনে আছে। কিন্তু সে এইসব কুচিন্তা মনে স্থান দিতে চায় না। এই সব চিন্তা মনে এলে সে পাগল হয়ে যাবে। সত্যি যদি তাই কোনদিন হয়, তাহলে শাহজাদার এই গুরুভার নিয়ে সে কি করবে? সে এক অসহায়া, সম্বলহীনা রমণী। সে কেমন করে শাহজাদার সন্তানগুলিকে লাহোরে বাদশাহের কাছে পাঠিয়ে দেবে? তাছাড়া তার নিজেরই বা কি অবস্থা হবে? শেষ পর্যন্ত ওসমানের আক্রমণে তাকে বশ্যতা স্বীকার করে জীবন বিসর্জন দিতে হবে? অনেক চিন্তা, অনেক সমস্যা। এই চিন্তার নাগপাশে আটকে পড়ে সে বিক্ষুব্ধ। তাই কাউকে না চটিয়ে সে কৌশলে নিজেকে শান্ত করে অপেক্ষা করতে লাগলো। এমন কি ওসমানকে বললো—শাহজাদার পরবর্তী সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

আসলে আনার এই সময়টা অতিক্রম করার জন্যে কৌশলের আশ্রয় নিল। কিন্তু ওসমান বোধহয় আনারকে চিনেছিল এবং সে বুঝেছিল আনার আবার সুযোগের অপেক্ষা করছে।

ওসমান আনারকে এরকম ভাবে না বুঝলে পরবর্তী ঘটনা ঘটতো না। এবং সেই ঘটনাতেই বোঝা গেল—ওসমান আনারের কথা একটুও বিশ্বাস করেনি। এর মধ্যেই একদিন গভীর রাত্রে আনার যখন নিজের কক্ষে ঘুমিয়ে আছে, সেই সময় ঘটনাটি ঘটল।

পাশের কক্ষে ধাত্রীর কাছে শাহজাদার শিশুপুত্র মুরাদ ও অন্যান্য সন্তানরা থাকতো। সে রাত্রেও তারা সেই কক্ষেই নিদ্রা যাচ্ছিল। আনার ছিল পাশের কক্ষে নিদ্রিতা হয়ে। কক্ষের দরজা খোলা। শুধু বাইরের অলিন্দে খোজা প্রহরী পাহারায় রত ছিল।

আনার তখন গভীর নিদ্রার কোলে। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল, কে যেন তাকে সবলে পিষে ফেলছে। দেহের ওপর একটি গুরুভার তাকে একেবারে নড়তে দিচ্ছে না। অনুমানে সে বুঝলো, কক্ষের মধ্যে সুযোগ পেয়ে কেউ ঢুকে তার ইজ্জত হানি করতে চাইছে তাছাড়া বক্ষের ওপরও পেষণের যাতনা। আনার বুঝতে পারলো, কে সে? তাই সে বিপদে বুদ্ধি হারালো না। আত্মসংবরণ করে সে নিঃশব্দে বালিশের আড়ালে রক্ষিত একটি বক্রাকৃতি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা হাতের মুঠিতে শক্ত করে ধরে আপন দেহের উপর রক্ষিত আততায়ীর বক্ষে সজোরে বসিয়ে দিল। আঘাতটা বোধহয় খুব জোর হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে একটি গোঙানির শব্দ উঠে দেহটা গড়িয়ে গেল আনারের দেহের ওপর থেকে। আনারের হাতে তখনও সেই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা। সে উঠে বসে পুনরায় সেই দেহ লক্ষ্য করে বহুবার যতত্র আঘাত হানলো।

তারপর সেই দেহের কোন সাড়া না পেতে সে ছুরিকা ফেলে দিয়ে কক্ষের অন্য প্রান্তে গিয়ে আলোর শিখা বাড়িয়ে দিল। তখনও সে উত্তেজনায় কাঁপছিল, উজ্জ্বল আলোর শিখায় সে দেখলো তার পালঙ্কের শুভ্র শয্যা রক্তে স্নান করছে, পড়ে আছে ওসমানের ক্ষতবিক্ষত নিস্পন্দ দেহ।

কিন্তু ওসমানের নিষ্প্রাণ দেহের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে হু হু করে কেঁদে উঠলো। এ সে কি করলো? শেষ পর্যন্ত ওসমানের রক্তে তার হাত কলুষিত হল! তার রমণী-জীবনে কলঙ্ক আরোপিত করতে হল। তার ফুলের মতন সুন্দর রূপের মাঝে অসুন্দরের ছায়াপাত ঘটল! শাহজাদার কথা সে ভাবলো। শাহজাদা যখন শুনবেন, তিনি কি মনে করবেন? অবশ্য তিনি সমস্ত কথা শুনলে খুসী হয়ে বলবেন—তুমি বীরাঙ্গনার মতই কাজ করেছ। কিন্তু আনার তো তাঁকে সব কথা বলতে পারবে না। ওসমানের কাছে যে একদিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে সে বেইমানী করেছে, এ কথা শুনলে শাহজাদা তারই শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। মোগলদের আইনে বেইমানীর শাস্তি বড় ভীষণ।

আনার আবার ভাবলো—ওসমান নিহত হয়েছে শুনলে দুর্গের পরিস্থিতি কি হবে? অধিনায়কের মৃত্যু হয়েছে শুনলে যদি রক্ষীবাহিনী বিদ্রোহ করে, তাহলে সে আওরত হয়ে কি করে ঠেকাবে? আনার সেই নিষুতি রাত্রে নিজের রক্তাক্ত হাতের দিকে তাকিয়ে অনেক কথা ভাবলো!

তারপর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হতে পেরে দিশেহারা হয়ে বাইরে বেরিয়ে প্রহরীকে ডেকে ওসমানের মৃতদেহ নিয়ে যেতে বলল।

সে রাত্রি কাটবার পর আরও একদিন কাটলো।

একদিনের পর আরো তিন দিন বিদায় নিল।

ওসমানের মৃত্যুর পর দুর্গের মধ্যে একটা থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। কেউ কিছুই প্রকাশ করছিল না অথচ অপ্রকাশিত একটি অর্থ কেমন যেন ত্রাসের মত সমস্ত দুর্গাভ্যন্তরে ঘোরাঘুরি করছিল। আনার মনে মনে শঙ্কিত হয়ে অনেক কিছুই ভাবতে লাগলো। অবশ্য তার ভাবনা ছাড়া কিছু নেই। এদিকে শাহজাদার পূর্ব সংবাদ দুর্গের সকলেরই কাছে জ্ঞাত হয়েছিল। তিনি যে আবার পরাজিত হয়ে পালিয়েছেন, সে সংবাদ কারো কাছে অবিদিত ছিল না। সেজন্যে সকলেই পরবর্তী সংবাদের অপেক্ষায় ছিল।

আনারও পরবর্তী সংবাদের অপেক্ষায় ছিল কিন্তু বিলম্বে সে শঙ্কিত হয়ে কোন ভয়ংকর ঘটনার প্রত্যাশা করছিল। তার এমনি ভয় করছিল, কেউ বুঝি তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। বা শাহজাদার সন্তানগুলি সরাবার মতলব করছে। আসলে হয়ত কেউই কিছু করছিল না, আনার শুধু ভয় পেয়ে এসব কথা ভাবছিল।

এমন কি আনার ভয় পেয়ে শাহজাদার সন্তানদের গোপনে শিক্ষা দিল সর্বদা সঙ্গে ছুরিকা রাখবার জন্যে। দারা জ্যেষ্ঠ, তাকে বললো—তুমি সর্বদা সতর্ক

থাকবে। এ সময় পিতা কাছে নেই, খুব সাবধান! কেউ তোমাকে স্পর্শ করতে এলে আঘাত করবে।

দারা সায় দিয়ে বললে—আমি শাহজাদা খুররমের পুত্র, সম্রাট আকবরের বংশধর! আমি কি কাউকে ডরাই?

সুজা বললো—আমাকে কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।

আর সর্বকনিষ্ঠ ঔরঙ্গজেব আদো আদো কণ্ঠে অথচ বলিষ্ঠভঙ্গিতে বললো—আমি পিতার সুনামই রাখবো।

আনার তারপর ভাবলো জাহানারার কথা। জাহানারার স্বভাবটি ঠিক মমতাজের মত হয়ে উঠছে। সে সর্বদা আনারের পিছু পিছু ঘুরে ফেরে। বয়স তো কম হল না, প্রায় বারো। আস্তে আস্তে তার শরীরে যৌবনের সৌন্দর্য উঁকি মারছে। তার মধ্যে রমণী-স্বভাব জেগে উঠছে। আনার একদিক দিয়ে যেন সেজন্যে পুলকিত কিন্তু অপর দিকে শঙ্কিত এইভেবে যে এর কৌমার্য রক্ষা হবে কেমন করে? এর ওপর তো শত্রুপক্ষ অত্যাচার করে শাহজাদার জীবনে দুঃখ দিতে পারে।

আনারকে আর বেশীদিন অপেক্ষা করতে হল না, এই পরিস্থিতির মধ্যেই একদিন শাহজাদার পত্র নিয়ে একটি দ্রুতগামী অশ্বারোহী দূত এসে উপস্থিত হল। শাহজাদা আনারকেই পত্রখানি দিতে বলেছিল বলে দূত তারই হাতে পত্র দিল। পত্রখানি উন্মুক্ত করে আনার রুদ্ধনিশ্বাসে পাঠ করে ফেললো। শাহজাদা কোন ভূমিকা না করেই কতকগুলি নির্দেশ দান করে পত্র শেষ করেছেন।

এই পত্র-বাহকের সঙ্গে আরো কটি অনুচর প্রেরণ করে দারা ও ঔরঙ্গজেবকে লাহোরে বাদশাহের কাছে পাঠিয়ে দেবে। 'আমি বারবার পরাজিত হয়ে শেষপর্যন্ত পিতার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি। এ আমার জীবনের কলঙ্ক কিনা জানি না, তবে ভেবে দেখলাম পিতার কাছে সন্তান সব সময়েই নিজের অপরাধ কবুল করে ক্ষমা চাইতে পারে। জানি, হিন্দুস্থানের লোক আমার অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা করবে। যাই হক পিতাকে কথা দিয়েছি আসীরদুর্গ ও রোটাসদুর্গ ছেড়ে দেব। সেজন্যে আমার কথা মত তুমি দারা ও ঔরঙ্গজেবকে লাহোরে পাঠিয়ে দিয়ে জাহানারা ও সুজাকে নিয়ে অবশিষ্ট লোকজনের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে চলে আসবে, আমি তোমাদের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। অধিক বিলম্ব করে আমার যন্ত্রণা বাড়িও না। জানবে, আমার সমস্ত বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব তোমাকে দান করে আমি গর্বিত।'

আনার সমস্ত পত্রখানি পড়ে উদ্বিগ্ন কিন্তু শাহজাদার লিখিত শেষ বাক্যটি অনুধাবন করে খুশি হল। শাহজাদা যে সুদূর প্রান্তে থেকেও আনারকে ভোলেন নি, তার জন্যে গর্বিত হল।

তারপর অতি দ্রুত ছায়াছবির মত দৃশ্যান্তর ঘটতে লাগলো।

দারা ও ঔরঙ্গজেবকে লাহোরে পাঠিয়ে দিয়ে আনার সমস্ত পরিবারবর্গ সঙ্গে নিয়ে দাক্ষিণাত্যের পথ ধরলো। দাক্ষিণাত্যে গিয়ে যখন পেঁছিলো তখন শুনলো,

শাহজাদা মমতাজবিবিকে নিয়ে কোথায় চলে গেছেন। কোথায় গেছেন কেউ বলতে পারলো না। আনারের সঙ্গে তখনও শাহজাদার কন্যা জাহানারা, শিশু পুত্র মুরাদ ও সুজা। আনার ঠিক করলো শাহজাদার পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সে দাক্ষিণাত্যেই অবস্থান করবে।

এদিকে তামাম হিন্দুস্থানের চতুর্দিকে এক দুঃসংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। বাদশাহের মহাবল সেনাপতি মহাবত খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। বাদশাহ ও রাজ্ঞী নুরজহান সেই মহাবতকে দমনের জন্যে সৈন্য সাজাচ্ছেন। মমতাজের পিতা আসফ খাঁও মহাবতকে দমনের জন্যে তাঁর পিছু পিছু বাহিনী নিয়ে ছুটছেন।

বিদ্রোহের সঠিক সংবাদ দাক্ষিণাত্যে আনারের কাছে বড় একটা এল না। তবে লোক মুখে প্রচারিত যে সংবাদ শুনতে লাগলো, তাতেই সে একটা পরিস্থিতি তৈরী করে নিল আর মনে মনে শাহজাদার মঙ্গলের জন্যে আল্লার কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলো

মাঝে মাঝে এক একটি সংবাদ দাক্ষিণাত্যে এসে সকলকে চমকে দিয়ে আবার বাতাসে মিলিয়ে যেতে লাগলো। সমুদ্রের স্রোত এসে ভূমির কিছু অংশ যেমন আবরিত করে আবার চলে যায় তেমনি মিলিয়ে যেতে লাগলো সংবাদগুলি।

তারপর আবার শোনা গেল, মহাবত খাঁ কৌশলে বাদশাহকে বন্দী করে সম্রাজ্ঞীকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে। মহাবত খাঁও যে সম্রাজ্ঞী নুরজহানের ঔদ্ধত্য স্বীকার না করে বিদ্রোহী হয়েছে এতেই আনুমানিক বোঝা গেল।

আনার মনে মনে সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের কথা চিন্তা করে তাঁর ধ্বংসই চাইলো। এই রমণীর জন্যে যে শাহজাদা আজ পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ভেবে সে সম্রাজ্ঞীর অমঙ্গল প্রার্থনা করলো। শাহজাদার কোমল প্রাণ, তিনি কোন অনিষ্ট করতে ভয় পেয়েছেন, আর তাছাড়া তাঁর ধমনীতে একই রক্তস্রোত প্রবাহিত, তিনি কোন ক্ষতি করতে ভয় পাবেন। সে জায়গায় মহাবত খাঁ কোন প্রতিশোধ নিতে ভয় পাবে না—এ জানা কথা।

কিন্তু আনার ভীত হল এই ভেবে যে, বাদশাহকে বন্দী করে এবং তাঁকে হত্যা করে যদি সিংহাসন মহাবত খাঁ অধিকার করে, তাহলে সমূহ বিপদ! তাহলে শাহজাদা প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবেন এবং চিরতরে মোঘলসাম্রাজ্যের সূর্য অস্তমিত হয়ে সিংহাসন হস্তান্তরিত হবে। এই কথা ভেবে সে শাহজাদা খুররমের কথা স্মরণ করে চিন্তিত হল—তিনি কি এ সম্বন্ধে কোন সংবাদই রাখেন না, না পরিস্থিতির গতি কোন দিকে ধাবিত হয় দেখে তিনি প্রতীক্ষারত?

আবার আর একটি শোকের বার্তা ছুটে এল—কে বা কারা জাহাঙ্গীর শার

জ্যেষ্ঠপুত্র খসরুকে হত্যা করেছে। অনেকে বলেছে—এ কাজ শাহজাদা খুররমের! আনার সেই সংবাদ শুনে আতঙ্কিত হয়ে নিজে নিজেই বললো—না না এ হতে পারে না। শাহজাদার প্রাণ বড় কোমল, আপন স্বার্থের জন্যে নিজের ভ্রাতাকে হত্যা করতে পারেন না। অন্য কেউ বিশ্বাস করলেও সে কখনও বিশ্বাস করবে না।

কেউ জানতে চাইছে না সংবাদের আসল রূপ। সংবাদ শুনেই আলোচনা হচ্ছে এবং তারপর আগামী পরিস্থিতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করে আবার পরবর্তী সংবাদের আশায় সকলে অপেক্ষা করছে।

আনার কিন্তু তা করছে না। আনার সংবাদের শুভাশুভ চিন্তা করে গুরুত্ব পরীক্ষা করছে এবং সে সংবাদের কতখানি সত্য তা স্থির করে তার পরিণতি ভাবছে।

লাহোর থেকে কাবুলের পথে ঝিলম্ নদীর পূর্বতীরে পট্টাবাসে সম্ভবতঃ নৌরঙ্গাবাদে সম্রাট জাহাঙ্গীর হাজার হাজার রাজপুত সৈন্য পরিবেষ্টিত মহাবত খাঁর কবলে বন্দী হয়েছেন। নূরজাহান তখন মুক্ত ছিলেন, তিনি ভ্রাতা আসফ খাঁর সাহায্যে সম্রাটকে মুক্ত করবার জন্যে নিজের সমস্ত বুদ্ধি ও কৌশল নিয়োজিত করেন কিন্তু সে চেষ্টা তাঁর বিফল হয়। এমন কি ধূর্ত মহাবত সম্রাজ্ঞীকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে বাদশাহকে প্রলোভিত করে সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুদন্ড লিখিয়ে নেন। কিন্তু পরে বাদশাহ নূরজাহানের ক্রন্দনে করুণাক্ত হয়ে স্বীকার করেন—তার ইচ্ছা ছিল না, সম্রাজ্ঞীর কোন অপরাধেরই শাস্তি তিনি প্রয়োগ করেন, শুধু মহাবতের কথায় বাধ্য হয়ে তিনি এই আদেশ দিয়েছেন।

দাক্ষিণাত্যে এমন কতকগুলি সংবাদ আসতে লাগলো যা একান্ত অবিশ্বাস্য। আবার সেই সংবাদগুলি বিশ্বাস করলে এমন অর্থ হয় যা ভয়ঙ্কর। অথচ সংবাদগুলি কাগজের এক একটি টুকরোর মত বাতাসে উড়ে আসতে লাগলো।

এরই মধ্যে আবার আনার শুনলো—বাদশাহের এই দুরবস্থায় সাহায্য করবার জন্যে যোগ্যপুত্র শাহজাদা খুররম সৈন্য সংগ্রহের জন্যে চতুর্দিকে ঘুরছেন। তিনি পিতার লাঞ্ছনা মোচনের জন্যে উদ্বিগ্ন। আনার এই কথা শুনে মনে মনে পুলকিত হল। আবার সংবাদ এলো—শাহজাদা অল্প সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে নাসিক থেকে যাত্রা করেছেন কিন্তু পথিমধ্যে অনুচরদের বেইমানিতে তাকে আবার পশ্চাদ্ধাবন করতে হয়েছে।

দেখতে দেখতে ছায়াছবির মত ঘটনাগুলি পর পর অদৃশ্য হতে লাগলো। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সেই ষোলশ সাতাশ সাল বড় ভয়ঙ্কররূপে আবির্ভূত হয়েছিল। তখন বিদ্রোহ প্রশমিত হয়েছে। কিন্তু পর পর আঘাত এসে বাদশাহকে একেবারে ভঙ্গ করে দিল। একে বয়স অধিক হওয়ার জন্যে বার্ধক্য উপস্থিত হয়েছিল, তার ওপর পর পর উদ্বেগ, অশান্তি তাঁকে একেবারে ক্ষতবিক্ষত করে দিল। প্রথমতঃ তাঁর প্রিয়পুত্র শাহজাদা খুররমের ব্যবহারে তিনি ভীষণ মর্মাহত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ প্রিয় সেনাপতি মহাবত খাঁর বিদ্রোহে আরো ভেঙ্গে পড়লেন। তিনি সে সময় বার বার বলেছিলেন—আমি যাদের সবচেয়ে স্নেহ করেছি, তারাই আমার বিরুদ্ধাচরণ করলো।

তারপর খসরুর নিহত হবার সংবাদে তিনি কেঁদেছিলেন। বিদ্রোহ প্রশমিত হলে শাহজাদা পরভেজের আকস্মিক মৃত্যু ঘটলো। মাত্র কয়ঘণ্টায় কুমার পরভেজ অসুস্থতা অনুভবে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

এই সব কারণে ১০৩৭ হিজিরায় সম্রাট জাহাঙ্গীরের পীড়া হল। তিনি তখন কাশ্মীরে। দিনদিন তাঁর আহার বন্ধ হয়ে আসলো। কপাত্র দ্রাক্ষারস ছাড়া আর কিছুই পান করবার উপায় থাকলো না।

তারপরেই তাঁর মৃত্যুর কথা চতুর্দিকে রটে গেল।

সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহ মৃত্যু হয়েছে এই সংবাদ যত না মর্মান্তিত হল, ততবেশী প্রচারিত হল, —শূন্য সিংহাসন এবার কার ভাগ্যে জুটবে? কে সেই ভাগ্যবান পুরুষ, যার শিরে প্রজ্বলিত হবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত মুকুটের দ্যুতি? সেসময়ে সবলে খুঁজতে লাগলো শাহজাদা খুররমকে। সেই শাহজাদা খুররম এখন কোথায়?

আনার তখন দাক্ষিণাত্যের প্রাসাদে বসে আল্লাকে জোড়হাত করে ডাকছে, —হে খোদা, আমার অন্তরের সেই একান্ত পার্থিব পুরুষকে সিংহাসন দাও, তিনি যদি এবার সিংহাসন অধিকার করতে না পারেন, তাহলে আর জীবন রক্ষা করবেন না।

এদিকে আবার সংবাদ আসতে লাগলো, যে মমতাজের পিতা আসফ খাঁ তাঁর আসল স্বরূপ বের করেছেন। শাহাজা খুররম যাতে সিংহাসন পান সেজন্যে ভেতরে ভেতরে অনেকদিন চেষ্টা করছিলেন, এবার সম্রাটের মৃত্যুতে সম্পূর্ণ শক্তি ও কৌশল নিয়ে এগিয়ে এলেন।

আসফ খাঁ খুব শীঘ্রই ইরাদত খান্‌খানি আজমের সঙ্গে পরামর্শ করে মৃত শাহজাদা খসরুর পুত্র দাওয়ার বক্‌শকে বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে তাকেই রাজ্যের আশা দিলেন। তারপর তাকে অশ্বে আরোহণ করিয়ে মস্তকে রাজছত্র দিয়ে লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হলেন।

এদিকে সম্রাজ্ঞী নুরজাহান ভ্রাতাকে বহুবার সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ করলেন কিন্তু আসফ খাঁ ভগ্নীর বহু অত্যাচার পূর্বে সহ্য করলেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে দেখা করলেন না। এমন কি সর্বদা তিনি ভগিনীর কাছ থেকে একদিনের পথের দূরত্বে অবস্থান করতে লাগলেন।

শাহজাদা খুররম তখন মহাবত খাঁর সঙ্গে গোলকুণ্ডায় একস্থানে বাস করছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়েছিল। বারাণসী নামক একজন সুদক্ষ বীর দ্রুতগামী দূত আসফ খাঁর কাছ থেকে অভিজ্ঞান স্বরূপ অঙ্গুরী নিয়ে শাহজাদা খুররমের কাছে গিয়ে পৌঁছলো। শাহজাদা আর কালবিলম্ব না করে তখনই যাত্রা করলেন।

এদিকে আসফ খাঁ জামাতার সিংহাসন নিরাপদ রাখবার উদ্দেশ্যে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের বাধা দেবার জন্যেই দাওয়ার বক্‌শকে সিংহাসনের আশা দিয়ে দাঁড় করিয়েছিলেন।

শাহজাদা তখন মমতজক সঙ্গ নিয়ে দাক্ষিণাত্যে আনারের কাছে গিয়ে সকলকে নিয়ে লাহোরে ফেরবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।

সেইসময় ভীমবর নামক স্থান থেকে রীতিমত রাজসিক আয়োজন সহকারে সম্রাট জহাঙ্গীরের মৃতদেহ এনে লাহোরে নূরজাহানের উদ্যানে সমাহিত করা হল। এই জায়গায় অন্যান্য আমীরেরা আসফ খাঁর অভিসন্ধি বুঝতে পেরে তাঁরই মতে চলতে লাগলেন। দাওয়ার বক্‌শ সম্রাট বলে রীতিমত ঘোষিত হলেন এবং ভীমবরে সেদিন তাঁরই নামে খোতবা পড়া হল।

নূরজাহান ভ্রাতার দুঃসাহসে চমকিত হলেন। তিনি আমীর ও ওমরাহদের স্বপক্ষে এনে তাঁদের উত্তেজিত করে সিংহাসন নিজের জামাতা, সম্রাটের কনিষ্ঠপুত্র শাহরিয়াকে দেবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। কিন্তু আসফ খাঁ সে চেষ্টা বিফল করবার জন্যে তাঁকে বন্দিনীর মত আটক করে রেখে দিলেন।

এদিকে শাহরিয়া পিতার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র লাহোরের রাজকোষ অধিকার করে বসলেন। সেখানে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সৈন্যদল সৃষ্টি করলেন। শাহরিয়ার সঙ্গ যুক্ত হল নূরজাহান-কন্যা লাডিলী। লাডিলী স্বামীকে সম্রাট করবার জন্যে ক্ষিপ্ত হয়ে সকলকে উত্তেজিত করতে লাগলো। এইসময় শাহজাদা দানিয়েলের ভ্রাতুষ্পুত্র মীর্জা বাইশিন্দার লাহোরে এসে শাহরিয়ার আশ্রয় নিলেন। শাহরিয়া পিতৃব্যকে সেনাপতি করলেন। তিনি সৈন্যদল নিয়ে নদী পার হয়ে অপর তীর সুরক্ষিত করে অবস্থান করতে লাগলেন।

আসফ খাঁ ও দাওয়ার বক্‌শ হাতী চড়ে আসতে আসতে দেখলেন, নদীতীরে তিনক্রোশ জুড়ে বিপক্ষ সৈন্য দল দাঁড়িয়ে আছে। তাঁদের সৈন্যের সংখ্যাও কম ছিল, সেজন্যে তাঁরা ভীত হলেন কিন্তু পরে যখন যুদ্ধ বাধলো, তখন শাহরিয়ার অশিক্ষিত সৈন্যরা গোলাঘাতে ভীত হয়ে অস্ত্রচালনার পূর্বেই রণে ভঙ্গ দিল। দূরে পর্বত শিখরে তিন সহস্র অশ্বারোহী নিয়ে শাহরিয়া দাঁড়িয়েছিলেন। সৈন্যদলের দুরবস্থায় সদলে শিখর থেকে নেমে দুর্গাশ্রয় করলেন।

আসফ খাঁ কিন্তু পরদিন সুশিক্ষিত সৈন্য ও বীরদের সাহায্যে দুর্গ অধিকার করলেন। শাহরিয়া সেই দুর্গের অন্তঃপুরে লুকোলেন। আসফ খাঁ তাঁকে ধরে নিয়ে এলেন। দাওয়ার বক্‌শের আদেশে পরদিন তাঁর চক্ষু দুটি নষ্ট করে দেওয়া হল।

শাহজাদা খুরম যখন গোলকুণ্ডা থেকে গুজরাটের পথ ধরে দাক্ষিণাত্যে এসে পৌছলেন তখন আনাররা যেখানে ছিল সেখানে এসেই দূত পুনরায় পূর্ববৃত্তান্ত সব শাহজাদাকে জানালো। শাহজাদা সেই দূতের হাতে শ্বশুর আসফ খাঁকে পত্র লিখে পাঠালেন। লিখলেন—শত্রুকে অবশিষ্ট রাখতে নেই, সুতরাং অবিলম্বে কণ্টকশূন্য করবার জন্যে খসরুর পুত্র দাওয়ার বক্‌শ, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহরিয়া ও শাহজাদা দানিয়েলের পুত্রদের হত্যা করবেন।

এই কথা লিখে দিয়ে শাহজাদা খুরম শাহজাহান উপাধি ধারণ করলেন, এবং সপরিবারে আগ্রা গমন করে সর্ববাদীসম্মতিক্রমে সম্রাট বলে গৃহীত হলেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় সম্রাট আকবরও যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন তাঁর সিংহাসন নিয়ে যুবরাজ সেলিম ও সেলিমের পুত্র খসরুর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। তখন খসরুর পক্ষে ছিলেন মহারাজা মানসিংহ। মানসিংহ চেয়েছিলেন খসরু সিংহাসনে বসুক কিন্তু দূরদর্শী সম্রাট আকবর মৃত্যুর আগে তাঁর প্রিয়তম পুত্র সেলিমকে ডেকে সেই রাজ্যভার তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন—পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যোগ্য-পুত্রই হয়, আমি সেই কর্তব্য পালন করলাম। সেদিন যদি সম্রাট জীবিতাবস্থায় পুত্রকে ডেকে রাজ্যভার না দিতেন, তাহলে ষড়যন্ত্র কোথায় গিয়ে পৌঁছতো বলা মুস্কিল।

যেমন ষড়যন্ত্র হল শাহজাহানের সিংহাসন প্রাপ্তির সময়। জাহাঙ্গীর যদি বেঁচে থেকে এই রাজ্যভার শাহজাহানকে দিয়ে যেতেন, তাহলে কোন গোলই হত না। কিন্তু আল্লা তাঁকে সে সময় দেন নি। দিতে গেলেও তাঁর প্রিয়তমা মহিষীই তাতে নিশ্চিত বাধা দিতেন।

বাদশাহ যে তাঁর প্রিয়তম পুত্র শাহজাহানকে ভালবাসতেন তার অনেক নিদর্শন বাইরে প্রকাশ ছিল। পুত্রের বিদ্রোহ এবং নিজের বার বার পরাজয়ে দুঃখিত হয়ে তাকে গোপনে পত্র লিখে জানিয়েওছিলেন—'তুমি কেন এরূপ আচরণ করে আমার প্রাণে আঘাত সৃষ্টি করছো?' এবং সম্রাটই কৌশল করে শাহজাহানের দুটি সন্তানকে নিজের কাছে এনে পুত্রের যথেচ্ছাচার বন্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

নূরজাহান পরে বুঝেছিলেন সম্রাটের দুর্বলতা কোথায়? তাই তাঁর বিদ্বেষভাব কমিয়ে সম্রাটের মনোভিপ্রায় মত শাহজাহানের ওপর অত্যাচারের মাত্রা লঘু করে দিয়েছিলেন।

যাই হক শাহজাহানের সিংহাসনলাভে মৃত সম্রাটের ইচ্ছাই পূর্ণ হল। যদি অতৃপ্ত অবস্থায় তাঁর আত্মা যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে, তাহলে এই মনোমত কার্যে নিশ্চয় তা শান্তির কোলে সমাহিত হবে।



আগ্রার হীরা-জহরত-মণিমাণিক্যখচিত তীব্র ঔজ্জ্বল্যের দ্যুতিতে প্রতিফলিত সিংহাসনের উচ্চবেদীতে বসে মস্তকে ততোধিক ঔজ্জ্বল্যমান মুকুট পরে আবুল মজফফর শাহাবুদ্দিন মহম্মদ সাহিব কিরানসানী শাহজাহান পাদিশাহ গাজী।

যেদিন সিংহাসনে শাহজাহান বসলেন এবং সম্রাটের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হল, সেদিন সমস্ত রাজ্যময় এক বিরাট উৎসব ও আনন্দের জোয়ার সৃষ্টি হল। ভবিষ্যতের সৃষ্টিকারী ময়ূরসিংহাসনের অধিষ্ঠাতা সেদিন সমস্ত কোষাগার উন্মুক্ত করে প্রজাদের ইচ্ছানুযায়ী লুণ্ঠনের সুযোগ দিলেন। সরাবের অসংখ্যক স্বর্ণভৃঙ্গার শুধু পূর্ণ

হয়ে নিঃশেষিত হল। আতরের সুগন্ধে, রঙবেরঙের পুষ্পস্তবকের সৌরভে আমোদিত হল আগ্রার প্রাসাদের কক্ষগুলি। রঙমহলের মূল্যবান কাশ্মিরী কার্পেটের ওপর অক্লান্তভাবে নর্তকীর চরণের নূপুর-ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলো। নহবতখানায় সমস্ত দিনরাত্রি ধরে মালকোষ, টোড়ী, জয়-জয়ন্তী রাগে সুমধুর সানাই বেজে চললো। আনন্দবার্তা ধারণ করে শুভ্র পারাবত উড্ডীন হল। তোপধ্বনি হল মুহুর্মুহু! সে এক বিচিত্র সুখকর দিনের প্রাণোজ্জ্বল মুহূর্ত। যমুনার শান্ত স্বচ্ছ জলে লাগলো প্রচন্ড মাতন।

নতুন সম্রাটের সিংহাসন প্রাপ্তির শুভমুহূর্তে সমস্ত হিন্দুস্থান উজাড় করে লোক আসতে লাগলো। তাদের কলস্বরে প্রাসাদের দরবারকক্ষ মুখর হয়ে উঠল। শাহজাহান পিতার রাজমুকুটই পরিধান করেছিলেন। এই মুকুট সম্রাট আকবর কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। তাই তার অভিনবত্ব ছিল বড় অদ্ভুত। মুকুটের দ্বাদশটি কোণ ছিল। প্রত্যেক কোণে পনেরো লক্ষ টাকার এক একটি হীরকখন্ড, মধ্যভাগে পনেরো লক্ষ টাকার একটি মুক্তো এবং অন্যান্য অংশে দু'শত চুনি ছিল। প্রত্যেক চুনির দাম দু' হাজার টাকা।

শাহজাহান সেই দুর্লভ মুকট পরিধান করে আমীর ও ওমরাহদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সিংহাসনে বহুক্ষণ ধরে বসেছিলেন। তাঁর প্রশান্ত মুখের ওপর এক অস্বাভাবিক জ্যোতি প্রতিফলিত হয়েছিল, তিনি মৃদু হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে আগত মেহমান আদমীদের কুর্নিশ গ্রহণ করেছিলেন।

হ্যাঁ, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এই সিংহাসন ও রাজমুকুট। শাহজাহান সিংহাসনে বসেও ভাবতে পারছেন না তিনি আজ সমস্ত হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র সম্রাট! তাঁর হুকুমে প্রতিটি প্রাণী খিদমৎ খাটবে। তাঁর চেয়ে ধনবান, শক্তিমান কেউ নেই, থাকলেও তারা মাথা নত করে বশ্যতা স্বীকার করবে, এই আনন্দে শাহজাহানের হৃদয় পূর্ণ হয়েছিল।

মমতাজের পিতা আসফ খাঁ জামাতাকে সিংহাসনে বসিয়ে চতুর্দিকে শ্যেনদৃষ্টির পাহারা দিয়ে চলেছেন। এ দিন বড় শুভদিন। এ দিনটিকে উপলক্ষ্য করে আল্লার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়। কিন্তু এদিনে শয়তানের ছুরিকাও ঝলসে ওঠে। কারণ একজনের সিংহাসন প্রাপ্তিতে বহুজনের ঈর্ষা প্রণোদিত হয়। যদিও উত্তরাধিকারী শাহজাদারা নিহত, তাদের সম্পূর্ণ নির্মূল করেই শাহজাহান নিষ্কণ্টক ভাবে সিংহাসন অধিকার করেছেন, তবু আমীর ওমরাহও ষড়যন্ত্র করে সম্রাটের গদি থেকে নামিয়ে দিয়ে নতুন কাউকে সিংহাসনে বসাতে পারে। কারণ অবশ্য কিছু নেই, তবে ঈর্ষার তীক্ষ্ণতা বড় তীব্র, সেই ঈর্ষাই এ কাজে উৎসাহ দিতে পারে।

এদিকে যেমন প্রাণোজ্জ্বল উৎসবে অতিথি অভ্যাগতের আসা যাওয়ার বিরাম নেই, তেমনি সাবধান হবার জন্যে চতুর্দিকে ছদ্মবেশী গুপ্তঘাতক শ্যেনদৃষ্টির পাহারা দিয়ে চলেছিল। তাদের আদেশ দেওয়া আছে, একটু বেখাপ্পা দেখলেই বিনা আদেশে তাকে বধ করে সরিয়ে দেবে। আসফ খাঁ তাদেরই পরিচালনা করছিলেন নিঃশব্দে।

শাহজাহান একজন রূপবান পুরুষ। তার গোলাপী বর্ণ দেহের খাঁজে খাঁজে গোলাপের নির্যাস। চোখ দুটিতে তাঁর সুরমার অঞ্জন। সুরমা আঁকা চোখের দুটি মণিমধ্যে দীপ্তিতে হাজারো ঝাড়ের প্রতিফলন। সম্রাটের প্রশস্ত ললাটের ওপর ঠিক মুকুটের নিচের অংশে অস্বাভাবিক স্বর্ণময় দ্যুতি। প্রশস্ত ললাটের অসামান্য দীপ্তিশোভা যে অন্য সব পুরুষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এই অর্থই প্রকাশ করেছে। সমস্ত দরবার কক্ষ স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক নানান রত্নের শোভায় সজ্জিত হয়েছিল, তার ওপর ছিল হাজারো হাজারো পুষ্পের বিচিত্র সজ্জা। পুষ্পেরই ক্রীড়া সর্বত্র। বাতাসে তাদেরই গন্ধমিশ্রণ বেশী। সম্রাটের হাতেও একখন্ড গোলাপ পুষ্প। তিনি সেই গোলাপ হাতে করে নিদর্শন সৃষ্টি করেছিলেন—যে শুধু অসি দিয়েই তিনি এই রাজ্য শাসন করবেন না, মায়া, মমতা, অনুগ্রহ প্রদর্শন করেও প্রজাদের ভালবাসা দান করবেন। অবশ্য এই অন্তর্নিহিত ভাব ছাড়াও সম্রাটের শিল্পসৌন্দর্যের খ্যাতি প্রচার করবার জন্যেও এর প্রয়োজন ছিল।

সকলের ইচ্ছা ছিল, সম্রাটের প্রিয়তমা মমতাজবেগম সম্রাজ্ঞীর আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে সিংহাসনের উজ্জ্বলতা বাড়ান। মমতাজের কাছে সম্রাটও সেই আর্জি পেশ করেছিলেন, তাতে বেগম মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—তুমি তো আছো, সমস্ত সিংহাসন আলো করে, সেখানে আমার স্থান কি বেমানান হবে না?

শাহজাদা বলেছেন—হেঁয়ালী রাখো মমতাজ। সিংহাসনে আজ তোমাকেও আমার সঙ্গে এক আসনে দেখতে চায় প্রজারা।

তখন মমতাজ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সংযতকন্ঠে বলেছেন, তুমি গোঁসা কর না প্রিয়তম। আমি আজ সবচেয়ে সুখী, তোমার মস্তকে রাজমুকুট দেখে। আমার বহুদিনের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। যদি বক্ষ উন্মোচন করে দেখাতে পারতাম, তাহলে দেখতে সেখানে কি আলোড়ন হচ্ছে?

শাহজাহান বললেন—তাহলে চলো না সেই আনন্দ আরো উপভোগ করবে আমার পাশে বসে উপবেশন করে!

মমতাজ মাথা নেড়ে বললেন—না সম্রাট, আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা জাগে না, সম্রাজ্ঞীর আসনে বসি। আমি জননী, আমার সন্তানদের মাঝেই আমি মূর্ত হয়ে থাকতে চাই। আর সমস্ত হিন্দুস্থানের প্রজাদের জননী যদি হতে পারি, সেই চেষ্টা করবো। আমি তোমার বেগম, সুখে ও দুঃখে আমার প্রেরণাই যেন তোমাকে শক্তিমান করে।

শাহজাহান বললেন, সে পরীক্ষায় তো সাফল্যলাভ করেছ। তবে কেন আজ এইদিনে এমনি কথা বলে মন খারাপ করে দিচ্ছ?

মমতাজ হঠাৎ প্রাসাদের বাইরে কান পেতে বললেন—শুনছো না, অগণিত জনগণ কার জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করছে!

শাহজাহান বললেন—সে তো তোমারই অবদান প্রিয়তমা?

মমতাজ মাথা নেড়ে বললেন—না, সে ঐ খোদার অনুগ্রহ। তুমি যাও, সম্রাট

দরবারে যাও। আজ এই শুভদিনে আমার কাছে থেকে মন খারাপ করো না। আজ আমার কেবল অতীতের সেই অন্ধকার দিনগুলির কথাই মনে পড়ছে।

শাহজাহান আবার বললেন—সেদিন তো গত হয়েছে বেগম, তবে কেন তাদের তুমি মনে করছো? দুনিয়াতে কোন বৃহৎ আশা পোষণ করলে ওরকম লাঞ্ছনা মাঝে মাঝে সহ্য করতে হয়। আমি তার জন্যে আজ কিছু মনে করি না।

মমতাজ বললেন—আমিও মনে করি না। কিন্তু আজ এই বিরাট জাঁক-জমকপূর্ণ প্রাসাদের ঐশ্বর্যমণ্ডিত কক্ষে স্বর্ণখচিত কেদারায় বসে বারবার সেই হারানো অন্ধকার দিনের কথাই মনে হচ্ছে।

শাহজাহান শেষপর্যন্ত বেগমকে সম্রাজ্ঞীর আসনে বসাতে রাজী করতে না পেরে ব্যথিত হয়ে চলে এলেন। তিনি বুঝলেন—তাঁর সেই অবহেলার প্রতিশোধ আজ মমতাজ নিজে অভিমানী হয়ে উঠছে। সেদিন অবশ্য তিনি অপরাধই করেছিলেন। মমতাজের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে তাকে লাঞ্ছনা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন যদি জানতেন—মমতাজের পিতা আসফ খাঁ মনে মনে তাঁরই সিংহাসন কায়েমী করবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় আছেন, তাহলে সেদিন কিছুতে মমতাজকে তিনি অবিশ্বাস করতেন না। কিন্তু কি করে তিনি বুঝবেন—আসফ খাঁ সেদিন বাদশাহের পক্ষ নিয়ে অগণিত সুশিক্ষিত সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করেছিলেন, একবার নয় একাধিকবার। অথচ সেই আসফ খাঁর মনে ছিল অন্য পরিকল্পনা। শাহজাহান এত চতুর হয়েও এই কৌশলটি কিছুতে বুঝতে পারেন নি। এই রাজনীতি বোঝা তার অসাধ্য ছিল বলেই তিনি মমতাজকে অজানিতভাবে অবহেলা করেছিলেন। আজ সেইজন্যেই মমতাজের ওপর তাঁর অনুগ্রহ সব চেয়ে বেশি।

মমতাজ সম্রাজ্ঞীর আসন অলংকৃত করলেন না দেখে অগণিত অভ্যাগতরা ক্ষুব্ধ হলেন এবং কোন কারণ শুনতে না পেয়ে একটু গুঞ্জনও সৃষ্টি করলেন।

কন্যার এই অনিচ্ছা প্রকাশে তাঁর মনের অভিসন্ধি জানার জন্যে আসফ খাঁ নিজে কন্যার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন—'অর্জমন্দ, আজ এই শুভদিনে, এমনি আনন্দের মাঝে তুমি এরকম আচরণ করছো কেন? যদি তোমার মনে কোন যন্ত্রণা থাকে, তা অন্ততঃ আজকের দিনের জন্যে সংবরণ করে অতিথিদের ইচ্ছা পূরণ কর। তাঁরা তোমাকে সম্রাটের পাশে একান্ত দেখার অভিপ্রায়ে ব্যগ্র হয়ে এখন তোমার অনুপস্থিতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। আমি জানি তুমি বিরুদ্ধস্বভাবের কোন কাজই কর না, কিন্তু যা তোমার ভাল লাগে না, অন্যের ভালোর জন্যেও তো তুমি করতে কখনও দ্বিধা করতে না! আজ কেন তার ব্যতিক্রম?'

মমতাজ মাথা নত করে বললেন—আমি কি করলে সকলের মনোঃপূত হয় বলুন, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তা আমি করবো।

তাহলে তুমি সম্রাটের পাশে বসে আমীর ওমরাহদের দর্শন দাও!

মমতাজ কোন কথা বললেন না, শুধু অসোয়াস্তি প্রকাশ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আসফ খাঁ বুঝলেন কন্যার মনের কথা। তারপর বললেন—বেশ সবার সামনে যখন দেখা দিতে না চাও, তাহলে অন্ততঃ জাফরীর আড়াল থেকে তাঁদের দর্শন দিয়ে খুশি কর।

মমতাজ মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন—আপনি আসুন পিতা, আমি প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছি।

আসফ খাঁ চলে গেলে মমতাজ বেশ পরিবর্তন করে দরবার কক্ষের ওপরের অলিন্দের মাঝে গিয়ে আমীর, ওমরাহদের দর্শন দিলেন। আবার সকলের উল্লাস ধ্বনিতে মুখরিত জয়সূচক শব্দ প্রাসাদের মর্মরসোপানে আছড়ে পড়লো। জয়ধ্বনি উঠলো সম্রাটের নামে। জয়ধ্বনি উঠলো সম্রাজ্ঞী মমতাজের নামে।



প্রাসাদের চতুর্দিকে যখন এমনি আনন্দলহরী গড়িয়ে গড়িয়ে সমস্ত সোপান মুখর করছিল, সে সময় একজনকে দেখা যাচ্ছিল না। সে কোথায়? এ প্রশ্ন অবশ্য কারুরই মনে নেই, এমনি যাঁর সবচেয়ে বেশি মনে আশা উচিত সেই সম্রাট শাহজাহান তখন সিংহাসনে বসে স্তুতি শুনতেই ব্যস্ত। তা ছাড়া পরণে তাঁর বাদশাহের বহুমূল্য রত্নখচিত কামিজ, মস্তকে সূর্যরশ্মিসনিভ মুকুট শোভা পাচ্ছে। তিনি এখন আড়ম্বরপূর্ণ পোষাকে আড়ম্বরের মাঝে বিচরণ করছেন। সামনের দিকেই তাঁর দৃষ্টি। অজস্র কুর্নিশ, অসংখ্য বাদশাহের নজরানা স্বর্ণ রেকাবপূর্ণ হয়ে এসে পৌঁছচ্ছে, তিনি সেদিকেই তাকিয়ে আছেন। গ্রহণ করছেন লাখো লাখো সম্মান, সম্মানের ভরেই অবনত। তাঁর এখন অন্য কথা ভাববার সময় কোথায়? কত চেষ্টার পর এই সিংহাসন, এ সিংহাসনের মোহে এত তিনি মুগ্ধ যে অন্য সব বিস্মৃতির অতলে। তাই কে কোথায় এ উৎসবে যোগদান করলো না, তাঁর দেখবার সময় নেই। এমনকি কে কোথায় বসে কাঁদতে থাকলো, তারই বা সন্ধান নেবার সময় কোথায়?

এমনকি মমতাজও সেদিন আনারের কথাবিস্মৃত হয়েছিলেন। তিনি অবশ্য এ ভাবেন নি যে আনার এই উৎসবে যোগদান না করে কক্ষের মাঝে অশ্রুত্যাগ করে নিজেকে অন্তরীণ করেছে। ভাবলে অবশ্য তিনি কক্ষের বাইরে নিয়ে আসতেন।

এই মমতাজের জন্যেই আনার অন্তঃপুরের বিশেষ একটি কক্ষ লাভ করেছিল। মমতাজ তাকে দিয়েছিলেন সম্মান, দিয়েছিলেন ইজ্জত, দিয়েছিলেন অনেক ধনরত্ন যা অন্য কারও ভাগ্যে জোটা দুর্লভ। এবং শাহজাহানকে বলেছিলেন, বহিনের যখন

শাদী দেবে তখন যেন ক'টি জাগীর তাকে দান করা হয়। জীবনে তার যাতে কোন দুঃখ না থাকে, তারই ব্যবস্থা করবে।

শাহজাহান কোন ব্যবস্থাই অসমর্থন করেন নি। তিনি বেগমের ইচ্ছাকে জয়-যুক্ত করে বরং আনারের সুব্যবস্থায় খুশি হয়েছিলেন।

কিন্তু আনার তাতে কি খুশি হয়েছিল?

অবশ্য সে পেয়েছিল এমন একটি কক্ষ যা বেগমের কক্ষের সঙ্গেই তুলনা চলে। সেই কক্ষের আসবাব এত মূল্যবান যে কেউ হঠাৎ প্রবেশ করলে বলবে—এ নিশ্চয় সম্রাটের প্রিয়তমা কেউ! না হলে এত ঐশ্বর্য পেল কেন? পোষাক পেয়েছিল আনার অঢেল ও রকমারী। প্রতিটি পোষাক পরিধান করলে বেগমের জৌলুস ম্লান হয়ে যায়। আনার এই আগ্রার দুর্গের অন্তঃপুরে আসবার পর একবার সেই পোষাকের ভেতর থেকে একটি জাফরাণ রঙের সূক্ষ্ম মসলিনের পোষাক পরিধান করেছিল। সূক্ষ্ম মসলিনের ভেতর থেকে তার দেহবর্ণের শোভা বিকশিত হয়ে আরো লোভাতুর করেছিল। মসলিনের গায়ে ছিল স্বর্ণের কারুকার্য, সেই স্বর্ণের দ্যুতির সঙ্গে মিলেছিল তার যৌবন রোশনাই। আনার দর্পনের সামনে দাঁড়িয়ে তার রূপের বাহার দেখে কুণ্ঠিত হয়ে পোষাক ত্যাগ করেছিল। মমতাজ দিয়ে-ছিলেন রজতখচিত একটি বহুমূল্যবান পেটিকা। তার মধ্যে ছিল হীরা-চুণি-পান্নার অলংকার। সে তার কতকাংশ অঙ্গের বিভিন্ন অংশে পরেছিল কিন্তু কী ভেবে তাও খুলে ফেলেছিল। কিছু তার ভাল লাগে নি। ভাল লাগে নি কেন—সে নিজেও তা জানে না। শুধু মনে হয়েছিল, কি হবে এসব আর পরে!

আগ্রার প্রাসাদে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তার মন কেমন যেন নিজের মাঝে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। প্রশ্ন জেগেছে—সে কে? কি অধিকারে সে এই প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাকে তো কেউ আজও কোন পরিচয় দেয় নি। শাহজাদা এখন অনেক বড় দুনিয়ার মানুষ, তাঁর কি নাগাল পাওয়া যাবে? যখন শাহজাদা বিদ্রোহের মাঝে পথে পথে বিচরণ করছিলেন, তখন তাঁকে বরং বোঝা যেত।

তবে কি সে মনে মনে চেয়েছিল—শাহজাদা সিংহাসন না পান! সম্রাট না হন! বোধহয় তাও তার ইচ্ছা ছিল না। তার কারণ সে শাহজাদার সৌভাগ্যের জন্য সর্বদা আল্লার কাছে প্রার্থনা জানাতো।

তবে কেন তার এই মানসিক অবস্থা?

কিন্তু আনারকে অনুসন্ধান করতে হয়নি, প্রাসাদে ঢোকার সঙ্গেই সে বুঝতে পেরেছে—এখানে তার কোন মূল্য নেই। এখানে আছে হাজারো হাজারো খুবসুরত আওরত, রাখা হয়েছে অন্তঃপুরের শোভার জন্যে সুতরাং এখানে হৃদয়ের কোন স্থান নেই। মহব্বতের কোন আকর্ষণ নেই, আছে শুধু ফরমাইস পালন করবার জন্যে কলের পুতুল।

এসব কথা আরো মনে হয়েছে—লাহোরে একদিন থাকাকালীন তার সঙ্গে

সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের দেখা হয়েছিল, তখন স্বামীর বিয়োগবেদনায় শোকাতুর হয়ে তিনি হিন্দুবিধবার মত অশ্রুমোচন করছেন।

আনার ইচ্ছে করেই সেই পূর্বপরিচিতা সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে দেখা করেছিল। তার একটু কৌতূহল ছিল, যে রমণী দিল্লীশ্বরীর ক্ষমতা নিয়ে ঐশ্বর্যে মত্ত হয়ে আড়ম্বর জীবনের মাঝে কাটাচ্ছিলেন, তাঁর হঠাৎ এই পরিবর্তনে কি রকম দেখতে হয়েছে, একবার দেখা দরকার।

সম্রাজ্ঞী নূরজাহান আনারকে দেখে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ প্রকাশ না করে শুধু শান্তকণ্ঠে বলেছিলেন—এসো আনার। আনার যে কখনও তাঁকে অসম্মান করেছে, তার কোন বিরক্তিকর চিহ্ন দাম্ভিকা সম্রাজ্ঞীর কোথাও নেই।

তারপর নূরজাহান আনারের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে ম্লানস্বরে বলেছিলেন—যৌবনের আগুনে অন্যকে দগ্ধ করাই রমণীর ধর্ম কিন্তু তুমি নিজের আগুনে নিজেই দগ্ধ হলে? পেলে না কিছু—দিলে সব! এবার কি করবে?

নূরজাহান আর কোন কথা বললেন না। একেবারেই নিরুত্তর।

আনার আরো কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে সংকুচিত হয়ে বেরিয়ে এলো। বাইরে যখন এলো, চলার শক্তি তার নিঃশেষ হয়েছে। বারবার একটি কথাই মনে ভাসতে লাগলো—পেলে না কিছু দিলে সব, এবার কি করবে? ...নিজের আগুনে নিজেই দগ্ধ হলে?

কী নিদারুণ কথা বললেন সম্রাজ্ঞী? শোনার সঙ্গে সঙ্গে আনারের অন্তঃস্থলে কেমন যেন ধিক্কারে ভরে গেল। এর চেয়ে যদি তিরস্কার করে বলতেন—আমার হেপাজতে থেকে তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে, এবার কোথায় যাবে? ধরা যখন পড়েছ, শাস্তির জন্যে তৈরী হও।

আচ্ছা, সম্রাজ্ঞী কি সেই পূর্ব-আচরণের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে এই কথাগুলি বললেন, না তাঁর বহু অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ আনারের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এই উক্তি করলেন?

যাইহোক তারপর থেকেই আনারের পরিবর্তন শুরু হয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে—যে রূপের জন্যে সম্রাজ্ঞী তাকে উচ্চাসন দিয়ে হারেমে স্থান দিয়েছিলেন, যে যৌবনের জন্যে তারও গর্ব ছিল অনেক বেশি—সেই যৌবন তার কলঙ্কিত হয়েছে, সেই রূপের মধ্যে ঢুকেছে মলিনতা। হাজার চেষ্টাতেও বাদশাহী স্নানাগারের গোলাপ সুবাসিত আতরের জলে ধৌত করলেও পরিষ্কৃত হবে না।

সম্রাজ্ঞীর বহুদর্শী অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ তাঁর উক্তির যথেষ্ট মূল্য আছে। যৌবনের আগুনে কাউকে সে দগ্ধ করতে পারেনি, নিজের আগুনে নিজেই পতঙ্গের মত দগ্ধ হয়েছে।

ইস্ এ কথাটা যদি আগে সে একবারও ভাবতো, তাহলে কি নিজেকে এমনি ভাবে বিলিয়ে দিত? কিন্তু তাই বা সে ভাববে কেমন করে? তার তো এক ভাবনা ছিল, কি করে সে শাহজাদার কাছে নিজেকে সঁপে দেবে? শাহজাদার বাহুবন্ধনে

নিজেকে সঁপে দেবার জন্যেই তো সুদূর দিল্লী থেকে মাণ্ডু পর্যন্ত অনেক কৌশল করে গিয়ে পৌঁছেছিল। মত্ত নেশায় উন্মত্ত হয়ে ছুটে গিয়েছিল আদিম প্রবৃত্তির পরিচারিকা হয়ে সোহাগের ইন্তেজারে ধরা দিতে। আজ সে বুঝতে পারছে কিন্তু সেদিন একবারও একথা তার মাথায় আসে নি।

একি হল তার? তার যে সব গেল! ফুলের মত যৌবন গেল! বাঁদীর মত ইজ্জত গেল! তার আর এখন রইলো কি?

আগ্রা প্রাসাদের মমতাজের দেওয়া ঐশ্বর্যমণ্ডিত কক্ষের হর্ম্যতলে বসে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো আনার। দুটি নীলোৎপল আঁখি চুইয়ে অজস্র অশ্রুধারা গন্ড বেয়ে স্রোতের আকারে ঝরতে লাগলো। কে ছুটে এসে তাকে কাছে টেনে নিয়ে অঞ্চল দিয়ে চোখের অশ্রুধারা মুছিয়ে দেবে? খুব ছোটবেলায় আম্মাজান গত হয়েছেন, আপন বলতে পিতা। পিতা তারই পরিচিত লোকের দ্বারা নিহত হয়েছেন, তাঁর মৃত্যুতে সে শোক করতে পারেনি। শুধু আহাম্মকের মত নিজেকে প্রবোধ দিয়েছিল—যৌবনে পুরুষই হয় রমণীর আপন, যে পুরুষ তার আপন হৃদয় দিয়ে, মহব্বত দিয়ে, সোহাগ দিয়ে ভরিয়ে দেয়। শাহজাদা কি তাকে সেরকম কিছু দিয়েছিলেন? তাহলে সে কেন পিতাকে হত্যার জন্যে শাহজাদাকে ক্ষমা করলো?

না, তখন ছিল আশা। শাহজাদা যে দুবার তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছিলেন—সময় এলেই তার সম্মান তিনি দেবেন। কিন্তু এই বিরাট সাম্রাজ্যে অনেক মানুষের মাঝে প্রবেশ করে আনার বুঝছে, শাহজাদার স্মরণে সে আর আসবে না; এখানে কারো কিছু প্রয়োজন হলে আদেশ করে, সেই আদেশ পালন করবার জন্যে বেতনভোগী কর্মচারী ঘুরছে। আনার কোন আদেশই করতে পারবে না, যদিও মমতাজ তার জন্যে দুটি বাঁদী মোতায়েন করেছেন। তাদের তো আদেশ করে বলতে পারবে না—যাও সম্রাটকে জিজ্ঞেস করে এসো, আনারউন্নিসার সম্মান দান করবার জন্যে কবে আয়োজন করছেন?

এজন্যেই এই উৎসব মুখরিত প্রাসাদে আনারের কোথাও স্থান নেই। সমস্ত প্রাসাদের চতুর্দিকে যখন মানুষের কলরব, সানাইয়ের সুমধুর রাগিনী সম্রাটের জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছে, সেই সময় সে কক্ষের মধ্যে লুকিয়ে অশ্রু-মোচন করে বারবার নিজেকে প্রকৃতস্থ করার চেষ্টা করছে।

এরই মধ্যে একসময় চতুর্দশবর্ষীয়া জাহানারা অপরূপ মূল্যবান বসনে ও অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে আনারের কক্ষে এসেছিল। তার নব প্রস্ফুটিত কুসুমকলির মত সজীব সৌন্দর্য সমস্ত কক্ষ আলো করেছিল। মমতাজের মতই সে মমতাময়ী, তাছাড়া একান্তভাবে আনারকে পেয়ার করতো। তাই আজকের এই উৎসবে সকলেই যখন আনন্দসাগরে মত্ত, এমন কি যে মমতাজ, মমতার আধার, করুণার ফল্গুধারা, তিনিও আনারকে বিস্মৃত হয়েছিলেন, কিন্তু জাহানারা হয়নি। সে খোঁজ নিতে এসেছে আনারের।

আনার তাকে দেখেই চোখের জল মুছেছিল।

জাহানারা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো—এ কি, সকলেই যখন আজকের উৎসবে আনন্দ করছেন, তুমি এসময় কক্ষে কেন বিবিজী!

আনার সেই নব প্রস্ফুটিত কিশোরী মেয়েটির সদ্যপ্রাপ্ত যৌবনরশ্মির দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলো। সে জানতো এই কিশোরীটি আজ নতুন উপাধিতে ভূষিতা হবে তার বাদশাহ পিতার কাছে। জাহানারা এখন বাদশাহজাদী, পিতার পেয়ারের রত্নহার। পিতা তাকে খুব বেশী পেয়ার করেন, সেজন্যে সে মনে মনে দারুণ পুলকিত। কিন্তু সেই পুলক তার মুখের ওপর রেখাঙ্কিত করেনি। এই বয়সে জাহানারা খুব সংযত মনের পরিচয় প্রদান করে। জাহানারার রূপ ছিল অসাধারণ, এই রূপের জন্যই জাহাঙ্গীর শা তার নামকরণ করেছিলেন জাহন-আরা অর্থাৎ জগতের আলো।

সেই জাহানারা আজ 'বেগমসাহিব' থেকে পাবে 'পাদিশাহবেগম' উপাধি। আনার সেকথা স্মরণ করে নিজের মনের দুঃখ সম্পূর্ণ গোপন রেখে সহাস্যে বললো —তোমার আজ নতুন সৌভাগ্য সূচিত হবে সাহিবা!

আনারের মনোভাব বুঝে জাহানারা জবাব দিল—কিন্তু আমার কথার উত্তর তো দিলে না? পিতা আজ সম্রাট হয়েছেন। চতুর্দিকে আনন্দের জোয়ার বইছে। তুমি পিতাকে কত সাহায্য করেছ, আর আজ তাঁর সৌভাগ্যে কি তুমি আনন্দিত নও?

হঠাৎ শিউরে উঠে আনার আতঙ্কিত কণ্ঠে বললো—না, না একথা বলো না জাহানারা। শাহজাদা আজ সম্রাট হয়েছেন, এ যে আমার প্রতিটি দিনের প্রার্থনা ছিল।

জাহানারা বললো—আমি জানি সে কথা বিবিজী! তাইতো বলছি, তবে কেন তুমি এ উৎসবে যোগদান কর নি? যদি কোন অনুযোগ থাকে, আমাকে বলো, আমি পিতার কাছে পেশ করবো। আজ সমস্ত পরিবার তোমার কাছে ঋণী!

আনার তাড়াতাড়ি বললো—না, না আমার আর কোন অনুযোগ নেই। আমি সত্যিই আনন্দিত! শুধু কেমন যেন ভবিয়তের কোন জোর পাচ্ছি না বলে বেরুতে পারি নি। তারপর জাহানারার কাছে রেহাই পাবার জন্যে বললো—তুমি যাও, আমি একটু পরেই গিয়ে উপস্থিত হচ্ছি। তোমার সম্মান উপাধি গ্রহণ করার সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হব জানবে।

জহানারা কিছু না বলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। সে বুদ্ধিমতী, বুঝতে পারলো কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল জট পাকিয়ে আছে।

জাহানারা চলে গেলে আনার আবার শয্যার গহ্বরে আছড়ে পড়ে ভাবতে লাগলো —এদের বোঝাই কেমন করে নিজের মনের কথা! এরা হয়তো ভাবছে—শাহজাদা সিংহাসনে বসতে সে সন্তুষ্ট হয় নি। হায়, কি বিশ্রী অমঙ্গলজনক উক্তি মরমের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলো! শেষ পর্যন্ত এও তার ভাগ্যে ছিল!

হঠাৎ আনার ঠিক করলো—না, এরকম নিঃসঙ্গভাবে কক্ষের মধ্যে বসে থাকলে সকলের বৈফিয়তের মাঝে পড়তে হবে, তার চেয়ে বেশ পরিধান করে এই প্রাসাদের

লোকের ভীড়ে হারিয়ে যাওয়া ভাল। যদিও মন চায় না এই কোলাহলের মধ্যে নিজেকে প্রবেশ করাতে, তবু অনেক সময় তো তাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নানা কাজ করতে হয়েছে, এও নয় আর একটি তার সঙ্গে যুক্ত হল।

এই চিন্তা করে আনার উঠে দাঁড়িয়ে সুন্দর করে সাজলো। মমতাজের দেওয়া সবচেয়ে মূল্যবান পোষাক পরে অঙ্গে অলংকার স্থাপন করলো, তারপর প্রসাধনের চিহ্নে রূপের ওপর আরো রূপ সৃষ্টি করে জাহানারা যেদিকে গিয়েছিল সেদিকে এগোলো। মনে মনে ভাবলো,—এবার আর কেউ বুঝতে পারবে না তার মনের অবস্থা!

আনার নিজেকে সঁপে দিল প্রাসাদ প্রাঙ্গণের অনাবিল উৎসব স্রোতের মধ্যে। কিন্তু অন্তঃপুরের অবরোধ এ অবস্থায়ও রক্ষিত ছিল। সেখানে ছিল শুধু জেনানা। অন্তঃপুরের জেনানা ও বাইরের অতিথি জেনানাও ছিল। সকলে দেখলো আনারকে। আনারকে দেখে তারা চমকিত হল। পরস্পরকে জিজ্ঞেস করলো—এ কে? উত্তরও মিললো—নিশ্চয় নতুন বাদশাহের কোন নয়া খুবসুরত রমণী।

আনার সে কথা শুনে মনে মনে পুলকিত হল। এবার সে ভাল করে তাকালো প্রাসাদের সজ্জিত প্রাঙ্গণের দিকে। দৌলতের রোশনাই চতুর্দিকে। সম্রাট শাহজাহান যে শিল্প-রসিক তার সম্পূর্ণ চিহ্ন আগ্রা প্রাসাদের প্রতিটি মিনারের বিচিত্র শোভায়। এমনভাবে রঙিন বস্ত্র, পুষ্পমাল্য, স্বর্ণ ও রজতের বিচিত্র কারুকার্য দিয়ে প্রাঙ্গণ সাজানো হয়েছে, যা শিল্পমনেরই পরিচয় বহন করে।

মনে মনে আনার নয়া সম্রাটের দীর্ঘায়ু কামনা করলো।

তারপর সে দরবার কক্ষের অলিন্দে যেখানে মমতাজ প্রভৃতি পুররমণীরা বাদশাহের উপাধি বিতরণের ব্যবস্থা দেখছিলেন, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো; মমতাজ তাকে দেখে সহাস্যে বললেন, এসো আনার।

পাশে জাহানারাকে দেখা গেল, সেও খুশি হ'ল।

ওদিকে তখন উপাধি বিতরণের পালা চলছিল। উজির আমীন খাঁ সমস্ত দরবার কক্ষ প্রতিধ্বনিত করে বাদশাহের উপাধি বিতরণ ক্রিয়া শেষ করছিল।

সম্রাটের কিছু দূরে দরবারের এক অংশে যুবরাজের পোষাকে ভূষিত দারা, সুজা, ঔরঙ্গজেব বসেছিল, আর পঞ্চম বৎসরের কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ মমতাজের পিতা আসফ খাঁর স্নেহক্রোড়ে পিতার সম্মানঅনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করছিল। মুরাদের হাতে ছিল একটি বিরাট কোষবদ্ধ তরবারী। সে সেই তরবারীখানা দু হাতের মুঠিতে ধরে যোদ্ধার মত পিতার রাজসিক মুকুটের দিকে তাকিয়েছিল। বালকের বোধহয় ইচ্ছা হচ্ছিল, ঐ মুকুটটি সে একবার মস্তকে পরিধান করে।

এই সময় পরিবারবর্গের উপাধি বিতরণ অনুষ্ঠান শুরু হল। জাহানারা পেল পিতার কাছ থেকে এক কোটি টাকা মূল্যের রত্নালংকার এবং 'পাদিশাহ বেগম' উপাধি। শাহজাদারা পেল স্ব স্ব কৃতিত্ব অনুযায়ী পিতার কাছ থেকে সম্মান। তারপর বেগম মমতাজের জন্যে অন্তঃপুরের সর্বময় কর্ত্রীত্ব পদ ও 'প্রধানা মহল।'

উপাধি প্রচার হল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরের মধ্যে অন্তঃপুরিকাদের গুঞ্জন শোনা গেল।

এই পদ সাধারণতঃ বাদশাহের জননী বা ভগিনীদের মধ্যে বিতরিত হত। ভারতীয় দেশাচার অনুসারে পত্নী অন্তঃপুরের গৃহিণী না হয়ে বিধবা জননী বা অন্য কোন প্রবীণা আত্মীয়াই গৃহকর্ত্রী হতেন। এই নিয়ম এতকাল ধরে চলে আসছিল। নূরজাহানের সময় জাহাঙ্গীর শা সেই নিয়ম লঙ্ঘন করে সম্রাজ্ঞীকে অন্তঃপুরের সর্বোচ্চ পদ 'প্রধান মহিলা' রূপে গ্রহণ করেছিলেন। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান অবশ্য সম্রাটের ওপর অলৌকিক প্রভুত্ব বিস্তার করে এই পদ অধিকার করেছিলেন।

সম্রাট শাহজাহান সিংহাসনে বসে মমতাজের ওপর প্রীতিস্বরূপ এ পদ অন্য কাউকে দেবার কথা চিন্তা না করে প্রিয়তমা বেগমকেই দিলেন। তাছাড়া মৃত সম্রাটের বিধবা পত্নী নূরজাহান তখন শাহজাহান কর্তৃক অবহেলিতা হয়ে বার্ষিক দু লক্ষ টাকা মাসোহারায় লাহোর-প্রাসাদে। সেজন্যে এ পদ নূরজাহানকে দেবার কোন প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া এলেও নতুন বাদশাহ তাঁকে দিতেন কিনা সন্দেহ। বাদশাহ তখন মমতাজের প্রতি এতো অনুরক্ত যে অন্য কারো কথা চিন্তা করতেই তার বিবেকে বাধে। মমতাজকে একদিন অবহেলা করে যদি অন্যায় করে থাকেন, সেদিনের অপরাধ স্খালনের জন্যেও অন্ততঃ আজ তাঁর অনেক কিছুই করা উচিত।

অবশ্য এ উক্তির কারণ সেই বিগত স্মৃতি—না হলে নতুন সম্রাট যে মমতাজকে আপন হৃদয়ের তুল্য ভালবাসতেন, তার অনেক নিদর্শন আছে। শাহজাহান এই একটি রমণীর কাছে চিরকাল আপন হৃদয়ের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছেন বলে কখনও তাকে তিনি বিস্মৃত হন নি, তবে মাঝে যে হয়েছিলেন তার একমাত্র কারণ ছিল রাজনীতির চক্রান্ত।

কিন্তু সম্রাট তার প্রধানা বেগমের ওপর অধিক আধিপত্য প্রদান করলে কি হবে? এদিকে অন্তঃপুরের অলিন্দে হঠাৎ দুটি ক্ষিপ্ত রমণীর উপস্থিতি স্পষ্ট হল।

একজন তাতার রমণী জিন্নৎ বেগম, অপরজন রাজপুত রমণী দুর্গাবতী। পরে জানা গেল এঁরা শাহজাহানের বিবাহিতা দুই মহিষী। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় অন্তঃপুরে থাকতেন, মাঝে মাঝে পিত্রালয়ে গমন করতেন এবং পিত্রালয়ে এতো বেশী সময় কাটাতেন যে এদের উপস্থিতি একটু বিস্ময়ের সৃষ্টি করলো। বিশেষ করে তাতার রমণী জিন্নৎ। তাঁর কন্ঠস্বর বেশ সোচ্চার হল।

জিন্নৎ সর্বসমক্ষেই মমতাজবেগমকে বললেন—আমরা থাকতে তোমার ওপর সম্রাটের এই পক্ষপাতিত্ব কেন? আমরা কি সম্রাটের শাদী করা বেগম নয়? সম্রাটের এই অন্যায় কিছুতে বরদাস্ত করা হবে না। অশান্তি যদি তিনি চান, তো অশান্তির আগুন জ্বলবে। আমি তাতার রমণী, আমার ধমনীতে তাতার রক্তের প্রবহমান ধারা—প্রয়োজন হলে রক্তারক্তি করতেও কার্পণ্য করবো না।

মমতাজ কোন সময়ই কলহ পছন্দ করতেন না। আকস্মিক এই আক্রমণে

অভিভূত হয়ে তিনি কিছু অনুযোগ করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠ ঐ তাতার রমণীর সুতীব্র কণ্ঠের মাঝে লীন হয়ে গেল।

বেগতিক দেখে আনার ইতস্ততঃ করে এগিয়ে এলো, একবার ভাবলো এখানে তার কিছু বলা উচিত কিনা! কিন্তু মমতাজের অবস্থা দেখে তার প্রাণ কেঁদে উঠলো। উচিত-অনুচিত বোধ লুপ্ত হয়ে আনারের মধ্যে প্রতিবাদের ভাষা জেগে উঠলো। অন্যান্য অন্তঃপুরিকা ও অতিথি রমণীদের সামনে হঠাৎ সে বলে বসলো— আস্ফালন করার কি আছে? আপনাদের ক্ষমতা থাকে তো বেগমসাহেবার বিরুদ্ধে জেহাদ করুন। সম্রাট তাঁর ওপর যে ভার অর্পণ করেছেন, তাঁর বিচারের প্রশংসা করে তাঁকে আপনাদের অভিনন্দন জানানো উচিত।

জিন্নৎ এই কথা শুনে আনারকে যেন ভস্ম করে দিতে এলেন। চোখে অগ্নিশিখা জেলে বললেন—কে হে তুমি বেসরম? তোমাকে কোন সময় দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

আনারও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—আপনি যদি সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের অন্তঃপুরে কোন সময় কিছুকাল বাস করতেন তাহলে আমাকে দেখতে পেতেন। যাই হক আপনার জানার প্রয়োজন নেই আমি কে? তবে জেনে রাখুন, আমি বেগমসাহেবার হিতৈষিনী।

জিন্নৎ বললেন—ওহ, সেজন্যে প্রাণে বুঝি বড় আঘাত লাগলো?

লাগবে নৈকী? কেউ যদি নিজের অধিকারের বাইরে আরো অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করেন তাহলে যার এতটুকু মনুষ্যরক্ত দেহে আছে, সেই প্রতিবাদ করবে।

মমতাজ আনারকে শান্তকণ্ঠে বললেন—বহিন চুপ কর। সম্রাট যে ব্যবস্থা করবেন তাই পালন করা আমাদের কর্তব্য। সপত্নীদের অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন এ সম্বন্ধে সম্রাটের কাছে আবেদন করেন।

এই বলে মমতাজবেগম সেখানে আর অপেক্ষা না করে জাহানারা ও আনারকে নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন।

সেদিন উৎসবের আয়োজন গভীর রাত্রি পর্যন্ত মুখরিত ছিল।

যমুনার নীল স্রোতধারায় হাজারো হাজারো অত্যুজ্জ্বল আলোর রোশনাই। আনার অলিন্দে দাঁড়িয়ে যমুনার জলের অপরূপ শোভার দিকে তাকিয়েছিল। কেমন যেন একা পড়ে গিয়ে নতুন করে ভাবনার গভীরে ঢুকলো। এতক্ষণ এখানে জাহানারা ছিল, সে চলে যেতেই এই ভাবনা এসে তাকে আক্রমণ করলো। আজকের এ পরিবারের শুভ দিনটি কোনক্রমে সে নিজের যন্ত্রণা গোপন করে অতিবাহিত করলো। আজ রাত্রি শেষ হলেই তার পরীক্ষার অবসান হবে।

আনার ভাবলো হঠাৎ মমতাজবেগমের কথা। মমতাজ তাকে যথেষ্ট পেয়ার করেন। অবশ্য তার কাছে কৃতজ্ঞ বলেই এই মহব্বত প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর এই মহব্বতের মূল্য কী আনারের কাছে? সম্রাজ্ঞী নূরজাহানও মহব্বত করতেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য বোঝা যায় নি। তবে মমতাজের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। আনার

বিপদে সাহায্য করেছে বলে মমতাজ কৃতজ্ঞতাবশতঃ তাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করছেন। অবশ্য এরও একটা অর্থ আছে, এই পরিবারে আকস্মিক সৌভাগ্য আবির্ভূত হতে এই অনুগ্রহ প্রকাশের সুবিধা হয়েছে। এখানে আছে প্রচুর দৌলত। সহস্র হস্তে বিতরণ করলেও নিঃশেষিত হবে না, যদি একজনকে কিছু দিয়ে নিজের ঋণ পরিশোধ করা যায়, ক্ষতি কি ?

আনারের এ কথা মনে হল, তার কারণ কিছুক্ষণ আগে মমতাজ তাকে বললেন, আনার তোমার জন্যে একটি সাতনরী মুক্তার হার রেখেছি, সময় হলে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিও।

আনার তার উত্তরে প্রতিবাদ করে বলেছিল—আপনি তো যথেষ্ট দিয়েছেন, আর নাইবা দিলেন ?

মমতাজ হেঁসে বললেন—তোমাকে অনেক দিলেও তোমার ঋণ পরিশোধ হয় না। গভীর বিপদের মুহূর্তে তুমি সেদিন না থাকলে আমার পুত্রকন্যাদের বাঁচাতে পারতাম না আনার।

আনার কুণ্ঠিত হয়ে বললো—সে তো বেতনভোগী পরিচারিকাও করতো বেগমসাহেবা, আমি এমন কী করেছি !

মমতাজ হেসে বললেন—পরিচারিকা তো অনেক দেখেছি ও দেখছি, তারা আর তুমি এক নও।

মমতাজ চলে যেতে আনার কিন্তু বেগমসাহেবার ওপর অহেতুক ক্ষিপ্ত হল। কৃতজ্ঞতা ও ঋণ পরিশোধ! সত্যিই কি মমতাজবিবি ঋণ পরিশোধের জন্যে এই এত অলঙ্কার তাকে দিচ্ছেন, না অন্য কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য এই অনুগ্রহ দান করেছেন? এই প্রশ্ন সম্পূর্ণ অভাবিতভাবে মনে উদয় হতে সে চমকিত হয়ে ভাবলো—নিশ্চয় বেগমসাহেবা জানেন সম্রাটের সঙ্গে তার গোপন সম্বন্ধের ব্যাপার। অধিক কিছু তাঁর করণীয় নেই বলে তিনি কৌশলের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। আনারকে প্রচুর রত্নোপহার দিয়ে বশীভূত করে স্বামীর আকর্ষণ থেকে তাকে সরিয়ে নিচ্ছেন।

আনার সেই যমুনার কোলে প্রাসাদের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে হঠাৎ উন্মাদের মত হেসে উঠলো। মমতাজ ভেবেছেন—আনার লোভী। অবশ্য লোভ হওয়া স্বাভাবিক, আনার রমণী। রমণীর লোভ সর্বজনবিদিত। কিন্তু তাই বলে আনার কতকগুলি নিষ্প্রাণ রত্নের জন্যে লালায়িত নয়! আজকের সম্রাট নয়, সেদিনের বিদ্রোহী শাহজাদার অনুগ্রহ সে লাভ করতে চায়। তার আশা বিরাট, তাই তার মনের প্রসাদ অনেক বেশী। তার রমণীরত্ন কি মমতাজের চেয়ে কোন অংশে কম ? উপাধি বিতরণকালে শাহজাহানের পূর্বজীবনের যে দুজন বেগম জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন অন্ততঃ তাঁদের চেয়েও তার মূল্য বেশী। সে ইচ্ছা করলে এখুনি মমতাজের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারে —আপনার অনুগ্রহ আপনি ফিরিয়ে নিন, এবার আমার অনুগ্রহ আপনি গ্রহণ করুন। একবার যদি সম্রাট সে-সুযোগ তাকে দেন, সে

সোচ্চারে একথা জানাতে পারে।

আনার ঠিক করলো, মমতাজের দেওয়া সৌভাগ্য সে ফিরিয়ে দেবে। সে বলবে—আমি যা করেছি বিনা স্বার্থে করিনি, আপনি সে কথা ভালভাবে জানেন। কিন্তু একথা বলতে পারবে কি? ভাবতে গিয়েই তার জিবের তালু শুকিয়ে গেল। সহজ অবস্থায় সে বলতে পারবে না, অথচ তাকে বলতে হবে। এই ভেবে সে নিজের কক্ষের দিকে চললো। আজ তাকে একটু সরাব পান করতে হবে। সরাব পান করে অপ্রকৃতস্থ হয়ে নিজের অধিকার বিস্তার করবে। জানুক, এখানকার সবাই জানুক—সে কে? এ প্রাসাদে তার মূল্য কতখানি। সেই ইব্রাহিম খাঁর কন্যা। শক্তিমানের কন্যা শক্তিরূপিনী। আজকের এই শুভদিনে তার গোপন পরিচয় উন্মুক্ত হয়ে আর একটি স্মৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করুক—যা ইতিহাসের কোথাও এতটুকু স্থান সংগ্রহ করে রক্ষিত হয়ে থাকবে।

আনার যে নিজেকে গোপন করে রাখার চেয়ে উন্মুক্ত করতে পারবে ভেবে শান্তিলাভ করলো। দুঃসাহসের অগ্নি মনের মধ্যে উষ্ণভাব সঞ্চার করতে মনে মনে খুশি হল, তারপর কক্ষে গিয়ে বাঁদীকে বলে প্রচুর সরাব আনালো, সেই সরাব পাত্রের পর পাত্র গলায় ঢেলে নিজেকে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতস্থ করলো। পা টললো, মাথা ঝিম ঝিম করলো, অবশেষে রক্তস্রোতে ঝড়ের গর্জন শুনলো।

আনার তখন প্রখর চেতনার মাঝে নিজেকে অপরূপবেশে অভিসারিকার মত সাজালো। তারপর বাইরে যখন বের হয়ে এল, দেখলো গভীর রাত্রি। মমতাজের কক্ষের দিকে গেল, কিন্তু দেখলো সে কক্ষে নিঃঝুমতা নেমে এসেছে। বুঝলো, বেগমসাহেবা সম্রাজ্ঞীর উপাধিতে সম্মানিতা হয়ে সুখস্বপ্নে শয্যার গহ্বরে পুত্রকন্যা নিয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সহসা আনার বেগম মহলের কাছ থেকে সরে এসে অলিন্দের একটি উন্মুক্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে হি হি করে পাগলিনীর মত হেসে উঠলো। জ্যোৎস্নালোকিত আকাশের মাঝে নিস্তব্ধ রজনীতে তার হাসির শব্দ চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ভয়াবহরূপ সৃষ্টি করলো।

রক্ষী ছুটে এলো, আনারকে দেখে সবিস্ময়ে বললো, কি হয়েছে বিবিরাণী?

আনার তখন অপ্রকৃস্থ, রক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো—কে বাবা তুমি? তুমি তো সম্রাট নও! তোমার মুখ তো সম্রাটের মত অতো খুবসুরত নয়? তবে কে তুমি? আমি আনার, আনারউন্নিসাবিবি। আমার পিতার নাম ইব্রাহিম খাঁ। নিজের স্বার্থে-ই আমি পিতার মৃত্যুর কারণ হয়েছি! সেই পাপিয়সী আনার চলেছে সম্রাটের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। তারপর ছুটে অলিন্দের সে অংশ থেকে চলে গেল। সেখান থেকে সে চললো রঙমহলের দিকে।

রঙমহলে তখন পূর্ণোদ্যমে নৃত্যের ফোয়ারা চলছিল। বিরাট খানদানী কক্ষের অত্যুজ্জ্বল আলোর মাঝে আজকের বাদশাহকে অভিনন্দিত করবার জন্যে এক নয়া নর্তকী স্বল্পবসনে অর্ধনগ্ন হয়ে নৃত্য করে চলেছে। কক্ষে আছে আরো

আমীর, ওমরাহ, অনেক অতিথিরা। পানপাত্রের মৃদুশব্দ উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। আনার একবার তার নেশাজড়িত চোখে রঙমহলের কক্ষের মধ্যে উঁকি মেরে নিজেকে আড়ালে আত্মগোপন করে রাখলো।

বেশ কিছুক্ষণ পরে নৃত্য চলাকালীন বাদশাহ নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন। তাই চাইছিল আনার। কয়েকপদ অগ্রসর হলে সামান্য অন্ধকার অংশে সে পিছুপিছু গিয়ে সহসা বাদশাহর গতিরোধ করলো।

গভীর রাত্রিকালে আচমকা এক রমণীর দ্বারা আক্রান্ত হতে বাদশাহ সভয়ে বললেন—কে ?

বাদশাহের আতঙ্কিতস্বর শুনে আনার খিল খিল করে হেসে উঠলো,—একি, বাদশাহ এত ভীরু ! আমি আনার, ঘাতক নয়, শত্রু নয়, তোমার পেয়ারের আনার।

বাদশাহ আনারের অপ্রকৃতস্থ অবস্থা দেখে বিরক্ত হয়ে বললেন, পথ ছাড়। আমি ক্লান্ত। তুমি নেশায় উন্মত্ত হয়েছ, বিশ্রাম নিতে যাও।

আনার হঠাৎ ক্ষিপ্ত হযে বললো—না, আমি উন্মত্ত হই নি। শুধু নিজের অবস্থাটা ভোলবার জন্যে একটু দাওয়াই সেবন করেছি।

তবে এতরাত্রে আমার কাছে এসেছে কেন ?

কেন এসেছি, সে কথা কি জানো না সম্রাট ? আমি ইজ্জত বিলিয়ে কলঙ্কিত হয়েছি, তাই নিজের সম্মান দাবী করতে এসেছি।

সম্রাট বিরক্ত হযে বললেন—সময় এলেই আমি তোমায় সম্মান দেব, এখন পথ ছাড়। কে কোথায় দেখে ফেলবে, আমার সম্মান নষ্ট হবে। ভুলে যেও না, আমি এখন বাদশাহ, অনেক সাবধানতার মধ্যে আমায় চলতে হবে।

আনার হঠাৎ শ্লেষভরে বললো—আর কিছু !

আর মমতাজের কাছে আমি আমার বিশ্বাস নষ্ট করতে চাই না। সে যা পছন্দ করে না, আমি তা প্রাণ ধরে করবো না।

মানে, নিজের চরিত্রের নিশান তুলে সততার প্রমাণ দেবেন ?

সম্রাট কোন কথা বললেন না। তাই আনার আবার তীক্ষ্মকন্ঠে বললো— আমি যদি মমতাজ বিবিকে সব বলে দিই !

শাহজাহান মৃদু হেসে বললেন—মমতাজ সবই জানে। তুমি পুনরায় একথা উচ্চারণ করলে এই উপকার হবে—তোমাকে আর কেউ পৃথিবীতে দেখতে পাবে না !

তার মানে ?

কী আর, মানে মৃত্যু !

আনারের হঠাৎ নেশা ছুটে গেল, ক্ষিপ্তস্বরে সে বললো—তাহলে সবটাই একটা চক্রান্ত ?

যদি মনে কর, তাহলে তাই। তবে এ নিয়ে বেশি নিজেকে উত্তেজিত কর না, তোমার কাছে আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমার প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়ই পূরণ করবো, এ সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞাসা কর না, উত্তর পাবে না।

আনার যেন শাহজাহানের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। তারপর হতবুদ্ধির মত একটা অসংলগ্ন প্রশ্ন করলো—আমি কি আর কখনও সম্রাটের সোহাগের স্পর্শ পাবো না ?

শাহাজাহান হাসলেন, তারপর বললেন—সে প্রশ্নের উত্তর এখন দিতে পাচ্ছি না। অন্ততঃ আজকের জন্যে পথ ছাড়, আমি বড় ক্লান্ত। এই বলে সম্রাট শাহজাহান চলে গেলেন।

আর আনার সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রকৃতস্থ করার চেষ্টা করলো।

আনার শুধু সে রাত্রে সম্রাটের কথায় হতবুদ্ধি হল না, পরদিন মমতাজ তাকে কক্ষের মধ্যে ডেকে নিজের মনটি যখন মেলে ধরলেন, আরো হতবুদ্ধি হল আনার। সে বুঝতে পারলো, নিজেকে সে বেশি বুদ্ধিমতী বলে মনে করতো, আসলে সম্পূর্ণ নির্বোধ ছাড়া কিছু নয়। সে আপন চিন্তায় বিভোরে সমাহিত থাকতে তাকে নিয়েই এক চক্রান্ত সৃষ্টি হয়ে গেছে। তার ধারণা ছিল, শাহজাহান ও তার প্রণয়-সম্পর্কে মমতাজবেগম অবহিত নন, তাই মমতাজের প্রতি বেশি অনুগ্রহান্বিত হয়েছিল কিন্তু আজকের আলোচনায় সে ধারণা তার বদলে গেল।

মমতাজ তাকে বললেন—আনার, তুমি তোষাখানার সমস্ত অধিকার চাইলে পাবে কিন্তু আমার সোহাগরত্নের প্রতি আকাঙ্খা ত্যাগ কর। সম্রাট আমাকে সব বলেছেন, তোমাকে তাঁর গ্রহণ করতে হয়েছে শুধু প্রয়োজনের খাতিরে—আসলে তিনি আমার বিশ্বাস হন্তা হয়ে কোন কাজ করতেন না।

আনার কি বলবে ? সে শুধু মমতাজবেগমের কথা শুনে অভিভূত হচ্ছিল, আর বাদশাহের সাধুতার পরিচয় পেয়ে চমকিত হচ্ছিল। মমতাজের কাছে তাঁর প্রেমাস্পদের আচরণের বিভিন্ন নমুনা শুনে সে চমকিত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ার চেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হচ্ছিল আর অবাক হয়ে ভাবছিল—এরাই দুনিয়ার সমস্ত শাসনভার নিজেদের হাতে নিয়ে লাখো মানুষকে সত্যবাদী হতে শিক্ষা দেবেন !

মমতাজ আবার বললেন—তুমি বিনিময়ে কি চাও বলো ? বাদশাহের মত খুবসুরত নওজোয়ান যদি শাদীর নিমিত্ত চাও, তাহলে সে ব্যবস্থাও হবে। আর তোমার শাদীর জন্যে বিরাট উৎসবের আয়োজন হবে, যা দেখে আমীর ওমরাহরা চমকিত হবেন। তুমি যদি এ ব্যবস্থা মেনে নাও, তাহলে তুমি পাবে কোন একটি প্রদেশের একাধিপত্ব—চাই কি স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

হঠাৎ আনার দু'চোখে জল নয়, তীব্র জ্বালা নিয়ে মমতাজের মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে বললো, আমি যে কলঙ্কিত, বেগমসাহেবা !

বেগমসাহেবা মৃদু হেসে বললেন—সমস্ত হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য এখন আমাদের হাতে। আমরা যে ব্যবস্থা করবো, তা মেনে নিতে এখানকার কেউ অরাজী হবে না।

আনার এতদিন মমতাজের গুনগানেই মুগ্ধ ছিল, আজ তাঁর অন্যরূপ দেখে বিস্মিত হল, মনে মনে বললো—এরা নিজের স্বার্থের জন্যে কি না করতে পারে ?

কিন্তু মুখে বললো—আপনি রমণী হয়ে অন্য একটি রমণীকে দ্বিচারিণী করতে লজ্জিত হচ্ছেন না ?

বেগমসাহেবা মৃদু হাসলেন, হেসে বললেন—আমি রমণী হয়ে এ কথা বলছি না, আমি রাজ্যের মঙ্গলার্থে এ কথা বলছি। বাদশাহের চরিত্র নিয়ে যদি প্রজাদের মধ্যে আলোচনা হয়, তাহলে বাদশাহের সিংহাসনের বিরুদ্ধে অশান্তির আগুন জ্বলবে।

আনার আবার বললো, বাদশাহ কি অন্য কোন রমণী সংসর্গহীন জীবন-নির্বাহ করবেন ? তাহলে হারেমে এত সুন্দরী আওরত কেন ? তাছাড়া বাদশাহ তাঁর পূর্বপুরুষদের দৃষ্টান্ত লঙ্ঘন করবেন কী ভাবে ?

বেগমসাহেবা আবার বললেন—হারেমের রমণীদের সঙ্গে সম্বন্ধ অন্য কারণে। সে হল বাদশাহের সমস্যাবহুল মনের শান্তির জন্যে। তোমার ক্ষেত্র অন্য। তুমি যদি বাদশাহের কাছে ইজ্জতের সম্মান না চাইতে তাহলে হয়ত আমাকে এসে অনুরোধ করতে হত না। তাছাড়া, আমরা কৃতজ্ঞ বলে তোমার মঙ্গলের জন্যে সর্বদা চিন্তিত।

তা যদি না হত—বেগমসাহেবা এরপর ম্লান হেসে বললেন—তাহলে এই সমস্যার ওপর গুরুত্ব না দিয়ে যে নিষ্ঠুর ব্যবস্থা বাদশাহের নিয়মে সৃষ্টি আছে তারই সাহায্য নেওয়া হত।

আনার মমতাজের কথার জের ধরে বললো—তাহলে ঘাতকের কৃপাণের তলায় এ বাঁদীর দেহ দ্বিখণ্ডিত হত—এই তো! হঠাৎ আনার দুই হাঁটু মুড়ে নামাজের ভঙ্গিতে বেগমের সামনে জানু পেতে বসে জোড়হাত করে কাতরভাবে বললো—ঐ আদেশ দেবার জন্যে ঘাতককে সংবাদ প্রেরণ করুন সম্রাজ্ঞী! মৃত্যুর পরপারে যদি কোন অস্তিত্ব থাকে তাহলে সেখানে গিয়ে আমি আপনার জন্যে প্রার্থনা করবো, আপনার জীবনের শান্তিকামনা করবো। শুধু আমার মুক্তির জন্যে ঘাতকের কৃপাণের তলায় যেতে আমাকে সাহায্য করুন।

মমতাজ বিচলিত না হয়ে হঠাৎ সুর পরিবর্তন করে শান্তকণ্ঠে বললেন—বহিন আমার, তুমি কি আমাকে একটুও পেয়ার কর না ?

আনার সেই নামাজের ভঙ্গিতেই বললো—করি কিনা তার প্রমাণ আপনি বহু-ভাবে পেয়েছেন !

তবে আজ কেন এরকম আচরণ করছো—আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছ ?

আনার অবনত মস্তকে বললো—আজ আপনি আমার ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে এমনি ধারণা মনে পোষণ করছেন। না হলে সেই আগের মতই আপনার সম্পর্কে আমার প্রগাঢ় প্রীতি বিদ্যমান। যেদিন সম্রাট আপনার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে আপনাকে অবহেলা করেছিলেন, আমি যদি সেদিন ঈর্ষান্বিতই হতাম, তাহলে সম্রাটের সেই বিক্ষুব্ধ মনে আরো বিদ্বেষ সঞ্চার করতাম। কিন্তু আমি নিজের স্বার্থের জন্যে একটি নিষ্পাপ রমণীর জীবন ধ্বংস করতে চাই নি, তাই আজ

আমাকে একথাও আপনার কাছ থেকে শুনতে হল।

মমতাজ হঠাৎ প্রগাঢ় স্নেহে আনারকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে বললেন—আমি জানি, আমি বিশ্বাস করি সে কথা আনার। তোমার স্বভাবের অনেক প্রমাণ পেয়েছি বলে আজ তোমাকে অনুরোধ করতে ছুটে এসেছি। আমি জানি, তুমি ইচ্ছে করলে তোমার প্রসার মনের অনুগ্রহ দিয়ে আমাকে খুশি করবে! আমি কি তোমার মনের কথা জানিনা? রোটাস দুর্গে আমার সন্তানদের তত্বাবধানে তুমি বিশ্বাসের পরিচয় না দিতে, তাহলে কি আজ আমি সম্পূর্ণ নিজের সব রত্ন ফিরে পেতাম? আজ সর্ব ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী তোমার কাছে ঋণী। শুধু আর একটি মাত্র প্রার্থনা মঞ্জুর কর—তাহলে তোমার রমণী মনের পরিচয় এই রাজ্যের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। দেখো, ভোগ অনেকেই করে কিন্তু ত্যাগের মধ্যে যে গৌরব, তা সবার ভাগ্যে জোটে না।

আনার অসহ্য হয়ে বিরক্তিকর কন্ঠে বললো—সম্রাজ্ঞী, আপনি অনুগ্রহ করে ক্ষান্ত হোন। আপনার উদারমনের পরিচয় এমনিভাবে আমার কাছে ক্ষুন্ন করে স্বার্থের জন্যে কলঙ্কিত হবেন না। অনুগ্রহ করে একটা কথার শুধু জবাব দিন—আপনার তো গুটি কয়েক সপত্নী আছে, আরো যে কোন সময় হবে না, তাও দৃঢ়স্বরে বলতে পারেন না। তার সঙ্গে যদি আরো একটা সংযোজিত হয়, এর জন্যে এতো বিচলিত হচ্ছেন কেন? মোগলবাদশাহের ইতিহাসে তো অনেক পত্নী গ্রহণেরই নিয়ম আছে! বাদশাহ তাদের মধ্যে যার প্রতি বেশী আকর্ষণ অনুভব করবেন তাকেই আপন অঙ্কে স্থান দেবেন। আপনি বেশ ভালভাবেই জানেন, বর্তমান সম্রাট আপনার প্রতি যেরকম আকর্ষণ অনুভব করেন, অন্য কাউকে আকস্মিক সে-সৌভাগ্য দান করবেন বলে মনে হয় না, সুতরাং আপনি অকারণে চঞ্চল হয়ে এমন অস্থির হয়ে পড়ছেন কেন?

মমতাজবেগম এবার শেষ অস্ত্র ত্যাগ করে, সামান্য রমণীর মত কেঁদে উঠলেন, সম্রাজ্ঞীর বসনে ভূষিতা ও প্রসাধনের ঔজ্বল্যে চিত্রিত সুরমাআঁকা দুটি চোখের মেদুর দৃষ্টিতে অশ্রুবিন্দু টলমল করতে লাগলো।

আনার নিজেও বহু বিনিদ্র রজনী ধরে অশ্রুত্যাগ করে চলেছে, কিন্তু সম্রাজ্ঞীর চোখে কাতরতার চিহ্ন দেখে মনে মনে সঙ্কোচ বোধ করলো। রমণী মনে বেদনার স্পর্শ লাগলো। এতদিন ধরে সে নিজের কথাই ভেবেছে, দগ্ধ মনে শুধু যন্ত্রণার প্রলেপ এঁকেছে। সহসা তার মনে হল, যে পাওয়ার পথে এতো বাধার সৃষ্টি, আর যে হৃদয় পাবার জন্যে সে এত করলো, তিনি যখন বেইমানের আশ্রয় নিয়ে তাকে সরিয়ে দিতে চান তখন কিসের এত পরিকল্পনা! তার চেয়ে ত্যাগের মধ্যে নিজের তৃপ্তির আস্বাদন খোঁজা ভাল; অন্তত এই বেগম, এই পরিবার, এখানকার আকাশ, বাতাস, পশুপক্ষী সকলে তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। আর রমণী জীবনের সেই চির আকাঙ্ক্ষিত শাহজাদার সংসর্গের দুটি মুহূর্তকে স্মরণ করে কল্পনার জাল বুনে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে। এই কথা ভেবে হঠাৎ আনার বললো—

বেগমসাহেবা, আমি আপনার রোদনে বড় ব্যথা পাচ্ছি। এত বড় সাম্রাজ্যের আপনি কর্ত্রী, আমার সামনে আপনি রোদন করছেন শুনলে সমস্ত হিন্দুস্থানের লোকেরা চমকিত হবে। আপনার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আপনাকে অসম্মানিতা করবো না। আপনি নিশ্চিন্তে ফিরে যান। আনার যখন কথা দিচ্ছে, সে তার বিশ্বাস রাখবে।

মমতাজ চোখের জল মুছে খুশি হয়ে বললেন—তোমার জন্যে আমার সমস্ত দৌলত ব্যয়ের নিমিত্ত থাকলো বহিন, তুমি যদি কখনও প্রয়োজন অনুভব কর, আমাকে একবার সংবাদ দিও।

আনার তখন নিজেকে প্রকৃতস্থ করার চেষ্টা করছে, অশ্রু রোধ করে গাঢ়স্বরে বললো—আপনার কোন দৌলত আমার কাজে লাগবে না সম্রাজ্ঞী। আপনি আমাকে যে রত্নালঙ্কার উপহার দিয়েছেন, তাও ফিরিয়ে নেবেন। রূপের জন্যে রূপসী উপকরণ আমার আর কি হবে? তবে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনি আমাকে আর কোন অনুগ্রহ প্রদর্শন করে নিজেকে ছোট করবেন না।

মমতাজের সঙ্গে কথা শেষ করে নিজের কক্ষে গিয়ে পালঙ্কের ওপর আছড়ে পড়ে আনার অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলো। একসময়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম ভাঙতে আবার সে অনেক ভাবলো। ভাবতে ভাবতে অচৈতন্য হয়ে জ্ঞান হারালো। এমনিভাবে দিন এলো রাত্রি অবসান হলো, আবার প্রভাত বিদায় নিলো, সূর্য অস্ত গেল। এর মধ্যে তার কাছে কেউ এসেছিল কিনা বুঝতে পারলো না। শুধু অর্ধচেতনার মধ্যে মাঝে মাঝে কেমন মনে হত—তার বাঁদী পালঙ্কের সামনে এসে মালেকার মুখের দিকে চেয়ে কি যেন খুঁজছে। মাঝে মাঝে আনার কার কন্ঠস্বর শুনতে পেত—সে সচকিতা হয়ে নিদ্রাজড়িত চোখ খোলবার চেষ্টা করতো কিন্তু কিছুতে যেন খুলতে পারতো না। তার মনে হত—সম্রাট তার কাছে এসে বলছেন—আনার, তুমি ওঠো! তোমার নারীত্বের বিরাট পরিচয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আজ আমার পাশেই তোমার যোগ্য আসন নির্দিষ্ট হচ্ছে। তুমি আমার সত্যিকারের মহিষী। তুমি হবে এই সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। আনার, মমতাজের মত স্বার্থপর রমণী দুনিয়াতে দুর্লভ নয়। ওরা নিজের স্বার্থের জন্যে কি না করতে পারে? ওদের সংকীর্ণমনের পরিচয়ে আমার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছে। তুমি ওঠো, তোমার জন্যে বেহেস্তের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে। তোমাকে গ্রহণ করবার জন্যে আমি আমার উদারবক্ষ প্রসারিত করেছি। এই বলে যেন সম্রাট শাহজাহান তাঁর চন্দন সুবাসিত উষ্ণস্পর্শের বাহু দুখানি প্রসারিত করে আনারকে শয্যা থেকে গ্রহণ করতে গেলেন। আনার চোখ বুজে সেই স্পর্শের মাদকতায় স্বপ্নের পারিজাত কাননে বিমোহিত হয়ে অনেকক্ষণ নেশার মাঝে বিচরণ করছিল তারপর হঠাৎ চোখ খুলতেই সে দেখতে পেল—সেখানে কেউ নেই, সমস্ত কক্ষ শূন্যতার মাঝে যেন হাহাকার করে জানাচ্ছে—কেউ নেই। এ সাম্রাজ্যের সমস্ত মর্মরময় প্রাচীরের গাত্রে নিষ্প্রাণ শুধু রত্নের ঔজ্জ্বল্য—এখানে প্রাণ নেই, নেই

কোন অনুগ্রহ প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা। এ যে রাজ্য নয় সাম্রাজ্য। এখানে নীতি নেই, আছে রাজনীতি। মহব্বত নেই, আছে ষড়যন্ত্র। মহব্বতের রঙিন মাদকতা নেই—আছে হাহাকারের কান্না।

আনারের যখন চেতনার পূর্ণ সঞ্চার হল, তখন আবার নিজেকে প্রশ্ন করলো—এখানে তাহলে আমি কেন নিজেকে বিলিযে দিলাম? কেন শাহজাদার ওপর আকাঙ্ক্ষা তীব্র করে নিজের ভবিষ্যৎ ভাবলাম না? এর চেয়ে যে ওসমান ভাল ছিল, তার বাসনা ছিল স্পষ্ট তার চাহিদার মাঝে কোন কৌশল ছিল না। তাহলে কেন তাকেই এই দেহ দান করে তার মন সম্পূর্ণ করলাম না? তবু তো আজকে এই যন্ত্রণার মাঝে তাকে এভাবে নিঃশেষ হতে হত না।

তারপর নিজেকেই সে আঘাত করলো—বেশ হয়েছে! আশা তার বিরাট ছিল, তাই এই পরিণতি হয়েছে। পিতা ইব্রাহিম খাঁ যেমন বিরাট আশা নিয়ে এই পরিবারের চাকরী নিয়ে একদিন অকালে অদৃশ্য হয়েছেন, তেমনি তাঁর কন্যা। কিন্তু কন্যা তো অদৃশ্য হচ্ছে না! শুধু কলঙ্কিত জীবন নিয়ে এই বাদশাহী হারেমের ঐশ্বর্যের পালঙ্কে এখনও সে শুয়ে আছে। আনার ভাবল, তার চেতনা চিরতরে লোপ পেয়ে একেবারে মৃত্যু হচ্ছে না কেন?



এর অনেকদিন পরে, আনার তখন অনেকটা প্রকৃতস্থ হয়েছে। শুধু ভগ্ন-হৃদয়ে নিজের কক্ষেই সে আবদ্ধ থাকে। সেই সময় একদিন নিভৃত রাত্রে সম্রাট শাহজাহান এসে তার নিদ্রা ভঙ্গ করলেন।

আচমকা কার স্পর্শে নিদ্রা ভেঙে যেতে আনার ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। প্রথমে সে ভেবেছিল, সেই ওসমানের মত কেউ; তারপর স্বল্পালোকিত আলোর বিচ্ছুরণে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দেখে বিস্ময়ের শেষ সীমায় উপনীত হল। আনারের নাসারন্ধ্রে খুসবাই গুলাবী আতরের মাদকতা প্রবেশ করলো। সম্রাটের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলো যে তিনি বেধড়ক সরাব পান করে নেশায় বিভোর হয়ে উঠেছেন। তাঁর দু'চোখে সেই মাদকতা, যে মাদকতার মিঠেল ছাউনিতে সে জীবনে দুবার হারিয়েছিল পথ।

সহসা তার মনে অতীতের সেই দুটি রাত্রির অদম্য প্রবৃত্তি জেগে উঠলো! রাত্রির সুষুপ্তির মাঝে সামনে দয়িত এসে দুই উষ্ণবাহু প্রসারিত করে তাকে আলিঙ্গনের মাঝে লীন করে দিতে চাইছে, সে দয়িত অন্য কেউ নয়, তারই ঈপ্সিত কামনার স্পর্শে রঞ্জিত সোহাগরেণু। সে তো কোন কোহেস্তের পরী নয় বা এমন কোন অলৌকিক

শক্তিময়ী অপার্থিব বস্তু নয় যে এই অবস্থায় অনিচ্ছা প্রকাশ করে নিজের কৃতিত্ব জাহির করবে—সে মানুষ, তার ভোগ করার নেশা আছে, পাওয়ার কামনা আছে, দেওয়ার বাসনা আছে।

তাছাড়া এই নিবৃতি রাত্রে আসমানের ঐ জ্যোৎস্নাধারার মাঝে কামনারই আদান প্রদান হয়। সেই বিনিময়ের জন্যে সে এই শয্যার মাঝে লজ্জাহীনা হয়ে পুরুষকে আহ্বান করতে পারে। একদিন এমনি আকাঙ্ক্ষায় কত রাত সে নিঘুম ছিল, আজ আচমকা ঘুম ভেঙ্গে যেতে তার সামনে সম্রাট নয়,—তারই ঈপ্সিত পুরুষকে দেখে বক্ষের মাঝে প্রবল যাতনা অনুভব করলো। তারপর হঠাৎ সম্রাটকে কুর্নিশ জানিয়ে বললো—আদাব আলিজা, বাঁদী আপনার জন্যে কি করতে পারে?

সম্রাট শাহজাহান কোন কথা বললেন না, শুধু নেশাজড়িতস্বরে একটু হাসলেন, তারপর আনারের শয্যার ওপর তার সান্নিধ্যে বসে তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে চাইলেন।

আনার তাড়াতাড়ি সম্রাটের বাহু নিজের দেহস্পর্শ থেকে মুক্ত করে নিয়ে শয্যার অন্য প্রান্তে গিয়ে বললো—মাপ করবেন জাঁহাপনা। আমি মমতাজবেগমের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আপনি অন্য কোন কক্ষে আপনার প্রবৃত্তি দমনের বাসনায় গমন করুন, আমি অপারগ।

শাহজাহান তবু কোন কথা বললেন না, সবল বাহুর বেস্টন দিয়ে আনারকে নিজের বিশাল বক্ষের মাঝে আনতে চাইলেন।

আনারেরও ইচ্ছা করছিল সম্রাটের প্রশস্ত বক্ষে মুখ লুকিয়ে নিজের সান্ত্বনা খোঁজে। ঐ পুরুষের লোমশ বক্ষে মাথা রাখলে যে তার সমস্ত অভিমান চূর্ণ হয়ে যাবে, তা সে জানে। কিন্তু সম্রাট তাকে তাঁর আপন ভোগের বস্তু ছাড়া আর কিছু মনে করেন না, একথা চিন্তা করতেই তার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো।

হঠাৎ আনার ভাবলো—শাহজাহান তাকে এত তুচ্ছ মনে করেন? এত নিম্নস্তরের? সে উঠে দাঁড়িয়ে বেশবাস ঠিক করে বললো—সম্রাট, আপনি অনুগ্রহ করে এ কক্ষ থেকে বিদায় নিন। আপনি যদি না যান তাহলে আমি বেগমসাহেবাকে ডাকতে বাধ্য হব!

বেগমসাহেবার নাম শুনে হয়ত সম্রাটের নেশা জড়ানো চোখের রঙিন দৃষ্টি একটু ফিকে হল, তিনি এবার শান্তকণ্ঠে বললেন—আমি তোমাকে কিছু নিবেদন করতে এসেছিলাম আনার!

আনার উত্তেজনায় এত বেশী উত্তপ্ত হয়েছিল যে অস্বাভাবিককণ্ঠে চীৎকার করে উঠত। কিন্তু সে তা না করে মাথা নামিয়ে নিজেকে সংবরণ করে বললো, কোন নিবেদনের আর প্রয়োজন নেই বাদশাহ। আমি বেগমসাহেবাকে যে কথা দিতে বাধ্য হয়েছি, তারই মাঝে আমার সমস্ত কামনা বাসনা বিলিয়ে দিয়েছি। তাছাড়া আমি সম্মান চেয়েছিলাম। সম্মানীয় বংশের কন্যা আমি, ইজ্জতহারা হয়ে বাঁচতে চাই নি। · যাক্ নসিবে যা লিখন আছে, তার বিরুদ্ধে মানুষ আর কি করবে? আপনি আসুন জাঁহাপনা। এ পরিবারের মঙ্গলের জন্যে আমি প্রার্থনা করছি

আমার প্রতি আর কোন করুণা প্রদর্শনের চেষ্টা করবেন না। মরতে তো পারবো না, পারলে অনেক বেশি সুখী হতাম। বেঁচে যখন থাকবো, এখন থেকে নিজের সব আকাঙ্ক্ষাকে যমুনাস্রোতে বিসর্জন দিয়ে কলঙ্কিত জীবনের মুক্তির সাধনা করবো।

আনার একটু চুপ করে থেকে আবার বললো—ত্যাগের মধ্যে পেয়েছি আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি। যৌবনের প্রবৃত্তির উত্তেজনায় যে মোহের আবেগে নিজের সব হারিয়েছি, অথচ পাইনি কিছু—সেই ত্যাগের সাধনায় আমি কিছু পাবার চেষ্টা করছি। একদিন হয়ত তা পেয়ে তৃপ্তির মাঝে নিজের জীবনের শান্তি পাবো।

শাহজাহান কিছুক্ষণ আনারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর বললেন—তবে যাই তাহলে। আর অপেক্ষা না করে দ্রুতগতিতে তিনি কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

সম্রাট চলে যেতেই আনারের সংযম ভেঙ্গে পড়লো। সে এতক্ষণ অশ্রুস্রোতে বাঁধ দিয়েছিল এবং সেই বাঁধন শিথিল হতে তার চোখে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ বইলো। এ কি হল? এ সে কি করলো? সম্রাটকে বিদায় দিল। নিজেকে একেবারে শেষ করলো? এ কাজ সে কেন করলো? প্রতিজ্ঞা? প্রতিজ্ঞার মূল্য কি আছে! এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে কে কার প্রতিজ্ঞা পালন করে? মমতাজবেগম তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু তিনি নিজে কি কোন প্রতিজ্ঞা করতেন? করলেও রাখতেন কি? অথচ এই সাম্রাজ্যে সমস্ত হিন্দুস্থানের মানুষ তাঁর যশগানে মুখর। তিনি নাকি সম্রাজ্ঞী নন, সকলের জননী, জননীর স্নেহ দিয়ে তিনি সকলের দুঃখের অবসান ঘটিয়েছেন।

অথচ তাঁরই অন্তঃপুরে একটি রমণীর সঙ্গে তাঁর যত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জননী হিসাবে হয়ত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন কিন্তু রমণীরূপে তিনি আনারের কাছে পরাজিত,—এ কথা আনার আজ হলফ করে বলতে পারে। মমতাজ নিজের স্বার্থের জন্যে রাজনীতির খেলা খেলে সম্রাটকে আপন করে রাখবার জন্যে আনারকে দিয়ে এক চরম প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন। এ কথা হয়ত আজ কাউকে বললে বিশ্বাস করবে না কিন্তু পৃথিবীতে তিনজন ব্যক্তি আছেন—শাহজাহান, মমতাজ আর সে, তিনজনই জানে, মনে মনে তারা কত বেশি দুর্বল। আনার নিজের দুর্বলতা চিরতরে নষ্ট করেছে, সে নিজের জীবন দিয়েও কৃতিত্ব বজায় রেখেছে কিন্তু শ্রেষ্ঠ দুই মানুষ —শাহজাহান ও মমতাজ!

আনার হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে সেই নিষুতি রাত্রে আপন কক্ষের মধ্যে সারা অঙ্গ দুলিয়ে হি হি করে হেসে উঠলো। হাসি প্রশমিত হলে সে বললো—আজ সম্রাট এসেছিলেন তার দেহভোগ করতে নয়, তার কাছে নিজের দুর্বল মনের জন্যে প্রার্থনা জানাতে! মনে হয় প্রার্থনা জানাতেই এসেছিলেন। বলতে এসেছিলেন—আনার কাউকে আমাদের এই দুর্বলতার কথা বলো না; আমাদের সম্মান, প্রতিপত্তি, রাজত্ব, সম্ভ্রম সব তোমারই কাছে গচ্ছিত রইলো, তুমি তা রক্ষা কর।

হঠাৎ আনার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পেরেছে ভেবে আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ

করে হেসে উঠলো, তারপর বললো—সম্রাট কিন্তু কোন কথাই বলতে সাহস করলেন না। বোধ হয় তিনি আনারের মানসিক অবস্থা দেখে ভীত হয়ে সম্রাটের মস্তক মাটিতে অবনত করে কক্ষ ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু তিনি যদি বলতেন তাহলে ঐ কথাই বলতেন। আনারকে অনুরোধ করতেন। আর আনার কি তার কথা কিছু শুনতো না। কারণ সম্রাটের ওপর তার অনেক বেশি আক্রোশ। তার ইজ্জত নিয়ে তিনি তাকে দেওয়ানা করে দিয়েছেন। মমতাজের কথা শুনেছে, কারণ তাঁর অভিযোগের মধ্যে কিছু সত্য নিহিত ছিল। তিনি চিরকাল চেয়েছিলেন—স্বামী তাঁর কুসুমবক্ষের সোহাগে রঞ্জিত হয়ে বিভোর থাকুক।

আনার নিজের কক্ষ ছেড়ে মনের শান্তির জন্য অলিন্দ দিয়ে যমুনার ধারে এসে দাঁড়ালো। আগ্রার প্রাসাদের উঁচু অলিন্দে দাড়িয়ে দেখতে পেল যমুনার বিস্তৃত জলের বুকে কোন আলোড়ন নেই, তার গতি শ্লথ। সেই শ্লথ গতির ওপর পড়েছে রজনীর উদ্দাম চঞ্চল জ্যোৎস্নার রশ্মিধারা।

আনার হঠাৎ নিজের মনকে যমুনার ঐ স্রোতধারার মত করার চেষ্টা করলো। রজনীর উদ্দাম চঞ্চল জ্যোৎস্নার রশ্মিধারার মত তার মনের মধ্যে এখনও কামনার রঙিন আকাঙ্ক্ষা, এখনও তার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আদিম প্রবৃত্তি তাকে উচ্ছৃঙ্খল জীবনের দিকে টানে—সে সেই উত্তেজনাকে প্রশমিত করবার জন্যে সেই নিষুতি রাত্রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল—এবার ভোগের জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা নয়, সংযমের জন্যেই চলবে তার প্রতিদিন ও রাত্রির সাধনা।

ইতিমধ্যে কোথা দিয়ে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের তিনটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেলকে জানে? তবে গণনা ঠিকই হয়েছিল। নির্দিষ্টক্ষণে অভিষেক ক্রিয়া যথাযথ হয়ে তিনটি নওরোজ উৎসবও পালিত হয়েছিল।

হঠাৎ সেদিন শাহজাহানের রাজত্বকালে ষোলশ' একত্রিশে সাল থমকে দাঁড়ালো। এই অশুভ ভয়ংকর বৎসরটি যে সম্রাটের মুকুটশোভিত মস্তক একেবারে হর্ম্যতলে শায়িত করবে—কে জানতো? সে বছরও যথারীতি রাজসিক আড়ম্বরে নতুন বৎসরের উৎসব পালিত হয়েছিল। কিন্তু সে বৎসর নতুনের আগমনে সবুজ পত্রের রঙে, হলুদের বর্ণশোভায় প্রতিফলিত ছিল না কে বলতে পারতো? অবশ্য সবার চোখেই নতুনের আগমনে শুভসঙ্গীতের সূচনার সঙ্গে উজ্জ্বল দিনের দীপ্তিশোভা প্রতিফলিত হয়েছিল কিন্তু এরই পশ্চাতে যে ছিল কালিমার রূপ, সে কে বুঝেছিল? কিন্তু বুঝলো সকলে বৎসরের জুনমাসের সাতই তারিখে। প্রিয়দয়িত ও সম্রাটের

হৃদয়ে অনির্বাণ শোকবহ্নি প্রজ্বলিত করে বেগম মমতাজ অন্তঃপুরের ঐশ্বর্যের সমস্ত লিপ্সা ত্যাগ করে বিদায় নিলেন চিরতরে—প্রাসাদের আকাশে, বাতাসে শোকছায়া প্রতিষ্ঠিত হল। সেদিন মহিষীর বিয়োগবেদনায় সাম্রাজ্য মুহ্যমান হয়ে গেল। সেদিনই বোঝা গেল—সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রাণী সম্রাজ্ঞীকে কিভাবে ভালবাসতো।

সম্রাট শাহজাহান সিংহাসন পেয়ে, সাম্রাজ্যের মাঝে অধীশ্বর হয়ে, পাশে পাশে মমতাজের প্রেরণায় সমস্ত অতীতের যন্ত্রণা বিস্মৃত হয়েছিলেন কিন্তু সে বিস্মৃতি তাঁর বেশিদিন রইলো না, আকস্মিকভাবে মমতাজকে হারিয়ে তিনি উপলব্ধি করলেন যে নসিব তাঁর সত্যিই শুভাকাঙ্ক্ষিত নয়।

মাত্র কদিনই বা তিনি সিংহাসনে বসেছেন, এরই মধ্যে তাঁকে এই নিদারুণ শোক সহ্য করতে হল। মমতাজের আর কি অপরাধ—অপরাধ সব তাঁরই। শান্তি যখন জীবনে আসবে না, তা পাবার চেষ্টা করাও বৃথা। একজন ফকিরের চেয়ে যে তাঁর ক্ষমতা অনেক স্বল্প, আজ ভাগ্য বিপর্যয়েই তাঁর একথা মনে হচ্ছে।

শোকের প্রথম উচ্ছ্বাসে প্রায় দীর্ঘদিন সম্রাট রাজকার্যে কোন মন দিতে পারলেন না। আপন কক্ষের মধ্যে বন্দী হয়ে শুধু গবাক্ষ দিয়ে আশমানের দিকে তাকিয়ে যমুনার স্রোতের মাঝে শুধু মমতাজের স্মৃতি খুঁজতে লাগলেন। উনিশ বৎসরের দাম্পত্যজীবনের খুঁটিনাটি কত কথাই তাঁর মনে এল। এই সুদীর্ঘ কালের অধিকাংশ সময়ই তাঁকে এক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কাটাতে হয়েছে, তার মধ্যে তিনি কতটুকুই বা প্রিয়তমাকে সুখদান করেছেন। বরং তাঁর মনের নানান অবস্থান্তরের ওপর সমতা রাখতে গিয়ে তিনি প্রিয়তমাকে আঘাতই করেছেন। আর নীরবে সেই রমণী সব সহ্য করে নিজের স্বভাব অম্লান রেখেছে। কোনদিনও কোন অভিযোগ প্রকাশ করেননি; তারপর যদিও বা এই কদিন মাত্র সে একটু স্বাতন্ত্র্য পেল, আল্লা তাকে সেই সুখ ভোগ না করতে দিয়ে কেড়ে নিলেন।

সম্রাট পত্নীবিরহে এতদূর মুহ্যমান হলেন যে তিনি চিরদিনের জন্যে রঙিন পরিচ্ছদ, সুগন্ধ ও মণিমুক্তার ব্যবহার ত্যাগ করলেন। তাঁর আমোদ-প্রমোদ উৎসব-আনন্দ সমস্ত পতিপ্রাণা সেই মমতাজের সঙ্গে চিরসমাধিলাভ করলো। এমনকি তিনি রাজ্যের চতুর্দিকে আদেশ প্রচার করে দিলেন—সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুতে অনির্দিষ্টকালের জন্যে কোথাও আমোদ-প্রমোদ উৎসব-আনন্দ পালিত হবে না।

তাতে এই হল—বহুদিন ধরে সর্বত্র একটি শোকের ছায়া কালিমাবর্ণ রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। বাৎসরিক অভিষেক-বাসরে ও জন্মদিন উৎসবে নৃত্য-গীতাদির চিরাগত অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল। শাহজাহানের শ্মশ্রুও যেন পত্নীবিয়োগের অনতিবিলম্বে শুভ্রবর্ণ ধারণ করলো। অকালবৃদ্ধ বাদশাহ যেন কয়েকমাসের মধ্যে নতুন এক মানুষে পরিণত হলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে অন্তঃপুরের প্রত্যেকেই সত্যিই ব্যথিত হলেন।

কিন্তু একজন হল না, সে আনার। আনার মমতাজের মৃত্যুতে নিজের স্বভাব অনুযায়ী ব্যথিত হয়েছিল, কিন্তু সম্রাটের অবস্থা দেখে মনে মনে বললো—বাদশাহ

যেন একটু অতিরিক্ত শোকপ্রকাশের চেষ্টা করছেন! একথা সেদিন আমার কেন বললো বোঝা যায়নি, হয়ত সম্রাটের প্রতি তার বিদ্বেষ ছিল বলেই বলেছিল।

শাহজাহান যে সত্যিই পত্নীবিয়োগে শোকাচ্ছন্ন হয়েছিলেন, তার প্রকাশ তাঁর সর্বশরীরে বিদ্যমান ছিল। মোগল সম্রাটদের পত্নীবিয়োগ এর আগে হয়ত অনেক হয়েছে কিন্তু এমনি পত্নীবিয়োগ ও তার শোক এর আগে বোধহয় কেউ দেখেন নি। তাই সম্রাট শাহজাহানের বেদনায় যমুনার চঞ্চল স্রোতধারা শোকাচ্ছন্ন হয়ে স্থির হয়ে গেল।

তারপর আস্তে আস্তে সবই আবার সমান অবস্থায় ফিরে এল কিন্তু সম্রাটের বেদনার উপশম হল না। অন্তঃপুরের দিকে তাকালেই যেন শুনতে পান সেই দুটি চরণের ধ্বনি। সর্বত্র যেন বেগমের কন্ঠই অনুরণিত হয়ে তাঁকে দগ্ধ করে। সেজন্যে তিনি প্রাসাদ থেকে অধিকাংশ সময় মুক্ত হয়ে পত্নীর সমাধির কাছে থাকতে লাগলেন। বেগমের সঙ্গে জীবিতাবস্থায় যে সব কথা বলার সময় পাননি, সেই সব কথাগুলি অশ্রুর স্রোতে সিক্ত করে নিবেদন করলেন।

. তবু শান্তি কোথায়? আজ যে কাছে নেই, তাকে দূর থেকে কতটুকুই বা অনুভব করা যায়? শুধু মনে হয় সে দূরে, বহু দূরে। তার নাগাল পাওয়া দুনিয়ার মানুষের সাধ্যের বাইরে।

সম্রাট শাহজাহান সেজন্যে ঠিক করলেন—পত্নীবিয়োগ বেদনা ভুলে তাকে অন্ততঃ জীবিতাবস্থায় আরো জাগিয়ে রাখার জন্যে তার স্মৃতি চির অক্ষয়ের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এমন একটি স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করবেন, যা প্রিয়তমা বেগমের স্মৃতিকে চির অম্লান করে রাখবে এবং সেই স্মৃতির সঙ্গে তাঁর এই দিলের মহব্বতের স্নিগ্ধতা যমুনার ঐ উন্মুক্ত প্রান্তরের নিঃশ্বাসের বায়ুতে ছড়িয়ে যুগ যুগান্তরের মানুষকে জানাবে—মোগলবাদশাহ শাহজাহান তাঁর প্রিয়তমা মহিষী মমতাজকে পেয়ার করতেন—এমন পেয়ার বুঝি জগতে কেউ কখনও করেনি।

সম্রাটের চিন্তা মানেই কার্যে পরিণত হওয়া, তাই রাজভান্ডার উজাড় করে সেরা রত্নগুলিকে বাছাই করে রাখা হল।

পত্নীর স্মৃতিসৌধের মাঝে বেদনাকে ধরে রাখতে পারবেন জেনে সম্রাটের শোক সেসময় অনেকটা শান্ত আকার ধারণ করেছিল।



সেবছর এই দেখে নওরোজ উৎসব একটু জাঁকজমকভাবে করবার জন্যে জাহানারা বাদশাহ পিতার কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছিল। তাছাড়া শোকের মোহ আর কতদিন

বেদনা নিয়ে আমোদপ্রমোদ ত্যাগ করে থাকবে। সকলের তো আর সম্রাটের মত পত্নীবিয়োগ হয়নি।

সেকথা বুঝে আর জাহানারার অনুরোধে সম্রাট কর্তব্যের খাতিরে নওরোজ উৎসব প্রতিপালনের জন্যে সকলকে আদেশ দিলেন। তখনকার দিনে এই ধরনের উৎসব খুব জাঁকজমকপূর্ণ হত এবং এই উৎসবে রাজ্যের চতুর্দিকে দারুণ আমোদ-প্রমোদের সাড়া পড়ে যেত। অবশ্য তার প্রধান উপলক্ষ্য ছিল রাজপুরী। সম্রাট নিজে এই উৎসবের একজন প্রধান উৎসাহদাতা হয়ে রাজভান্ডার থেকে প্রচুর অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করতেন এবং এই উপলক্ষ্যে রাজদরবারে একটি অনুষ্ঠান হত, তাতে বাদশাহ এইদিন স্ব স্ব যোগ্যতানুযায়ী অনেককে পুরস্কার প্রদান করতেন।

মমতাজবেগম বেঁচে থাকতে তিনবছর এই উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়েছিল তারপর বেগমের মৃত্যুতে উৎসব বন্ধ হয়ে যায়।

এবার জাহানারার ইচ্ছায় সে উৎসব পালিত হবার ব্যবস্থা হল। জাহানারা এখন সম্রাটের মণি। পত্নীকে হারিয়ে পত্নীর শোক ভোলবার জন্যে সম্রাট কন্যার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। তাছাড়া সম্রাট তাঁর জ্যেষ্ঠকন্যাকে একটু অতিরিক্ত স্নেহই করতেন। মমতাজের মত স্বভাবটি জাহানারা পেয়েছিল বলে হয়ত সম্রাটের এত আকর্ষণ।

যাইহক সেদিন সূর্যোদয়ের পর থেকে অস্তগমন পর্যন্ত দরবারগৃহে এক উল্লেখ-যোগ্য নওরোজ উৎসব প্রতিপালিত হল। রাজপুরীতে সাধারণতঃ বছরে কটি আনুষ্ঠানিক উৎসব পালিত হত। সম্রাটের জন্মতিথি উৎসব দুবার অনুষ্ঠিত হত, চন্দ্র ও সৌর গণনানুসারে আর এ ছাড়া 'ঈদই গুলাবী' ও 'জশন-ই নওরোজ'। কিন্তু মমতাজের বিয়োগে আনুষ্ঠানিক কর্তব্য পালন ছাড়া এ উৎসবের আমোদ-প্রমোদ একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এই বৎসর এদিনে প্রিয় দুহিতা জাহানারার ইচ্ছেয় এই উৎসব পালিত হল। রাজপ্রাসাদ ফুলমাল্যে, আলোক সজ্জায়, বসনভূষণে সাজানো হল, নৃত্যগীতের ব্যবস্থাও হল। আমোদ-প্রমোদ বন্ধ থাকলো না। সারা শহর পূর্ণ করে সে উৎসব মুখরিত হল।

কন্যার ইচ্ছায় সম্রাট উৎসবে যোগদান করতে বাধ্য হলেন। প্রারম্ভে তিনি কিছুটা প্রফুল্ল ছিলেন কিন্তু যত উৎসব এগিয়ে চলতে লাগলো, দিন এগিয়ে যেতে লাগলো, কেমন যেন তিনি গম্ভীর হয়ে মানসিক যন্ত্রণার মাঝে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলেন। বার বার তাঁর উজ্জ্বল চোখদুটি থেকে অশ্রু ধারা বেয়ে আসতে লাগলো। যখন তাঁর মানসিক অবস্থা একেবারে উচ্চমার্গে পেঁছলো, তিনি উৎসবে আর বেশীক্ষণ নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি রাজসিক বেশে সবার সামনে থেকে নিজেকে একান্ত সরিয়ে পত্নীর চিন্তায় বিভোর হবার জন্যে আরামকক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলেন। অন্য সকলকে বললেন—আমি ক্লান্ত, বিশ্রামান্তে ক্লান্তি বিদূরিত হলে আবার গিয়ে উৎসবে যোগদান করবো। শুধু জাহানারাকে একান্তে

ডেকে তিনি কন্যার সামনে নিজেকে মেলে দিলেন। জাহানারা পিতার মুখমণ্ডল দর্শন করে আর কথা না বাড়িয়ে কক্ষান্তরে চলে গেল।

শাহজাহান তখন নিজের আরামকক্ষে শয্যার ওপর শয়ন করে চক্ষু বুজে পত্নীর কথাই ভাবছিলেন। ভাবছিলেন, মমতাজ কেন এত তাড়াতাড়ি চলে গিয়ে প্রিয়তমকে এই দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে গেল। আর যে কিছুতে সহ্য করতে পারছেন না তিনি এই শোক।

নিঃসঙ্গ অবস্থায় সম্রাট যখন এসব কথা ভাবছেন, একজন তখন নিঃশব্দে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলো। সে আনার। আনার এতদিন কোথায় ছিল সে ইতিহাস নিষ্প্রয়োজন। তবে আনার কেন আজ সম্রাটের সামনে এলো, এ আচরণ অবাক হয়ে লক্ষ্য করার আগে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। আনার সেই অতীতের রাত্রির পর আর কখনও সম্রাটের সামনে এমনিভাবে আসেনি। এমনকি মমতাজ মারা যাবার পরও সে দূর থেকেই সম্রাটকে দেখতো, কাছে কখনও গিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলেনি—জাঁহাপনা, শোক নিবারণ করুন। খোদার ইচ্ছার ওপর তো কিছু করার নেই, তবে কেন অবুঝ হয়ে নিজেকে দগ্ধ করছেন ?

স্বল্পালোকিত কক্ষের মধ্যে স্বর্ণনির্মিত পালঙ্কে শুয়ে সম্রাট ললাটে হাত দুটি স্থাপন করে চোখ বুজে ছিলেন। নিঃশব্দে আনার সম্রাটের কাছে গিয়ে পক্ব-কেশে পরম যত্নে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

মানসিক অবস্থাটা কিছুক্ষণের মধ্যে সামলে নিয়ে সম্রাট চোখ খুলে আনারের দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে বললেন—আনার, তুমি !

আনার মাথা নেড়ে বললো—হ্যাঁ, জাঁহাপনা আমি। এর আগেই আমার আসা উচিত ছিল, কিন্তু লজ্জায় আসতে পারিনি।

শাহজাহান শান্তকণ্ঠে বললেন—লজ্জার কি আছে আনার ? যা হবার সে তো হয়ে গেছে। মমতাজ নেই এই অভাবই আমার এখন সবচেয়ে বেশী। তাকে হারানোর দুঃখ আমার প্রাণে এমন করে যে বাজবে—কে জানতো ?

আনার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললো—শোক সংবরণ করুন সম্রাট। তিনি কী ছিলেন—আমিও জানি। তাঁর মত রমণী এ দুনিয়াতে যে দুর্লভ, এ কেউ না জানলেও আমার জানা আছে। তবু বলছি জাঁহাপনা, তাঁকে যখন আর ফিরে পাবেন না, মিছে কেন আপনি নিজেকে নষ্ট করছেন, আপনার জন্যে সমস্ত সাম্রাজ্য অপেক্ষায় আছে, আপনার সামনে কত কর্তব্য। এ সময়ে কি এত অধৈর্য হলে চলে ? তাছাড়া বেগমসাহেবার পুত্রকন্যাদের দেখাও আপনার কর্তব্য। এসব বিস্মৃত হয়ে বালকের মত শোকে মুহ্যমান থেকে ক্রন্দন করা অন্ততঃ সম্রাটের শোভা পায় না। আপনি উঠুন, উঠে আবার দাঁড়ান, চেয়ে দেখুন দুনিয়ার সমস্ত প্রখর আলোর জ্যোতি সব আপনারই ওপর প্রতিফলিত হচ্ছে। আপনার যে অনেক কাজ বাদশাহ, তাঁকে যখন আর ফিরে পাবেন না, বিরহে ক্ষতবিক্ষত না হয়ে তাঁর মনের আকাঙ্খাগুলি সব পূরণ করুন—দেখবেন অন্তরালে তার আত্মা শান্তিলাভ করছে।

এতকাল এমন করে কেউ সান্ত্বনা দেয় নি তাই সান্ত্বনার বাণী শুনে সম্রাটের অশ্রুধারা আরো স্রোতস্বিনী হল। তিনি নীরবে অশ্রুত্যাগ করতে করতে আনারের সান্ত্বনার কথাগুলি শুনে শোকের মাঝে আরো অভিভূত হলেন কিন্তু শান্তি পেলেন। বিশেষ করে আনার আজ অতীতের স্মৃতি ভুলে বেগমসাহেবার ওপর অসন্তুষ্ট না হয়ে তাঁকে সান্ত্বনা জানাতে এসেছে দেখে আনারের ওপর তিনি খুশি হলেন। কিন্তু তাঁর বিস্ময় জাগলো আনারের সমস্ত দেহের দিকে তাকিয়ে। আনার সেজেছে ঠিক মমতাজের মত। মমতাজ যেমনি ফিরোজা ও গোলাপীবর্ণের সমন্বয়ে পোষাক পরিধান করতো, কোন সময় সালোয়ারের রঙ ফিরোজা কামিজের রঙ গোলাপী, আবার কোন সময় সালোয়ারের রঙ গোলাপী ও কামিজের রঙ ফিরোজা থাকতো, আর বিভিন্ন যে কোন বর্ণের ওড়না, তার কোন ঠিক ছিল না। সম্রাট আনারের পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখলেন যে সে মমতাজের মত পোষাক পরেছে। এমন কি মমতাজ যেমন করে বেশবিন্যাস করতো আনারও তাই করেছে। নীলোৎপল দুটি চোখের কোণে মমতাজের মতই সুরমার অঞ্জন, ঠোঁটের কোণে গাঢ় তাম্বুলরাগ।

শাহজাহান আনারের সজ্জার আসল অভিপ্রায় কি বুঝতে না পেরে মনে মনে শঙ্কিত হলেন। কিছুতে তিনি অনুমান করতে পারলেন না, এতদিন পরে আনার যখন এসেছে তখন নিশ্চয় তার কোন গোপন অভিপ্রায় আছে। কিন্তু সে অভিপ্রায় কি বোঝা যাচ্ছে না? অথচ মমতাজের মত পোষাক পরিচ্ছদ পরে এমন কি তার মত হাসি নকল করে, সে যেমন সম্রাটের কাছে এসে মাথায় ও মুখে স্পর্শসুখ দান করতো তেমনি আনার প্রথম এসে তাও দান করলো। এসব ভেবে সম্রাট চিন্তিত হলেন।

কিন্তু আনার অনেকক্ষণ আর কোন কথা বললো না, সে তাকিয়েছিল গবাক্ষের বাইরে আশমানের দিকে। সেখানে ক্লান্ত রোদ্দুর। শেষ হয়ে আসছে দিন। দেখবার কিছু ছিল না। শুধু জীবন-সায়াহ্নকালীন একটি ম্লান ছায়ার মত রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আনারের তো এখনও সময় আসে নি, তবে কেন সে ওসব দেখছে? বরং আজ তার সমস্ত আকৃতিতে প্রসাধনের চমৎকারিত্বে তার যৌবন যেন নতুন রূপে আবির্ভূত হয়েছিল।

তখনও বাইরে উৎসবের প্রাঙ্গণ থেকে কোলাহল ভেসে আসছে।

শাহজাহান এমনি অনিশ্চিতের মাঝে বড় অসোয়াস্তি অনুভব করছিলেন তাই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন—আনার, তুমি আর কিছু বলবে?

আনার হঠাৎ চমকিত হয়ে বললো, না বাদশাহ, আমি কিছু বলবো না। তারপর সংকোচ কাটিয়ে বললো—একটি নিবেদন আছে সম্রাট, যদি অভয় দেন তো ব্যক্ত করি।

সম্রাট মনে মনে আর একবার কম্পিত হলেন, তারপর সংযত হয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন, বলো, অভয় দিচ্ছি। তবে উত্তেজনা বাড়াবার মত কোন কথা বলো না,

তাহলে আমি আব সহ্য করতে পারবো না।

আনার তবু ইতস্ততঃ করলো, অনেক ভাবলো, তারপর বললো —বেগমসাহেবা সমাধিস্থ হয়েছেন আর তো ফিবে আসবেন না। আপনার এই বিরাট সমস্যাবহুল জীবন কত দায়িত্বের মধ্যে এগিয়ে যাবে, এখন যদি বেগমসাহেবার শূন্যস্থান পূর্ণ না হয়, তাহলে আপনার মনও শান্ত হবে না। তাই বলছিলাম—এই বলে আনাব হঠাৎ কেমন যেন সংকুচিত হযে থামলো।

সম্রাট সেই অবসরে ভাল করে আনারেব দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করে বললেন—বলো, থামলে কেন?

আনাব ম্লান হেসে বললো —আপনি তো আমাকে সম্মান দেবেন বলেছিলেন তাই সে কথা স্মরণ করিযে আবার আপনাকে বিব্রত করতে এলাম। আপনি তো জানেন, আমি বেগমসাহেবার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম বলে এতকাল নীরবে নিজেকে দগ্ধ করেছি। কিন্তু আমিও তো রমণী, আমারও আশা আকাঙ্ক্ষা আছে।

মমতাজের শূন্যস্থান পূর্ণ করতে এই বমণী অগ্রসর হযে এসেছে দেখে সম্রাট ক্ষিপ্ত হলেন। তারপব আনাবের সেই কাঙালের মত নিজেব স্বার্থ সিদ্ধির কৌশল দেখে আরো উত্তেজিত হলেন। কিন্তু যতটা ক্রোধ তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হল, ততটা ব্যক্ত করলেন না, শুধু শ্লেষবাক্যে বললেন—সেজন্যে বুঝি মমতাজের আকৃতির নকল করে আমাকে প্রলোভিত করতে এসেছ? তারপব শয্যা থেকে উঠে বললেন—বলো আর কিছু তোমার আর্জি আছে?

আনার মাথা নত কবে চোখের জল সামলাতে সামলাতে বললো—না, আর কিছু আমার আর্জি নেই সম্রাট। আমি শুধু বাঁদী থেকে বেগমের সম্মানে উন্নিতা, হতে চাই। আর বেগমের আকৃতি নকল করেছি বলে যে শ্লেষ প্রয়োগ করছেন, তার মধ্যে আমার আর কোন উদ্দেশ্য নেই, শুধু আপনার সেই আকৃতি বড় প্রিয ছিল বলে এই বেশবিন্যাস করেছি।

শাহজাহান হঠাৎ দারুণ ভাবে শান্ত হযে গিয়ে বললেন—আনার, তুমি অন্তঃপুরে যাও, আমার শরীবে বড় উত্তেজনা জাগছে, তাছাড়া তবিয়ৎ ভাল নেই। এসব কথা অন্য সময় হবে!

হঠাৎ আনার চোখের জল মুছে সম্রাটের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্বরে বললো—আমি জানি, আপনি আমার আর্জি কখনও পূরণ করবেন না। তাহলে আমাকে উত্তর দিন, আপনি কেন আমার রমণীমনকে ক্ষতবিক্ষত করেছেন?

শাহজাহান বিরক্ত হয়ে বললেন—আনার, আমি বলছি, তুমি এখন ভেতরে যাও। আমি বড় ক্লান্ত।

আনার আবার দৃঢ়স্বরে বললো, না, আমি যাব না। আপনি এই বলে আমার কাছ থেকে এড়িয়ে যেতে চান! আজ আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আপনার জবাব চাই।

সম্রাট কাতরভাবে বললেন, আমি তার জন্যে তোমার কাছে সম্রাট হয়ে ক্ষমা

চাইছি আনার। ক্ষমা করে আমার যাতনা প্রশমিত করতে সাহায্য কর।

আনার তবু থামলো না বা সম্রাটের কাতর অনুনয়ে কর্ণপাত করলো না। সে যেন আজ মরীয়া। সম্রাট এই মুহূর্তে তার গর্দান দেবার আদেশ দিলেও সে থামবে না। তাই মরীয়া হয়ে বললো —বেশ, বেগম না করতে চান, মমতাজবিবির যেমন স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ব্যবস্থা হচ্ছে, আমারও তেমনি একটি স্মৃতিসৌধ করে দেবেন বলুন। আর সেই স্মৃতিসৌধের গাত্রে লিখিত থাকবে,—আপনার নাম, আপনার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ—এই সব কথা।

শাহজাহান আনারের স্পর্ধা দেখে হতচকিত হয়ে সেদিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে বললেন—এ রমণী কি পাগল হয়ে গেছে নাকি? মমতাজ আর সে! একি সুস্থ মস্তিষ্কে কেউ চিন্তা করতে পারে? তাই ক্ষুব্ধস্বরে বললেন—মমতাজের মত প্রেয়সী যদি হতে, নিশ্চয় তোমার সে-সাধ পূর্ণ করতাম।

আনার আবার বললো—কেন, আমি মমতাজের চেয়ে কম কিসে? আমি কি আপনার সঙ্গে মমতাজবিবির মত মহব্বত করি নি? আপনি বরং আমাকে অসম্মান করেছেন, আমি কখনও আপনাকে এতটুকু অবহেলা করিনি।

অনেক দুঃখেও সম্রাটের মুখে ম্লান হাসি জেগে উঠলো, তিনি হেসে বললেন—আনার, তুমি অপ্রকৃতস্থ না হলে এমন কথা বলতে না। তুমি কি জানো না, তোমার মত শত শত রমণী আমার হারেমে আছে, তারা কখনও সম্রাটের অনুগ্রহ পেলেও তোমার মত সম্রাজ্ঞীর আসন কামনা করে না। কারণ তারা জানে, তাদের প্রাণের মূল্য একটুকরো প্রদীপের আলোর মত। নির্বাপিত করতে শুধু একটি আদেশেরই অপেক্ষা।

এককথায় আনার উত্তেজিত হয়ে বললো, আমি জানি, আপনার হারেমে অনেক তাজা খুবসুরত জোয়ানী আওরত আছে। আর এও জানি, সম্রাটের ক্ষমতা অসীম। তাঁর আদেশে জল্লাদের খড়্গ সব সময়ে ওঠানামা করে। তাই বলে আনার মৃত্যুর জন্যে ভয় পায় না। তবু আমি জিজ্ঞেস করছি। আপনি কি মনে করেন, আমি সেই সব উচ্ছিষ্ট যৌবনের উপাচার নিয়ে হারেম শোভা করে আছি? আমার নারীত্বের কি কোন মূল্য নেই? আপনি কি জানেন না কত বড় অন্যায়কে আপনি প্রশয় দিয়েও আমার কুমারীত্ব নষ্ট করে আজ ন্যায়ান্যায়ের বড় বড় কথা বলছেন? সেদিনের কথা কি ভুলে গেছেন? বিরাট মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে আপনি কৌশলে আমার রমণীরত্ন হরণ করলেন? সেদিন যদি জানতেন, আপনি কখনও আমাকে সম্মানিত করতে পারবেন না, তাহলে আমাকে গ্রহণ না করে স্পষ্ট কথা বলতে পারতেন। আনার হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে বললো—আমি যে সেদিন আপনাকে অনেক বিশ্বাস করেছিলাম সম্রাট। তার কি প্রতিফল এই! শেষে কান্না রোধ করে ক্ষুব্ধস্বরে বললো—আপনার মনে রমণীর কান্নাও কোন স্পর্শ সৃষ্টি করে না। আপনি নির্মম। আপনি পাষাণ। শুধু বেগমসাহেবার স্মৃতির ছল করে নিজেকে সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্ত করতে চাইছেন! আমি কি জানি না—

আপনি বেগমসাহেবাকে কত ভালবাসতেন ?

শাহজাহান হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন—আনার, স্তব্ধ হও। তুমি অনেক দূরে এগিয়ে গেছো !

আনার সঙ্গে সঙ্গে গর্জে বললো—না, আমি থামবো না। যা সত্য তা আলোর মত স্পষ্ট। আপনি যখন আমার ওপর অবিচার করেছেন, আমিও আপনার সম্মান অক্ষুন্ন রাখবো না। আপনি সত্যি করে বলুন তো—আপনি কি যথার্থই মমতাজকে ভালবাসতেন ? তারপর আনার নিজেই উত্তর দিল—আপনি কখনও কাউকে ভালবাসেন নি। মোগল বংশের পূর্বপুরুষরা যেমন দৌলতের লোভে, বিলাস-ব্যসনের আকাঙ্ক্ষায় প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়ে নিজের স্বার্থকে জয় করতো তেমনি আপনিও যে কত বড় মিথ্যুক, আর কেউ না জানলেও আমি জানি। এই বলে আনার নিজের বক্ষে কবার হাত ঠেকালো।

হঠাৎ শাহজাহান ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন—খামোশ।

কিন্তু আনার না থেমে বলে চলল—শুনেছি শাহনসা সম্রাট আকবর দয়ালু, সহানুভূতিশীল জ্ঞানী, বিচক্ষণ সব কটি গুণের আধার ছিলেন, আজ বুঝছি তিনিও যেমন মিথ্যের জন্যেই সত্যের কৌশল গ্রহণ করতেন তেমনি বাদশাহদের পূর্বপুরুষ ও উত্তমপুরুষ। প্রত্যেকেই লোভের আকর্ষণ ত্যাগ করতে না পেরে এই পথে চলেছেন।

পত্নীর নামে, পূর্বপুরুষের নামে নাম-গোত্রহীনা একটি রমণীর দুর্ণাম স্বকর্ণে শুনে বাদশাহের সহ্যের সীমা অতিক্রম করলো, তিনি এতক্ষণ সব সহ্য করেছিলেন কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত হতে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। নিদারুণ ক্রোধে কি করবেন ভেবে না পেয়ে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে ডাকলেন—জাহানারা, বেটি !

জাহানারা বোধ হয় বাইরেই পিতার আহ্বানের অপেক্ষাতেই ছিল কারণ কক্ষের এই কলহ প্রাসাদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল, এমনকি এতদিন ধরে যা গোপন ছিল, আজকে তা আর গোপন থাকলো না, স্পষ্ট হয়ে উঠলো আলোর মত। জাহানারা মনে মনে শঙ্কিত হয়ে পিতার জন্যেই শুধু ভাবছিল। আজ তার পিতার জীবন-মৃত্যুর জন্যে সেই দায়ী ! অথচ আনারউন্নিসাকে মাতৃস্বসার মত শ্রদ্ধা জ্ঞান করে আসছে, তাকে অপমানিত করে পিতার কক্ষ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে না। তাই একান্ত অস্থির হয়ে সে কক্ষের বাইরে অপেক্ষা করছিল। পিতার আহ্বানে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে কক্ষে প্রবেশ করলো।

জাহানারা প্রবেশ করতেই সম্রাট কোন আদেশ করবার আগেই আনার মাথা নত করে কক্ষ থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

সেদিকে তাকিয়ে জাহানারা ভ্রূকুটি করে তারপর পিতাকে জিজ্ঞেস করলো—আমাকে কি আহ্বান করেছেন পিতা !

শাহজাহান জাহানারার দিকে না তাকিয়ে পালঙ্কের মাঝে ভালভাবে শুয়ে চোখ বুজে ক্লান্তস্বরে বললেন—আমার শরীরটা আজ ভাল চলছে না বেটি। উৎসবের শেষানুষ্ঠান তুমিই সমাপ্ত কর। আমার অনুপস্থিতিতে সম্রাটের অনুগ্রহলাভে কেহ

যেন বঞ্চিত না হন, সেদিকে দৃষ্টি দিও।

হঠাৎ জাহানারা কি একটা কথা বলবার জন্যে দু'চারবার চেষ্টা করলো কিন্তু না বলতে পেরে পিতার কপালে নিজের কোমল হাতের ছোঁয়া দিয়ে তাঁকে নিশ্চিন্ত করে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

জাহানারা কি বলতে চাইলো, প্রকাশ হল না। কিন্তু সে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আনারের সব কথাগুলিই শুনেছিল। তবে কি জাহানারা পিতাকে কোন অনুরোধ করতে চাইছিল?

কিন্তু জাহানারার যে কথা অব্যক্ত থাকলো তা আর ব্যক্ত করবার প্রয়োজন হল না।



অল্প কিছুক্ষণ পরেই উৎসব মুখরিত প্রাসাদ সহসা আতঙ্কে থর থর করে কেঁপে উঠলো।

জশন-ই নৌরোজ উৎসবের শেষদীপ রাজপ্রাসাদ থেকে নিভে যাবার আগে চতুর্দিকে সংবাদ ছড়িয়ে গেল অন্তঃপুরের আর একটি জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে।

তবে সে রোগযন্ত্রণা ভোগ করে মরে নি। মরেছে একান্ত নির্মমভাবে। নিজের জ্বালাময় বক্ষে ছুরিকাঘাত করে আত্মহনন যজ্ঞ সম্পন্ন করেছে। রক্তের বন্যায় অন্তঃপুরের একটি কক্ষ ভেসে যাচ্ছে। ঐশ্বর্যময় কক্ষের জৌলুসের সঙ্গে আরো জৌলুস বর্দ্ধিত করে এই শোণিতবর্ণ নিজের প্রকাশ প্রতিষ্ঠিত করেছে।

শাহজাহানের কাছে যখন সংবাদ গেল, তিনি কিছুমাত্র শোক প্রকাশ না করে বললেন—এ বেশ ভালই হল। ও যদি নিজে আত্মহনন না করত, তাহলে ওর মৃত্যুর জন্যে অবিশ্যি ঘাতককে সংবাদ দিতে হত। আবার দিল্লীর সম্রাটের হাত রমণী-রক্তে কলুষিত হত, তারপর রক্ষীদের তিনি আদেশ দিলেন—আনারউন্নিসার কবর দেবে আমরাই নির্মিত নয়া উদ্যানের বাঁদী সমাধির মধ্যে। তার কবরের ওপরে একটি ছোট্ট সৌধ তৈরী করে দেবে, আর সে সৌধটি যেন আনারের মতই সুন্দর হয়।

কিন্তু একটি প্রশ্ন, সম্রাট আনারকে বাঁদী সমাধির মাঝে সমাধিস্থ করার হুকুম দিলেন কেন? আনার তো বাঁদী ছিল না! আনার বাঁদীও ছিল না, বেগমও ছিল না কিন্তু সে তো আওরত ছিল! সম্রাটের হারেমে যে সমস্ত আওরত বিনা পরিচয়ে সম্রাটের ভোগের নিমিত্ত ব্যয়িত হত, তারা মারা গেলে তাদের যেখানে কবরস্থ করা হত—সেখানে কেন আনারকে সমাধিস্থ করার হুকুম দিলেন না? তবে কি আনারকে পরিচয়ের মাঝে স্বীকৃতি দেবার জন্যে তিনি বাঁদী সমাধিতে তাকে উৎসর্গ করলেন? তাই যদি তাকে মৃতুর পর সম্মানিত করলেন—তবে কেন বেগমদের

সমাধিতে তাকে উৎসর্গীকৃত করলেন না। আনার তো আর এসে তার অধিকার চাইতো না!

কিন্তু কে জানে, কিসের উদ্দেশ্যে সম্রাটের এই আয়োজন?

শাহজাহানের আদেশ মত সব কাজই সম্পন্ন হয়েছিল কিন্তু সেই সমাধির ওপর সৌধ আর তৈরী হয় নি। সম্রাট তারপর এক বিষয়ী কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তাঁর আর মনে পড়েনি। মনে পড়বে আর কেমন করে? এ তো আর মমতাজ নয়! মমতাজের পিতা আসফ খাঁর মত যদি আনারের পিতা ইব্রাহিম খাঁ শাহজাহানকে সিংহাসন লাভে সাহায্য করতেন তাহলে হয়ত আনারের ওপর এমনি অবিচার হত না। আর তার সৌধ তৈরীর কথা না ভুলে বরং আর একটি তাজমহলের মত সমাধিসৌধ তৈরী হত যা পৃথিবীতে আনারউন্নিসার স্মৃতিস্বরূপ প্রকাশিত হয়ে থাকতো। কিন্তু স্বার্থপর দুনিয়া! এখানে হৃদয়ের মূল্য কী? জীবনের মূল্য কতটুকু? মহত্বের মূল্যের কি দাম!

তাই আনার সবার অন্তরালেই থেকে গেল। তার কবরের ওপর দিয়ে পথিকের চলায় সে স্থান একেবারে সমান হয়ে গেল। কেউ জানলো না পায়ে চলা এই মাটির তলায় আছে একটি কবর, যেখানে আনারউন্নিসা বলে একটি খুবসুরত আওরত ঘুমিয়ে আছে, যার কৌমার্য নষ্ট করেছিলেন সেই বাদশাহ যিনি নাকি পরবর্তীকালে তাজমহলের মাঝে প্রিয়তমা মহিষীর পাশে শুয়ে নিজের প্রেমের অম্লান সুরভি ছড়িয়ে রেখেছেন।

বাদশাহ শাহজাহানের কিই বা দোষ ছিল? তাঁর হারেমে তো এমনি কত রমণী স্ব-ইচ্ছায় তাদের রমণীরত্ন তুলে দিয়ে সুখে জীবন নির্বাহ করেছে; কই তারা তো কখনও দুঃখ প্রকাশ করেনি! তেমান আনারউন্নিসা। তার দুঃখের কি আছে? সেও বাদশাহ কর্তৃক সোহাগিনী হয়েছিল কিন্তু সে মমতাজের মত বেগম হতে চেয়ে নিজের অতিরিক্ত দুঃখই ভোগ করেছে। এত বড় আশা যদি না করতো তাহলে সে দগ্ধ হয়ে নিজের মৃত্যু নিজে গ্রহণ করতো না।

তাই আনারউন্নিসার জন্যে কারও দুঃখ নেই। এমনি যে সব রমণী উচ্চাশা নিয়ে সম্রাটের হারেমের মাঝে বাস করে আত্মহনন করেছে, তাদের জন্যে কারুরই অনুকম্পা হতে পারে না। দুনিয়াতে কত উচ্চাশা অনেকে পোষণ করে, তাদের সে উচ্চাশা কখনও সবই পূরণ হয় না।

সুতরাং আনারের জন্যে যদি কেউ দু'ফোঁটা অশ্রু ত্যাগ না করে, তাহলে অন্যায় আর কী ·

তাই আনারের ঐ সৌধহীন মাটির নীচে শায়িত মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে বলতে ইচ্ছে হয়, আনারউন্নিসা তোমার রূপ ছিল সত্যি! কিন্তু তুমি সেই নিজের রূপে নিজে মুগ্ধ হয়ে লোভের হাত প্রসারিত করেছিলে। তুমি চেয়েছিলে, তুমি কেন বাদশাহের মহিষী হয়ে অন্তঃপুরের ইজ্জত বাড়াবে না? তোমার যা আছে, একজন মহিষীর তুলনায় কম কিছু নয়। এই বিচারই তোমাকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে গেছে।

তারপর তুমি চাইলে মমতাজের মত হতে। মমতাজের সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী হতে। এমন কি জগদ্বিখ্যাত তাজমহলের মর্মর স্মৃতি-সৌধের অনুরূপ স্মৃতি-সৌধের মাঝে অক্ষয় হতে! মমতাজ যা পেয়েছিল তুমিও তা পাবে না কেন—এই ছিল তোমার অভিযোগ।

কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি কি মমতাজের মত কোন সৌভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলে? মমতাজের পূর্বপুরুষ ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের একান্ত সুহৃদ। বিশেষ করে, নূরজাহানের ভ্রাতার কন্যা ছিলেন মমতাজ। আর তুমি নিজে তুলনা করলে শুধু রূপের যাচাই দিয়ে মমতাজের সঙ্গে। রূপ জীবনের সব নয়, একথা জানা তোমার উচিত ছিল। রূপ ছাড়াও কৌশল দরকার, সে কৌশল প্রয়োগে তোমার কৃতিত্ব ঠিক প্রকাশ হয়নি।

যাই-হক—তবু তোমার জন্যে বড় কষ্ট হয়। তুমি যা চেয়েছিলে তা অবশ্য একেবারে অন্যায় নয়। কিন্তু তোমার প্রেমের অগুরু সুবাসে কি কেউ সুরভিত হয়েছিল? সম্রাট শাহজাহান তোমাকে যেটুকু অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন সে তাঁর করুণামাত্র। আর শেষ দিন তোমার প্রতি যে অবিচার প্রদর্শন করলেন সেটি বাদশাহের বাদশাহী বিচারের ফল। এবং শেষদিনই বুঝতে পারলে—সম্রাট শাহজাহান কখনও তোমার সঙ্গে মহব্বত করেন নি। শুধু গ্রহণ করেছিলেন আর সে গ্রহণ শুধু তোমার লোভাতুর যৌবনপুষ্ট দেহের আকর্ষণের জন্যে।

যাই হক—তোমার বোঝা উচিত ছিল—ওঁরা বাদশাহের জাত। ওঁদের শোণিতে অনেক রক্তের মিশ্রণ। ওঁরা উচ্চাশা নিয়ে জন্মেছেন। ওঁরা বেইমানকে নির্মম শাস্তি দেন। কিন্তু নিজের বেইমানীকে বাহবা দেন। তোমার মত একটি আওরতকে ওঁরা সম্মান না দিতে পারেন, অনুতপ্ত হন না।

তোমার ক্ষতবিক্ষত দেহটি আজ কবরে শায়িত হয়ে যন্ত্রণা ভোগ করছে কিনা জানি না। তবে তোমার মত উচ্চাকাঙ্ক্ষী রমণীদের কাছে অনুরোধ তারা তোমার দৃষ্টান্তে অনুতপ্ত হয়ে, যা পাওয়া যাবে না তার দিকে না ছুটে যা পাওয়া একান্ত সহজ তার দিকে যেন এগিয়ে যায়। তুমি বেগম হতে চেয়েছিলে কিন্তু সারাজীবন বাঁদীর সম্মানও পেলে না। বাঁদীরও যে সম্মান, তোমার তাও ছিল না। তুমি যদি এসব না চেয়ে শাহজাদার রূপে মুগ্ধ না হয়ে অনলে না পুড়ে কোন আমীর বা ওমরাহের প্রতি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে তাহলে হয়ত তোমার শেষ পরিণতি এমনি নির্মম হত না। কিন্তু তোমার আশা ছিল বিরাট, কামনা অসীম—তাই এই চরম পরিণতি।

কেউ যদি তোমার এই কাহিনী জেনেও তোমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন না করে তবে সবার অন্তরের মাঝে যিনি অধিষ্ঠিত, সেই অদৃশ্যমান তোমার কবরে শায়িতা আত্মার শান্তি কামনায় দু'ফোঁটা অশ্রু ত্যাগ করবেন।

এ ছাড়া তোমার মত পরিচয়হীন একটি রমণীর জন্যে আর কি-বা আশা করা যেতে পারে?

আনার যখন সম্রাটের কক্ষ থেকে বিতাড়িত হয়ে বেরিয়ে এসেছিল সেসময় তার মানসিক অবস্থা স্মরণ করে একটি প্রার্থনাই মনে হয়, দুনিয়াতে আর কখনও যেন কোন রমণীর জীবনে সে মুহূর্ত না আসে।

আনার যেন বিরাট অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে একটু আলোর জন্যে বার বার দিশেহারা হয়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু কোথায় আলো? আলো নেই। শুধু মসিমাখা তমসাচ্ছন্ন নিবিড় অন্ধকারের আর্তি। আর সে আকুল হয়ে সেই অমসৃন দুর্গম পথ দিয়ে চলতে চলতে বার বার আতঙ্কে শিহরিত হতে লাগলো। চোখের সামনে সেই অন্ধকারের মধ্যে শুধু মৃত্যুর নিশানা। কে যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগলো—আয় আয়।

এ দুনিয়া বড় নির্মম স্থান। তোমার স্থান এখানে নেই।

মৃত্যুকে বড় ঘৃণা করতো আনার। সেই মৃত্যুই তাকে সেই মুহূর্তে—বার বার হাতছানি দিয়ে ডেকে বলতে লাগলো—আমার ক্রোড়ে, আছে পরম শান্তির আশ্রয়। সেখানে কোন অবিচার নেই। মানুষ মরে গেলে তার আত্মার কোন যন্ত্রণা থাকে না, তুমি চলে এস, আর রাজসিক ঐশ্বর্যের বিলাসের মাঝে অবগাহন করে অশান্তিময় দুনিয়াতে থাকতে হবে না। বরবাদী জীবন চিরতরে ধবংস করে দাও। কোন মায়া নয়, কোন মমতা নয়, অনুকম্পাও মনে স্থান দিও না।

আনার নিজের কক্ষে প্রবেশ করলে সেই মৃত্যুই তাকে দূতের বেশে এসে তার বালিশের তলায় রক্ষিত ছুরিকাটি হাতে তুলে দিল। আর সে কোনরূপ দ্বিধা না করে আমূল বসিয়ে দিল তার লোভাতুর বক্ষের ঠিক মধ্যস্থানে।

তারপরেই একটি বিকট চীৎকার অনুরণিত হয়ে সমস্ত প্রাসাদের উৎসব কলরব স্তব্ধ করে দিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠলো। মুহূর্তে মর্মরময় স্তব্ধ প্রাসাদের বক্ষে কম্পন সৃষ্টি করে এক অমঙ্গলের বার্তা চারদিকে ছড়িয়ে গেলো।

আনারের প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহ কারুকার্যমণ্ডিত হর্ম্যতলে পড়ে রইল। অন্তঃপুরের চতুর্দিকে তখন একটা ভয়ের আতঙ্ক বিস্তার করেছে।

কিংবদন্তীর অঞ্জনা

রাখহরি ভট্টাচার্য পূজা সারতে বেরিয়েছিলেন। নিত্য পূজো। তাড়াতাড়ি না সারতে পারলে রোদে তেতে উঠবেন। তারপর বাড়ী ফেরাও মুস্কিল হবে। যজমান ঘর অনেক। মাথায় ভেজা গামছাটা দিয়ে আদুল গায়ে, উপবীতটা চেপে ধরে দুর্গা নাম জপতে জপতে এগোচ্ছিলেন। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। চোখ দুটো গোল গোল হয়ে উঠল। তারপর নারায়ণের বাক্সটা চেপে ধরেই পিছন ফিরে দৌড় মারলেন।

এত জোরে দৌড়তে লাগলেন যে, ফৌজের আগেই গ্রামে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু গ্রামে এসে বলতে আর তাঁকে হল না। গ্রামবাসীরা শব্দ শুনেই চমকে উঠেছে। তার সাথে ধুলোর ঝড়ে আকাশ বাতাস কালো হয়ে উঠল। যেন কটা ক্ষেপা হাতি ছুটে এসে শান্ত গ্রামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সূর্য তখন মাথার উপরে রক্তবর্ণ চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। পাখিরা আপন স্বরে গান গাইছিল। তারা হঠাৎ তাদের কলকাকলি থামিয়ে দিল। গাছগাছালির সবুজ বুকে মৃদুমন্দ বাতাস বইছিল, তাও থেমে গেল। থেমে গিয়ে সকলে তাকিয়ে থাকল সেই ধুলোর ঝড়ের দিকে। গ্রামবাসীরা আর রথের ওপর ছিটিয়ে ছড়িয়ে থাকল না, তারা যেদিকে পারল প্রাণ নিয়ে লুকিয়ে পড়ল। সবার মুখেই সন্ত্রাস ভাব! গ্রামের বৌ-ঝিরা কলসি কাঁখে ঘাটের পথে যাচ্ছিল, এই দেখে ছুটে পালাল।

সার সার অশ্বের ওপর সওয়ার হয়ে বাদশাহী ফৌজ চলেছে। ছোট্ট গ্রামের বুকে এত ফৌজের আমদানী যেন আতঙ্কের মত। মড়্‌মড় শব্দে গাছপালা ভেঙে পড়ল। ভেঙে পড়ল কারও সাজানো সব্জী বাগান। রিসালাদার ফৌজের মুখে কোন কথা নেই, তারা চলেছে তো চলেছেই। কিন্তু কোথায় যায় তারা? কি কাজে এই আবর্জনাতুল্য বরবাদী গ্রামে ঢুকেছে? কি চায় এরা? তবে কি কোন গোপন মতলব আছে? গ্রামবাসীরা সেই সব কথাই ঘরের আগল বন্ধ করে ভাবতে লাগল, আর বাড়ীর মেয়েদের সাবধান করে দিল—কেউ যেন ভুলেও বাইরে উঁকি না মারে? কৌতুহল আর বেশীক্ষণ থাকল না। ফৌজরা গ্রামের পূর্বপ্রান্তে যেখানে বড় একটি ময়দান ছিল, যার পাশে শান্ত জলের রূপসী দিঘি, সেখানেই ছাউনি পাতল।

খবর আরও ছুটে এল। ফৌজের সঙ্গে আছেন বাদশাহ্‌ শাহ্‌জাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ্‌সুজা। তিনি একদিন বিশ্রাম নিয়ে উত্তরবঙ্গে এগিয়ে যাবেন। এই বিশ্রামের জন্যেই ছাউনি। সারি সারি সাদা বকের মত ছাউনি পড়েছে। পাখীয়াল ময়দান ভরে ছাউনি। ময়দানের দু-পাশে আম, কাঁঠালের গাছ।

গ্রীষ্মকাল। সূর্যের তাপে কাঁঠাল পেকে মধুর গন্ধ ছড়িয়েছে। তালগাছে তাড়ির কলসি ঝুলছে। দিঘির জলে সবুজ পাতার ছড়ানো বুকে লাল লাল পদ্ম।

মৌমাছির ঝাঁক কোথা থেকে যেন কোথায় উড়ে যাচ্ছে। নীল আকাশ ছেয়ে হলুদ বর্ণের প্রখর সূর্যরশ্মি, যেন কোন গ্রাম্যবালিকা হলুদ কাপড় ছুপিয়ে পরেছে। আকাশের শূন্যে কটি চিল বৃত্তাকারে ঘুরছে ; শকুন তাকিয়ে আছে তীব্র চোখে মরা জিনিসের লোভে। পানকৌড়ি গাছের ডালে বসে দিঘির জলের দিকে তাকিয়ে আছে, শিকারের লোভে তার চোখ দিয়ে লালা ঝরছে।

গ্রামবাসীরা সেদিনের জন্যে সব কাজে ইস্তফা দিল। সবাই ঘরে ঢুকে আগল বন্ধ করে চুপচাপ ভাবতে লাগল। কি ব্যাপার ? কোন্ মতলবে বাদশাহী ফৌজ, সঙ্গে খোদ শাহ্‌জাদা ? আন্দাজ করবার চেষ্টা করতে লাগল। খবর যেটা রটেছে সেটা যে ঠিক নয়, তাই সকলের মনে হল। কিন্তু কে বেরুবে বাড়ী ছেড়ে ? কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে ?

শাহ্‌জাদা শাহ্ সুজার স্বভাব জানা তো কারুর বাকী নেই ? তামাম হিন্দুস্থানের শ শ মুল্লুকের সবাই জানে, শাহ্ সুজার স্বভাব। ইচ্ছে করে, ঐ বুজদিল্ লম্পট স্বভাবের মানুষটাকে বেপাত্তা করে দিতে। লালসায় ভরা চোখ দুটো তুলে নিয়ে কুত্তা দিয়ে খাওয়াতে। হিন্দুস্থানের সবচেয়ে সেরা বাদশাহ্ শাহ্‌জাহানের পুত্র বলে তাই, তা না হলে ষড়যন্ত্র কি দানা বেঁধে ওঠে নি !

হিন্দু, মুসলমান কাফের মোল্লা সবারই মনে সেই একই ইশারা। বাতাসের বুকে শুধু ষড়যন্ত্র আর ষড়যন্ত্র। কিন্তু কোন হুঁশিয়ারীই কাজে লাগেনি, সব ষড়যন্ত্রকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে ঐ দিল্লীর বুকে মুঘল পতাকা আজও তেমনিভাবে উড়ছে। সারা হিন্দুস্থানের নারীপুরুষ তাদের নিরাপত্তার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে। সব প্রার্থনাই বুঝি পরিহাসের মত। নসীব যাদের ঈশ্বর কেড়ে নিয়েছেন, তাদের প্রার্থনা বুঝি ঐ ভুখা দরবেশের মত।

শাহ্ সুজা লুটছেন। বঙ্গদেশের শাসনকর্তা করে বাদশাহ্ পিতা পাঠিয়েছেন, আর শাহ্‌সুজা এই শ্যামল সবুজ নরম দেশে এসে সরাব পানের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন। নাচো, গাও, পিও। মজাসে জিন্দেগী ভরিয়ে রাখো। শাহ্‌সুজা বঙ্গদেশে এসে আর কিছু খুঁজছেন না। কোন রাজকর্ম, দেশের জন্যে কোন উন্নতি, জমিতে ফসল হল কিনা তার জন্যে খবরদারী, ওসব তাঁর হুঁশের বাইরে। তিনি শুধু খুঁজছেন আরও মজা, নিত্য নতুন মজার খোঁজ পেলেই সামনে যাকে পান খুশিতে ইনাম দিয়ে দেন।

তাই ফৌজরা অস্ত্র ত্যাগ করেছে। হাতে নিয়েছে সরাবের পেয়ালা, চোখে পরেছে কামনার সুর্মা।

তারা খুঁজে চলেছে দিল্ বিগড়ে যায় এম্‌নি খুবসুরত আওরৎ। আওরতের আগ-জ্বালা রূপেতে থাকবে পুড়িয়ে দেবার দাহ। দেহের বাঁকে বাঁকে থাকবে দুনিয়ার সব চেয়ে মজাদার চমক। তবেই না মহফিল, তবেই না গানা বাজানা আউর দুসরা কুছ।

ফৌজরা মোসাহেব সেজে কানে আতরের তুলো গুঁজে খুঁজে চলেছে। গ্রাম

থেকে গ্রাম, এক তল্লাট থেকে আর এক তল্লাট।

ঝোপঝাড়, পুকুরধার, কারুর ঘরের আনাচে কানাচে একবার চোখ পড়লেই হল। আর সে যদি খুবসুরত হয়, হয শাহজাদার এক রাত্রের খোরাকের মত, তাহলে আর তার পরিত্রাণ নেই। বোনের ইজ্জত রক্ষাব জন্যে ভাই ছুটে যেতে চায়। কন্যার সম্ভ্রম বাচাবার জন্যে বাপ এগিয়ে যায় কিন্তু তার পরিণাম তো সবাই জানে! কানে আতরের তুলো গোঁজা মোসাহেব তখন ফৌজে পরিণত হয়, তরবারির এক কোপে বাধাদানকারীর জীবন কেড়ে নিয়ে তুলে নিয়ে চলে যায় মজার সামগ্রী।

শাহ্ সুজা হয়ত দু একদিন সেই সদ্য ফোটা যৌবন তনুটি নিয়ে লোফালুফি খেলেন, তারপর কি ভেবে দিয়ে দেন ফৌজদের বিলিয়ে। ভাল লাগে না তাঁর, কোন মজাই ভাল লাগে না। আওরৎ যেন তাঁর কাছে একঘেয়ে হয়ে আসছে। সরাবও আর ভাল লাগে না। নর্তকী নাচলে বলেন—খাঁমোশ।

পাখীয়াল ময়দানটা ছিল ছেলেদের খেলাধুলা করবার জায়গা। আর ধোপারা দিঘির জলে কাপড় কেচে ঘাসের ওপর মেলে দিত।

সেই ময়দানে সারি সারি তাবু। সাদা ডোরাদার কাপড়ের ছাউনি। ছাউনির ওপরে ব দশাহী পতাকা উড়ছে। শৌর্যবীর্যের প্রতীক ঐ মুঘল পতাকা।

ঘোড়াগুলোকে একপাশে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তারা ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে তুলছে। এ পাশে ফৌজী সেনারা পোষাক খুলে ফেলেছে। তাদের পরণে ঢিলে পায়জামা, গায়ে লম্বা পিরান।

অশ্ব পৃষ্ঠে রসদ এসেছে। রান্নার ব্যবস্থা হচ্ছে। কিছু কিছু মেয়েলোককেও এদিক ওদিক দেখা যাচ্ছে। দিঘির জলে চলেছে ফৌজীদের মাতামাতি। তারা যেন কিশোর বয়স ফিরে পেয়েছে।

শাহ্সুজার বেগমরা কেউ আসেননি, তারা রাজমহল প্রাসাদে। শুধু সঙ্গে আছে কিছু মনোহারিণীর দল আর বাঁদী। তারাই আলাদা দুটো তাঁবুর মধ্যে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। শাহ্জাদা সুজা এসেই সরাবের পেয়ালা ধরেছেন। সরাব ছাড়া যেন তার কিছুই ভাল লাগে না। শুধু সরাব পেয়েই সন্তুষ্ট নন, নাচ-ওয়ালীকে ফরমাইস করেছেন নাচের জন্যে। তাই সুজার তাঁবুতে তখন দিনের বেলাতেই মজলিস বসে গেছে। হঠাৎ শাহ্জাদা সরাব পান করতে করতে ঢুলু ঢুলু চোখে কাকে যেন ডাকলেন। কিন্তু সে না এসে অন্য একজন সেলাম করে দাঁড়ালে, তাকে জড়িতস্বরে ধমক দিলেন—এই উল্লুককা বাচ্চা, তুম কৌন হ্যায়? রহিম আলি কো বোলাও। রহিম আলি কোথায় যেন গিয়েছিল, তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না, শাহ্জাদার তখন মেজাজ চড়ে গেছে।

নাচ থামিয়ে দিয়ে, সরাবের পেয়ালা ছুঁড়ে দিয়ে টলতে টলতে উঠে দাড়িয়েছেন। এই সময় রহিম আলি এসে উপস্থিত হল। ফৌজের সেরা একজন সৈনিক। তাছাড়া শাহ্জাদার প্রিয়পাত্র। অনেক বেহুঁশ জীবনের রসদ সে জুগিয়ে চলে। তাকে দেখেই যেন শাহ্জাদার মেজাজ আরও সপ্তমে উঠল। একটা গালি ছুঁড়ে দিয়ে মুখ

বিকৃত করে বললেন—এই যে বেসরম কুত্তা, কোথায় বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল ? রহিম কি যেন বলতে গেল। কিন্তু শাহ্‌জাদা আবার একটা গালি ছুঁড়ে দিলেন, তারপর বললেন—কভি নহী ? আসলি চিজ লে আও।

রহিম তখন গালি হজম করেও বলল—হুজুর, আর কিছুক্ষণ সময় লাগবে। আঁধারটা নেমে এলেই তাকে এনে দেব।

ও সব কোন বাত আমি শুনতে চাই না। আভি লে আও। আমার নেশা ভাল জমছে না। কেউ আমাকে কোন আনন্দ দিতে পারছে না। দেমাগটা বিলকুল গড়-বড় হয়ে যাচ্ছে। তুমি আচ্ছা চিজ দেবে বলে এত পথ আমাকে তক্‌লিফ দিয়ে নিয়ে এলে, এখন বলছ আরও সময় লাগবে। তোমার মতলবটা কি বলবে মিঞা ?

হুজুর আমাকে আপনি বিশ্বাস করুন। আমি যা বলেছি তার এতটুকু মিথ্যে নয়। শুধু গ্রামের মধ্যে একটা গন্ডগোল করতে চাই না বলে সময় নিচ্ছি। আঁধারটা হলেই তাকে ভুলিয়ে আপনার ছাউনিতে এনে তুলব। শাহ্‌জাদা সুজার তখন চোখ দুটি নেশায় ঢুলঢুলু, তিনি বললেন—কেন গন্ডগোলের কি আছে ? কাফের প্রজারা কি আমার বিরুদ্ধাচরণ করতে চায় ? তাদের মাথা এত শক্ত ?

না হুজুর, তারা এখনও পর্যন্ত কিছুই বলে নি।

তবে ? তবে কেন এই বিলম্ব ? আমি যে আর বিলম্ব সইতে পারছি না। কত দিন নতুন আওরতের মুখ দেখি নি। তাদের দীঘল কালো চোখে মুক্তার মত টলটলে জল দেখিনি। তাদের ভয়ে ভাবনায় ব্যাকুল ইজ্জত হারাবার আর্তনাদ শুনিনি। ...তুমি তো জানো না বুর্বাক আলি, এ যে কি আনন্দ, ভীরু আওরতের সেই ব্যাকুল প্রার্থনা শুনলে মনে হয় ভয়ার্ত কোন হরিণী বুঝি বাঁচবার প্রার্থনায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আর সেই আহত পশুর জীবন নিয়ে আমি খেলছি শাহ্‌জাদার সম্মান নিয়ে এক নতুন শক্তির খেলা।

রহিম আলি মাথা নত করে বলল—হুজুর আর কিছুক্ষণ মেহেরবানী করে অপেক্ষা করুন, আমি তাকে যখন এনে দেব বলেছি দেবই।

দেব যখন বলেছ দিচ্ছ না কেন ? বিলম্ব কি জন্যে ? ফৌজ সঙ্গে নাও, ঘর জ্বালিয়ে দাও, গ্রামবাসীদের লোপাট করে দাও—তারপর নিয়ে চলে এস সেই খোদার মেহের বাণীকে।

না হুজুর, সেরকম কিছু করতে গেলে মেয়েটাকে জিন্দা পাওয়া যাবে না।

তাহলে এত ফৌজ সঙ্গে নিয়ে এলে কেন ? তাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেই তো হত।

না হুজুর, এত ফৌজ সঙ্গে আনা হয়েছে বলেই গ্রামবাসীরা ভয় পেয়েছে। মেয়েটাকে ধরে আনলেও তারা কিছু বলবে না।

তাহলে এখুনি নিয়ে এসো। তুমি যদি না আনো, তাহলে আমি নিজেই যাই। গিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসি এই মজার আসরে।

এই বলে শাহ্‌জাদা নিজের আনন্দেই হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হেসে উঠলেন।

তারপর উঠে দাঁড়াতে গেলেন কিন্তু পারলেন না। বসে পড়ে মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে কপালের রগ দুটো চেপে ধরলেন, তারপর বললেন—তবিয়ৎ বিলকুল ঠিক নহী। যাও তুম। জলদি কাম হাঁসিল কর।

রহিম বেরিয়ে এল চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে। তারই এখন মহাবিপদ আসন্ন। এদিকে শাহ্‌জাদা, বুজদিল একরোখা বেয়াদপ মেজাজী। যা কবুল করেছে দিতে না পারলে নির্ঘাৎ গর্দান নেবেন। আর ওদিকে বেয়াড়া এক পরিবারকে বশ করে মেয়েটাকে ছিনিয়ে আনতে হবে। প্রস্তাব এখনও যায় নি, তবে তার মুসাবিদা চলছে। ষড়যন্ত্র অনেকদিন থেকে দানা পাকিয়ে উঠছিল, লালঝুঁটি গ্রামে যে একটি খাসা আপেল দিন দিন কাবুলের মেওয়ার মত রসাল হয়ে উঠছে সে খবর দিয়েছিল একজন ফৌজ। ফৌজের আবার কি রকম সম্পর্কের ভাই সাহায্য করবে ব'লে এগিয়ে এসেছিল। ফৌজী ও তার ভাই দু'জনই কাফের। কাফেরদের বিশ্বাস নেই। তবু রহিম বিশ্বাস করেছিল। বিশ্বাস করেছিল এই ভেবে যে এছাড়া তো উপায়ও কিছু নেই।

ফৌজী রামনাথ গ্রামে আসেনি। সঙ্গে এসেছিল সেই দূর সম্পর্কের ইন্দ্রজিৎ। লালঝুঁটি গ্রামের বাসিন্দা নয়, তবে এ জেলাতেই তার বাস। তবে লোকটি বেশ ধূর্ত, কাজ হাঁসিল করবার যে শলা পরামর্শ দিয়েছিল তাতে বিশ্বাস হয়েছিল। তার ওপর বিশ্বাস করেই সে এতদূর এগিয়েছে। এখন শেষ উদ্ধার হলেই হয়। তবে কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে কাফেরকে। সে মাঝে মাঝে ছাউনিতে আসছে আর কোথায় উধাও হয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলেই বলে—ব্যবস্থা করছি, একজনের গৃহস্থ মেয়েকে ধরে নিয়ে আসব, তার জন্যে জমি তৈরী করতে হবে না !

তারপর এসে বলল—না, যত তাড়াতাড়ি কাজ হাঁসিল হবে ভেবেছিলাম তত তাড়াতাড়ি হবে না। ব্যাটা ব্রাহ্মণ বাপটা বড় তেঁড়েটে। রাত না হলে কিছুই করা যাবে না।

রহিম আলির কেমন যেন অসহ্য লেগেছিল, তারও ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা অল্প, তাছাড়া শাহ্‌জাদাকে সে চেনে। বেশী দেরী হলে তিনি যে ক্ষাপ্পা হয়ে উঠবেন তা সে জানে। তাই সে বলেছিল—অতো তক্‌লিফ করবার কি আছে? ফৌজ তো সঙ্গেই আছে, দরকার হলে সমস্ত গ্রামটাই ধ্বংস করে দেওয়া হবে। যদি অসুবিধা থাকে বলো সেই ব্যবস্থাই করি।

কিন্তু সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে ইন্দ্রজিৎ আবার উধাও হয়েছিল।

ইন্দ্রজিৎ তখন সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে। রাখাল ভট্টাচার্য সেই ব্রাহ্মণ। যার ব্যবসা পূজারীগিরি।

কিন্তু রাখাল ভট্টাচার্য কিছুই জানে না, জানে তার মেয়ে অঞ্জনা। সত্যিই সেই কুমারী মেয়ে সাতরাজার ঐশ্বর্যের রূপ নিয়ে রাখাল ভট্টাচার্যের দরিদ্র ঘরে জন্মেছে। বাপ ও মেয়ে। সংসারে আর কেউ নেই। আর আছে রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর। সেই ঠাকুরের সেবা ও ছোট্ট সংসারটি দেখেই অঞ্জনার দিন কাটে। বয়স কত? খুব জোর চোদ্দ। কিন্তু চোদ্দ বছর বয়েসে যেন চন্দ্রের চোদ্দটি কলার সুষমা সে পেয়েছে।

মেয়ে ডাগর হয়ে উঠেছে। ঘরে রাখা উচিত নয়। বিয়ে দিতে হবে কিন্তু বিয়ের কথা মনে এলেই রাখাল ভট্টাচার্যের বুকটা শুকিয়ে যায়। অঞ্জনা ঘর অন্ধকার করে চলে যাবে মনে হলেই তার কাজকর্মে আর হাত পা চলে না।

সেই অঞ্জনার সঙ্গে একদিন ইন্দ্রজিতের আলাপ হল।

ইন্দ্রজিৎ আজ সাধারণ ঘরের সন্তান হলেও তার পূর্বপুরুষ ছিল গৌড়ের নবাবের অমাত্য। দাঁয়ুদ খাঁ যখন গৌড়ের মহান প্রতাপশালী নবাব, তখন তার পূর্বপুরুষরা সেই পাঠানবীরকে অনেকভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাই ইন্দ্রজিতের শরীরে ছিল রাজঅনুগ্রহের রক্ত। কিন্তু রাজার অনুগত হওয়ার চেয়ে তার মনে যেন অন্য সুরের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এখন শাহ্ সুজা বাংলার বুকে উচ্ছৃংখলতার স্রোত বইয়ে চলেছেন। সকলে নীরবে অত্যাচার সহ্য করছে, আর ভগবানকে ডাকছে। ভগবান যেন এই পাপীর শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

ভগবানই একমাত্র দুর্বলের সহায়, ঘরের বৌ, মেয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে সমাজটাকে যে রকমভাবে কলঙ্কিত করে তুলছে, তাতে ভগবান সহায় বলে বুঝি সবলরা আর বসে থাকতে পারে না। চিরকাল রাজার বিরুদ্ধে যেমন একদল শক্তিশালী দল গড়ে ওঠে, আবার তা ভেঙেও যায়, বাংলায় সেদিন এমনি এক একটি দল গোপনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। ইন্দ্রজিৎ তেমনি একটি দলের একজন সভ্য। তারই চক্রান্তে আজ বাদশাহ্ পুত্র শাহ্সুজা লালঝুঁটি গ্রামে এসে ছাউনি করেছেন।

অঞ্জনা খুব সাহসিনী মেয়ে। ইন্দ্রজিতের প্রস্তাব শুনে প্রথমে না করেছিল, তারপর কেমন যেন সাহস প্রকাশ করেছে। তার কৌতুক আরও মাথা চাড়া দিল যখন দেখল সত্যি সত্যিই শাহ্জাদা গ্রামে এসে পেঁছিলেন।

এবার শেষ খেলা।

রাখাল ভট্টাচার্য দাওয়ার ওপর বসে চোখ বুজে তামাক টানছিলেন।

ইন্দ্রজিৎ নিঃশব্দে রান্নাঘরে ঢুকল। তারপর অঞ্জনার সঙ্গে চাপা স্বরে কথাবার্তা বলতে লাগল।

অঞ্জনা শুধু একবার বলল—আমার লজ্জা সম্ভ্রম সবই তোমার। যদি কিছু অঘটন ঘটে যায় তুমি আমাকে গ্রহণ করবে তো!

ইন্দ্রজিৎ মাথা নেড়ে বলল—তোমার কোন ভয় নেই। তুমি শুধু বাদশাহ্ পুত্রের ছাউনি পর্যন্ত পেঁছিবে, তার আগেই আমরা শাহ্ সুজাকে শেষ করব। খোদ মালিককে শেষ করতে পারলেই ফৌজরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাবে।

অঞ্জনা কি ভেবে বলল—আচ্ছা।

তাহলে ঠিক সন্ধ্যের সময়। আঁধার নেবে এলেই তুমি তৈরী থাকবে। তোমার বাবা যখন রাধাকৃষ্ণের পুজোয় বিভোর থাকবেন, তখন কজন লোক অন্ধকারে এসে তোমার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে তোমাকে নিয়ে যাবে।

অঞ্জনা আর কোন কথা বলল না। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জ্বলন্ত উনুনের দিকে তাকিয়ে রইল। ইন্দ্রজিৎ তারপর বেরিয়ে গেল।

সেদিনের দিনটা বড় উদ্বেগের মধ্যে বিদায় নিল। গ্রামবাসীরা সারাদিন বাড়ীতেই কাটাল। কেউ ভুলেও বাড়ীর বাইরে বের হল না। গ্রামের পথে তখন ফৌজের লোকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কার গাছের ডাব, কার গাছের কাঁঠাল এই পেড়ে খাচ্ছে। ভাঙছে চুরছে ; সাজান বাগান, পুকুরের মাছ, ধানের গোলা তচনচ করে যাচ্ছে-তাই কাণ্ড করছে। তবু কেউ ভয়ে বেরিয়ে তাদের বাধা দিল না।

তখনকার দিনের মানুষের এমনিই ফৌজের ওপর ভয় ছিল। এই ভয়ের মধ্যে দিয়েই সন্ধ্যার অন্ধকার এসে লালঝুঁটি গ্রামের আকাশকে কালো করে দিল। গ্রামবাসীদের ঘরে ঘরে খুব মৃদু শব্দে সন্ধ্যার শাঁখ ঘণ্টা বাজল।



ওদিকে তখন পাখীয়াল ময়দানের ওপর মশালের আলো জ্বলে উঠেছে। মশালে মশালে যেন সারা গ্রামটাই দিনের মত স্বচ্ছ হয়ে গেছে। শাহ্ সুজার তাঁবুতে আবার মজলিশ বসেছে। নর্তকী নাচছে ঘাঘরা ঘুরিয়ে। সারেঙ্গীতে তান উঠেছে জলদ। শাহ্ সুজা মনোহারিণী পরিবৃত হয়ে সরাব পান করে চলেছেন। তাঁর দিল্ বেজায় খুশ। নয়া আওরৎ এখুনি এসে পড়বে। রহিম আলি কসম খেয়ে কবুল করে গেছে। সুতরাং জানের পরোয়া রহিম করে। আর বেইমানী করবে না। তাই শাহ্ সুজা হুঁশ কে ধরে রাখবার জন্যে অল্প অল্প সরাব পান করছেন।

কাঁচুলি সম্বল স্বল্পবসনা মনোহারিণী তার পেলব হাতে স্বর্ণপাত্র তুলে দিচ্ছে শাহ্জাদার মুখে। দিচ্ছে আরও কিছু হাসি, কটাক্ষ, দেহের স্পর্শ, যৌবনের মাদকতা, তবু যেন শাহ্জাদা খুশি হচ্ছেন না।

তাঁর মন তখন ছাউনির দরজার দিকে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে রক্ষী কৃপাণ তুলে। শাহ্জাদার মেজাজে চিড়্ ধরছে! ধৈর্য বুঝি আর ধরে রাখা যায় না। বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে। দূরে জঙ্গলের জোনাকিরা আলো ফেলে চলেছে।

তাছাড়া গ্রামটার চতুর্দিকে যেন কেমন এক নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। রহিম আলি নিজের ছাউনির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছে। খবরটা যদি সত্যি হয় ফৌজদের তৈরী হতে বলাই উচিত। কিন্তু তবু কেমন যেন তার বিশ্বাস হচ্ছে না। ইন্দ্রজিৎ এত বড় বেইমানী করবে? কাফের এক কমজোরী নওজোয়ান, বাদশাহের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায়?

কিন্তু চরের মুখের খবর, তাই মিথ্যে হবে কেমন করে? সেই চরের খবর বিশ্বাস করেই সে পাঠিয়েছে এক জবরদস্ত সিপাইকে ময়দানের চারপাশ ঘুরে আসতে। ময়দানের চারপাশে যে আমগাছ জাম গাছ আছে, তার পাতার আড়ালে নাকি একদল

সশস্ত্র ষড়যন্ত্রকারী লুকিয়ে আছে।

ইন্দ্রজিৎ সেই দলের লোক। ইন্দ্রজিৎকে ধরবার জন্যে লোক পিছনে ছুটেছে। এখন শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লে হয়। আরও লোক গেছে সেই ব্রাহ্মণের মেয়েটাকে ধরে আনতে। তারাও যে কেন এত দেরী করছে বোঝা যাচ্ছে না। রহিম আলি বাতাসের বুকে কান পাতল। মশালের আলো চতুর্দিক আলোকিত করে আছে। এ পাশে কোথাও অন্ধকার নেই। অন্ধকার যা তা ঐ রহিম আলির চোখে।

হঠাৎ জবরদস্ত সেই সিপাইটা এসে চাপা স্বরে জানাল—হুজুর, সর্বনাশ, বহু-লোক এই ময়দানের চারপাশে ঘেরাও করে আছে।

রহিম আলি আর অপেক্ষা করল না। ছুটল শাহ্জাদার তাঁবুতে।

নাচ তখন পুরোদমে চলেছে। শাহ্জাদা তখন অধৈর্য হ'য়ে এক মনোহারিণীর মুখটা বুকের ওপর চেপে ধরেছেন।

রহিম পাশে গিয়ে সুজার কানে কানে বলল—হুজুর, এদিকে আমাদের সর্বনাশ হয়েছে। একদল দুর্বৃত্ত আমাদের আক্রমণ করতে আসছে।

শাহ্জাদার কানে সে সব গেল না, তিনি শুধু মাথা নেড়ে বললেন—কোন বাত আমি শুনতে চাই না। কোথায় তোমার সেই নয়া আওরৎ, তাকে নিয়ে এস।

রহিম আলি অগত্যা শঙ্কিত চিত্তে বাইরে বেরিয়ে এল।

আর এই সময়ে সে দেখল তার প্রেরিত লোক একটি মেয়েকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে ছুটে আসছে। তারা রহিম আলিকে দেখে থমকে দাঁড়াল, রহিম আলি তাদের ইশারায় মেয়েটিকে শাহ্জাদার ছাউনির মধ্যে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিল। মনে মনে সে দারুণ খুশি হল। তার প্রতিজ্ঞা পূরণ হয়েছে। শাহ্জাদার কাছে আর সে অবিশ্বাসী থাকল না। কিন্তু এদিকে তার তখন অন্য চিন্তা। তার মনে হতে লাগল, এখুনি বুঝি দুর্বৃত্তরা ঘাড়ে এসে পড়বে। এই ভেবে সে ছুটল ফৌজদের তাঁবুতে। ফৌজরা তখন শাহ্জাদার মতই মজায় মশগুল। তাদের কাছে রহিম আলি বিপদের কথা বলতে গেল কিন্তু তারা কানেই নিল না। আনন্দের কাছে কি যুদ্ধের কথা ভাল লাগে?

রহিম আলি আবার বাইরে এসে দাঁড়াল। তার ভয় ইন্দ্রজিৎকে। সেই কাফের শয়তান এখন কোথায় সে ভাবতে লাগল। মেয়েটা নির্বিঘ্নে এসেছে। সে এবার পড়বে বাঘের কবলে, বাঘের কাছ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া বড় শক্ত। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ এই ষড়যন্ত্র করল কেন? তবে কি চরের সংবাদ ভুল?

আর ইন্দ্রজিৎ তখন রহিম আলির পাঠানো লোকের পাল্লায় পড়ে দূরে আরও দূরে পালাচ্ছে।

লোকটি তাকে ধরবার জন্যে তৈরী, জখম করবার জন্যে তীক্ষ্ন অস্ত্র তুলেছে আর ইন্দ্রজিতের হাতে আছে সামান্য এক লাঠি। তবে সে ঐ লাঠিটা ছোড়বার সুযোগ খুঁজছিল।

হঠাৎ কোথায় যেন পেঁচা ডেকে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জনার বিপদের কথা

হাতে সে লাঠিটা তাক করে ছুঁড়ে দিল লোকটির মাথা লক্ষ্য করে।

অব্যর্থ লক্ষ্য। তাছাড়া লাঠি চালনায় ইন্দ্রজিৎ ওস্তাদ ছিল।

লোকটি ঘুরে পড়ে গেল, আর ইন্দ্রজিৎ তার ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

লোকালয়হীন এক প্রান্তরে অন্ধকারে দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি চলতে লাগল।

হঠাৎ লোকটি সশস্ত্র ছিল, ছিল তার কোষবদ্ধে তরবারি, কোমরে ছোরা, হাতে বর্শা। বর্শাটা ধস্তাধস্তির সময় অন্ধকারে ছিটকে পড়েছিল। লোকটি হঠাৎ কোমরের ছোরা তুলে ইন্দ্রজিতের কাঁধে আঘাত করল। রক্তে ভিজে গেল ইন্দ্রজিতের জামা। ইন্দ্রজিতও কম শক্তিশালী নয়, সে সেই কাঁধ এক হাতে চেপে ধরে লোকটির খাপ থেকে তরবারী ছিনিয়ে নিল, নিয়ে এলোপাথাড়ি চালাতে লাগল।

রক্তের নদীতে সেই নির্জন প্রান্তর ভরে গেল। লোকটি এক সময় আর পেরে না উঠে ঢলে পড়ল মাটিতে। ইন্দ্রজিৎ তাকে পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াল কিন্তু আর বিলম্ব করা সমীচিন হবে না। তার সংকেতের ওপর নির্ভর করে অগণিত ষড়যন্ত্র-কারী যুবক পাথীয়াল ময়দানের চারপাশে সশস্ত্র তৈরী আছে। অঞ্জনাকে তার ওপর নির্ভর করে এত বড় ঝুঁকি নিতে বলেছিল। এতক্ষণ হয়ত সে শাহজাদার তাঁবুতে পেঁাছে গেছে কিন্তু আর বিলম্ব করলে তাকে আর বাঁচানো যাবে না। ইন্দ্রজিৎ ছুটতে চেষ্টা করল কিন্তু এত রক্তক্ষরণ হতে লাগল যে সে আর চলতে পারল না। শরীরটা ক্রমে ক্রমে ক্লান্ত হয়ে আসছে। অবশ হয়ে আসছে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কিন্তু তাকে পেঁাছতে হবেই। সে না পেঁাছলে অঞ্জনা চিরতরে হারিয়ে যাবে। সে তার ওপর নির্ভর করে এত বড় ঝুঁকি নিয়েছিল। তাকে যে সে বড় ভালবাসে। ইন্দ্রজিৎ আবার উঠে দাঁড়াল। আবার ছুটতে লাগল। অনেকখানি এগিয়ে গেল। দূরে দেখা যাচ্ছে নিঝুম গ্রাম কিন্তু পূর্ব দিকে যেন আলোর বন্যা, মশালের সারি সারি আলোগুলি এতদূর থেকেও দেখা যাচ্ছে। বাতাসে কান পাতলেও শোনা যাচ্ছে শাহজাদার তাঁবু থেকে বাজনদারদের বাজনার শব্দ। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ আর এগোতে পারল না। কেমন যেন কাল ঘুম এসে তার দুচোখ জড়িয়ে দিল। সে অচৈতন্য হয়ে সেখানে ঢলে পড়ল।

আর এদিকে তখন গাছে গাছে সংকেত আদান প্রদান হচ্ছে। ... কর্মী পরস্পরের দিকে বিস্ময়ে চেয়ে আছে। তারা কিছুতে বুঝতে পারছে না ইন্দ্রজিতের ব্যাপার কি? তার সংকেত ছুটে আসছে না কেন? তারা গাছের পাতার আড়ালে সেই দেখল, অঞ্জনাকে নিয়ে শাহজাদার লোকেরা তাঁবুতে ঢুকল। এরপর বিলম্ব করলে যে একটি মেয়ের ইজ্জত আর রক্ষা হবে না, সেই কথা ভেবে তারা ছটফট করতে লাগল। কিন্তু তবু ইন্দ্রজিতের নির্দেশের অপেক্ষায় তারা থাকল।

অনেক অনেক পরে রাত তখন আরও এগিয়ে গেছে। গ্রামের অন্যান্য অংশে অন্ধকারটা আরও চেপে এসেছে। ছাউনির চারপাশের মশালগুলোর আলো ধীরে ধীরে কমজোরী হয়ে আসছে। ঝিঁঝির ঐক্যতান বেড়ে গেছে।

শাহজাদার তাঁবুতে তখন মজলিস মশগুল। তাঁর তাবু থেকেই জোরালো

কণ্ঠস্বর বাইরের নিস্তব্ধ প্রান্তরে ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

এই সময় মেয়েলী আর্তনাদের দারুণ পরিত্রাহি চিৎকার রাতের সমস্ত স্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দিল। আর তখনই নেমে এল গাছ থেকে হুড়মুড় করে সেই আত্মগোপনকারীর দল। একটা গাছ থেকে নয়, অসংখ্য গাছ থেকে, অসংখ্য মানুষের মেলা পিল পিল করে ছুটতে লাগল ফৌজী তাঁবু লক্ষ্য করে।

তারপরই লেগে গেল এক রীতিমত যুদ্ধ। নেশায় মাতোয়ারা ছিল ফৌজের দল। হঠাৎ চটকা ভেঙে গেল। হাতে অস্ত্র তুলে নেবার আগেই লাঠি এসে মাথায় পড়ল। রক্তের বন্যা ছুটল পাথরীয়াল ময়দানে। লালকুঁটি গ্রাম মুহূর্তে একটি রণক্ষেত্র হয়ে উঠল। দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল বাদশাহী তাঁবুগুলো। শাহ্জাদা সুজাকে মুক্তি সেনারা খুঁজতে লাগল। রণক্ষেত্রের ব্যূহভেদ করে বীরেরা শাহ্জাদার তাঁবুর মধ্যে ঢুকল।

কিন্তু তাঁবু ফাঁকা। তাঁবুর একপাশ জ্বলতে শুরু করেছে। ফরাসের ওপর পড়ে আছে কটি অচৈতন্য মেয়ে, আর গড়াচ্ছে পান পাত্র। তারা মেয়েগুলোর অচৈতন্য দেহ উলটে মুখ দেখতে লাগল কিন্তু যাকে তারা খুঁজছিল তাকে দেখতে পেল না।

সেই অভাগিনী মেয়েটি কোথায়? যে এত বড় কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল?

তাকে চতুর্দিকে তারা খুঁজতে লাগল কিন্তু তার দেখা পেল না। এদিকে মত্ত ফৌজরা মারামারি করতে করতে একসময় পলায়ন করল। সমস্ত গ্রাম আগুন লাগিয়ে দিয়ে তারা পালিয়ে গেল।

পরদিন প্রভাত। প্রভাতের আলো ফুটলে দেখা গেল মৃতের পাহাড়ে চতুর্দিক [illegible]য়ে গেছে। তখনও আগুনের ধোঁয়া উড়ছে আকাশে। মুক্তি সেনাদের কয়েকজন [illegible]নও অঞ্জনাকে খুঁজে চলেছে। তারপর তাকে একসময় দেখতে পেল দিঘির জল [illegible]কে [illegible]সে উঠতে।

শাহ্জাদা সুজা তখন তার দলবল নিয়ে অনেক দূরে।

সেই লালকুঁটি গ্রাম এখনও আছে। আছে সেই গ্রামের পুরোনো অধিবাসীর বংশধরেরা। তারা জানে না গ্রামটির নাম পরে কেন অঞ্জনা হয়েছিল। সেই দিঘি এখনও আছে, তবে [illegible]স দিঘিতে আর আগের মত জল নেই। এখন আর [illegible] লাল পদ্ম। এখন সে দিঘি মজে গিয়ে শুধু কালের সাক্ষী হয়ে আছে।

ইতিহাস শুধু মুখ ফিরিয়ে আর এক ইতিহাসের কথা ভাবছে। তবু [illegible] গ্রামের সেই অঞ্জনার কথা আজও কি ভোলা যায়? ভোলা যায় এমনি কে ইন্দ্রজিৎকে, যে প্রণয়িণীর জন্য [illegible] নতুন এক ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছিল!